প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৩৫৭

প্রকাশিকা : মাধবী মণ্ডল

সংবাদ প্রকাশন, ৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক : বীণাপাণি প্রেস, ১০ রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন, কলিকাতা-৬

[illegible] : [illegible] টাকা

শ্রীপ্রদীপ দাশগুপ্ত
স্নেহভাজনেষু

গল্প

নাটক

উপন্যাস

বড়দা বললেন, 'তুই জানালার ধরে বসিস নি। আমাকে বসতে দে। পাহাড়ী পথে গাড়ি যখন ঘুরে ঘুরে উঠবে, চক্কর লেগে যাবে।'

বেশ জমিয়ে বসেছিলুম জানালার ধারে। সরে আসতে হল, বড়দার হুকুম। নড়চড় হবার উপায় নেই। কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি। শিলিগুড়ি থেকে যাব কালিম্পং। কালিম্পং-এ যাচ্ছি ঠিক বেড়াতে নয়। দাদার কিছু কাজও আছে। দাদা বলবে কাজ, বাবা বলবেন অকাজ। দাদার মাথায় অর্কিড ঢুকেছে। গ্যাংটকে কার যেন অর্কিডের চাষ আছে। সেখান থেকে অর্কিড কিনে কলকাতার কাঁচের ঘরে কি যেন বলে কনট্রোলড আবহাওয়ায় লালন পালন করা হবে। যেমন খরচ তেমনি পরিশ্রমের ব্যাপার।

আমার গাছপাগল দাদা। প্রথমে মাথায় ঢুকেছিলো চন্দ্রমল্লিকা। সে এক কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। ছোট টব। বড় টব। মেজো টব। ন টব। টবের ছড়াছড়ি। গাছ এ টব থেকে ও টবে যায়। ও টব থেকে সে টবে। কত রকমের খাদ্য। কালো গুঁড়ো গুঁড়ো। সাদা মিহি মিহি। দানা চিনি চিনি। কত রকম ফুলের নাম, টাইগারস নেল, স্নোবল। পাতা থেকে কালো কালো পোকা ঝাড়ার হরেক রকম ব্রুশ। যত রকমের পুরস্কার আছে ফুলের জন্যে দাদা সব পেয়ে বসে আছে। চন্দ্রমল্লিকার পর এল গোলাপ। ব্ল্যাক প্রিন্স, প্রিমরোস, অ্যালবার্ট, ফিলিপস। গোলাপ আবার চন্দ্রমল্লিকার বাবা।

মা বলেছিলেন, "বাবা, দু একটা পুজোর ফুলের গাছ লাগা না, টগর, করবী, অপরাজিতা, জবা। দাদা ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'রাবিশ'। ও সব ফুলের কোন আভিজাত্য নেই মা। আমার হল মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।

দাদা এখন সেই গণ্ডার মারতে কি ভাণ্ডার লুটতে চলেছেন। নেপালী ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। দাদা জানালার ধারে বহাল তবিয়তে বসে। কোলের ওপর সোয়েটার, মাঙ্কি ক্যাপ। গাড়ি নাকি ঘুরতে ঘুরতে পাহাড়ী পথে যত ওপর দিকে উঠতে থাকবে ততই শীত করবে এবং তখন একে একে সব পরে নিতে হবে। গরম থেকে ঠাণ্ডা, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। একটু অসাবধান হলেই গলায় ঠাণ্ডা লেগে যাবে। বুকে সর্দি বসে যাবে। কোনও রকম ঝুঁকি নেওয়া চলবে না।

বুক পকেট থেকে দুটো ট্যাবলেট বেরোল। একটা আমার একটা দাদার। জলের ফ্লাস্ক পাশেই দোলদোল করে দুলছে।

'নে খেয়ে নে।'

'কিসের ট্যাবলেট দাদা? সর্দির।'

'আজ্ঞে না। বমির।'

'এখন ট্যাবলেট খেয়ে বমি করতে হবে।'

'মূর্খ! গবেট। গাধা।'

বাব্বা এক সঙ্গে তিনটে। গবেট, মূর্খ, গাধা। দাদার গালাগালে সাধারণত পশু, পাখিই আসে। খুব রেগে গেলে, ঘটি, বাটি, ডেকচি, গামলা প্রভৃতি আমাদের স্কুলের সংস্কৃতের মাষ্টারমশাইয়ের ভাষায় যাবতীয় মনুষ্যেতর অপ্রাণীবাচক শব্দ আসিতে থাকে। যেমন, কবে যে তোর বুদ্ধি হবে ব্যাটা জামবাটি।

দাদা এক ঢোক জল দিয়ে বড়িটা খেয়ে নিয়ে বললে, 'এই ট্যাবলেট খেলে বমি বন্ধ হয়ে যাবে।' কথা না বাড়িয়ে ট্যাবলেটটা গিলে ফেললুম। আরও তো অনেক যাত্রীই আমাদের সঙ্গে পাহাড়ে উঠছেন, কই কারুর তো তেমন দাদার মত বাড়াবাড়ি দেখছি না। বাবা তাই দাদাকে মাঝে মাঝেই বলেন, 'শঙ্কর অত উতলা নাই বা হলে, ধীরে ধীরে সব কাজ করবে। হুড়ুম দুড়ুম করবে না, বাড়াবাড়ি করবে না। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে শেখ।'

মাথা ঠাণ্ডা দাদা, ভাবা যায় না। মা বলেন, 'এক একটা ছেলে আমার এক এক রকম। বড়টি আগ্নেয়গিরি, মেজটি ঝড়, ছোটটি মিটমিটে।

আমি নাকি মিটমিটে ডান। ডানপিটের কি করি আমি। সাদা ধবধবে বিছানায় ডিগবাজি খাই। বালিশে বকসিং লড়ি। বাথরুমে জল বেরোবার নর্দমার মুখ এঁটে এঁটে জল ছেড়ে সারা গায়ে সয়ষের তেল মেখে বুকে পিঠে পিছলে পিছলে রুই মাছের মত খেলে খেলে বেড়াই। ছোট বলেই তো এসব করি, বাবার মত যখন বড় হয়ে যাব তখন কি আর বাথরুমে সিলিপ খাব। মা সেদিন বাথরুমের মেঝেতে পা দিয়েই পিছলে ভুম করে পড়ে গেল। পড়ে গেলে রেগে যাবার কি আছে। আমি তো সারাদিনে কতবারই ভুমদাম করে পড়ে যাই। সিঁড়ি বেয়ে। মই থেকে। গাছের ডাল থেকে। খেলার মাঠে। কই আমি তো রেগে যাই না। মা অমনি বাথরুমের মেঝে থেকে তেড়ে এসে আমার কান ধরে দুই থাপ্পড় মেরে বললে, 'বাঁদরটা বাথরুমে মারবার কল বানিয়ে রেখেছে। কাল থেকে বাইরের কলে চান করবি, বাথরুমে আমি তালা দিয়ে রাখব।'

দাদা জানালা আড়াল করে একটা খবরের কাগজ ধরে রেখেছে। চোখ বন্ধ। তুমি জানালার ধারে তাহলে বসলে কেন যদি চোখ বুজে কাগজ আড়াল দিয়েই থাকবে। কত কি দেখার জিনিষ হু হু করে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। পাইন গাছ, ধুপি গাছ, সুন্দর সুন্দর নেপালী বাড়ি, পাহাড়, রঙবেরঙের মানুষ। আশ্চর্য দেশের ভিতর দিয়ে চলেছি ঘুরে ঘুরে। পাক খেয়ে সমতল ছেড়ে উঠে চলেছি হাজার হাজার মিটার উঁচুতে। দাদা সাইডব্যাগ থেকে একটা মোটা অর্কিডের বই বের করে পড়তে শুরু করল। এ তো ভারি মজা। জানালার ধারে বসলে, প্রথমে কাগজ আড়াল, চোখ বন্ধ। তারপর যদিও বা চোখ খুললে, চোখের সামনে বই।

'দাদা, আমাকে জানলার ধারে বসতে দাও না। তুমি তো কিছুই দেখছ না? কেবল পড়ছ।'

'ও নো নো। তোকে কোন বিপদে ফেলতে চাইনা। এটা খুব ভয়ের জায়গা। ঠাণ্ডা, হিম, খাড়া পাহাড়, নিচু খাদ। দেখলেই তোর মাথা ঘুরে যাবে। ঘুরে গেলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যাবি। আমি তো সেই কারণেই বই খুলে পড়তে শুরু করেছি। তোর তো এমনিই পড়াশোনায় তেমন মন নেই। তারপর বাঁধা গরু ছাড়া পেয়েছিস। আর রক্ষে আছে। হাঁ করে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ কখন জানালা গলে হয়ত বাইরেই ছিটকে চলে যাবি। নে ঘুমিয়ে পড়।'

'ঘুমোব কি গো!'

'না ঘুমোতে চাইলেও ঘুমিয়ে পড়তে হবে। মনে রেখ তুমি একটা ট্যাবলেট খেয়েছ। আমাদের সামনের আসনে পাগড়ি মাথায় পাশাপাশি দু'জন বসে আছেন। আমি এত ছোট, প্রায় চাপা পড়ে গেছি। সামনে যেন পাঁচিল। কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। ধ্যুৎ, কত কি দেখতে দেখতে যাব ভেবেছিলুম। দাদা সব মাটি করে দিলে।

আমার বাঁ পাশে দাদা, ডান পাশে আর এক ভদ্রলোক। জিন্সের প্যাণ্ট। জিন্সের চারপকেট, চার কলার, পুরো হাতা জামা। চোখে বাদামী কাঁচের চশমা। কপাল ঢাকা সান ক্যাপ। কেমন একটা ভয় ধরিয়ে দেবার মত চেহারা। ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা চুইংগাম বের করে মুখে ফেলে চিবোতে শুরু করলেন। আড় চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। বিশাল চেহারা। কোলের ওপর টেলিফটো লেনস্ লাগান দামী ক্যামেরা। চিবুকে, ঠোঁটে কেমন একটা বেপরোয়া ভাব। মাঝে মাঝে আবার হাঁটু নাচাচ্ছেন।

হঠাৎ একবার চোখাচোখি হয়ে গেল। চশমার ভেতরে চোখ। তবু মনে হল চোখ দুটো নেচে গেল। মুখ ঘুরিয়ে নিলুম। চোখ নাচাবার কি আছে। মুখের যতটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল

ভদ্রলোক বাঙালী। দাদার মুখের দিকে তাকাতেই অবাক হয়ে গেলুম, ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথাটা বুকে ঝুলে পড়েছে। বা দাদা বা।

ভদ্রলোকের দিকে আর একবার তাকাতেই মনে হল ঠোঁটের কোণে কেমন একটা কৌতুকের মুচকি হাসি। আচ্ছা বিপদ ত? সামনে সর্দারজীদের পাঁচিল। পাশে জানলা আটকে ঘুমন্ত দাদা। এপাশে কেমন কেমন সন্দেহজনক একজন মানুষ। মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। ডানহাতের কনুইতে একটা খোঁচা খেয়ে চোখ মেলতে হল। চোখের সামনেই একটা হলদে রঙের চুইংগাম।

'নাও। গাম খাও। বুঝেছি খুব যা তা লাগছে। সুহাস ত দেখছি ঘুমিয়েই পড়ল!' আশ্চর্য আমার দাদার নাম কী করে জানলেন এই ভদ্রলোক। এঁর দেওয়া চুইংগাম খেয়ে মরব না কি? 'নো থ্যাংকস। আমি খাব না।'

'ভয় পাচ্ছ? খুব স্বাভাবিক। অচেনা লোক। তায় তোমার দাদার নাম জানি। তুমি কি ভাবছ তাও জানি।'

'কি ভাবছি?'

'ভাবছ আমি একটা ছেলেধরা। তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে ঝোলায় ভরে নিয়ে যাব। তারপর তোমার বাবার কাছ থেকে র‍্যানসাম আদায় করব।

'র‍্যানসাম মানে কি?'

'র‍্যানসাম মানে মুক্তিপণ।'

'ভেরি গুড। কিডন্যাপ মানে কি?'

'জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া।'

'ভেরি ভেরি গুড।'

'হাইজ্যাক মানে কি?'

'ছিনতাই।'

'ট্রিপল ভেরি গুড।'

'আপনি কি ইংরিজির মাস্টার মশাই?'

'কে জানে কি? যদি জানতেই পারতুম আমি কে তাহলে কি এত খোঁজাখুঁজি প্রয়োজন হন। তুমি কি জান তুমি কে? জান না। জানলে কি তোমার এই অবস্থা হয়। নাও ঘুমিয়ে পড়।'

'আমার কি এমন খারাপ অবস্থা হয়েছে।'

'বুঝবে পরে। তুমি কি কেউ জানে না। তুমিও না তোমার গার্জেনরাও নয়। এই না জানার ফলে তোমাকে নিয়ে কত কাণ্ড হবে দেখবে। যেমন আমাকে নিয়ে হয়েছে। যেমন তোমার দাদা সুহাসকে নিয়ে হয়েছে।'

'আমার দাদাকে আপনি কি করে চিনলেন।'

'দেখে।'

'কখন দেখে? ছেলেবেলায়?'

'না, এখন দেখে। এইমাত্র দেখলুম আর চিনলুম।'

খুব ভয় পেয়ে চুপ করে গেলুম। কি লোকরে বাবা। এমন তো কখনও শুনিনি, কারুর দিকে তাকিয়েই তার নাম জেনে ফেলা যায়, তার ছেলেবেলা জেনে ফেলা যায়। দাদাটাও এমন হয়েছে, এইরকম একজনের পাশে বসিয়ে কেমন দিব্যি ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে!

গাড়িটা হঠাৎ ঝাঁকানি খেয়ে থেমে গেল। দাদার মাথাটা ঠাঁই করে সামনের সিটে ঠুকে গেল। ছোট্ট গাড়ি। জন কুড়ি লোক বড় জোর ধরে। হঠাৎ আচমকা এত জোরে কেন যে থামল। আমার পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক বললেন, 'জানতাম এইরকমই হবে। হঠাৎ ওপর থেকে একটা বোলডার গড়িয়ে পড়েছে।'

দাদা কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'বোলডারটা গাড়ির ছাদে পড়লে কি হত?'

ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখে বললেন, 'গাড়িটা ভেঙে চুরমার হয়ে যেত। টাল রাখতে না পেরে খাদে গিয়ে পড়তে পারত।'

'তা হলে কি হত?'

'আমাদের মৃত্যু হত।'

দাদার মুখটা ভয়ে যেন কেমন হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি আমার তেমন ভয়টয় করছে না। কি হবে, কি হতে পারত, এসব ভেবে ভেবে মন খারাপ করার কোনও মানে হয় না। গাড়িটা এখন এখানে বেশ কিছুক্ষণ থেমে থাকবে। সামনের পথ পরিষ্কার না হলে যাওয়া যাবে না।

দাদাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম, 'তুমি আমার পাশের ভদ্রলোককে চেন?'

ফিস ফিস করে বললে কি হবে ভদ্রলোক ঠিক শুনে ফেলেছেন। দাদা উত্তর দেবার আগেই তিনি বললেন, 'না না, তোমার দাদা আমাকে চিনবে না। কি করে চিনবে!'

'তা হলে আপনি কি করে চিনলেন?'

'আমি চিনতে পারি। আমার অনেক ক্ষমতা।' বলে তিনি আসন ছেড়ে হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। আরি ব্বাস্ যেমন লম্বা তেমনি চওড়া মানুষ। দেখলেই ভয় করে। দাদার মুখেও বেশ ভয়ের ভাব। চোখ দুটো বড় বড় হয়ে উঠেছে।

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটা ঘড়ি বের করে খুললেন। খুট করে শব্দ হল। সেকেলে পকেট ঘড়ি। এসব জিনিস আজকাল আর সহজে দেখা যায় না। ঘড়িতে কিছুক্ষণ চোখ রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'না, এ গাড়ি আর পথের শেষ দেখতে পাবে না।

দাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

'নিয়তি।'

'সে আবার কি?'

'নিয়তির ইংরেজি কি মাস্টার?' আমাকে প্রশ্ন।

'ফেট।'

'রাইট ইউ আর। সেই ফেট এই গাড়িটিকে টানতে টানতে খাদের দিকে নিয়ে যাবে। তারপর তিনশত মিটার নিচে পাশ ফিরে শুয়ে থাকবে, বছরের পর বছর।'

'কি করে জানলেন?'

'আমি সব জানতে পারি। আর জানতে পারি বলেই আমি যা করতে চাই তা কোনও দিনই করতে পারি না।' ঘড়ি পকেটে পুরে, কাঁধে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে ভদ্রলোক নেমে পড়লেন।

আমরা দু'ভাই হাঁ হয়ে বসে রইলুম। ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে আমাদের জানালার পাশে এসে দাঁড়ালেন। একটু আগের ঝাপসা কুয়াশা কেটে গিয়ে আবার রোদ উঠেছে। মাথার টুপি হাত দিয়ে কপালের ওপর আরও খানিকটা টেনে নামিয়ে দিয়ে বললেন—

"আমার ইনটিউশান বলছে আর চার পাঁচ কিলোমিটার যাবার পরই এই গাড়ি একটা খাদে গিয়ে পড়বে। বাঁচতে যদি চাও ত নেমে এস। মাস্টার ইনটিউশান মানে কি?'

'ইনটিউশান মানে মন, মানে সিকসথ সেনস, মানে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।'

'ব্যাস, ব্যাস, প্রায় কাছাকাছি গেছ। আচ্ছা গুডবাই।'

ভদ্রলোক গটগট করে উলটো দিকে হাঁটতে হাঁটতে পথের ঢাল বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। গাড়ির পিছনের কাঁচ দিয়ে আমরা তাকিয়ে তাকিয়ে সেই রহস্যময় মানুষটির চলে যাওয়া দেখলুম।

'দাদা।'

'বল।'

'কি করবে?'

'বড় ভেঙে পড়েছি রে! এখনও ভাল করে ঘুম ছাড়েনি চোখ থেকে। তার ওপর গাড়ি গেছে থেমে। তার ওপর লোকটি সাংঘাতিক ভয় ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার ওপর। না, তার আর ওপর নেই। আমার শরীরে শক্তি নেই। থ্যাস থ্যাস করছে। আমি চোখ বুজিয়ে বসে থাকি। যা হয় হবে।'

'যা হয় হবে কি গো।'

'হ্যাঁ যা হয় হবে।'

ওদিকে বোলডার সবাবার কাজ শুরু হয়ে গেছে। এ রাস্তায়

মিলিটারি ট্রাক চলে। পথ বেশিক্ষণ বন্ধ রাখা চলে না। রাস্তা প্রায় সাফ হয়ে এসেছে! এখুনি আমাদের গাড়ি চলতে শুরু করবে।

'দাদা কি করবে?'

'কিচ্ছু করব না। তুই চুপ করে বোস। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে?'

খ্যাঁ খ্যাঁ শব্দ করে গাড়ি স্টার্ট নিয়েই ঘুরে ঘুরে আবার চলতে শুরু করল।

'কাজটা ভাল করলে দাদা। জেনে শুনে বিপদে পড়বে।'

'রাখ তোর বিপদ। বিপদ বললেই বিপদ! এতগুলো মানুষেরই কি এক ভাগ্য।'

বেশ কিছুটা যাবার পর আমার ভয় ভয় ভাবটা কেটে গেল। পরিষ্কার রাস্তা। এই রোদ, এই মেঘ, ভয় পাবার মত কোনও ব্যাপারই নেই। দাদা স্যাণ্ডউইচের প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। ফ্লাস্কে চা আছে। সকলেই গুজগুজ করে কথা বলছেন, নানা ভাষায়।

হঠাৎ আমাদের পাশ দিয়ে একটা জিপ চলে গেল ওভারটেক করে। স্পষ্ট শুনলুম জিপের ভেতর থেকে কে যেন চিৎকার করে বললেন, 'সুহাস নেমে এস। এখনও সময় আছে।'

আমি চমকে উঠে বললুম 'দাদা শুনলে?

'শুনলুম।'

'তাহলে?'

'তা হলে চা খা।'

উঃ কি দাদার পাল্লায় পড়লুম। গলা ছেড়ে মাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে। গাড়িটা যতবার খাদের দিকে সরে সরে যাচ্ছে ততবার গলার কাছে একটা শব্দ ঠেলে আসছে, গেল গেল। এই বুঝি গেল।

আমরা দু'জনেই কেবল হাঁসফাঁস করছি। গাড়ির অন্য সকলে কেমন নিশ্চিন্তে বসে আছে। ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ আগে থেকে জেনে ফেলার এই দুর্ভোগ।

'দাদা আমরা কত কিলোমিটার এলুম ?'

'কে জানে কত ? চুপ করে বসে বসে ভগবানের নাম জপ কর। বাঁচার ওই একটাই রাস্তা।'

'তোমার কি মনে হয় বাসটা সত্যি সত্যিই খাদে পড়ে যাবে ?'

'যেতেও পারে। মাঝে মধ্যে পড়েও তো। নিচের দিকে তাকালে দেখতে পাবি সব পড়ে আছে।

ভয়ে পেট গুড় গুড় করে উঠল। দাদা এক আশ্চর্য মানুষ ! জেনে শুনে কেমন বসে আছে। একেই বলে, হাসি হাসি পরব ফাঁসি মা গো।

গাড়িটা একটা বাঁক ঘুরেই খ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল। বেশ বড় রকমের একটা ঝাঁকুনি খেতে হল। এই রে, এইবার বোধহয় খাদে পড়ছে ! চোখ বুজিয়ে মা-কে ডাকি। কতক্ষণ চোখ বুজিয়ে ছিলুম জানি না। সামনের দিকে গোলমাল হচ্ছে। চোখ বুজিয়ে জিজ্ঞেস করলুম !

'দাদা, আমরা কি পড়ে গেছি !'

"গবেট, পড়ে গেলে আমরা কেউ বেঁচে থাকতুম না কি ?'

'তাহলে !'

ড্রাইভার হিন্দিতে বলছে, আগেওয়ালা যো জীপ ওভারটেক করকে গিয়া না, ও জীপ গির গিয়া।'

দাদা লাফিয়ে উঠল, 'সে কি ? এ কেয়া বাত।'

হুড়মুড় করে আমরা নেমে এলুম। তিন চার জন হলদে হলদে টুপি পরা নেপালী রাস্তার ধারে ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক অনেক নিচে একটা জিপ চাকা চারটে আকাশের দিকে করে উলটে পড়ে আছে।

'কত মিটার নিচু হবে দাদা ?'

'আমার মাথা ঘুরছে।' দাদা পথের পাশে বসে পড়ে বললেন, 'দাঁড়া একটু বসে নি।'

এক সর্দারজী পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, বললেন, 'করিব তিনশও মিটার তো জরুর হোঙ্গে।'

তাঁর কথার রেশ হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে না যেতেই নিচের সেই কুয়াশা ঘেরা উপত্যকা থেকে একটি কণ্ঠস্বর যেন ভেসে এল—

'ম্যাস্টার টার্ন টার্টল মানে কি?' আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলুম, কচ্ছপের মত উলটে যাওয়া।

আমি ও টম

গলায় নতুন বগলস পরে দরজার সামনে বসে আছে টম। টম আমার কুকুর। গায়ের রঙ বাদামি। কপালে একটা সাদা তিলক। লেজটা বেশ মোটাসোটা। মেঝেতে আয়েস করে ফেলে রেখেছে। ন্যাজের ডগাটা আবার সাদা। মাঝেমাঝে যখন জোরে হাওয়া দিচ্ছে চোখ যেন বুজে আসছে। কানের পাশের লোম উড়ছে ফুরফুর করে। হাওয়ায় ঘাড়ের লোমে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

আমাদের দুজনেরই খুব মন খারাপ। দুজনেই বকুনি খেয়ে দরজার সামনে বসে আছি। আমি শুধু বকুনি খেয়েছি, টম আবার খবরের কাগজ পেটা খেয়েছে।

"তোকে তখন আমি বারবার বললুম চাদর ধরে অমন করে টানা-টানি করিসনি। ছিঁড়ে যাবে। খেলার সময় তোর তো কোনো জ্ঞান থাকে না। নতুন চাদর ছিঁড়ে দিলে মা রাগ করবে না? সব মা'ই রেগে যাবে। একটা চাদরের দাম জানিস?"

টম উদাস চোখে একবার তাকিয়ে চোখ আধবোজা করে আবার হাওয়া খেতে লাগল।

"তোকে না আমি বলেছি কোনও কথা বুঝলে প্যাটাপ্যাট ন্যাজ নাড়বি। তা না হলে আমি বুঝব কী করে কথাটা তোর কানে গেল কি গেল না! তোর আজকাল খুব ডাঁট হয়েছে। বিলিতি কুকুর বলে মাথা কিনে নিয়েছিস। কেমন মার খেলি?"

টম ন্যাজ নাড়ল। খুব মন খারাপ। তাই ন্যাজ তেমন জোরে নাড়ল না। পুটুক পুটুক করে দুবার নেড়ে বুঝিয়ে দিলে, তোমার কথা বুঝেছি। টমের সঙ্গে আমার কথাবার্তা এই ভাবেই হয়। দুজনের ভাষা আলাদা হলেও দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারি। ওর অকারণ
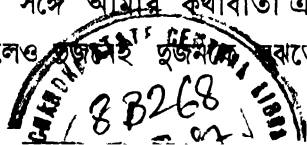
ঘেউ-ঘেউটা বুঝি না ঠিকই, তবে ওর ন্যাজের আর চোখের ভাষা আমি বুঝি।

"এই টম! বাব্বা, তোর দেখছি আমার চেয়েও প্রেসটিজ-জ্ঞান বেশি। এত করে ডাকছি, একবার তাকা না।"

উদাস চোখে আমার দিকে একবার তাকিয়েই টম সামনের থাবায় মুখ রেখে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। "তোর আর কি! মন খারাপ, লম্বা হয়ে ভর সন্ধেবেলা শুয়ে পড়লি। আমার তো আর সে-উপায় নেই। এখুনি পড়তে বসতে হবে। আলো না থাক, মা নাকের ডগায় শেজ জ্বেলে দিয়ে যাবে। কাসতে কাসতে আমার শিক্ষকমশাই আসবেন। এক বস্তা খাতা, এক ধামা বই। আমি যদি তোর মতো কুকুর হতুম রে। দু জনেই বসে থাকতুম পাশাপাশি, গলায় বাদামি রঙের নতুন বগলস পরে। তবে আমি তোর চেয়ে একটু চালাক হতুম। বিছানার চাদর ধরে টানাটানি করে মার খেতুম না। আর কী হবে বল? দুঃখু করিসনি। তুই চাদর ছিঁড়ে মার খাস, আমি অঙ্ক ভুল করে মার খাই। দুজনেরই এক বরাত।"

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললুম, টমও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল।

আমাদের দুজনকে শোবার ঘর থেকে কান ধরে বের করে দিয়ে মা গা ধুতে গিয়েছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়েই আবার বকাবকি শুরু করেছে। টমকে বলছে, "ওর কাছ থেকে সরে এসো। দরজার সামনে আর বসতে হবে না। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর সুগ্রীব। তুমি এত হুড়ে ছিলে না। ওর পাল্লায় পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছ। যাও, ঘরে যাও।" টম অমনি সুড়সুড় করে ঘরে চলে গেল। বা রে মজা! যত দোষ নন্দ ঘোষ!

আমি কী করেছি! টম শুয়ে ছিল। আমি ঘরে ঢুকতেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে ন্যাজ নাড়ল, একবার ডন্ মারল, তারপর লাফ মেরে মেরে আমার হাতটা ধরার চেষ্টা করতে লাগল। তার মানেটা কী? শুয়ে থেকে থেকে শরীরে জং ধরে গেল, এসো এক পক্কড় খেলা হয়ে

যাক। তখন বালিস নিয়ে, বল নিয়ে, ফেদার ডাস্টার নিয়ে, সে কী হুটোপাটি? মেঝে থেকে খাটে, খাট থেকে মেঝেতে। কখনও আমি নিচে, টম আমার ঘাড়ে, কখনও টম নিচে, আমি তার ঘাড়ে। উঃ কী লাফান লাফায় টম! জিভ বের করে হ্যা-হ্যা করছে। ঝুল কাটছে। তেড়ে তেড়ে এসে পা জড়িয়ে ধরছে। আমি একবারও বলেছি, টম তুই চাদরটা ছেঁড়! এস া কথা কেউ বলতে পারে!

রাত আটটার সময় মাস্টারমশাই চলে গেলেন। পাটিগণিত, জ্যামিতি, গ্রামার, বিজ্ঞান মাথায় ম্যারাকাস বাজছে। রান্নাঘরের কাছে মা খুব লাফাচ্ছে। মনে হয় আরশোলা বেরিয়েছে। এখন খুব "খোকা খোকা"। খোকা যাবার আগেই আর এক খোকা, টম গিয়ে হাজির। টমটা দেখছি মায়ের এক নম্বরের চামচা। আরশোলা নয়, ইয়া বড় এক কোলাব্যাঙ। বাগান থেকে উঠে এসেছে বোধহয়। ব্যাঙটা দেয়ালের কোণে থপাক থপাক করে লাফাচ্ছে।

সব ব্যাপারেই টমের আগ বাড়িয়ে যাওয়া চাই। একটা হীরো হীরো ভাব। ঘাড় কাত করে ব্যাঙটাকে দেখছে আর গোঁ গোঁ করছে। মা বলছে, 'ওরে, তুই তো খুব ফুটবল খেলিস, এক কিকে ওটাকে বাইরে পাঠাতে পারছিস না।"

"পাঠাব কী করে মা? তোমার টম যে আগেই ওখানে গিয়ে মস্তানি করছে।"

টম ভেবেছে ওটা একটা বল? লাফাচ্ছে আবার পড়ে যাচ্ছে। মাঝে-মাঝে টুকুস টুকুস করে থাবা বাড়াচ্ছে আবার টেনে নিচ্ছে। হঠাৎ সাহস খুব বেড়ে গেল। ঘ্যাঁ ঘ্যাঁক করে ব্যাঙটাকে কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিয়ে পেছিয়ে এল।

বাবা! ব্যাঙের বিষ তো জানো না! ঠাসা বিষ, দিয়েছে টমের মুখে ঢেলে। টমের মুখে গ্যাঁজলা। অসহ্য যন্ত্রণায় মেজেতে শুয়ে পড়ে কাতরাচ্ছে। ব্যাঙটা বোধহয় মরেই গেছে। চারটে ঠ্যাং ওপরে তুলে কোণে পড়ে আছে। মাঝে মাঝে নড়ছে।

মা ভীষণ ঘাবড়ে গেছে। ঘাবড়ালে কী হবে, আমাকে দারভাতে ভোলেনি।

"এ কী হল রে? টম, টম! যাঃ, বাঁচবে তো? যদি মরে তো তোর জন্যেই মরবে। এত বড় ছেলে হলি, না মারতে পারলি ব্যাঙটাকে একটা লাথি, না পারলি টমটাকে আটকাতে। অপদার্থ!"

"কী করে বুঝব মা, বলা নেই কওয়া নেই তোমার টম ইডিয়েটের মতো ব্যাঙটাকে কামড়াতে যাবে।" ফরাসীরা ব্যাঙ খায়। কই তাদের মুখ দিয়ে তো গ্যাজলা বেরোয় না। ব্যাঙ কি সাবান দিয়ে তৈরি? তা না হলে টমের মুখ দিয়ে এত ফেনা বেরোচ্ছে কী করে? একটা জিনিস বুঝলুম, কুকুরের পেটে দুটো জিনিস সহ্য হয় না, এক ঘি, দুই ব্যাঙ।

টমের অবস্থা যত খারাপের দিকে যাচ্ছে, মায়ের উত্তেজনা ততই বাড়ছে। আর যা হয়! মায়ের যেমন স্বভাব! কী করবে বুঝতে পারছে না, অসহায় অবস্থা, চোখ বেয়ে জল নামছে। আমারও মনটা খুব খারাপ হচ্ছে। টম আমার বন্ধু। মা বলে আমরা দুটো ভাই। একজন দ্বিপদ, আর একজন চতুষ্পদ।

বাবা এসে পড়লেন। না এলে কী যে হত। বাবা সব শুনে বললেন, "দুধ আন। ডিম আছে, ডিম?" দুধ এল, ডিম এল। ডিমের সাদা অংশটা দুধে মিশিয়ে বেশ করে ফোটান হল। এইবার টমকে খাওয়াতে হবে। যেমন করেই হোক মুখে ঢুকিয়ে দিতে হবে। উঃ, সে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার!

সেই এগ ফ্লিপ খেয়ে টম দুদিন বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। উঃ, ব্যাঙের কী নেশা।

আমরা যেমন অসুখ থেকে উঠলে ঝোলভাত খাই টমও তেমনি তিনদিনের দিন উঠে দুধ-ভাত খেল। শরীরটা খুবই দুর্বল। দুজনে বসে আছি দরজার কাছে। একটু আগে মা বলে গেছে, 'দরজার সামনে বেশিক্ষণ বসে থেকো না টম, এখনও শরীরটা তেমন সারেনি।

তোমার জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়ো।

একগাদা বাদুলে পোকা ফলসা গাছের তলায় বিজ-বিজ করছে। টম ঘাড় কাত করে, কান খাড়া করে পোকাগুলোকে দেখল। মুখ দেখে মনে হল খুব ইচ্ছে করছে একবার খোঁচাখুচি করে। কিন্তু কিছু করল না। উদাস হয়ে রইল। একটা টিকটিকি চলে গেল সড়সড় করে। একবার ঝিঁকি মেরে উঠেছিল আর একটু হলেই দৌড়ে ফেলত। খুব সামলে নিল নিজেকে। অ্যায়, এইবার একটা ধ্যাঙ বেরিয়েছে। সেই কোলা। থপাক থপাক করে চলেছে। খুব মন দিয়ে টম জিনিসটাকে দেখছে। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে চলে গেল। চোখের বাইরে যেতেই টম একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। আমি বললুম, "যাও না, যাও, আর একবার হয়ে যাক।" টম আমার দিকে তাকালই না।

কিছুক্ষণ পরে একটা শামুক বেরোল। ধীরে ধীরে রেলগাড়ির মতো চলেছে, পিঠে খোল, সামনে খাড়া ছুটো শুঁড়, শুড়ের মাথায় ছুটো কালো ফুটকি চোখ। টমের চোখে-মুখে ভীষণ একাগ্রতা। আমরা যেভাবে পুজোর মিছিল দেখি সেই ভাবে দেখছে। একেবারে নতুন ধরনের জীব। বসে-বসেই ছুবার নেচে উঠল। পা উসখুস করছে। গলা বাড়িয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে দেখছে। "টম, আর চালাকি করতে যেও না। মরবে।" ভুক ভুক করে আমাকে বোধহয় বলতে চাইল, নিজের চরকায় তেল দাও। তড়াক করে লাফিয়ে গিয়ে এক থাবা মারতেই শামুকটা ভেতরে ঢুকে গেল। আমি বললুম "টম ম্যাজিক।" টম তখন ছুটো থাবা দিয়ে সেটাকে নিয়ে ফুটবলের মতো খেলতে শুরু করেছে। "শামুক বলে বেঁচে গেলি। তা না হলে আবার এগ ফ্লিপ, ছুদিন ঘুম।" শামুকটাকে এ'পা থেকে ও'পায়ে ঠেলে দিয়ে টম ভোও করে জানিয়ে দিল জিনিসটা তো মন্দ নয়।

বালির ওপর পোল

মান্দারহিলে আমরা বেড়াতে গেছি। শীতের সময়। সঙ্গে আছেন আমার কাকা। ভীষণ ডাকাবুকো মানুষ। সাহস খুব বেশি হলে বলা হয়, দুঃসাহস। বাইরে চেঞ্জে গেলে সকাল-বিকেল বেড়াতেই হবে। না বেড়ালে চেঞ্জে এসেছ কেন? কেউ না প্রশ্ন করুক, নিজেদের বিবেকই প্রশ্ন করবে।

বেলা তিনটের সময় কাকাবাবু বললেন, গেট রেডি। কোট পরো। মোজা চাপাও। মাফলারে মাথা মোড়ো। আজ আমরা বহুদূরে যাবো। হাঁটার রেকর্ড করব। দুধ খেয়েচো?

তখন সস্তাগণ্ডার বাজার। দুধের বন্যা বইছে। রোজ সকালে বিশাল এক বালতিতে দুধ আসে। এত দুধ যে, তাইতে রূপকথার রাজপুত্রের মত স্নান করা যায়। বাড়ির আশেপাশে অসংখ্য বাঁশ আর বেতের ঝাড়। সেই বাঁশঝাড় থেকে কচি বাঁশ কেটে এনে, দুধ মন্থনের যন্ত্র তৈরি হয়েছে। মুখের দিকটা ডাল-ঘোঁটার কাঁটার মত ছেতরে দেওয়া হয়েছে। নীলচে সবুজ কচি বাঁশ যে কী সুন্দর দেখতে! একটা থামের পাশে দুধভর্তি বালতি। থামের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা সেই বাঁশের টুকরো দুধে ডুবে আছে। বাঁশে প্যাঁচানো আর একটা দড়ির দু-প্রান্ত ধরে টানো। কাঁটা অমনি বনবন করে দুধের মধ্যে ঘুরতে লাগল তরঙ্গ তুলে। সে এক আশ্চর্য খেলা! যত ঘোরে ততই মাখন ভেসে ওঠে, ছোটো ছোটো, টুকরো টুকরো। সারা সকাল দুধ মন্থন করেই কেটে যায়।

সেই দুধ এক গেলাস চোঁ চোঁ করে খেয়ে আমরা তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় বেরিয়ে পড়লুম। কাকাবাবুর হাতে একটা পাঁচ সেলের বিরাট টর্চ। সূর্য পাটে বসার আয়োজন করছে। সারাদিনের পর

ছুটির সময় আসছে। আবার দেখা হবে কাল সকালে। দূরে আকাশের গায়ে মান্দারহিল লেগে আছে। সমুদ্র মন্থনের সময় ওই পাহাড়কেই দেবতা আর অসুরেরা মন্থন দণ্ড হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। পাহাড়ের গায়ে নিচের দিকে দড়ি বাঁধার দাগ গোল হয়ে আছে, আমরা দেখে এসেছি, একদিন। দড়ি নয় বাঁধা হয়েছিল বিশাল ময়াল সাপ। দেবতারা ধরেছিলেন ল্যাজের দিক, অসুরেরা ধরেছিলেন মুখের দিক। টানাটানির চোটে সাপের মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল কলসি কলসি গরল। সেই গরল ধারণ করেছিলেন মহাদেব। গলার কাছটা নীল হয়ে গেল! মহাদেব হলেন নীলকণ্ঠ।

আমরা দু-জনে হাঁটছি আর হাঁটছি। কাকাবাবু হাঁটছেন নেচে নেচে। হাঁটার বেগও তেমনি। আমাকে মাঝে মাঝে দৌড়তে হচ্ছে। এই পাণ্ডববর্জিত দেশেও একটা পিচের রাস্তা সোজা চলে গেছে। কখনও উঠছে ওপরে, কখনও নামছে নিচে চারপাশে ফাঁকা মাঠ। ছড়ানো পাথর। ছোটো, বড়, মাঝারি। যেন দৈত্যদের লড়াই হয়ে গেছে।

বেশ কিছুটা হাঁটার পর আমার পা ধরে গেল। আর পারছি না হাঁটতে। কাকাবাবু বললেন তুই এখানে বসে থাক। আমি মাইল দশেকের আগে থামবো না।

চারপাশে ফাঁকা মাঠ। বাবলাগাছের ঝোপ। রাশি রাশি পাথর। ছোট-বড় টিলা। সূর্য নেমে যাচ্ছে হু হু করে পাহাড়ের আড়ালে। শীত আসছে হিল হিল করে সাপের মত। কাকাবাবু কথা কটা বলেই যে গতিতে হাঁটছিলেন, সেই গতিতেই এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। দূরত্ব বেড়েই চলেছে। ভয়ে বুক কাঁপছে।

চিৎকার করে ডাকলুম, কাকাবাবু!

প্রতিধ্বনি ঘুরে এল। যতবার ডাকি ততবারই আমার গলা, আমার ডাক বড় ছোটো ঢেউয়ের আকারে ফিরে ফিরে আসে। ভীষণ ভয়ে ছুটতে শুরু করলুম। যে পা হাঁটতে পারছিল না, সেই পা দৌড়োচ্ছে দেখে অবাক!

বেশ খানিকটা ছুটে কাকাবাবুকে ধরে ফেলে হাঁপাতে লাগলুম। রাগে, অভিমানে চোখে জল এসে গেছে। কাকাবাবু পিঠে হাত রেখে বললেন, কি বুঝলি? দেহের জোরে নয়, মনের জোরে মানুষ সব পারে। পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে।

আমি না এলে আপনি আমাকে ফেলে চলে যেতেন?

না রে পাগল! আমি তোকে সাহসী করতে চাই, কষ্টসহিষ্ণু করতে চাই।

এইবার আমরা দু-জনে হাত ধরাধরি করে হাঁটতে লাগলুম। কাকাবাবু গান ধরলেন, দুর্গম গিরি···। গানের ফাঁকে ফাঁকে আমি কেবল বলতে লাগলুম, সন্ধে হয়ে গেলে কী হবে।

ঘোড়ার ডিম হবে। দুর্গম গিরি···

আমরা ফিরবো কি করে?

ফিরবো না, কান্তার মরু···

আমার কোনো কথাই শুনতে চাইছেন না। হঠাৎ দূর আকাশের গায়ে একটা ব্রিজ দেখা গেল। দিন-শেষের সোনালি রোদ পড়ে, রুপোর মত ঝক ঝক করছে।

আরেব্বাস ব্রিজ রে। বলে কাকাবাবু ছুটতে লাগলেন।

আশ্চর্য, ব্রিজ কোথা থেকে এলো! নদী কই? আমি আনন্দে ছুটলুম।

তখন কি জানতুম, ব্রিজের ওপারে কী আছে? ব্রিজের তলায় কী আছে। ভাগ্যে কী আছে?

চকচকে অ্যালুমিনিয়াম রঙের ব্রিজ পড়ে আছে বিশাল এক মজা নদীর ওপর। একফোঁটা জল নেই। শুধু সাদা বালি। শেষ দিনের আলোয় রুপোর মত দানার চকচক করছে। কাকাবাবু ব্রিজের মাঝখানে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকালেন।

কম উঁচু নয়। অনেক নিচে বালির নদী। তাকালেই ভয় করে। নদীর সব জল কে যেন শুষে নিয়েছে। সামনে পেছনে যতদূর তাকানো

যায় ধু ধু করছে শুধু বালি।

এ আবার কেমন নদী? জল নেই একফোঁটা?

জল নেই কি রে, সব জল ভেতরে চলে গেছে। এ নদীর নাম ফল্গু নদী। নাম শুনেছিস? তাকিয়ে দেখ। যেখানটা খুঁড়বি সেখান থেকেই পরিষ্কার জল বেরোবে। কাঁচের মত টলটলে।

কাকাবাবুর হাতে পাঁচ সেলের এক বিরাট টর্চ। সেই টর্চ বাড়িয়ে দেখাতে লাগলেন, ওই দেখ জায়গায় জায়গায় গর্ত খোঁড়ার চিহ্ন রয়েছে। দেহাতিরা এসে জল নিয়ে গেছে। দেখেছিস?

দেখেছিস বলার সঙ্গে সঙ্গে, অসাবধানে তাঁর হাত ফসকে টর্চটা নিচে পড়ে গেল। এত উঁচুতে আছি, টর্চটা পড়তে কত সময় লাগল ঘড়ি ধরে দেখা থাকলে অঙ্ক কষে উচ্চতা বলা যেত। জিনিসটা নরম বালিতে পড়ে দেবে গেল।

যাঃ পড়ে গেল, বলে কাকাবাবু আমার দিকে তাকালেন, কী হবে? ফেরার সময় যে অন্ধকার হয়ে যাবে।

কী করে ফেললেন?

ইচ্ছে করে। বিজ্ঞানীরা মাধ্যাকর্ষণ পরীক্ষা করে একটা সূত্র বের করার জন্যে পিসার টাওয়ার থেকে নানা ওজনের জিনিস নিচে ফেলতেন। ঘড়ি ধরে দেখতেন কত সময় লাগল। বড় হলে পড়বি, ল অফ গ্র্যাভিটি। নিউটন সায়েবের নাম শুনেছিস, যিনি সেই গাছ থেকে আপেল পড়া দেখেছিলেন।

হ্যাঁ শুনেছি।

আজ আমি সেই নিউটন। সেদিন ছিল আপেল। আজ হল টর্চ। এইবার ফেলবো তোমাকে? টাক-ডুমাডুম-ডুম।

কাকাবাবু ব্রিজের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিউটন হয়ে নাচতে লাগলেন। কাকাবাবু সব পারেন। হঠাৎ হঠাৎ দুম করে এমন সব কাজ করেন, ভাবলে ভয় হয়। তারপর সামাল দিতে জীবন বেরিয়ে যায়। এই তো এখানে বেড়াতে আসার সপ্তাহখানেক আগে আমাদের গ্রামের বাড়িতে

গিয়ে এক কাণ্ড করে এলেন। ঝাঁকড়া একটা রঙ্গনগাছে থলের মত বিরাট একটা কী ঝুলছে। তার ওপর একগাদা মাছির মত পোকা বিজ বিজ করছে। কাকাবাবু বললেন, এটা কি জানিস?

দেখে মনে হয়েছিল, মৌচাক। বললুম, মৌচাক।

বলেছিস ঠিক। মৌচাকে খোঁচা মারলে কী হয় জানিস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, উড়ে এসে কামড়ে দেয়।

মৌমাছির কামড় কোনদিন খেয়েছিস?

আজ্ঞে না।

আম খেয়েছো, জাম খেয়েছো, মৌমাছির কামড় খাওনি খোকা। একটু খেয়ে দেখো!

খেয়ে দেখো, বলেই মৌচাকে মারলেন এক খোঁচা। তারপর কী হোলো, আমি বলতে পারবো না। অন্যের মুখে যেমন শুনেছি, যেভাবে শুনেছি সেই ভাবেই বলি। ঘণ্টাখানেক পরে, আমরা দু-জনে আমাদের বাড়ির উঠোনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। ভিজে বেড়ালের মত চেহারা। মাথা থেকে পা পর্যন্ত সারা গায়ে ঝুলছে ঝাঁঝি আর পানা। মা জিজ্ঞেস করছেন, একী চেহারা? কী করে এমন হোলো? এই তো দু-জনে বেশ সেজেগুজে বাগান দেখতে বেরোলে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তর আমাদের দিতে হল না। উত্তর দিলেন উদ্ধারকারী গ্রামের মানুষেরা। তাঁরা বললেন—দেখলুম মা, এই ছেন্‌কাটা, এই বড়বাবুটা মাঠ ভেঙে পাঁই পাঁই করে ছুটছে। পেছনে আকাশ কালো করে ছুটে আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি। আমরা মা বলতে লাগলুম, পানাপুকুরে ডুবে পড়ো, ডুবে পড়ো, নইলে মরবে, কেউ বাঁচাতে পারবে না।

কাকাবাবুকে কেউ না চেনে তো আমি চিনি হাড়ে হাড়ে। কখন কী করে বসবেন কেউ জানে না। আমি পায়ে পায়ে ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেইদিকেই সরতে লাগলুম। আজ নিউটন হয়েছেন। সেদিন প্যাসকেল হয়ে আমাকে জলে ডোবাতে চেয়েছিলেন।

জলের ঊর্ধ্ব-চাপের পরীক্ষা হচ্ছিল! আমার পায়ে পায়ে পাশে সরে যাওয়ার চেষ্টা কাকাবাবুর নজর এড়ায়নি। পালাচ্ছিস কোথায়, বলে খপ করে আমার হাত চেপে ধরলেন।

পালাতে চাইলেও কী পালাবার উপায় আছে! আর পালিয়ে যাবই বা কোথায়! নিচে ধু ধু বালির নদী। চারপাশে গভীর জঙ্গল। কালো পিচের রাস্তা ক্রমশই উঁচু হয়ে হয়ে আকাশের দিকে চলে গেছে। এতক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে আছি, একটিও মানুষ চোখে পড়ল না। এমন নির্জন জায়গা পৃথিবীতে আর দুটি নেই।

পালাবার তালে আছিস? কোথায় পালাবি? একা একা যেতে পারবি?

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, আমাকে ফেলে দেবেন না কাকাবাবু। মারা যাবো।

হ্যাঁ, মারা যাওয়া অত সোজা! ধপাস করে নরম বালির ওপর গিয়ে পড়বি, দেখবি কেমন আরাম লাগবে!

না, প্লিজ না।

প্লিজ-ফ্লিজ জানি না। এক্সপেরিমেণ্ট ইজ এক্সপেরিমেণ্ট। টর্চটাকে তো তুলতে হবে, পয়সার জিনিস।

ফেললেন কেন?

তুলবো বলে।

তুলে আনুন।

আমি কেন তুলবো? তোলাতুলির কাজ ছোটদের।

আমি আবার উঠে আসব কি করে?

সে আমি জানি না। আমার কাজ ফেলা। তোমার কাজ ওঠা।

বাঃ, তার মানে টর্চ আর আমি দু-জনেই একসঙ্গে যাই। টর্চও গেল, আমিও গেলুম।

আমি দড়ি ঝুলিয়ে দোব, তুই ধরে ধরে উঠে আসবি।

দড়ি পাবেন কোথায়?

সে আমি কাছাকাছি কোনও গ্রাম থেকে নিয়ে আসবো।

অত বড় দড়ি পাবেন?

সে দুশ্চিন্তা আমার। তোমাকে সে-জন্যে ভাবতে হবে না। দড়ি আর কথা, যত খুশি ততই লম্বা করা যায়। লম্বা দড়ি, লম্বা বাত।

কাকাবাবু নিচের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন, আরে! তাজ্জব কী বাত। টর্চটা তো আর নেই। তাহলে, তাহলে কি…?

তাহলে কী কাকাবাবু?

যা সন্দেহ করেছিলুম।

চোর?

আজ্ঞে চোর নয়, চোরা বালি। ইস্! আমার তো আবার সব বদবিটকেলে খেয়াল, তোকে যদি দুম্ করে সত্যি সত্যিই ফেলে দিতুম, তাহলে কী সর্বনাশ হোতো বল তো? তুই ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতিস।

চোরা বালি আবার কী জিনিস? আমি তো শুনেছি, চোরা না শোনে ধর্মের বাণী।

চোরা বালি বড় সাংঘাতিক জিনিস। পরীক্ষা করে দেখতে চাস্?

না বাবা। দেখতে গিয়ে মরি আর কি?

তুই মরবি কেন? আমি মরে তোকে দেখিয়ে যাবো। পড়িসনি, বিজ্ঞানী নিজের ওপর পরীক্ষা চালাতে গিয়ে জীবন দান করেছেন! এভারেস্টে উঠতে গিয়ে কত দুঃসাহসী আর ফিরে আসেননি। জীবন বড়, না আবিষ্কার বড়! সত্য বড়, না ভয় বড়? দেখ তাহলে!

কথা শেষ করেই কাকাবাবু ব্রিজের রেলিঙের ওপর ঝাঁ-করে উঠে পড়লেন। সরু রেলিঙে ঠিকমত দাঁড়াতে পারছেন না। লগবগ, লগবগ করছেন। যে-কোনও মুহূর্তে নিচে পড়ে যাবেন? পড়া মানেই চোরা বালিতে তলিয়ে যাওয়া।

আমি আতঙ্কে চিৎকার শুরু করলুম, ও কাকাবাবু লাফাবেন না, ও কাকাবাবু লাফাবেন না।

কে কার কথা শোনে! হাত দুটো পেছন দিকে ঝুলিয়ে বিশাল এক

লাফ মারার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, আর কোনও উপায় না দেখে। আমি তারস্বরে ‘বাবা, বাবা’ বলে কাঁদতে শুরু করলুম।

কান্নায় কাজ হল। কাকাবাবু সামনে লাফ না মেরে পেছনে লাফ মারলেন। শরীরটাকে সোজা করে আমার দিকে ঘুরে বললেন, ভীরু, কাপুরুষ! তোর দ্বারা কিসসু হবে না।

বাঃ, আপনি লাফ মেরে মরে যাবেন, আর আমি একটু কাঁদব না?

আগে দেখবি তো, আমি সত্যিই মরছি কী না। সেই ইংরেজি কথাটা বুঝি ভুলে গেছিস, ভীরুরা প্রকৃত মরার আগে হাজার বার মরে?

পোলের ওদিক থেকে বিরাট আকারের একটা কুকুর গদাইলস্কর চালে আসছে। চোখ সেদিকে চলে গেল। ইয়া হাঁড়ির মত গোব্দা মুখ। বেড়ালের মত লম্বা লম্বা গোঁফ। কুকুরের গোঁফ হয়! ঠিক মনে পড়ছে না। এসব প্রশ্নের উত্তর কাকাবাবুই দিতে পাবেন। তাঁব অনেক জ্ঞান। আমি তো বোকা।

কাকাবাবু, কুকুরের গোঁফ হয়?

সেই স্বাস্থ্যবান কুকুরটা তখন হেলতে-দুলতে আমাদের সামনে এসে গেছে। হাঁটছে দ্যাখো, যেন চেঞ্জারবাবু বেড়াতে বেরিয়েছে। গায়ের রঙটাও কী সুন্দর। এমন কুকুর আমাদের দেশে দেখিনি। ভাল খাওয়া আর জলবায়ু পেলে কী না হয়!

কাকাবাবু বললেন, এটা বেটাছেলে কুকুর, তাই গোঁফ বেরিয়েছে। জায়গাটা কিরকম দেখেছিস, একটা সাধারণ কুকুর, তারও স্বাস্থ্য দেখ্।

কুকুরটা একবার থমকে দাঁড়াল। ভ্যাঁচ করে একবার হাঁচল। তারপর যে পথে যাচ্ছিল, সেই পথেই এগিয়ে চলল হেলে-দুলে। আমরা চলেছি এদিকে, ও চলেছে ওদিকে।

কাকাবাবু বললেন, ব্যাটা খুব খেয়েছে। নড়তে পারছে না। নাও আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। আমাদের কম করে আরও অন্তত মাইল-পাঁচেক হাঁটতে হবে। তা না হলে দূর করে দেবে।

কে দূর করে দেবে?

ওরে বাবা, জানিস না বুঝি? চেঞ্জারদের ওপর স্থানীয় লোকের খুব নজর। না হাঁটলে, ভাল হজম হবে না, হজম না হলে খাওয়া কমে যাবে, খাওয়া কম হলে বিক্রি কমে যাবে, ব্যবসা মরে যাবে, মোটা না হলে জায়গার নাম কমে যাবে। সব এক সুতোয় বাঁধা। নে, নে, আর দেরি নয়, জোরে জোরে হাঁট।

পোলটা বেশ বড়। আমরা প্রায় শেষে এসে গেছি। রাস্তা সোজা চলে গেছে, দূরে একটা পাহাড়ের দিকে। দু-পাশে বাবলা গাছ। পেছনে কারা যেন ছুটে আসছে! একপাল গরু, ল্যাজ তুলে ছুটে আসছে। এখুনি আমাদের গুঁতিয়ে ফেলে দেবে। একপাশে সরে দাঁড়ালুম।

এত গরু একসঙ্গে ছুটে আসছে কেন?

দ্যাখো, দ্যাখো, দেখে শেখ। এদেশে গরুরাও চুপ করে বসে থাকে না, বিকেলে দল বেঁধে ছুটতে বেরিয়েছে। মানুষের দুটো কাজ, বুঝলে, এক দেখে শেখা, আর এক ঠেকে শেখা। চল্ আমরাও দৌড়ই।

গরুর পালের পেছনে, লাঠি উঁচিয়ে এক রাখাল আসছে পাগলের মত ছুটতে ছুটতে। গরুতে, মানুষে রেস হচ্ছে যেন।

কাকাবাবু হেঁকে উৎসাহ দিলেন, বহুত আচ্ছা জী, বহুত আচ্ছা।

রাখাল হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, আচ্ছা নেহি জী, শের নিকালা, ইধারসেই উধার গিয়া। দেখা নেহি? কথা কটা বলতে বলতেই রাখাল বহুদূরে চলে গেল।

শের কি জিনিস কাকাবাবু? ওজন? এক সের, দু-সের!

তোমার মুণ্ডু! শের মানে, বাঘ। ওরে···

কাকাবাবু কথা শেষ না করেই ছুটতে শুরু করলেন। আমিও ছুটছি। ছুটতে আমি ভালই পারি।

ছুটতে ছুটতে কাকাবাবু বললেন, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। কুকুরের গোঁফ হয় না। ওটা কুকুর নয়, কেঁদো একটা বাঘ। উরে বাবারে! খুব বাঁচা বেঁচে গেছি! ছোট্ ছোট্। চাচা, আপনা প্রাণ বাঁচা! কাকাবাবু ছুটছেন লম্বা লম্বা পা ফেলে। তাঁর সঙ্গে আমি পারবো

কেন? তবে আমারও খুব স্পীড এসে গেছে। ছুটতে ছুটতে আমার একবার মনে হল। অলিম্পিকে দৌড়োবার সময় পেছনে যদি একটা বাঘ লেলিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমি ভারতের জন্যে একটা স্বর্ণপদক আনতে পারি।

মানুষ বিপদে পড়লে কেউ কারুর নয়। কাকাবাবু একবারও পেছন ফিরে তাকাচ্ছেন না। শুধু ছু'টই যাচ্ছেন। এমন সময় দূরে সেই বাঘটা বারকয়েক ডেকে উঠল। কী বিশ্রী হেঁড়ে ডাক। আকাশ-বাতাস যেন ফেঁড়ে ফেলছে। দুটো কান চুলবুল করে উঠল। সেই ডাকে গাছে গাছে পাখির ঝাঁক ভয়ে কিচির-মিচির করে আরও আতঙ্ক ছড়িয়ে দিল। কী বোকা রে বাবা! তোরা তো আছিস গাছে! বাঘ কি গাছে উঠবে? বাঘ কি বেড়াল, যে পাখি ধরে খাবে!

পোল শেষ হয়ে গেল। কাকাবাবু আমার থেকে প্রায় বিশ বাইশ গজ এগিয়ে গেছেন। ভয়ে ভয়ে, কাঁপা কাঁপা গলায় বললুম, আমাকে ফেলে পালাবেন না কাকাবাবু।

কাকাবাবু যে বেগে দৌড়চ্ছিলেন সামনের দিকে ঠিক সেই বেগে পেছন দিকে দৌড়ে এসে ছোঁ-মেরে আমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে আবার সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলেন। এখন আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ঘোড়ায় চেপেছি। সেই ছড়াটা মনে পড়ছে, টাট্টু ঘোড়া খুব ছুটেছে। ঠাকুরদাদার চুল পেকেছে। ডামাডোলের দিন পড়েছে। ঢাকের পিঠে পালক নাচে। সাহসও খুব বেড়ে গেছে। এত উঁচুতে যখন আছি, বাঘে আমার আর কী করবে! ধরলে কাকাবাবুকেই ধরবে!

এতটা দৌড়ে আমার জিভ বেরিয়ে গেছে। কাকাবাবুও বেশ হাঁপাচ্ছেন।

টং থেকে বললুম, আর দৌড়ে কী হবে! এবার তো থামলে হয়।

কথা শেষ হতে না হতেই সামনের দিক থেকে চার পাঁচজন

আমাদের দিকে তীরবেগে দৌড়ে এলো। একজনের হাতে আবার লণ্ঠন। ছোটার তালে তালে দুলছে।

কাকাবাবু থেমে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, ক্যা হুয়া ভাই?

তারা দূর থেকে বললে, শুনা নেহি, শের নিকালা?

যাঃ বাব্বা, শের তো পিছে নিকালা।

নেহি জী চক্কর মারকে সামনা আ গিয়া।

তব্ তো মাটি কর দিয়া রে বাবা!

আমরা যেদিক থেকে এসেছিলুম কাকাবাবু আবার সেদিকেই ছুটতে লাগলেন। পোলের ঢাল বেয়ে উঠতে এবার জীবন বেরোচ্ছে।

কিছুটা ছুটেই দেখা গেল একটি দেহাতি লোক বেশ আপনমনে লাঠি ঠুক ঠুক্ করে আরামসে চলেছে। বাঘ-টাঘ তার কাছে যেন কিছুই নয়। পিঠে একটা পুঁটলি দুলছে চলার তালে তালে।

কাকাবাবু তার কাছে এসে বললেন, শুনা, শের নিকালা।

লোকটি গম্ভীর গলায় বললে, নিকালা তো কেয়া হুয়া!

তোমকো খা লেগা।

লোকটি ভীষণ রেগে বললে, তোম নেহি আপ বোলো জী।

আপকো খা লেগা।

খানে দেও।

লোকটি উদাস গলায় খানে দো, বলে যে চালে হাঁটছিল সেই চালেই হাঁটতে লাগল। আবার গান ধরেছে, রাম নাম সুখদায়ী।

কথা বলার জন্যে কাকাবাবু একটু থেমেছিলেন। লোকটি গান ধরতেই আবার ছুটতে সুরু করলেন। ছুটতে ছুটতে বললেন, যাও বা বাঁচার আশা ছিল, গান ধরে সব মাটি করে দিলে। বাঘ এবার নিশানা ঠিক করে এই দিকেই তেড়ে আসবে।

পোল আবার ফুরিয়ে গেল। পোলের বেশ মজা। একেবারে সমান মাপ। এ-পাশেও যতটা ও-পাশেও ততটা। ধনুকের মত

পড়ে আছে, বালিতে দু-পাশ ঢুকিয়ে। আমরা এখন বাড়িমুখো। অন্ধকার হয়ে এলেও, আকাশের নিচের দিকটা লালচে হয়ে আছে। গাছের মাথা-টাথাগুলো বেশ কালো দেখালেও নরম একটা আলো বেরিয়ে এসেছে। বেশ গা ছমছমে সন্ধে। চারপাশ নির্জন। ধু ধু মাঠ। ঝোপ-ঝাপ, পাথরের চাঁই। আকাশের গায়ে নীলচে রঙের যেসব পাহাড় লেগেছিল, সেগুলো একেবারে জমাট অন্ধকারের স্তূপের মত দেখাচ্ছে। বাবলাগাছের কাঁটা ছুঁয়ে বিদ্যুৎ-তরঙ্গের মত বাতাস আসছে সিন্ সিন শব্দে।

পোল থেকে নেমে কাকাবাবু সবে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছেন, নে এবার কাঁধ থেকে নাম! অমনি সামনের দিকে যারা গিয়েছিল, দেখা গেল তারা আবার উর্ধ্বশ্বাসে ফিবে আসছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া হুয়া জী? ফিব কেয়া হুয়া?

শের নিকালারে বাপ, শের নিকালা।

কাকাবাবু রেগে গিয়ে বললেন, মারে গা এক ঝাপ্‌পড়। বসিকতা পা গিয়া। একবার বোলতা হায় উধার, আর একবার বোলতা হায় ইধার। মামার বাড়ি পা গিয়া?

কাকাবাবুর কথা কে শুনবে! তারা তখন কোথায় চলে গেছে। পেছনে শোনা গেল লাঠির ঠুক্ ঠুক্ শব্দ। আর সেই গান। রাম নাম সুখদায়ী।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, কি করি বল তো? সারা রাতই কি এই পোলের এধার থেকে ওধার, আর ওধার থেকে এধার ছোটাছুটি করে বেড়াতে হবে? তাহলে আর বাঁচবো না রে! তার ওপর তুই চেপে আছিস কাঁধে। ওজন তো কম নয় তোর!

আমাকে এবার নামিয়ে দিন কাকাবাবু। এবার আমার লজ্জা করছে।

যাক তোরও তাহলে লজ্জা আছে?

কাকাবাবু ধীরে ধীরে আমাকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দিলেন। পায়ে যেন কোনও জোর নেই। এখন বাঘ এলে আর দৌড়তে পারব না। কী আর করব, বাঘের পায়ে ধরব। সেই পথিক লাঠি ঠুক ঠুক করে আপনমনে আমাদের পাশ দিয়ে চলেছে।

কাকাবাবু কিছু ভেবে না পেয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেয়া করে গঃ জী ?

লোকটি উদাস গলায় বললে, আরাম করো, আরাম করো, রামজী কা নাম করো।

কাকাবাবু আমাকে বললেন, লোকটার সাহস দেখেছিস? ভগবানের নামের জোর দেখ!

চলুন আমরাও রাম-নাম নিতে নিতে পেছন পেছন যাই।

আমরা যাবার জন্যে পা বাড়াতেই লোকটি গম্ভীর গলায় বললে, ঠারিয়ে!

কাকাবাবু বললেন, কেন ?

কল্কেতে কী একটা ভরতে ভরতে লোকটি যা বলল, তার বাংলা করলে দাঁড়ায়, তোমরা যদি দু'জন ওদিকে যাও, তাহলে বিপদ হতে পারে! একটু অপেক্ষা কর! আমি ধূমপান করে নি! বাঘটার ক্ষিদে পেয়েছে, তাই অমন ঘোরাঘুরি করছে! বাঘটাকে আমি চিনি! খুব ভাল ছেলে! মানুষ ও খায় না। একটা গরু বা মোষ পেলেই ও পাহাড়ের দিকে চলে যাবে!

কথা শেষ করে লোকটি কল্কেতে টান লাগাল। আগুন ঝিলিমিলি করছে! আর একটু জোরে টান মারার সঙ্গে সঙ্গে ব্লপ করে আগুন জ্বলে উঠল! আগুনের গোল একটা বল ঠিকরে আকাশের দিকে উঠে গেল! এমন দৃশ্য আগে কখনও দেখিনি!

কাকাবাবু ভয়ে চমকে উঠে বললেন, বাপ্! এ যে ভৌতিক কাণ্ড!

পথিক পাঁচবার গাঁজায় দম দিলেন। পাঁচটা আগুনের গোলা

আকাশের দিকে উঠে গেল। সন্ধ্যা শেষে রাত নেমে গেছে চারপাশে। সব কিছুই কেমন যেন ভৌতিক হয়েছে। ঝোপঝাড়, বড় গাছ, ছোট গাছ, টিলা, পাহাড়। সব কিছুই যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে ওত পেতে বসে আছে। পথের পাশ থেকে মাঝে মাঝে একটা দুটো আলগা পাথর ছড়্ ছড়্ শব্দ করে ঢালু বেয়ে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। শব্দে আমরা চমকে উঠছি। ভাবছি বাঘ বুঝি এসে গেল।

পথিক কল্কে ঠুকে গাঁজার আগুন পথের পাশে ফেলে দিলেন। বাতাসে আগুনের ফুলঝুরি খেলে গেল। পথিক তার ঝোলাটি আমাদের সামনে ফাঁক করে ধরে বললে, সব এর মধ্যে ফেলে দাও।

কাকাবাবু বললেন, কী ফেলবো?

তোমাদের অহংকার, হিংসা, পাপচিন্তা, মনের মধ্যে যা যা ময়লা আছে, সব, সব ফেলে দাও এর মধ্যে।

আমার মনে কিছু হিংসে ছিল, রাগ ছিল, লোভ ছিল, মনে মনে সব বিসর্জন দিলুম পথিকের তালিমারা ঝুলিতে। কাকাবাবু কী ফেললেন জানি না। তবে কিছু একটা ফেললেন।

পথিক ঝোলা মুড়ে বললেন, আর শের তোমাদের কিছু করতে পারবে না। শুধু শের কেন কেউ কিছু করতে পারবে না। নাও, এবার আমার সঙ্গে চলো।

আমরা তিনজনে উঠে দাঁড়ালুম। দূর আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। ঝড় জল হবে না কি? আজ কার মুখ দেখে আমরা বেড়াতে বেরিয়েছিলুম কে জানে! আমি আয়নায় আমার মুখই দেখেছিলুম। চলতে চলতে পথিক জিজ্ঞেস করল, কী, এখন শরীরটা বেশ হাল্কা লাগছে না?

হ্যাঁ, বেশ হাল্কা লাগছে। কাকাবাবু বললেন।

আমি অবশ্য তেমন কিছু বুঝছি না। কাকাবাবু সাধু-সন্তে, তুকতাকে ভীষণ বিশ্বাস রাখেন। জ্যোতিষচর্চা করেন। মাঝে মাঝে প্রেতচক্র বসান। গভীর রাতে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে

তাকিয়ে থাকেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বলেন, অনেক রকম অলৌকিক জিনিস দেখা যায়। গাছেরা নাকি ফিসফিস করে কথা বলে। জড়-পদার্থেরা হেঁটে-চলে বেড়ায়।

পথিক পিঠে ঝোলা নিয়ে সামনে নুয়ে পড়ে টুকটুক করে হেঁটে চলেছে। আমরা চলেছি পাশে পাশে। কিছুই তেমন দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে পাতলা অন্ধকার। বাতাসের সন সন শব্দ। বাঘের গর্জন থেমে গেছে। হয়তো শিকার পেয়েছে। সামনে ঝাঁকড়া মত বিশাল একটা গাছ। তলায় তলায় আলকাতরার মত আঁধার। ধক্ ধক্ করে দুটো আলো জ্বলছে। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, কি রে বাবা?

পথিক বললেন, ডরো মাৎ! এই সেই শের।

মট্ করে একটা শব্দ হল। কাকাবাবু বললেন, হাড় ভাঙার শব্দ। কী করব আমরা, এগোব? কাকাবাবুরও গলাটা যেন একটু কেঁপে গেল। আমার পা-দুটো অবশ হয়ে আসছে।

পথিক জ্বলজ্বলে চোখ দুটো লক্ষ করে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, তোমরা আমার পেছন দিয়ে আস্তে আস্তে গাছতলাটা পেরিয়ে চলে যাও, আমি আসছি।

পথিক বাঘের খুব কাছে গিয়ে বললেন, ক্যা মস্তান, শিকার মিল গিয়া?

বাঘ উত্তরে একটা চাপা গর্জন ছাড়ল। দুবার ল্যাজ আছড়াল পটাপট্ শব্দে। আমরা যতটা সম্ভব দ্রুত গাছতলাটা পেরিয়ে গেলুম। আর একবার হাড় ভাঙার শব্দ হল। পথিক লাঠি ঠুক ঠুক করে এগিয়ে এলেন। কিছুই যেন হয়নি। যেন বড় একটা বেড়াল আদর করে এলেন। গুন্‌গুন্ করে সেই একই গান ঠোঁটে লেগে আছে।

প্রায় মাইলখানেক হাঁটার পর আমরা লোকালয়ে এসে পড়লুম। কিছু কিছু দোকানপাট রয়েছে। মিঠাইওয়ালা লাড্ডু পাকাচ্ছে। গরম কচুরি ভাজার গন্ধ আসছে নাকে। থাক থাক পেঁড়া সাজানো

রয়েছে। বড় কড়ায় দুধ ফুটছে। পথিককে দেখে সেই বাজার-মত জায়গাটার সমস্ত মানুষ একবাক্যে হই হই করে উঠল, আইয়ে মহারাজ আইয়ে।

পথিক শুধু উদাত্ত গলায় বললেন, জয় রামজী কি জয়, জয় রাম।

আমরা এত হেঁটেছি যে পা যেন আর চলছে না। মিঠাইওয়ালার দোকানের বাঁশের বেঞ্চিতে কাকাবাবু আর আমি থেসকে বসে পড়লুম। মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি। স্থানীয় লোকেরা পথিককে ছেঁকে ধরল। মহারাজের কী খাতির। কাঁচা শালপাতায় লাড্ডু আর প্যাঁড়া এসে গেল। খাঁটি ঘিয়ে কচুরি ভাজা হচ্ছে। কী তার গন্ধ? বাঘের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে এখন পেটে চন-চনে খিদে। ভেবেছিলুম, আমরা হয়তো বাদ পড়ে যাব। না, এরা ভদ্রতা জানে। আমাদের জন্যেও খাবার এসে গেল।

মহারাজের কাছে নানা লোকের নানা বায়না। কারুর বোখার হয়েছে, কারুর পেটে দরদ। কারুর দাঁত। মহারাজ সকলকেই ওষুধ দিচ্ছেন। ওষুধ আর কিছুই নয় প্রসাদ। মুখ থেকে বের করে দিচ্ছেন কাউকে এক টুকরো প্যাঁড়া, কাউকে লাড্ডু। মুখে ফেলামাত্রই অসুখ সেরে যাচ্ছে। মহারাজের জয়ধ্বনিতে দিক্‌বিদিক কেঁপে উঠছে। মিঠাইওয়ালা বেশ বড় তিন ভাঁড় দুধ পাঠিয়ে দিলেন। মোটা সর ভাসছে। কাকাবাবু ভীষণ খেতে ভালবাসেন। মুখ দেখে মনে হল ভীষণ খুশি হয়েছেন। চুমুকে চুমুকে দুধটা মেরে দিয়ে, তিনিও জয়ধ্বনি দিলেন, জয় মহারাজের জয়।

কাকাবাবু বললেন, তুই সোজা বাড়ি চলে যা। আমি একটু সাধুসঙ্গ করে যাই। মহারাজের কাছে অনেক জিনিস। একটু সেবা করে দেখি। যদি কিছু পাওয়া যায়।

এই অন্ধকারে আমি একলা যাবো কী করে?

কী যে বলিস! এই তো একটু মাত্র পথ। সোজা গান গাইতে গাইতে চলে যা। ভয় কী? পুরুষ মানুষের আবার ভয় কী?

শোনা গেল, মহারাজ আজ এখানেই রাত কাটাবেন। আর একটু পরেই দূর ওই গ্রামে রামলীলা হবে। মহারাজ সেই লীলা দেখবেন। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে দলে দলে হ্যাজাক লাইট চলেছে। কালো কালো ছায়া চলেছে সার বেঁধে, মেয়েপুরুষের দল। আকাশ ফুঁড়ে একটা বাজি উঠল। ফট্ করে ফেটে তারার ফুল ঝরতে লাগল। চারপাশ আলোয় আলো।

মিঠাইওয়ালার দোকানের পাশ থেকে অন্ধকারে কে যেন ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল। প্রথমে ভেবেছিলাম সাপ। বাঘের হাত থেকে বেঁচে এইবার নাগের হাতে মৃত্যু। মিঠাইওয়ালা বললে, মহারাজ আমার বহু কাঁদছে।

মহারাজ বললেন, আও বেটি ইধার আও।

মহিলা মহারাজের পায়ের কাছে এসে বসলেন। মাসখানেক হল একমাত্র শিশুটি মারা গেছে। তাই ভীষণ দুঃখু। মহারাজ তার মাথায় হাত রাখতেই ফুলে ফুলে কান্না থেমে গেল। মহারাজ মৃদুস্বরে বললেন, জয় রামজী কি জয়!

মহারাজ ঝোলার মধ্যে হাত চালিয়ে একটা পাকা পেয়ারা বের করে মহিলার হাতে দিয়ে বললেন, যাও বেটি ঘরে যাও। এই ফল খেলে তোমার সব দুঃখ চলে যাবে। তুমি আনন্দ পাবে।

মহিলা ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কাকাবাবু সাধুজীকে বললেন, মহারাজ আমি আপনার চেলা হতে চাই।

মহারাজ অন্ধকারে চুপ করে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হ্যাজাকের আলো এসে পড়েছে মুখের একপাশে। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে আগুনের টুকরোর মত। এতক্ষণ মানুষটিকে আমরা সাধারণ পথিক ভেবেছিলুম, এখন মনে হচ্ছে ভীষণ শক্তি আছে ভেতরে। খুব ইচ্ছে হচ্ছে, আমিও একবার চেপে ধরি। সামনে পরীক্ষা। একটু শক্তি পেলে হয় তো ফার্স্ট হয়ে যাব। সকলের তাক লেগে যাবে। অঙ্কে একশোর মধ্যে একশো। ইংরাজিতে মিনিমাম সত্তর। বাঙলায় আশি।

পাহাড়ের দিকে বিদ্যুৎ ঝিলিকের সঙ্গে সঙ্গে বাজ-পড়ার বিশাল শব্দে বনস্থলী কেঁপে উঠল! হঠাৎ পাগলা হাতির মত আকাশ-পাতাল তোলপাড় করে গাছপালা মড়মড়িয়ে বাতাস ছুটে এল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়ছে। ধুলো উড়ছে। বন্দুকের ছর্‌রার মত কাঁকর, বালি গা ঘষে চলেছে। মিঠাইওয়ালার দোকানের ত্রিপল ভটাস করে উড়ে চলে গেল জাদু-কার্পেটের মত। সবাই ছুটছে আশ্রয়ের জন্যে এদিকে-ওদিকে।

সেই পথিক মহারাজ নিশ্চল। কোনও চঞ্চলতা নেই। আমাদের দু-জনের দিকে তাকিয়ে মহারাজ বললেন, ডরো মাত। সব ঠিক হো যায়গা।

মহারাজের একটা হাত কাকাবাবুর কাঁধে। তিনি বসে রইলেন। অলৌকিক কিনা জানি না, আমাদের চারপাশে বৃষ্টি হয়ে চলেছে অঝোরে, আমরা তিনজনে গোলাকার একটা শুকনো জায়গায় বেমালুম বসে আছি যেন অদৃশ্য একটি ছাদ আমাদের মাথার ওপর রয়েছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে, বাজ অট্টহাসি হাসছে পাহাড়ের মাথায়।

কাকাবাবু পরের দিন সকালে ইঁদারার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁতন করছেন। এই শীতে পরনে শুধু একটা গামছা। খালি গা। ফরসা শরীরে বিজকুড়ি বিজকুড়ি শীতকাঁটা। আমার পরনে প্যাণ্ট, শোয়েটার, মোজা, জুতো। গলায় সাতপাট মাফ্‌লার। মাথায় হনুমান টুপি। এত কিছুর দরকার ছিল না। ঠাণ্ডা লাগবে, ঠাণ্ডা লাগবে বলে মা পরিয়ে দিয়েছেন। কাকাবাবুর আজ এ অবস্থা কেন?

আপনার শীত করছে না?

দাঁত থেকে দাঁতন সরিয়ে বললেন, না।

কেন শীত করছে না?

সে অনেক ব্যাপার।

তার মানে?

তোর মনে আছে কালকের সেই সাধুর ঝুলি?

খুব মনে আছে।

কাল সেই ঝুলির মধ্যে কি কি ফেলেছি জানিস ?

না।

শীত ফেলেছি, গ্রীষ্ম ফেলেছি, দুধ খাবার লোভ ফেলেছি। ভাল ভাল জামা কাপড় পরার ইচ্ছে, সব ফেলে দিয়েছি।

হঠাৎ হঠাৎ যা খুশি তাই করার ইচ্ছে, সেই ইচ্ছেটা ফেলেছেন ?

যাকে তোর মা বলে পাগলামি ?

ওই আর কি।

না রে সেটা ফেলতে ভুলে গেছি। ওটা ফেলে দিলে বাঁচব কি নিয়ে ?

ফেললে ভালো হত। আমি তাহলে বেঁচে যেতুম।

তোকে মারবে কে রে গাধা ? তুই দেড়শো বছর বাঁচবি।

মানুষ দেড়শো বছর বাঁচে নাকি ? একমাত্র কচ্ছপ বাঁচে তিনশো বছর।

তুই কিস্যু জানিস না। গজকচ্ছপ বাঁচে দেড়শো বছর।

গজকচ্ছপ কি জিনিস ?

ঠিক তোর মত দেখতে, তোর মত স্বভাব, ভীতু শীতকাতুরে, একেবারে অবিকল তোর মত।

ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কথা না বাড়িয়ে ইঁদারার কাছ থেকে সরে এলুম। সাধুর ঝুলিতে আরও অনেক কিছু ফেলার ছিল। বেলা দশটার সময় কিছু না খেয়ে, ধুতি আর শার্ট পরে কাকাবাবু হন হন করে কোথায় বেরিয়ে গেলেন।

মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, কিছু খাবে-টাবে না ? দুধ, মোহনভোগ ?

মৃদু হেসে কাকাবাবু বলেছিলেন, আমার আর খাওয়ার প্রয়োজন নেই বউদি। চিরকালের মত আমার পেট ভরে গেছে।

মা হেসেছিলেন, দেখা যাবে বেলা একটা দেড়টার সময়। যখন বেড়িয়ে ফিরে আসবে।

একটা বাজল, দুটো বাজল, তিনটে বাজল, কাকাবাবুর আর দেখা নেই। আমার ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। ঘর-বার করছি। মা একবার বাইরে আসছেন, একবার ভেতরে যাচ্ছেন। অত সব রান্না, কারুরই খাওয়া হয়নি। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। কারই বা সাহায্য পাওয়া যাবে? মা গালে হাত দিয়ে গেটের পাশে রকে বসলেন। বেলা ক্রমশই পড়ে আসছে। শীত আসছে চেপে।

মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যেতে পারে বল তো?

মনে হয় সেই সাধুর আস্তানায়?

কোথায় সেই আস্তানা?

তাতো জানি না মা।

কাল সেই সাধুকে তোরা কোথায় পেয়েছিলিস?

ওই দূর গ্রামে। একটা মিঠাইয়ের দোকানে।

চল তাহলে একবার যাই।

সে তো মা অনেক দূরে।

তা হোক। তুই টর্চটা নে। ঘরে বসে ভেবে ভেবে মরার চেয়ে বাইরে খুঁজে আসাই ভাল।

দরজায় তালা মেরে মা আর আমি বেরলুম। আমাদের বাড়িতে যে কাজ করে সেই সুখিয়াও সঙ্গে চলল। কাকাবাবু ফিরছেন না দেখে তার ভীষণ মন খারাপ হয়েছে। মাঝে মাঝেই আঁচলে চোখ মুছছে।

মা হাঁটতে হাঁটতে এক সময় রাগ করে বললেন, এই সব মানুষের সঙ্গে কেউ বিদেশে আসে, তোর বাবার যে কি কাণ্ড! রোজই চিঠি দিচ্ছে, আজ আসছি আর কাল আসছি। আমাকে এরা সব পাগল করে ছাড়বে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর আমরা সেই মিঠাইওয়ালার দোকানে এসে পৌঁছলুম। আজও পুরি ভাজা হচ্ছে। বড় বড় লাড্ডু সাজানো দোকানে। অমৃতি তাকিয়ে আছে স্নেহের চোখে ভীষণ খিদে। আজ আর কে খাওয়াবে। কাকাবাবুও নেই। সাধুবাবাও নেই।

মাকে দেখেই মিঠাইওয়ালা দোকান থেকে নেমে এল। কেয়া হুয়া মাঈজী।

মা সব বললেন। মিঠাইওয়ালার দোকানে কাকাবাবু সকালে একবার এসেছিলেন। সাধুবাবার খবর নিয়ে সোজা পাহাড়ের দিকে চলে গেছেন।

পাঁহাড়? সে কত দূর?

ওই যে মা, আকাশের গায়ে আঁকা। এখান থেকে চার পাঁচ ক্রোশ তো হবেই।

আমরা অন্ধকারে আকাশের গায়ে লেগে থাকা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলুম। আজ আর যাওয়া যাবে না।

ভোরের ট্রেনে বাবা এলেন। সব শুনে বললেন, বিকাশ তাহলে সত্যিই সাধু হয়ে গেল। এর আগেও একবার সাধু হয়ে গিয়েছিল।

সাধু হয়ে গেল, কি বাঘের পেটে গেল, জানলে কি করে?

মান্দার হিলে বাঘ। হাসালে তোমরা।

পরশু বাঘ বেরিয়েছিল। আর সেই বাঘই হল কাল।

চা, জলখাবার খেয়ে বাবা আমাকে নিয়ে পুলিশ চৌকিতে চললেন। দারোগাবাবু সব শুনে বললেন—মিস্টার, যে সাধু হয়ে গেছে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি কি করে! আমরা যে চোরই ধরি। সাধুকে কি ধরা যায়! তবু একটা ছবি দিয়ে যাবেন। তালাস করে দেখবো।

মহাসমস্যা। কাকাবাবুব কোনও ছবি নেই।

মা বললেন, আর্টিস্টকে বলে আঁকিয়ে দাও। বলো এইরকম নাক, এইরকম চোখ। মানুষের চোখ আর নাকই তো আসল।

বাবা বললেন, চেহারা তো আমার চোখে আসছে। আমিই তো এঁকে দিতে পারি।

সাতদিন মান্দারহিলে কাটিয়ে আমরা কলকাতায় ফিরে এলুম। কাকাবাবুর কোনও খোঁজ নেই। কোথায়ই বা সেই সাধুবাবা। সব তোলপাড় হয়ে গেল তবু কাকাবাবুর কোনও সন্ধান নেই। এক মাস

গেল, দুমাস গেল। একবছর গেল, দুবছর গেল। কাকাবাবুর হাত-ঘড়ি দেরাজের ওপর টিকটিক করে। মা এখনও দুপুরে পা ছড়িয়ে বসে চোখের জল ফেলেন। অনেকে তীর্থ থেকে ফিরে এসে বলেন, একজন সাধুর সঙ্গে দেখা হল, ঠিক বিকাশের মত দেখতে। অমনি আমরা ছুটি সেই তীর্থে। বেড়ানো হয় কিন্তু কাকাবাবুকে ধরা যায় না।

কত বড় হয়ে গেলুম। কাকাবাবুর পাঞ্জাবি এখন আমার গায়ে ঠিক হতে পারে। কাকাবাবু বলেছিলেন, সাহসী হবি, পরোপকারী হবি। মনটাকে জলের মত পরিষ্কার রাখবি। আমার সাহস অনেক বেড়েছে। অন্যের উপকার করার চেষ্টা করি। আর মন! সেই সাধুর ঝোলার মধ্যে মনের সব নোংরা জিনিস তো ফেলেই দিয়েছি।

রোজ রাতে এখনও আমি স্বপ্ন দেখি। প্রতিদিন দেখি। বালির নদী পড়ে আছে নিচে। সেই বালিতে পড়ে আছে ঝকঝকে একটা রুপোর টর্চ। আর সোনার তৈরি একটা পোল কোথায় যেন চলে গেছে। নীল একটা পাহাড়ের কোলে। পোলের মাঝখানে পা ছড়িয়ে বসে আছে বিশাল একটা বাঘ। আর বাঘটার কিছু দূরে স্থির হয়ে বসে আছেন সেই সাধুবাবা আর আমার কাকাবাবু।

ছাঁৎ করে ঘুম ভেঙে যায়। দেখি মাঝরাত? আর ঘুমোতে পারি না। জেগে শুয়ে থাকি। আর তখনই জানতে পারি আমি একা নই, মা আর বাবা দু'জনেই জেগে। আর জেগে আছে সেই পোল। বালির ওপর শুয়ে আছে পোল। মাথার কাছে বসে আছে পাহাড়। সেই পাহাড়ের মাথায় জ্বলছে হোমের আগুন। আকাশ টক-টকে লাল।

নিজের ঢাক নিজে পেটালে

বড়মামা বললেন, 'এবার আমি নিজের ঢাক নিজেই পেটাব।'

মেজমামা চায়ের কাপে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'সে আবার কী ?'

মাসিমা কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললেন, 'তার মানে লণ্ডভণ্ড আবার একটা কিছু করে ছাড়বে। ইলেকশানে দাঁড়াতে চাইছ নাকি বড়দা ?'

'ইলেকশান ? ও ভদ্রলোকের ব্যাপার নয়।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে কি ধর্মগুরু হবে ?'

'সে শক্তি নেই। ধর্ম নিয়ে ছেলেখেলা চলে না।'

মাসিমা বললেন, 'তাহলে ঢাকটা পেটাবে কী করে ? কী ভাবে ?'

'আমি নিজেই আমার জন্মদিন করব। তোরা তো কেউ কিছু করলি না !'

মেজমামা বললেন, 'জন্মদিন ! বুড়ো বয়েসে জন্মদিন ? লোকে তোমাকে পাগল বলবে।'

'সারা গ্রামের মানুষকে আমি পেটপুরে খাওয়াব। সারাদিন সানাই বাজবে। ফুল, ফুলের মালা। এলাহি ব্যাপার করে ছেড়ে দোব। দেখি লোকে কেমন পাগল বলে। সেদিন সারাদিন আমি ফ্রিতে চিকিৎসা করব। একটাও পয়সা নোব না। ফ্রি ওষুধ।'

মেজমামা বললেন, 'মরবে, একেবারে হাড়-মাস আলাদা করে রেখে যাবে। তোমার জয়ঢাকের মতো পেট ফাঁসিয়ে দেবে।'

'দেখা যাক।'

মাসিমা বললেন, 'কে রাঁধবে। কে পরিবেশন করবে ?'

'তোকে কিছু করতে হবে না। কলকাতা থেকে সাতজন হালুইকর

আসবে। আমার বিশজন চ্যালা পরিবেশন করবে।'

'এ করে কী লাভ হবে। এর মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই। লোকে বলবে ডাক্তার সুধাংশু মুখুজ্যে রুগীমারা পয়সা ওড়াচ্ছে। লোকের চোখ টাটাবে। নামের বদলে বদনামই হবে। তার চেয়ে তুমি বরং জন্মদিনে পশুভোজন করাও। একেবারে নতুন আইডিয়া। একদিকে গ্রামের যত গোরু। আর একদিকে ছাগল। আর একদিকে বেড়াল। আর একদিকে কুকুর। আর ভোরবেলা পাখি। পৃথিবীর কেউ কোনওদিন যা ভাবতে পারেনি। বিশ্বাসঘাতক মানুষ, অকৃতজ্ঞ মানুষকে খাওয়ানো মানে ভূতভোজন। এ যদি তুমি করতে পার, আমি তোমার দলে আছি।'

বড়মামা চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মেজমামাকে পেছন দিক থেকে জড়িয়ে ধরলেন। 'তুই আমার ভায়ের মতো ভাই। আমি রাম, তুমি লক্ষ্মণ।'

মাসিমা বললেন, 'আহা, কী স্বর্গীয় দৃশ্য!'

বড়মামা চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'কিন্তু মেজো, কী ভাবে ওদের নেমন্তন্ন করা হবে! মানুষকে তো চিঠি দিয়ে করে! একটা গোরু, একটা ছাগলে তো জমবে না। একপাল চাই। বাগান যেন একেবারে ভরে যায়। সেটা কী ভাবে হবে?'

'মাথা খাটাতে হবে।'

মাসিমা বললেন, 'কবে হবে? তার আগের দিন আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব।'

বড়মামা বললেন, 'সে আমি জানি। কোনও ভাল কাজে তোমাকে পাওয়া যাবে না।'

মাসিমা উঠে চলে গেলেন। মেজমামা বললেন, তোমার জন্মদিন কবে?'

'সেটা আমাকে দেখতে হবে।'

'সেটা তুমি আগে খুঁজে বের করো। আমি ইতিমধ্যে প্ল্যানটা

ছকে ফেলি। জিনিসটা যদি করা যায় বড়দা, ফাটাফাটি হয়ে যাবে।'

'আচ্ছা মেজো, নেমন্তন্ন মানেই তো ভাল-মন্দ খাওয়া। মানুষের খাওয়ার মেনু আমরা জানি। পশুর ভাল খাওয়া কী হবে? মেনুটা কী হবে?'

মেজমামা কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, 'পাখির ভালমন্দ খাবার হল, ফল, মেওয়া। গোরুর হল, ভাল বিচিলি, আখের গুড়, ছোলা সবুজ ঘাস, গাছের পাতা। ছাগলের বটপাতা, কাঁঠালপাতা! কুকুরের হল মাংস।'

বড়মামা বললেন, 'দুধ, বিস্কুট।'

'মেনুটা আমরা পরে ঠিক করে ফেলব বড়দা।'

মেজমামা উঠে চলে গেলেন। কলেজে আজ আবার সকালেই ক্লাস। বড়মামা আমার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেলেন। ড্রয়ার খুলে খুঁজে খুঁজে একটা কোষ্ঠী বের করলেন।

'বুঝলি, জন্মতারিখটা খুঁজে বের করতে হবে। তুই কোষ্ঠী দেখতে জানিস?'

'আমি? আমি তো ওসব জানি না বড়মামা!'

'কী জানিস তুই? নে, এটাকে খোল। ধর।'

কোষ্ঠী খুলছে। খুলতে খুলতে ঘরের এ-মাথা থেকে ও-মাথায় চলে গেলুম। কত বড় কোষ্ঠী রে বাবা!

'বড়মামা, ঘর যে শেষ হয়ে গেল! দেয়ালে ঠেকে গেছি। আর যে যাবার জায়গা নেই! একে কী কোষ্ঠী বলে বড়মামা?'

'একে বলে গাছ-কোষ্ঠী। গাছের ডালে বসে ন্যাজের মতো ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে দেখতে হয়। ভাটপাড়ার তর্কপঞ্চাননের তৈরি রে ব্যাটা! এতে সব আছে। নে, মাথার দিকটা মেঝেতে পেতে বইচাপা দিয়ে এদিকে চলে আয়।'

চাপা দিয়ে চলে এলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকল বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি। বড়মামা সাবধান করলেন, 'লাকি,

কোষ্ঠী নিয়ে ইয়ারকি কোরো না। চুপ করে একপাশে বোসো।'

লাকি ফোঁস ফোঁস করে কোষ্ঠী শুঁকে চেয়ারে গিয়ে বসল জিভ বের করে।

বড়মামা বললেন, 'নে, হামাগুড়ি দিয়ে মাথার দিক থেকে দেখতে দেখতে নিচের দিকে নেমে আয়। দেখবি এক জায়গায় লেখা আছে, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়স্য, প্রথম পুত্র জাতবান। ওই জায়গায় লেখা থাকবে মাস, দিন, সাল, তারিখ, সময়।'

'এ খুব কঠিন কাজ যে বড়মামা! আপনার মনে নেই কবে, কোন্ দিন, কোন্ সালে জন্মেছেন?'

'ধুস, নিজের জন্মদিন মনে থাকে? নে নে, হামাগুড়ি দিয়ে দেখতে দেখতে নেমে আয়। কষ্ট কী রে? হামা দিতেও কষ্ট। ছেলেবেলায় কত হামা দিয়েছিস!'

পড়তে পড়তে নিচের দিকে নামছি। সব কি আর পড়ছি, না পড়া যাচ্ছে? কত রকমের নকশা আঁকা। ছবি আঁকা। ছক কাটা। মানুষের ভাগ্য যে কী ভীষণ জটিল! নামতে নামতে পেটে নেমে এলুম। কোথায় সেই জাতবান! সব আছে, ওইটাই নেই।

'বড়মামা, তর্কপঞ্চাননমশাই ওটা লিখতে ভুলে গেছেন।'

'সে কী রে! আমি কি রামচন্দ্র! না জন্মাতেই রামায়ণ লেখা হয়ে গেল!'

'লিখতে মনে হয় ভুলে গেছেন!'

তাহলে এটা কার কোষ্ঠী! ভাল করে দ্যাখ রে গবেট। জন্ম-তারিখ, দিন, সময় ছাড়া কোষ্ঠী হয় না।'

'আপনি একবার দেখুন, আমার চোখে পড়ছে না!'

'এদিকে আয়, ন্যাজটা চেপে ধর। চেপে না ধরলে গুটিয়ে যাবে।'

বড়মামা হামা দিয়ে কোষ্ঠী পড়ছেন, ঘরে এলেন কবি করুণাকিরণ। বড়মামার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়। বড় বড় কবিতা লেখেন। মাথায় বড় বড় কাঁচাপাকা চুল। ইদানিং বড়মামার কাছে প্রায়ই

আসেন। শরীরে হাজারটা ব্যামো। কখনও পেট ভুটভাট। কখনও মাথাধরা। কখনও বুক ধড়ফড়, হাত-পা কাঁপা। কবি বলে বয়স্ক বলে বড়মামা খুব খাতির করেন। বিনা পয়সায় চিকিৎসা চলে। ফ্রি ওষুধ। আজ আবার কী রোগ নিয়ে এলেন কে জানে? এখুনি জানা যাবে।

কবি করুণাকিরণ বললেন, 'কী হে ডাক্তার, আবার নতুন করে হামা দেওয়া শিখছ না কি? দ্বিতীয় শৈশব এরই মধ্যে ফিরে এল?'

'আজ্ঞে না, নিজের জন্মতারিখ খুঁজছি।'

'ওটা কোষ্ঠী বুঝি? বাঃ, বেশ পেল্লায় ব্যাপার তো! খুঁজে পেলে?'

'আজ্ঞে না।'

'সরো, আমি খুঁজে দিচ্ছি।'

আমরা তিনজনেই মেঝেতে হামাগুড়ি দেবার অবস্থায়। কবি করুণাকিরণ খুঁজে খুঁজে বের করলেন, বড়মামার জন্মদিন পয়লা আষাঢ়। মেঝে থেকে বীরের ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বড় শুভদিনে জন্মেছ হে ডাক্তার। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে, প্রথম পুত্র জাতবান। তোমাকে আটকায় কে? ধর্মে, অর্থে, মোক্ষে তরতর, তরতর করে ওপর দিকে উঠে যাবে।'

ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল কেন? ডাক্তার, একবার প্রেসারটা চেক করো তো!

মেজমামা আজকাল রাতে খই-দুধ ছাড়া অন্য কিছু খান না। ভুঁড়ি হয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া রাতে গুরুভোজন করলে তাড়াতাড়ি ঘুম পেয়ে যায়। বেশি রাত অবধি লেখাপড়া করা যায় না। দুধে খই ভেজাতে ভেজাতে বললেন, 'তোমার জন্মদিন তাহলে পয়লা আষাঢ়!'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ। এসে গেল। প্ল্যানটা ভেবেছিস, কী ভাবে কী হবে?'

'ক'দিন ধরেই খুব ভাবছি, বুঝলে? পাখি আর কুকুরের জন্যে চিন্তা নেই। জানো তো, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'তুই কাককে পাখির মধ্যে ফেলছিস?'

'ও মা, সে কী! কাক পাখি নয়! দুটো ডানা, উড়তে পারে। পাখি ছাড়া আবার কী?'

'ডাক আর স্বভাব দুটোই ভারী বিশ্রী।'

'তুমি রূপ দেখো না দাদা, গুণটাও দ্যাখো। ইংরিজিতে বলে নেচারস্ স্ক্যাভেঞ্জার। তাছাড়া পায়রা আছে, চড়াই আছে। আমাদের ঠাকুরদালানেই শ-খানেকের বেশি পায়রা আছে। একমুঠো দানা ছড়ালেই সব ফরফর করে নেমে আসবে।'

'আরে দূর, সে তো সব গোলা পায়রা!'

'গোলা পায়রা, পায়রা নয়! তুমি যে কী বলো দাদা! তোমার জন্যে জাপান থেকে ন্যাজঝোলা পায়রা কে আনবে দাদা! পাখি বলতে তুমি কী বোঝো?'

'ধর, টিয়া, ময়না, দোয়েল, বুলবুলি, ফিঙে, বউ-কথা-কও, নীলকণ্ঠ, কোকিল, বাবুই, চাতক, শালিক। মানে সব জাতের পাখি, যারা গান গাইতে পারে।'

'দ্যাখো দাদা, অমন দুই দুই কোরো না। সব পাখিই ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওই দিন একঝাঁক ছাতারে যদি ধরতে পারি, সভা একেবারে জমে যাবে।'

'প্লিজ মেজো, ছাতারে আমদানি করিসনি। ভীষণ ঝগড়াটে পাখি। চিল্লে বাজার মাত করে দেবে।'

'আরে, ভোজসভা একটু সরগরম না হলে মানায়! বিয়েবাড়িতে দ্যাখোনি যত না খাওয়া হয় তার চেয়ে বেশি হয় চিৎকার।'

মাসিমা তাড়া লাগালেন, 'তোমরা দয়া করে টেবিল ছেড়ে উঠবে? রাত কটা হল খেয়াল আছে?'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুই সব সময় অমন অসহযোগিতা করিস কেন কুসি? তোর সামান্য একটু সহানুভূতি পেলে, আমরা দু'ভাই পৃথিবী জয় করতে পারি।'

'থাক, তোমাদের আর পৃথিবী জয় করে কাজ নেই। সব মাথায় তুলে এখন জন্মদিন হচ্ছে। তাও কী রকম জন্মদিন, না পশু-ভোজন।: লোকে শুনলে তোমাদের দুজনকেই পাগলা গারদে দিয়ে আসবে।'

মেজমামা বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উঠে পড়ো বড়দা। এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। কুসিটার মাথায় কোনও আইডিয়া নেই। একেবারেই স্টিরিও।'

দুই মামা ছাদে এসে ঢাউস দুটো বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসলেন। মাথার উপর এক আকাশ তারা। কোণের দিকে একফালি চাঁদ ঝুলছে। মনে হচ্ছে, কে যেন ছবি এঁকে রেখেছে। মাঝে মাঝে বাতাস বইছে। দূরে, বহুদূরে একপাল কুকুর চিৎকার করছে।

মেজমামা বললেন, 'বড়দা, শুনছ! এই গ্রামে ওই রকম কয়েক পাল কুকুর আছে।'

'তুই ওদের নেমন্তন্ন করবি নাকি?'

'নিশ্চয়। তাছাড়া তুমি কুকুর পাবে কোথায়?'

'ওরা তো লেড়ি রে?'

'তোমার বড়দা বড় জাতিভেদ। বর্ণ বৈষম্য দূর করো। ভগবানের রাজত্বে সবাই সমান।'

'ওদের স্বভাব তুই জানিস না মেজো, ম্যানেজ করতে পারবি না। শেষে পুলিশ ডাকতে হবে।'

'হ্যাঃ, পুলিশ ডাকতে হবে! কী যে তুমি বলো বড়দা। স্রেফ ইট মেরে ভাগিয়ে দোব।'

'গোরু আর ছাগলের জন্যে তা হলে কী করবি?'

'নিমন্ত্রণপত্র ছাড়ব। বয়ানটা আমি এখুনি লিখে দিচ্ছি। ভাগনে!'

'বলুন মেজমামা ?'

'লেখ তো।'

কাগজ আর কলম নিয়ে বসতেই মেজমামা বলতে শুরু করলেন ঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী পয়লা আষাঢ় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস পালিত হবে মদীয় ভবনে সাড়ম্বরে, যথোচিত উৎসব সহযোগে। উক্ত পুণ্যদিবসে এই উপলক্ষে আয়োজিত পশুভোজসভায়, স-শাবক আপনার গৃহপালিত গোরু/ ছাগলকে উপস্থিত থাকার জন্যে ও প্রীতিভোজে অংশগ্রহণের জন্যে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই। উপহারের বদলে আশীর্বাদই প্রার্থনীয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি-নিয়ন্ত্রণবিধি অনুসারেই ভোজের আয়োজন করা হবে। ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘজীবন কামনা করে তাঁকে জনসেবার সুযোগ দান করুন।

ভবদীয় শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নির্ঘণ্ট : প্রাতে সানাই সহযোগে উৎসবের সূচনা। স্নান, পূজাপাঠ, হোম। অনুষ্ঠান মণ্ডপের উদ্বোধন, মাঙ্গলিক সংগীত। পক্ষী-উৎসব। ডাক্তার মুখোপাধ্যায় স্বহস্তে পক্ষিভোজন করাবেন। ক্ষণ বিরতি। দ্বিপ্রহরে, গো ও ছাগ উৎসব। সাড়ম্বরে, গোরু ও ছাগলদের সুখাদ্য বিতরণ করা হবে। রাতে কুকুরসেবা। স্বস্তিবাচন। উৎসবের পরিসমাপ্তি।

নিমন্ত্রণপত্র লেখা শেষ হল। বড়মামা গদগদ স্বরে বললেন, 'বাঃ, চমৎকার! তোর মাথাটা মেজো বেশ ভালই খেলে। সাধে তুই নামকরা অধ্যাপক!'

'নাও, এখন শুয়ে পড়ো। বড় বড় হাই উঠছে। কাল সকালে

ভোলাবাবুকে প্রেসে দিয়ে আসতে বোলো, আর বেশি সময় নেই। শ-তুয়েক কপি ছাপালেই হবে।'

মেজমামা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে ঘরের দিকে চলে গেলেন।

শ্যামল হাজরার খড়ের গোলা। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হাজরামশাই ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর অন্ধকার করে, গদির ওপর পা তুলে গ্যাট হয়ে বসে আছেন। সামনে লাল ক্যাশ বাক্স। মেজমামা আর আমি দোকানে ঢুকতেই, হাজরামশাই ভদ্র হয়ে বসতে বসতে বললেন, 'আসুন, আসুন, মেজবাবু, কী সৌভাগ্য আমার।'

হাজরামশাই কাশতে লাগলেন। একঢোক ধুনোর ধোঁয়া গিলে ফেলেছেন।

মেজমামা গদির ওপর ঝুলে বসলেন। চোখ জ্বালা করছে। মেজমামা বললেন, 'আপনার কাছে একটা খবরের জন্যে এলুম।'

হাজরামশাই কাশি সামলে বললেন, 'কী খবর মেজবাবু?'

'আচ্ছা, আপনার গোলা থেকে যাঁরা খড় নেন, তাঁদের নাম-ঠিকানা সব আমায় দিতে পারেন?'

হাজরামশাই সন্দেহের চোখে তাকালেন, 'কেন বলুন তো? আমায় ভাতে মারতে চান?'

'ভাতে মারতে চাইব কেন?' মেজমামা আশ্চর্য হলেন।

'বলা যায় না, হয়তো পাশাপাশি আর একটা গোলা খুলে বসলেন!'

'পাগল হয়েছেন? প্রোফেসারি ছেড়ে গোলা খুলতে যাব কোন্ দুঃখে?'

'বলা যায় না মেজবাবু। ছেলে-চরানো, আর গোরু-চরানো প্রায় এক জিনিস। শেষে হয়তো ভাবলেন বিদ্যার বদলে খড় দেওয়াই

ভাল। অনেক সহজ কাজ !'

মেজমামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তা যা বলেছেন ! ব্যবসা করতে জানলে তাই করতুম। না, সে কারণে নয়। আমি জানতে চাইছি অন্য কারণে।'

মেজমামা সব ভেঙে বললেন। বড়মামার অভিনব জন্মদিন পালনের কথা। গোরুদের সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করতে হলে গোরুর মালিকের নাম-ঠিকানা জানা দরকার। সব শুনে হাজরামশাই হাঁ হয়ে গেলেন।

'মেজবাবু আপনি রসিকতা করছেন না তো ! এ-রকম কথা কেউ কখনও শোনেনি।'

'আমার দাদা পশুভক্ত। সারাজীবন গোরু, ভেড়া, ছাগলেরই সেবা করে গেল। সাত-সাতটা কুকুর। সেই ভালবাসা পরিবারের বাইরে ছড়িয়ে দেওয়া আর-কি ! বুঝলেন না হাজরামশাই !'

'সবই বুঝলুম, তবে এই দুর্মূল্যের বাজার। মানুষই খেতে পাচ্ছে না।'

'তাহলে বুঝুন, পশুরা কী অবস্থায় আছে ? কটা গোরু ভালভাবে খেতে পায় ? কটা ছাগল খাবার পর পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে ! কটা ছাড়া কুকুরের খাবার স্থিরতা থাকে ? পশু বলে কি তারা মানুষ নয় !'

হাজরামশাই হাসলেন। হাসতে হাসতে মোটা একটা খাতা খুললেন, 'নিন, আমি বলে যাই, আপনি লিখে নিন। চা খাবেন মেজবাবু ?'

'তা একটু হলে মন্দ হয় না।'

হাজরামশাই কর্মচারীকে ডেকে চায়ের হুকুম দিলেন। নাম-ঠিকানা লেখা চলতে লাগল। অনেকেরই গোরু আছে। মেজমামার খুব আনন্দ। আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'গোরুতেই মাত করে দেবে। কুকুরের আর দরকার হবে না। বাড়িটা বৃন্দাবন হয়ে

যাবে। 'দাদা আমায় রাখালরাজা হয়ে গো-সেবা করবে।'

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমাদের পাগলামিব দিনটা তাহলে কবে ঠিক হল?'

বড়মামা আর মেজমামা দুজনেই বসে ছিলেন। একসঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'পাগলামি মানে? জীবসেবা মানে শিবসেবা। পড়িসনি?'

'পড়েছি দাদা। তবে এখন পড়েছি পাগলের হাতে। দিনটা কবে সেইটা শুধু বলে দাও। তার দু'দিন আগে আমি পালাব।'

'পালাবি মানে! বাড়িতে এতবড় একটা কাজ। শুধু কাজ নয়, সামথিং নিউ। তুই পালালে আমরা যাব কোথায়? তুই আমাদের অনুপ্রেরণা।'

'আমার ভূমিকা?'

'দর্শক। তুই হবি দর্শক। খবরের কাগজের লোক আসতে পারে। এমন তো হয়নি কখনও। তাদের একটু আদর-আপ্যায়ন করবি। 'পশুপ্রেমী বড়দা' বলে আমরা একটা পুস্তিকা ছাপাচ্ছি। সেইটা জনে জনে বিতরণ কববি। মনে রাখবি—এটা সাধারণ বাড়ি নয়। তপোবন। আশ্রম।'

মাসিমা মুচকি হেসে চলে গেলেন। বড়মামা বিষণ্ন মুখে বললেন, 'আমাদের পাগল বলে গেল!'

'আরে এ-পাগল সে-পাগল নয়। এ হল আদরের পাগল। প্রেমিক পাগল। যে-কোনও ভাল কাজ, অভিনব কাজের সূত্রপাতে লোকে পাগলই বলে। তোমার সেই ব্যাঙ-নাচানো সায়েবের গল্প মনে পড়ে? পাগলামি থেকে এল বিদ্যুৎ। পাগলামি থেকে এল বসন্তের টিকে। নাও, এসো, চিঠিগুলো খামে ভরে ফেলা যাক। আজই নিমন্ত্রণে বোরোতে হবে। বেশি সময় নেই।'

'তুই কি সত্যিই 'পশুপ্রেমী বড়দা' ছাপাবি ?'

'ছাপাবি কী ? ছাপতে চলে গেছে।'

'কী লিখলি, আমাকে একবার দেখালি না ভাই !'

'ছেপে আসুক। পড়লে তুমি অবাক হয়ে যাবে। শুরুটা আমার লাইন-দুয়েক মনে আছে—পশু না হলে পশুকে ভালবাসা যায় না। আমাদের পশুপ্রেমী বড়দা আশৈশব পশুপক্ষীর সঙ্গে বিচরণ করতে করতে এখন পশু-ভ্রাতা কি পশু-পিতার স্তরে চলে গেছেন।'

'এই সব লিখলি ? লোকে আমাকে ভুল বুঝবে না তো !'

'কেন, ভুল বুঝবে কেন ?'

'ওই সব লিখে আমাকেই তো পশু বানিয়ে দিলি।'

'মানুষের আর কোনও গৌরব নেই দাদা। এখন পশু হওয়াই গৌরবের। গোরু তবু দুধ দেয়। পাখি তবু গান গায় ! কুকুর তবু পাহারা দেয় ! তোমার মানুষ কী করে দাদা ? শুধু বদমাইশি।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।' বড়মামা খামে চিঠি ভরতে লাগলেন আপনমনে।

সন্ধেবেলা আমি আর মেজমামা বেরিয়ে পড়লুম, ঠিকানা মিলিয়ে বাড়ি-বাড়ি ঘুরতে। বেশ মজা লাগছে। প্রথম বাড়ি। মেজমামা ডাকলেন, 'হরিদা আছেন, হরিদা ?'

হৃষ্টপুষ্ট, কালো চেহারার হরিদা বেরিয়ে এলেন। দেখলেই মনে হয় ডেলি সের দুয়েক দুধ খান। খাবেন না কেন ? বাড়িতে তিন-তিনটে গোরু। হাম্বা হাম্বা ডাক ছাড়ছে। ভদ্রলোকের দু'হাতের কনুই পর্যন্ত কুচো-কুচো খড় লেগে আছে। মেজমামাকে দেখেই বললেন, 'আরেব্বাবা, কী সৌভাগ্য ! মেজবাবু যে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ করতে এলুম। আগামী পয়লা আষাঢ় দাদার শুভ জন্মদিন।'

'বাঃ বাঃ, ডাক্তারবাবুর জন্মদিন। নিশ্চয় যাব। সপরিবারে, সবান্ধবে।'

'হরিদা, নিমন্ত্রণ আপনাকে নয়, আপনার তিনটি গোরুকে !'

'অ্যাঁ, সে আবার কী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, দুপুরবেলা আপনার গোরু তিনটিকে বেশ সাজিয়ে-গুছিয়ে অনুগ্রহ করে নিয়ে আসবেন ! মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ রইল। বলেন তো গোয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথামত 'ওদেরও বলে যাই।'

'মানুষের ভাষা যে ওরা বুঝবে না মেজবাবু!'

'আপনি তাহলে ওদের বলে দেবেন। চিঠির তলায় অবশ্য লেখাই আছে, পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়। আপনি তাহলে ঠিক সময়ে ওদের নিয়ে যাবেন, কেমন ?'

'আমার গোরু তিনটে মেজবাবু ভিন্-জাতের। একটু ভাল খায়।'

'কী খায় হরিদা ?'

'পাঁচ কেজি ছোলা এক-একজন···।'

'পেট ছেড়ে দেবে।'

'আজ্ঞে না, ওইটাই ওদের খোরাক, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি আর খড়ের কুচো, এবেলা-ওবেলা মিলিয়ে এক ডজন ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'অ্যাঁ, বলেন কী ? মরে যাবে যে।'

'আপনি আপনার পেটের মাপে দেখছেন মেজবাবু। গোরুর পেট তো পেট নয়, জালা। বিদেশী গোরু মেজবাবু, খোরাকটি ঠিক রাখলে তবেই না দুধ ছাড়বে। এবেলা-ওবেলা ষোল-সতের কেজি।'

'এই সাংঘাতিক খোরাক ম্যানেজ করেন কী করে ?'

'দুধ বেচে মেজবাবু।'

'আচ্ছা চলি তাহলে—' বলে মেজমামা আমার হাতে টান মারলেন। উৎসাহ যেন মরে এসেছে। শ্যামল সাঁপুই বাড়ির রকে বসে কড়রমড়র করে লেড়ো বিস্কুট দিয়ে চুমুকে চুমুকে চা খাচ্ছিল। মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'শ্যামল, তোমার কটা গোরু !'

'সে তো একবার আমি বলে দিয়েছি, আবার কেন ?'

'কাকে বলেছ ?'

'কেন, ওই যে সরকারের লোক এসেছিল, কী বললে—সেনসাস না কী হচ্ছে। পশুগণনা।'

'আমি গণনা করতে আসিনি। নেমন্তন্ন করতে এসেছি। দাদার জন্মদিনে তোমার গোরুদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি।'

শ্যামল সাঁপুই হেসেই অস্থির। ভাবলে আমরা পাগলা হয়ে গেছি। 'এক-আধটা গোরু! আমার সাত-সাতটা গোরু। সব কটাকে নিয়ে যাব? দুটো বাছুরও আছে!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সপরিবারে, সবান্ধবে যাবে।'

রাত দশটার সময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা ডিসপেনসারি বন্ধ করে ছোট ছাদে বসে বাতাস সেবন করছিলেন। আর গুনগুন করে গান গাইছিলেন—'নেচে নেচে আয় মা শ্যামা—'

মেজমামা ধপাস করে বেতের চেয়ারে বসে বুকপকেট থেকে নোট-খাতা বের করে, বিড়বিড় করে যোগ করতে শুরু করলেন, একশো-তিন। বুঝলে বড়দা।'

'আমি যে তোর সঙ্গে যাব···অ্যাঁ, কী বললি ?'

'হাণ্ড্রেড থ্রি, দিশি, বিলিতি মিলিয়ে। ধরে নাও শ-খানেক গোরু আসবে। ইয়া-ইয়া সব চেহারা। খোরাক শুনলে তুমি লাফিয়ে উঠবে।'

'ভালই তো, ভালই তো। পেটপুরে সব খাওয়াব।'

'খোরাক শুনবে? পারহেড পাঁচ কেজি ছোলা, সম-পরিমাণ খোল-ভুসি, ছোলার চুনি, কুচো বিচিলি, ভেলি গুড়—আখের গুড় হলেই ভাল হয়। বারোশো ভিটামিন ট্যাবলেট।'

'ছ্যাঃ, কোথা থেকে শুনে এলি, এসব চালিয়াতির কথা! মানুষই দু'বেলা খেতে পায় না, গোরু খাবে ছোলা, ভিটামিন ট্যাবলেট! এরপর বলবি, ছাগলে রাবড়ি খাচ্ছে।'

'যাদের গোরু তারা বলেছে। আমি গোরুর কী জানি বল? একজন বললে, আমার গোরু আধ মাঠ কচি দুব্বো খায়, তা না হলে কনস্টিপেশান হয়।'

'ওসব চালের কথা, রাজনীতি করছে রে মেজ। আমাদের জব্দ করতে চায়। যে যাই বলুক, আমরা আমাদের মেনু অনুসারে খাওয়াব।'

'তা হয় না বড়দা। মানুষ হলে হত। লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, পাঁপরভাজা। পশুদের এক-এক শ্রেণীর এক-এক প্রকার খাদ্য। যার যা খাবার তাকে তো তা দিতে হবে। কুকুরকে আলোচাল দিলে খাবে? ছাগলকে তার নিজের মাংস দিলে ছোঁবে? অশান্তি হয়ে যাবে বড়দা।'

'তা হলে তাই হবে। ছোলা কত লাগবে?'

'ধরো, ছশো কেজি। ছশো কেজি খোল, ভুসি, ছোলার চুনি, একশো কেজি ভেলি। বাইশটা বড় ছাগল আর বিয়াল্লিশটা ছানা আসবে। কুকুর আসবে ষাট-সত্তর, বিলিতি আরও দশ-বারোটা। ছটা তার মধ্যে অ্যালসেশিয়ান। বাকি ছটা স্পিৎস। দু'দল, না তিনদল। তিনদলের তিন রকম ব্যবস্থা। স্পিৎস খাবে কিমা। অ্যালসেশিয়ান খাবে খাব-খাবা মাংস, লেড়ি খাবে হাড়গোড়, ছাঁটছুট। ছাগলের জন্যে চাই পুরো একটা কাঁঠালগাছ আর বটগাছ।'

বড়মামা বেশ যেন নার্ভাস হয়ে গেছেন, 'মেজ, খরচের কথা বাদ দে। সে যা হবার হবে। কিন্তু জায়গা লাগবে বিশাল।'

'ম্যানেজ করার জন্যে অনেক লোকও লাগবে। শ-খানেক কাঠের ডাবর চাই, গোরুর জন্যে।'

'আচ্ছা মেজ, আজকাল তো সব খাওয়াবার ভার ক্যাটারারকে দিয়ে দেয়?'

'সে মানুষ হলে হত! পশুদের জন্যে ক্যাটারার নেই, সাপ্লায়ার আছে।'

'কাল ভেটেরিনারি হসপিট্যালের ডাঃ সাহানাকে একবার ফোন করব। দেখি উনি কী ভাবে সাহায্য করতে পারেন।'

সাড়ে এগারোটার সময় সভা ভেঙে গেল।

বড়মামা সকালের চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে বললেন, 'ডিফিট, গ্রেট ডিফিট।'

মেজমামা এক চুমুক চা খেয়ে বললেন, 'আমি সারারাত ভেবে দেখলুম, ব্যাপারটা অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো হয়ে যাবে। সামলানো যাবে না। লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। বিশাল জায়গা চাই, বহু লোকজন চাই। আইডিয়াটা ভাল ছিল। কাজে লাগানো গেল না, এই যা দুঃখ।'

মাসিমা বললেন, 'যাক বাবা, বাঁচা গেছে। কদিন ধরে ভগবানকে আমি কম ডেকেছি! যাই, পুজোটা দিয়ে আসি, মানত করেছিলুম।'

মেজমামা বললেন, 'ঝট করে আর-একটা নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপিয়ে ফেলি। আপনার গৃহপালিত পশু নয়, সপরিবারে আপনারই নিমন্ত্রণ। ভাগ্নে?'

'আজ্ঞে।'

'ঝট করে দু'লাইন লিখে নাও। সবিনয় নিবেদন, অনিবার্য কারণে আগামী পয়লা আষাঢ়, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে। পশুসেবার পরিবর্তে সন্ধ্যায় এক প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত প্রীতিভোজে আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি। ভবদীয়।'

বড়মামা খুঁতখুত করে বললেন, 'অ্যাঃ, ব্যাপারটা গেঁজে গেল রে মেজো।'

আজ পয়লা আষাঢ়।

ভোর পাঁচটা থেকে সানাই শুরু হয়েছে। ভোরের সুর বাজছে। বাইরের বিশাল মণ্ডপ ফুলে-ফুলময়। কাল রাতে এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। আজ একেবারে ঝলমলে রোদ। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন। পুজোপাঠ, হোম-অর্চনা শুরু হল বলে। বড়মামার স্নান হয়ে গেছে। পরনে পট্টবস্ত্র, গায়ে উত্তরীয়। রূপ একেবারে খুলে গেছে। কাল থেকে চিঠি আর টেলিগ্রাম আসতে শুরু করেছে, দূর-দূরান্ত থেকে। সকলেই দীর্ঘজীবন কামনা করেছেন।

মাসিমা পুজোর আয়োজন করছেন। ভোরবেলাতেই বাজার এসে গেছে। বড় বড় মাছ শুয়ে আছে রকের একপাশে। পুঁচকে একটা বেড়াল মাছের আকার দেখে ভয়ে থমকে পড়েছে, দেয়ালের একপাশে।

হালুইকর ব্রাহ্মণ হাতা, খুন্তি, ঝাঁঝরি, লটবহর নিয়ে এসে গেছেন। অ্যাসিসটেণ্টরা উনুনে আগুন দিয়েছেন। বাগানের দিকের আকাশে ধোঁয়া উঠছে পাকিয়ে পাকিয়ে।

ইলেকট্রিকের লোক এসে টুনি ঝোলাতে শুরু করেছে। তিনজন ঝাড়ুদার খচরমচর করে ঝাঁড়ু দিতে শুরু করেছে চারপাশে। আজ সব ছবির মতো হয়ে যাবে।

বেলার দিকে ফুলের তোড়া আসতে শুরু করল। হাসপাতাল থেকে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে। বড়মামার হাসি-হাসি মুখ। ধুতি আর পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কপালে চন্দনের টিপ। দুপুরে মাছের মুড়ো দিয়ে ভাত খাবেন। ছোট্ট একবাটি ঘি খাবেন চুক করে চুমুক দিয়ে। সানাই মাঝে-মাঝে থামছে, মাঝে-মাঝে বেজে উঠছে। রান্নার শব্দ ভেসে আসছে। বাতাসে সুবাস ছড়াচ্ছে।

সন্ধে হতে-না-হতেই পুটুস-পুটুস করে আলোর মালা জ্বলে উঠল চারপাশে। তেমনি গুমোট গরম নেই। ভিজে-ভিজে বাতাস বইছে। জুঁই, বেল, রজনীগন্ধার সুবাস। একে একে নিমন্ত্রিতরা আসতে শুরু

করলেন। সাড়ে সাতটার মধ্যে প্যাণ্ডেল কানায় কানায় ভরে গেল। বড়মামা, মেজমামা অভ্যর্থনায় ব্যস্ত! 'আসুন, আসুন, নমস্কার, নমস্কার' এই চলছে সন্ধে থেকে। কারুর হাতে চা, কারুর হাতে ঠাণ্ডা জলের বোতল। আমি বিতরণ করে চলছি, 'পশুপ্রেমী বড়দা।' জাফরানি রঙের মলাট। গোটা গোটা অক্ষর। কেউ পড়ছেন। কেউ মুড়ে রাখছেন।

টেবিলে টেবিলে পাতা পড়ে গেল। পাশ দিয়ে গন্ধ ছড়াতে ছড়াতে খাবার ছুটছে। রাধাবল্লভী, ফিসফ্রাই। বিরিয়ানি গন্ধে পাগল করে দিচ্ছে। বড়মামা আর মেজমামা হাতজোড় করে সকলকে বলতে লাগলেন, এবার 'আপনারা অনুগ্রহ করে আহারে বসুন।'

সভা একেবারে পরিপূর্ণ। কবি করুণাকিরণ মাঝের একটি আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'শুরুর আগে আমি একটি কবিতা পড়তে চাই, "আজি তব জন্মদিনে, হে রাখাল/ বীণা তব বাজে/ জীবনের জয়গানে/ থেমে থেমে/ সেবার মূর্তি তুমি/ তোমারে চুমি/ শতবর্ষ পার করে/ হেসে হেসে/ তুমি যবে যাবে অমর্তলোকে/ অশ্রুজলে সিক্ত হবে / রিক্ত ধরণী।"

ফটাফট, ফটাফট হাততালি।

হঠাৎ কোণের দিকে এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বাজখাঁই গলায় বললেন, 'ওয়াক আউট। আপনারা সকলে প্রতিবাদে এখুনি এই সভা পরিত্যাগ করুন।'

'কেন? কেন?' সমবেত কণ্ঠে প্রশ্ন।

'কেন? আপনারা এই পুস্তিকাটা একবার পাতা উলটে দেখেছেন?'

'কী আছে, কী আছে?'

'এই যত কিছু আয়োজন, সবই আমাদের অপমানের কৌশল। এক জায়গায় জড়ো করে পাইকারিদরে জুতো মারার বড়লোকি চাল'।

'কেন? কেন?'

‘একটা অংশ পড়ে শোনালেই বুঝতে পারবেন আপনারা। পড়ছি, শুনুন।

শিবজ্ঞানে, জীব-সেবা যার জীবনের ব্রত, শৈশব থেকেই পশুপ্রেমে সে উতলা। গোরু, মোষ, ভেড়া, ছাগল, গাধা, কুকুর, পাখি, এদের নিয়ে জীবন কাটাতে পারলে আমার পশুপ্রেমী বড়দা আর কিছুই চায় না। মানবদরদি আমরা দেখেছি, এমন পশুপ্রেমী আমাদের দেশে কদাচিৎ চোখে পড়ে।

সেই পশুপ্রেমী বড়দার অভিনব জন্মদিনের, অভিনব আয়োজন এই পশুভোজসভা। একদিকে গোরু, আর একদিকে ছাগল, অন্যদিকে পাল-পাল্ কুকুর সেবা করছে, আর তারই জয়গান গাইছে সমস্বরে।’

‘অপমান, অপমান!’ সভা চিৎকার করে উঠল।

মেজমামা চেঁচাচ্ছেন, ‘ছি ছি, ভুল বুঝবেন না, প্রোগ্রাম চেঞ্জ কবেছে, প্রোগ্রাম চেঞ্জ করেছে।’

বড়মামা বলছেন, ‘এ কী বলছেন, এ কী বলছেন, আমি কখনও অপমান করতে পারি! লেখাটা ভুল হাতে পড়েছে।’

কে কার কথা শোনে! সব লণ্ডভণ্ড করে নিমন্ত্রিতরা বেরিয়ে গেলেন। সানাই তখনও বাজছে করুণ সুরে। রাধাবল্লভীর মহা-শ্মশানে দুই মামা হাঁ করে দাঁড়িয়ে।

ফানুস

সেবার কালীপুজায় আমি আর পিণ্টু ঠিক করলুম, ঠিক সূর্যাস্তের সময় আমাদের বাড়ির দোতলার ন্যাড়া ছাদ থেকে রঙ-বেরঙের বিশাল একটা ফানুস ছেড়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেবো। পিণ্টুর বাবাকে আমরা কাকাবাবু বলতাম। কাকাবাবু সব জানতেন। তিনি কেমিস্ট ছিলেন। বাড়িতে একটা ছোট লেবরেটারিও ছিল। ছুটির দিন মাঝে মাঝে মন-মেজাজ ভাল থাকলে আমাদের ডেকে ডেকে নানা কেরামতি দেখাতেন। আগের বছর আমাদের একটা হাউইয়ের ফর্মুলা দিয়েছিলেন। ফর্মুলার কোন দোষ ছিল না। আসলে খোলটা আমরা ঠিকমত তৈরি করতে পারি নি। পারলে হাউই আকাশের ব্রহ্মতালু ভেদ করত নিশ্চয়ই। খোলের দোষে রকেট আকাশে না উঠে বোতলশুদ্ধ ছাদে শুয়ে শুয়েই ফুলকি কেটেছিল। কাকাবাবু বলেছিলেন, টেরিফিক ফোর্স হয়েছে হে, তবে সাধারণ কাগজের খোল বলে কেতরে পড়েছে। যে কাগজে নোট তৈরী হয়, সেই পার্চমেণ্ট কাগজে খোল তৈরি করতে পারলে—দেখতে কাণ্ডটা হতো কী!

ফানুসের খোল নিয়েও প্রথমে একটু সমস্যা হলো। বিশাল একটা খোল চাই এস্কিমোদের ঘরের মতো। ধোঁয়া ঢুকবে সেই খোলে তবেই না তিনি আকাশে উঠবেন হেলে-দুলে। এ-সব ব্যাপারে চীনেরা ভারী একস্‌পার্ট। তারা ড্রাগন করে, লণ্ঠন করে, হাতি করে। কাগজ দিয়ে তারা কি না করতে পারে! আমাদের দৌড় ঠোঙা পর্যন্ত। চীনে গুরু পাই কোথায়, পাড়ায় একটিমাত্র চীনের জুতোর দোকান। হাফা-সায়েব আবার এ-সব জানেন না। তাঁর মা জানতেন, তিনি দু'বছর আগে মারা গেছেন।

ঠোঙা তৈরির বিদ্যে নিয়েই আমি আর পিণ্টু বসলুম খোল

বানাতে। ঘুড়ির কাগজ, এক বালতি আঠা আমাদের কাঁচা মাল। তৈরি হবে গোলগাল খোল।

পিণ্টু বললে, মোহনবাবুর চেহারাটা মনে রাখ। মোহনবাবুর পা-ছুটো ছেঁটে মাথাটা নিচু করে দিলে যে চেহারাটা হবে, আমাদের খোলটা হবে ঠিক সেই রকম। মোটা মোহনবাবুর জ্যামিতি নিয়ে পিণ্টুদের বাড়ির বাইরের ঘরের মেঝেতে থেবড়ে বসে বেশ কিছুক্ষণ আমাদের গবেষণা চলল।

পিণ্টু বলল, আসলে আমাদের একটা গোল জালা বানাতে হবে। গলার দিকটা সরু, মোহনবাবু চিত হয়ে শুয়ে থাকলে তাঁর ভুঁড়িটা যে-রকম দেখায়, ওই রকম দেখতে হবে।

সবই তো বোঝা গেল। হাতের কাছে চার দিস্তে ঘুড়ির কাগজ, কাঁচি, আঠাও রেডি, কাটাকুটি শুরু করলেই হয়। সাহসের অভাব।

পিণ্টু বললে, এক কাজ করি চল, মানদা মাসির কাছে একবার যাই। ঠোঙা তৈরির কায়দাটা শিখতে পারলেই মোটামুটি যা-হয় কিছু একটা দাঁড়াবে।

মানদা মাসি সারাদিনে হাজার হাজার ছোট বড় ঠোঙা তৈরি করে সংসার চালান। মাঝে মাঝে তাঁর পেয়ারের ছাগল ঠোঙা খেয়ে ফেলে। ছাগলের নাম বুধি। যদিও তার বুদ্ধি-সুদ্ধি কিছু আছে কিনা আমাদের সন্দেহ।

আমরা যখন মাসির বাড়ি গেলুম, বুধিকে নিয়ে মাসি তখন ভীষণ ব্যস্ত। বুধি একবাটি আঠা সহযোগে একদিস্তে খবরের কাগজ দিয়ে ব্রেকফাস্ট করে চোখ উল্টে পড়ে আছে। ঘটনাটা ঘটিয়েছে দড়ি ছিঁড়ে, মাসি যখন পুকুরে, তখন।

মাসি বুধিকে বলছেন, ওঠ, বাবা ওঠ, যোয়ানের আরকটুকু খেয়ে নে মা, ঠিক হজম হয়ে যাবে। ও বুধি, বুধি!

ছাগলের চোখ এমনিই কি রকম ড্যাবা ড্যাবা মরা মনুষের মতো,

তায় কাগজ খেয়ে মনে হচ্ছে যেন বোল্ড-টাইপে ছাপা শ্রাদ্ধের চিঠি।

মাসির কাছে কাজ আদায় করতে এসেছি, মাসির কাজে সাহায্য করলে মনটা যদি একটু ভেজে।

আমরাও বুধির সেবায় লেগে গেলুম। পিণ্টু চোয়াল ধরে হাঁ করবার চেষ্টা করছে। আমি আস্তে আস্তে গায়ে হাত বুলিয়ে তোয়াজ করার চেষ্টা করছি। জুতোর চামড়ায় কি আর সুড়সুড়ি লাগে; বুধির চোয়াল ফাঁক করে কার পিতার সাধ্য! অথচ মাসিকে ছাগল ছাড়া না করলে আমাদের কাজ বন্ধ। বুধি হঠাৎ তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে আমাদের সব কটাকে চার ঠ্যাঙের মোক্ষম লাথি ঝেড়ে, আরকের বাটি উল্টে দিয়ে, মাসির শোবার ঘরে ঢুকে গেল।

মাসি ধুলো ঝেড়ে মাটি থেকে উঠে আমাদের হাত ধরে তুলতে তুলতে বললেন, লাথির জোর দেখলি? তারপর একমুখ হেসে বললেন, আমার দুষ্টু মেয়ে। পিণ্টুর কপালের কাছটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

মাসি বললেন, তোদের লাগলো নাকি?

আমরা দুজনেই কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, বড্ড লেগেছে মাসি, ফ্যাকচার হয়ে গেছে।

আহা বাছা রে! কি করতে তোরা এইছিলিস?

তোমার কাছে শিখতে।

হায় কপাল! আমি কী জানি যে তোদের শেখাবো রে! না জানি লেখাপড়া, না জানি নাচগান। আমি যে তোদের মুখ্যু মাসি রে।

তুমি যা জানো, আমরা জানলে আজ বর্তে যেতুম।

ধুর পাগল। তোদের মাসি একটা অপদার্থ।

ও-সব বোলো না মাসি, আমরা কিন্তু রেগে যাচ্ছি। তুমি আমাদের ফানুসের খোল তৈরি করে দেবে। ঘুড়ির কাগজ কিনেছি, আঠা তৈরি করেছি, তুমি ছাড়া আমাদের কে আছে মাসি!

গ্রামের একপাশে মানদা মাসির একলা আস্তানা, একটা ছোট্ট

আটচালা, একটা ছাগল, একটা পেয়ারা গাছ, ব্যস্ আর কিছু নেই। ত্রিভুবনে মাসির কেউ আত্মীয়ও নেই। আমরা যেই বলেছি তুমি ছাড়া আমাদের কে আছে মাসি। মাসির চোখ দুটো ছলছল করে উঠল, ওরে আমার সোনা রে—ব'লে, পিণ্টু আর আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, নিয়ে আয় তোদেব কাগজ। তা বাবা, আমি তো ঠোঙা তৈরির ইসপার্ট, আমি কি তোদের ফানুস মানুষ পারবো রে?

খুব পারবে মাসি। দেখতে হবে ঠিক মোহনবাবুর মতো।

পাজি ছেলে! আচ্ছা নিয়ে আয় তোদের কাগজ আর আঠা।

তৈরি হলো ফানুস। মন্দ হলো না। তবে ঠিক গোল না হয়ে একটু লম্বাটে হয়ে গেল, বিশাল একটা ঠোঙার মতো।

কাকাবাবু বললেন, থাক গে যা হয়েছে! একটু বেঢপ হলো বটে, তবে ধোঁয়াটা ধরে রাখা নিয়ে কথা। তা হবে'খন।

খোলা দিকটায় একটা তারের গোল রিং লাগানো হলো। মাঝখানে আড়াআড়ি দুটো তারে পাটে পাটে জড়ানো হলো কেরোসিন তেলে ভেজানো কাপড়ের ফালি আর রজন।

পিণ্টু বললে, যতটা পুরু করে পারিস জড়া। যত বেশি ধোঁয়া হবে তত উঁচুতে উঠবে, উঁচু আরো উঁচু, একেবারে স্বর্গে চলে যাবে রে!

কল্পনা ফানুসের আগেই উড়ছে। লক্ষ একেবারে চাঁদে গিয়ে পৌঁছনো। জিনিসটা বেজায় ভারী হয়ে গেল।—এত ভারী উড়বে তো রে?

কি যে বলিস! আগেকার দিনে ফানুসে মানুষ উড়তো।

তেলে ভেজানো একটা দশ হাত কাপড় উড়বে না?—পিণ্টুর অকাট্য যুক্তি কাকাবাবুও সমর্থন করলেন।

সন্ধে তখন হয় হয়। দীপাবলী, পশ্চিম আকাশে লালে লাল করে সূর্য ডুবছে। সমস্ত বাড়ির ছাদে ছাদে দিনের আলো নেভার আগেই আলসেতে মোমবাতি ফিট করার কাজ চলছে। এদিক-সেদিক থেকে ঠুসঠাস কয়েকটা পটকা ফাটার শব্দ হচ্ছে। নগেন

একটা উড়োন তুবড়ি টেস্ট করল। প্রথম ফানুস উঠলো কামারপাড়ার দিক থেকে! কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুস হুস করে আকাশে উঠে গেল। নভেম্বরের মাঝামাঝি। দমকা উত্তরের হাওয়ায় মাতালের মতো টলতে টলতে ফানুস নিরুদ্দেশ।

আমাদের দলবল ছাদে উঠেছে। পিন্টুর হাতে লম্ফ, আমার হাতে প্যাকাটি। কাকাবাবু পাশে আছেন, অ্যাডভাইসার। আর আছেন পাঁচুদা, লম্বা মানুষ তিনি, দু'হাতে ফানুসটা মাথার ওপর তুলে ধরে থাকবেন। ধোঁয়া ঢুকে খোলটা ফুলে উঠবে। টান টান হয়ে উড়ে যাবার টান ধরবে, তারপর আপনা থেকেই আকাশের জিনিস আকাশে উড়ে যাবে।

পাঁচুদা লম্বা মানুষ। দু-হাত তুলে ফানুসে ধোঁয়ার টান ধরাচ্ছেন। দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। খোলটাই না পুড়ে যায়! কাকাবাবু বললেন, রজন বড্ড বেশি হয়ে গেছে রে। যাক, দেখা যাক কি হয়! ভগবানকে ডাক।

আশে-পাশের বাড়ির ছাদে কৌতূহলী মুখ। উড়বে ফানুস, উড়ছে ফানুস। রোগা মানুষ পাঁচুদা মোটা ফানুস ওড়াচ্ছেন। মাথার ওপর দু-হাত তুলে কতক্ষণ দাঁড়াবেন! হাত টন টন করছে। তার ওপর আগুনের আঁচ। মুখ চোখ লাল। ফানুসটা একটু দুলে উঠতেই তিনি তোলপাই মেরে ঠেলে দিলেন। প্রথমে বেশ হাত পাঁচেক উঠে, উত্তরের দমকা হাওয়ায় ছাদেব সীমানা পেরিয়ে গেল। তারপরই শুরু হলো তাব আসল খেল। সামনেই একটা একতলা বাড়ি। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড টলতে টলতে সেই বাড়ি টপকে গেল। তারপরই একটি পোড়ো দোতলা বাড়ি। ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলা চলছে, কেউই মেরামত করে না। ভাঙ্গা ছাদে লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ছিল। শীতের মুখে শুকিয়ে ঝনঝন করছে। ফানুসটার ইচ্ছে সেইখানেই শুয়ে পড়ে।

কাকাবাবু বললেন, সর্বনাশ করেছে! ঘাসে আগুন লেগে গেলে

লঙ্কাকাণ্ড হবে যে! তোরা সব উইল ফোর্স প্রয়োগ কর। আমরা চোখ বুজিয়ে, জয় মা কালী, জয় মা কালী—জপতে শুরু করলুম। একটু যেন কাজ হলো। ফানুসটা পাখির মতো বসতে গিয়েও ঝিকি মেরে হাতখানেক উঠে শুকনো ঘাসে আগুনের তাত লাগিয়ে চিলে-কোঠা পেরিয়ে গেল। আমরা ভয়ে কাঠ! ফানুসের একি বাঁদরামি, অনেকটা মানুষের মতো ব্যবহার। পোড়ো বাড়িটার পর খেলার মাঠ। মাঠ দেখে যেন ফানুসের খেলতে ইচ্ছে করল। ওপরে না উঠে, একপাশে কেতরে ফানুস নামতে শুরু করল। এরপর আমরা আর কিছু দেখতে পেলুম না, বাড়ির আড়ালে আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে তার শয়তানি চলছে।

চারদিক অন্ধকার। সার সার আলো জ্বলে উঠছে বাড়িতে বাড়িতে। ঠুস ঠাস, ধুম ধাম—পটকা ফাটছে। মাইকে মাইকে গানের সোরগোল। পাঁচুদা বলছেন, যাক বাবা, মাঠে গিয়ে পড়েছে তবু রক্ষে। আর ঠিক সেই সময় মাঠের দিকে বাড়ির আড়ালে ধপ করে একটা আগুন লাফিয়ে উঠলো। মাঠের ওপাশে চিৎকার উঠলো—আগুন, আগুন! আমরা ভয়ে দরজা জানলা বন্ধ ক'রে বসে রইলুম। পুলিশ-কেস হতে পারে, জেল হতে পারে, ধোলাই হতে পারে। অল্প কিছু সময় পরেই দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল।

রাত দশটা নাগাদ ছাগলের গলার দড়ি ধরে বগলে একটা পুঁটলি নিয়ে মানদা মাসি আমাদের বাড়িতে এলেন। ফানুস মাঠ পেরিয়ে তাঁর শুকনো খড়ের চালে ল্যাণ্ড করেছিল। তাঁর জিনিস তাঁরই কাছে ফিরে এসেছিল রাগে আগুন হয়ে।

যে ফানুস উড়লো না, সে ফানুসের দাম সাতশো টাকা। মানদা মাসির নতুন খড়ে-ছাওয়া বাড়ি করিয়ে দিলেন কাকাবাবু। আমাদের বললেন, ঘাবড়াও মাত্। আসচে বার আমি খোল তৈরি করব। এক্সপেরিমেণ্ট ইজ লাইফ!

বয়স্ক কণ্ঠ ঃ ও বাব্বা, কুকুর আছে যে, মরেছে। অলেস্টারটা তাহলে খুলে ফেলাই ভাল। কুকুর বাবার অলেস্টার সহ্য করতে পারে না। সেবার দেরাদুনের রাস্তায় কি কেলেঙ্কারী হয়েছিল। তিনটে তাগড়া কুকুর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না। মাঙ্কিক্যাপটা কি করব? খুলে ফেলব, না থাকবে! কটা বাজল দেখি! দুটো বেজে পাঁচ—। সে কি রে বাবা! এই তো সবে ভোর হল। ট্রেনে বসে বসেই তো সূর্যোদয় দেখলুম। এরই মধ্যে দুটো পাঁচ।

[দরজা খোলার শব্দ। জোরে কুকুরের ডাক]

শান্ত হও। শান্ত হও বৎস। অত উত্তেজনা ভাল নয়।

নারী কণ্ঠ ঃ কাকে চাই ?

বঃ কণ্ঠ ঃ তুমি কে ?

নাঃ কণ্ঠ ঃ আমি কাজ করি।

বঃ কণ্ঠ ঃ আই সি, এমপ্লয়ী! ইউনিয়ান কর ?

নাঃ কণ্ঠ ঃ মুখ্যু মানুষ। ইংরেজি জানি না বাবা।

বঃ কণ্ঠ ঃ ধম্মঘট কর ?

নাঃ কণ্ঠ ঃ আজ্ঞে না। আপনি কি পুলিশের লোক ?

বঃ কণ্ঠ ঃ আজ্ঞে না। আমি মিলিটারী ম্যান। মনোরমা কোথায় ?

নাঃ কণ্ঠ ঃ মা বাথরুমে।

বঃ কণ্ঠ ঃ মার স্বামী কোথায় ?

নাঃ কণ্ঠ ঃ বাজারে।

বঃ কণ্ঠ ঃ লেড়কা-লেড়কিরা কোথায় ?

নাঃ কণ্ঠ : বিছানায়।

বঃ কণ্ঠ : বিছানায়? কান পাকাড়কে আভি উতার দেও। ছুটো পাঁচ বেজে গেল। আভিতক লেটকে পড়ে থাকা হায়। মামার বাড়ি পা গিয়া।

নাঃ কণ্ঠ : ছুটো পাঁচ কি বলছেন গো বাবু? এই তো সবে আটটা বাজল।

মনোরমা : কে গো শঙ্করীর মা?

শঙ্করীর মা : বুড়ো মত একটা লোক। মাথায় হনুমান টুপি। বলছেন মিলিটারী।

মনোরমা : ওমা, দাদা তুমি! কখন এলে?

দাদা : ছুটো পাঁচে—। রাত কি দিন বলতে পারব না, ঘড়িতে লেখা থাকে না।

মনোরমা : এই তো সবে আটটা বাজল গো দাদা। বাজনা শুনে বাথরুমে গেলুম। ভেতরে এসো, ভেতরে এসো।

দাদা : নো নেভার। কুকুর থেকে আমি দূরে থাকতে চাই। দে আর ডেঞ্জারাস। কামড়ালেই পেটে ইঞ্জেকসান।

মনোরমা : দাদা, এই তুমি মিলিটারী ম্যান! কুকুরের ভয়ে কাবু! সারা জীবন তাহলে কি লড়াই করলে?

দাদা : মেয়েদের মত বোকা বোকা কথা বলিসনি তো। আমি কি তোর বাড়িতে এতদিন পরে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এলুম? কি যে বলিস মনা?

মনোরমা : তুমি নির্ভয়ে ভেতরে এস। কুকুর বাঁধা আছে।

দাদা : কি রকম বাঁধা? খুলে বেরিয়ে আসবে না তো? ডাক শুনে মনে হচ্ছে মানুষ-খেকো কুকুর।

মনোরমা : মোটা চেন দিয়ে জম্পেস করে বাঁধা আছে!

দাদা : ভেরি ওয়েল। আমাদের আর্মিতে কি বলে জানিস? সাবধানের মার নেই।

মনোরমা : আমাদের শাস্ত্র কি বলে জানো ? মারের সাবধান নেই। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।

দাদা : সদরে চৌকাঠ করিসনি কেন ? বাইরে থেকে সাপ-খোপ ঢুকতে পারে !

মনোরমা : আজকালকার হাল ফ্যাশানের বাড়িতে চৌকাঠ থাকে না দাদা।

দাদা : বড় ভয়ঙ্কর কথা ! জীবন নিয়ে খেলা।

মনোরমা : স্যুটকেসটা হাত থেকে নামাও। কি আশ্চর্য, তুমি কি দাঁড়িয়ে থাকবে সারাদিন !

দাদা : বসব কিরে ! ফার্স্ট আমার একটা বাথরুম চাই, এক বালতি গরম জল চাই। এক শিশি disinfectant চাই। একটা ভাল সাবান চাই, একটা স্পঞ্জ চাই এবং একঘণ্টা সময় চাই। তারপর তুই আমাকে বসার অনুরোধ করবি। হ্যাঁ বিফোর দ্যাট এক গেলাস ভেরি ওয়ার্ম—ভেরি ওয়ার্ম চা চাই।

মনোরমা : চা আমি এখুনি সাপ্লাই করছি। বাথরুম তোমার চোখের সামনে। তোমার যা চাই সব ওখানে আছে।

দাদা : এইবার আমার গোটাকতক প্রশ্ন আছে—।

মনোরমা : করে ফেলো।

দাদা : তুই দরজা না খুলে তোর কাজের লোক কেন দরজা খুলল ! তার মানে আমার আসার জন্যে তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। কেন ছিলে না ? Why ? ক্যা হাম অচানক আ গিয়া ? অ্যাম আই আনওয়ান্টেড ? রিপ্লাই। জবাব লাগাও।

মনোরমা : ও মা ! তুমি যে আজই আসবে জানব কি করে দাদা ?

দাদা : হোয়াই ? তোকে আমি চিঠি দিয়ে জানিয়েছি। দিইনি ?

মনোরমা : হ্যাঁ দিয়েছো, তবে চিঠি নয়, একটা প্রেসক্রিপসান। ওপরে ছাপমারা দেরাদুন মিলিটারি হসপিট্যাল। সেইটুকুই পড়া যায়। বাকিটা ডাক্তারেই পড়তে পারে। মানুষের কম্ম নয়।

দাদা : সে কিরে? চিঠিটা তাহলে কাকে পাঠালুম! সর্বনাশ করেছে, সেটা তাহলে প্রেসক্রিপশান ভেবে ছুটির দরখাস্তর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি। আমি চললুম।

মনোরমা : সে কি কোথায় চললে?

দাদা : দেরাদুনে। দরখাস্ত থেকে চিঠিটা খুলে প্রেসক্রিপশানটা লাগিয়ে দিয়ে আসি। তা না হলে আমার কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে।

(দরজা খোলার শব্দ)

মনোরমা-স্বামী : কি ব্যাপার, শশাঙ্কদা যে। কখন এলেন?

শশাঙ্কদা : তোমাদের ঘড়ি অনুসারে আটটার সময়। আমার ঘড়ি অনুসারে দুটো বেজে পাঁচে। আচ্ছা তাহলে চলি।

মনোরমা-স্বামী : চলি মানে? কোথায় যাবেন?

শশাঙ্ক : দেরাদুনে। সব গোলমাল করে ফেলেছি ভাই। ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে যে প্রেসক্রিপশানটা অ্যাটাচ করার কথা ছিল সেটা মনোকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আর মনোকে লেখা চিঠিটা দরখাস্তের সঙ্গে পিন আপ করে কর্নেল মোরোর টেবিলে রেখে এসেছি।

মনোরমা-স্বামী : তা কি করে হয়? আপনি তো ছুটি মঞ্জুর করিয়ে এসেছেন? তা নাহলে এলেন কি করে!

শশাঙ্ক : হ্যাঁ তাও তো ঠিক [হাসি]। ওরা তো আমাকে বললে —একমাস ছুটি মঞ্জুর করা হল। সে চিঠিটা তো আমার সঙ্গেই রয়েছে। ভাগ্যিস বললে উদয়ন। তা না হলে আবার আমাকে কলকাতা থেকে দেরাদুন ছুটতে হত।

গড সেভ দি কিং। আচ্ছা তাহলে আমার দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব দে মনোরমা। তোর ছেলেমেয়েরা এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় পড়ে আছে কেন ?

উদয়ন ঃ টি ভি। টি ভি হেড-এক। কাল টি ভি-তে ফিল্ম ছিল। সেই ছবিতেই কাত।

শশাঙ্ক ঃ সে কি উদয়ন ? তোমার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি বলে টি ভি ঢোকালে ? পড়ুয়াদের সর্বনাশ !

উদয়ন ঃ আমি ঢোকাইনি দাদা। আপনার বোন আমদানি করেছে।

শশাঙ্ক ঃ না না মনোরমা, ওসব আমি অ্যালাউ করব না। আজই ওটাকে আমি অকেজো করে দোবো। মেজর শশাঙ্ক ওসব বরদাস্ত করবে না।

মনোরমা ঃ দাদা। বরং কণ্ট্রোল করে দিও।

শশাঙ্ক ঃ আমি বাথরুমে ঢুকছি। ও দুটোকে ঠেলে তোল। তারপর আমি এসে দেখছি। এ বাড়িতে আমি ডিসিপ্লিন চালু করতে হবে। এত ঢিলে-ঢালা চলবে না বাপু।

মানোরমার ছেলে বোধয়ন ঃ কে এসেছেন মা ?

মনোরমা ঃ তোমার মামা এসেছেন। বড় মামা। সেই যাঁর গল্প তোমাদের করতুম। মিলিটারী মামা। ছ-ফুট লম্বা ইয়া বড় গোঁফ। তোমাদের ওপর ভীষণ রেগে গেছেন।

সোমা ঃ দাদা, দাদা দেখবি আয় কি বিরাট জুতো !

মনোরমা ঃ জুতো দেখা বেরোবে। মানুষটা বাথরুম থেকে বেরোক তারপর তোমাদের মজা বেরোবে। বেলা নটা অবদি পড়ে পড়ে ঘুম।

বোধয়ন : সোমা, মামার সুটকেসটা দেখেছিস ? তোকে শুইয়ে রাখা যায় ওর ভেতর।

মনোরমা : তোমরা রেডি হয়ে খাবার টেবিলে চলে যাও। মামা এসে তোমাদের ধরবেন।

সোমা : কি ধরবেন মা ? পড়া ?

বোধয়ন : পড়া ধরবেন কেন রে বোকা। উনি কি মাস্টারমশাই ? তোমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবেন। হ্যাণ্ডশেক করবেন।

শশাঙ্ক : অ্যাবাউট টার্ন। হল না, হল না।

মনোরমা : কি করে হবে দাদা ? তুমি যা জোরে চিৎকার করলে !

শশাঙ্ক : অ্যাবাউট টার্ন কি আস্তে ফিস ফিস করে বলে ? ইংরেজিতে বলে শাউট ইওর অর্ডারস। তাও তো আমি গলা অনেক খাটো করে বলেছি।

মনোরমা : কই, তোমরা নমস্কার কর। প্রণাম কর।

শশাঙ্ক : না না প্রণাম নয়। হাত মেলাও. শেক হ্যাণ্ডস। বাঃ তোর ছেলেটার হাতের গ্রিপ তো বেশ ভাল। এ হাতে রাইফেল বেশ ভাল জমবে। কি নাম রেখেছিস ?

মনোরমা : বোধয়ন (কাশি), মেয়ের নাম সোমা।

শশাঙ্ক : বোধয়ন। ইংরাজিতে নাম লিখতে গিয়ে চেত্তা খেয়ে পড়ে যাবে যে রে। এঃ। ছেলেটাকে নামের ফাঁদে ফেলে দিয়েছিস রে। হাঁপানির রুগী তো এ নাম ধরে ডাকতেও পারবে না।

মনোরমা : আধুনিক নাম এইরকমই হয় দাদা। ওর বাবা নাম রাখার বই দেখে নিজের নামের সঙ্গে মিলিয়ে রেখেছে। ডাক-নাম বুড়ো।

শশাঙ্ক : বাঃ এই নামটা বেশ হ্যাণ্ডি।

মনোরমা : নাও চলো। ব্রেকফাস্ট তৈরী।

শশাঙ্ক : ব্রেক ফাস্ট? দাঁড়া দাঁড়া, তার আগে আমাদের অনেক কাজ বাকি। প্রথমে চেক আপ। সোম আর বুধ এদিকে এস। ফল ইন।

সোমা : ফল ইন মানে কি মামা?

শশাঙ্ক : তোমরা দুজনে পাশাপাশি আমার সামনে সোজা হয়ে পা জোড়া করে দাঁড়াও। মনা তুইও দাঁড়াতে পারিস। উদয়ন কোথায়? সেও দাঁড়াতে পারে। ডাক তাকে। এই একমাসে তোদের স্বভাব আমি পাল্টে দেবো। বিলকুল চেঞ্জ করে দেবো। সবকটাকে আমি কর্নেল বিশ্বাস বানিয়ে ছেড়ে দোবো।

বোধয়ন : কর্নেল বিশ্বাস কে মামা?

শশাঙ্ক : বাঙালী বীর। বাঘের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করেছিলেন।

সোমা : মল্লযুদ্ধ কি মামা?

শশাঙ্ক : কুস্তি। কুস্তি লড়েছিলেন।

মনোরমা : যাঃ তুমি সব ভুল বলছ। কর্নেল বিশ্বাস ছিলেন ভূপর্যটক।

শশাঙ্ক : এইরে, তাই নাকি? তাহলে বাঘ মেরেছিল কোন বাঙালী? তুই ঠিক জানিস?

মনোরমা : কি জানি বাবা। আমার তো তাই মনে হচ্ছে।

শশাঙ্ক : ঠিক আছে। সন্দেহ হচ্ছে যখন ওটা ছেড়ে দাও। আরও বাঙালী আছে। আশানন্দ ঢেঁকিকে ধর। জেনারেল চৌধুরীকে ধর। নেতাজীকে ধর। স্বামীজীকে ধর। উদয়নটা আবার গেল কোথায়?

মনোরমা : সে আবার বাজারে গেছে।

শশাঙ্ক : ওর ভুঁড়িটাকেও কমিয়ে দিয়ে যেতে হবে। এই বয়েসে অত বড় পেট! আরে ছি ছি। তুই একটু নজর রাখিস না মনো। আচ্ছা একবার চেক আপ। দেখি দাঁত দেখি।

তোমরা সকলে ঈ কর। মনা কর। আরে দাঁত খিঁচো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট লাইক দ্যাট। মনোরমা। তোর দাঁতের অবস্থা ভেরি ব্যাড। ভেরি ভেরি ব্যাড। ওয়ার্স্ট। তুই দাঁত থাকতেও দাঁতের মর্যাদা বুঝিসনি। এই দাঁত থেকেই বাত আসবে।

মনোরমা : আসবে কি দাদা এসে গেছে।

শশাঙ্ক : ছি ছি, তুই আমার বোন হয়ে আমাদের বংশের মুখ ডোবালি। বাবা আমাদের আটাত্তর বছর বয়েসেও দাঁত দিয়ে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে আস্ত একটা আখ খেতেন। কিসের জোরে? দাঁতনের জোরে। নিম দাঁতন।

মনোরমা : এখানে দাঁতন পাচ্ছি কোথায়?

শশাঙ্ক : বুড়ো, তোমার দাঁত ভাল পরিষ্কার হয়নি। তোমার দাঁতও মার লাইনে যাচ্ছে। বি কেয়ারফুল। বেশি মিষ্টি খাচ্ছ। আজ থেকে নো সুইটস। খাবার পরই দাঁত মাজার অভ্যাস করবে। মনে রাখবে ওয়ার্লডে হাতি তার দাঁতের জন্যেই বিখ্যাত। মিলিটারীতে বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক মানে হাতির দাঁত। সোমা তোমার দাঁত এখনও ভাল আছে। বেস্ট অফ দি লট।

উদয়ন : একি তোমরা সব দাঁত খিঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

শশাঙ্ক : দেখি তোমার দাঁত। শো মি ইওর টিথ।

উদয়ন : দাদা আমার সে গুড়ে বালি। দুপাটিই ফল্‌স।

শশাঙ্ক : ও তুমি তাহলে ফোকলা দিগম্বর। বয়েজ, লেট আস গো।

মনোরমা : এখন কোথায় যাবে?

শশাঙ্ক : খোলা জায়গায়। সামান্য ব্যায়াম। ব্যায়াম ছাড়া কারুর আহারের অধিকার থাকে না। উদয়ন তোমার ল্যাঙোট?

উদয়ন : ল্যাঙোট?

শশাঙ্ক : হ্যাঁ হ্যাঁ লেঙ্গোটি।

উদয়ন : ল্যাঙোট কি হবে দাদা ?

শশাঙ্ক : তোমার ভুঁড়ি কমাব। তোমাকেও ব্যায়াম করতে হবে। দুদিনে তোমার শরীরের বাড়তি মেদ কমিয়ে দোবো। ওই কি একটা শরীর। গোলগাপ্পা।

উদয়ন : এই বয়সে আমি করব একসাইজ! অ্যাম আই ম্যাড— ?

শশাঙ্ক : সেই নীতিবাক্যটি স্মরণ কর উদয়ন, আপনি আচরি ধর্ম। নিজেকে ঠিক না করলে তুমি এদের ঠিক করবে কি ভাবে! যাও যাও ল্যাঙোট না থাকে, জাঙিয়া পরে এস।

মনোরমা : দাদা সাহস করে একটা কথা বলব ?

শশাঙ্ক : বল।

মনোরমা : আজ ও সব থাক। তুমিও ট্রেনে এলে এতটা পথ, আজ রেস্ট নাও। কাল থেকে সব হবে।

শশাঙ্ক : কাল ? কাল কাল করে কালক্ষেপে পৃথিবীর কত মহৎ প্রচেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে ? জীবন থেকে একটা দিন চলে গেলে তুই ফিরিয়ে দিতে পারবি ? নো কাল্। আজ থেকেই শুরু হবে।

মনোরমা : এসব ভোরবেলা করতে হয় দাদা। আজ অনেক বেলা হয়ে গেছে।

শশাঙ্ক : ভোর! তোদের ভোরই তো হয় সকাল নটায় ? পড়েই এলি সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। জীবনে সূর্যোদয় আর দেখতে হল না। [হাসি] হাও ফানি! হাও ফানি!

মনোরমা : ঠিক আছে দাদা। কাল থেকে ভোর ভোরেই হবে।

শশাঙ্ক : অলরাইট। তোদের কথায় আর একটা দিনও ডাস্টবিনে গেল। কি আর করা যাবে বল। অভ্যাস। হ্যাবিট। সহজে কি তাড়ান যায় ? Habit সবচেয়ে বড় ক্রিমিন্যাল। বয়েজ, ফল আউট।

বোধয়ন সোমা : হো ও ও……

শশাঙ্ক : হোয়াট ইজ দিস ? চিৎকার করছ কেন। হঠাৎ এই উল্লাসের কারণ ?

মনোরমা : ওরা মাঝে মাঝেই এইরকম চিৎকার করে দাদা। ছোটো তো ! ছোটোরা একটু চেঁচাবে ?

শশাঙ্ক : তা বলে যখন তখন চেঁচাবে ? আমি চেঁচাবার অর্ডার দিয়েছি ? আমি কি বলেছি ফল—আউট। আমি হলে এই ইন্‌ডিসিপ্লিনির জন্যে ব্রেকফাস্ট বন্ধ হয়ে যেত। ইস্‌-স্‌-স্‌। টেবিল ক্লথটা কি অপরিষ্কার, জায়গায় জায়গায় হলুদের ছোপ। কে যেন হাত মুছেছে। মোস্ট ইনডিসেন্ট।

উদয়ন : আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন দাদা। যে কোন সংসারেই ওরকম একটু আধটু দাগ পাবেন। ওসব উপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

শশাঙ্ক : টাইম টেবল আছে ?

মনোরমা : টাইম টেবল কি হবে দাদা ?

শশাঙ্ক : আজই চলে যাব। তোদের সঙ্গে আমার মিলবে না রে। অশান্তি হয়ে যাবে।

মনোরমা : তুমি একটু ধৈর্য ধরে দেখোই না। কাল থেকে সব তোমার মনের মত হয়ে যাবে।

শশাঙ্ক : ওকি, ওকি ? ওই ফুলো ফুলো জিনিসগুলো কি আসছে !

উদয়ন : লুচি। লুচি আপনি দেখেননি ?

শশাঙ্ক : অাঁ ! লুচি ? তোমরা লুচি খাও ! বিষ। এ কাইণ্ড অফ পয়েজন। গুড লর্ড ! শিশু হত্যার পরিকল্পনা !

বোধয়ন : আমি লুচি আর আলুভাজা খেতে ভীষণ ভালবাসি।

সোমা : আমি চাটনি আর চানাচুর।

উদয়ন : আমি কাবাব আর পরোটা।

মনোরমা : আমি মোগলাই পরোটা আর কষা মাংস।

শশাঙ্ক : তোদের ইকমিক কুকার আছে ? এই একমাস নিজের

রান্না আমি নিজে করে নোবো। খাদ্যহীন খাদ্য আমি খেতে পারব না। এসব লুচি-ফুচি সরিয়ে নে। আমাকে প্লেন অ্যাণ্ড সিম্পল এক কাপ চা দে।

সোমা : লুচি খেলে কি হয় মামা?

শশাঙ্ক : স্বামী বিবেকানন্দের নাম শুনেছিস?

সোমা : হ্যাঁ।

শশাঙ্ক : তিনি বলে গেছেন বাঙালী লুচি আর পরোটা খেয়ে খেয়েই পরকালটা খাবে। গান্ধীজী বলে গেছেন চিনি হল হোয়াইট পয়েজন। এসব কুখাদ্য। খেতে খেতে এত বড় একটা লিভার হবে। অজীর্ণ অম্বল, ইয়া ভুঁড়ি ঢ্যাবঢ্যাবে অকর্মণ্য শরীর। বাত, ন্যাবা অম্লশূল, পিত্তশূল।

মনোরমা : লুচি ছুটির দিনেই হয় দাদা। অন্যদিন পাঁউরুটি, মাখন, জেলি।

শশাঙ্ক : ফল ঢোকে বাড়িতে? না! সে সবের পাট নেই। সকালে ফল হল সোনা। একটা করে আপেল, কমলা, কলা, পেয়ারা। এক গেলাস দুধ—। বয়েলড ভেজিটেবলস, হাফ-বয়েলড ডিম, মধু, খেজুর, সোয়াবিন, কিসমিস। না ওসব মুখে রুচবে না।

সোমা : দুধ রুগীর খাদ্য।

বোধয়ন : সোয়াবিন রিয়েল অখাদ্য।

উদয়ন : খাওয়াটা দাদা আপরুচি। অত পথ্য অপথ্য খাদ্যগুণ মেনে খেতে গেলে ওষুধ খাওয়াই ভাল।

শশাঙ্ক : ইয়েস, এই হল শিক্ষিত মানুষের ধরন। জ্ঞান পাপী। তাল কানা। মুখ্যুর মুখ্যু। শেম শেম।

উদয়ন : যাই। আয়। আয়।

বহিরাগত : বুঝলে কড়কড়ে বিলিতী তাস। ছেড়ে দিলে সবকটা সড়াক করে পিছলে যাবে। কি পালিশ!

উদয়ন : ওরা কোথায়?

বহিরাগত : সব আসছে। সব আসছে—

উদয়ন : বস্, আমি আসছি—

শশাঙ্ক : কি ব্যাপার? কারা এল?

মনোরমা : তাসপার্টি, এইবার বেলা ছুটো পর্যন্ত হই-চই চলবে।

সোমা : মাঝে মাঝে দাঙ্গাও বেধে যায়।

উদয়ন : তাস আর দাবাতে একটু দাঙ্গা-হাঙ্গামা হবেই। তা না হলে ঠিক জমে না।

শশাঙ্ক : আই সি।

মনোরমা : তুমি তাস খেলতে বসছ কিন্তু আজ ছুটোর মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকোতে হবে। আমার সিনেমার টিকিট কাটা আছে।

উদয়ন : সিনেমা সিনেমা আর সিনেমা। টি ভি তে সিনেমা, সিনেমায় সিনেমা।

বোধয়ন : তুমি বেশ আছ মা। রবিবার হলেই তোমার সিনেমা।

সোমা : চল দাদা, আমরাও আজ যাব।

বোধয়ন : দাঁড়া না, আর একটু বড় হই!

মনোরমা : (শাসনের গলায়) ছোটরা ছোটদের মত থাকবি। বড়দের কাজের সমালোচনা করতে আসবি না।

শশাঙ্ক : আই সি।

বোধয়ন : বাবা তুমি রেডিওর ব্যাটারি এনেছো?

উদয়ন : এই যাঃ ভুলে গেছি রে। ছু-ছুবার বাজার গেলুম। ইস্ একদম মনে ছিল না।

বোধয়ন : বাঃ কি করে রীলে শুনব। আমি তাহলে সারাদিন আজ পার্থদের বাড়িতে থাকব।

মনোরমা ঃ না! পরের বাড়িতে রীলে শুনতে যেতে হবে না।

বোধয়ন ঃ তাহলে ব্যাটারি আনিয়ে দাও।

মনোরমা ঃ ক্রিকেটের কি বুঝিস তুই। কাল ইস্কুল আছে। আজ সব টাস্ক বসে বসে তৈরি কর। একদিন রীলে না শুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হযে যাবে না।

বোধয়ন ঃ তোমাকেও তাহলে সিনেমা দেখতে যেতে দেবো না।

মনোরমা ঃ (ধমকের সুরে) বুড়ো।

বোধয়ন ঃ (একই রকম সুরে) কি!

মনোরমা ঃ বাপের আদরে বাঁদর তৈরি হচ্ছে।

উদয়ন ঃ এর মধ্যে আবার বাপকে ধরে টানাটানি কেন? ঠিক আছে, আমি শঙ্করীর মাকে দিয়ে ব্যাটারি আনিয়ে দিচ্ছি।

মনোরমা ঃ (ব্যাজার গলায়) হ্যাঁ তাই দাও। তবু ছেলেকে একটু শাসন করবে না।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

সোমা ঃ নাও সকালেই ঝগড়া শুরু হল। আঃ শান্তি নেই। দাদা তুই চুপ কর না বাপু।

বোধয়ন ঃ পাকামো করিসনি সোমা। মার আদরে বাঁদর তৈরী হচ্ছে।

সোমা ঃ বাঁদর নয়রে বোকা, বাঁদরী।

শশাঙ্ক ঃ আই সি!

বোধয়ন ঃ বাবা, আজ তুমি মুরগি এনেছো?

উদয়ন ঃ না রে আজ পাঁঠা—

বোধয়ন ঃ এঃ রোববারটাই মাটি করে দিলে।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ তোমাদের ভীষণ নবাবী অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে। এই খাই না, সেই খাই না।

উদয়ন ঃ কি যে বল না? ওদের তো এখন খাবারই বয়েস। তাজা লিভার, কি বলেন দাদা?

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

মনোরমা ঃ কি দাদা? তখন থেকে তুমি আই সি, আই সি করে যাচ্ছ।

শশাঙ্ক ঃ আই সি।

সোমা ঃ মা, আই সি মানে তো আমি দেখি, তাই না?

বোধয়ন ঃ হ্যাঁ রে সোমা। মামা ওই একটা ইংরেজিই জানেন।

উদয়ন ঃ তুমি তাহলে বাইরের ঘরে চার পাঁচ কাপ চা পাঠিয়ে দিও।

(চেয়ার সরানোর শব্দ)

শশাঙ্ক ঃ আমি তাহলে বাগানের দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে একটু বসি। ভাল বই-টই কিছু আছে?

বোধয়ন ঃ ডিটেকটিভ বই পড়বেন মামা, থ্রিলার কমিকস্!

শশাঙ্ক ঃ কেন, অন্য কোন বই নেই? রামায়ণ আছে রে?

মনোরমা ঃ না দাদা।

বোধয়ন ঃ আমার কাছে ছোটদের ইংরেজি রামায়ণ আছে। পড়বেন?

শশাঙ্ক ঃ মহাভারত আছে রে?

মনোরমা ঃ না দাদা—

শশাঙ্ক ঃ গীতা আছে?

মনোরমা ঃ একটা পকেট সাইজ আছে।

শশাঙ্ক ঃ ভাল কোন জীবনী আছে?

সোমা ঃ ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়বেন মামা?

শশাঙ্ক ঃ আই সি। তাহলে আজকের কাগজটাই দে।

বোধয়ন ঃ মামা আমি আগে খেলার পাতাটা একটু দেখেনি, প্লিজ!

শশাঙ্ক ঃ বেশ! তোমার দেখা হয়ে গেলে আমাকে দিয়ে এস।

বোধয়ন : আয় আয় শ্যামল আয়, পার্থ কোথায় রে ?

শ্যামল : ওই তো আসছে। ওর বাবা ওকে একটা বাইক কিনে দিয়েছে।

বোধয়ন : আয় না ভেতরে আয়।

শ্যামল : কি চাপিয়েছিস ! রেকড প্লেয়ারে আমার তো নাচতে ইচ্ছে করছে।

বোধয়ন : নাচ না ! এটা তো নাচেরই মিউজিক।

পার্থ : বোধয়ন—তোর কাছে কাটায় লাগাবার কোনও ওষুধ আছে রে ! তিনবার আছাড় খেলুম।

বোধয়ন : ভেতরে আয় না। দিচ্ছি লাগিয়ে।

পার্থ : কি বাজাচ্ছিস ? একটা সিনেমার গান লাগা না।

বোধয়ন : লাগাচ্ছি, লাগাচ্ছি তুই বস না—

পার্থ : বেশিক্ষণ বসব না রে। সেলুনে চুল কাটতে যাব। দাদুটা ভীষণ ফ্যাচ ফ্যাচ করছে। বুড়োটা বড় চুল দেখতে পারে না।

বোধয়ন : আমার মিলিটারী মামা এসেছে রে। মাথার চুল দেখলে তোদের হাসি পাবে। এইটুকু এইটুকু করে ছাঁটা। তেমনি মেজাজ। কাল থেকে আমাদের পিটি করাবে। ভোরবেলা বিছানা থেকে টেনে তুলবে! কোনদিন আমার চুলগুলোও কপচে দেবে রে।

শ্যামল : তোর খুব বিপদ রে বোধয়ন।

বোধয়ন : তেমনি মিলিটারী মেজাজ। ইয়া লম্বা। ইয়া গোঁফ !

পার্থ : ছোটদের জীবনে কোন সুখ নেই রে। তোর যেমন মামা, আমার তেমনি দাদু। শ্যামল তোর কে রে ?

শ্যামল : আমার সব ক্লিয়ার ! আমি তো মামার বাড়িতেই পড়ে আছি। আমার বাবা তো মারা গেছেন ভাই। আমাকে কে আর শাসন করবে বল ? মা কেবল মাঝে

মাঝে দুঃখু করে বলে, ভাল করে লেখাপড়া কর খোকা।

পার্থ : তুই তো লেখাপড়ায় ভালই রে ভাই। অঙ্কে তুই তো একশোর মধ্যে একশো পাস!

শ্যামল : আমি যে তেমনি ইংরেজিতে কাঁচা। তোরা সব ইংলিশ মিডিয়ামে পড়িস, আমাকে কে পড়াবে বল। তোদের সকলের টিউটর আছে, আমার কে আছে বল!

শশাঙ্ক : তোমার ভগবান আর বিশ্বাস শ্যামল।

বোধয়ন : মামা আপনি? এই তো দেখলুম আপনি রোদে বসে আছেন।

শশাঙ্ক : তুমি আমার পা দুটো বোধহয় দেখনি। মানে যে পায়ে মানুষ দেহটাকে খাড়া রাখে, চলে বেড়ায়। আমি তো উদ্ভিদ নই, যে এক জায়গায় গজিয়ে থাকবো। [শ্যামল বোধয়নের মামাকে গিয়ে প্রণাম করে] আরে থাক্ থাক্। তুমি দীর্ঘজীবী হও শ্যামল। তোমার এখনও সাবেক অভ্যেসটা আছে দেখছি। আধুনিক ছেলেরা তো কেউ মাথা নিচু করে না। তারা তো জন্মেই মিলিটারী।

শ্যামল : আমার মা যে বলে দিয়েছেন গুরুজনদের প্রণাম করে মাথা পেতে আশীর্বাদ নেবে, তাতে তোমার ভাল হবে। রোজ সকালে আর ঘুমোবার আগে ভগবানকে ডাকবে, বাবাকে মনে মনে চিন্তা করবে। তিনি যেখানেই থাকুন তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

[শ্যামলের কথা শুনে বোধয়ন ও পার্থ হাসবে]

শশাঙ্ক : তোমরা দুজনে হাসছ কেন?

পার্থ : ও কি রকম পাকা পাকা কথা বলছে। শ্যামল, তুই সেই কবিতাটাও আবৃত্তি কর। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।

শশাঙ্ক : তোমরা বুঝি ভগবান-টগবান মান না !

পার্থ : আমার দাদা বলেন ও সব কুসংস্কার। ভগবান আবার কি ? কারুর কাছে মাথা নিচু করবি না। সব সময় মাথা উঁচু করে চলবি। কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়।

শশাঙ্ক : তোমার দাদা কি করেন ?

বোধয়ন : পলিটিকস্ করেন !

শশাঙ্ক : আই সি ! তা তোমাদের সকালবেলা পড়াশোনা নেই ?

পার্থ : রবিবার আবার পড়া কি। ছুটির বার।

শশাঙ্ক : রবিবার তাহলে কি করো ?

পার্থ : [মজা করে] বাবা গেছেন মাছ ধরতে। মা গেছেন মামার বাড়ি। আমরা এখন রীলে শুনব। হই হই করব !

শশাঙ্ক : কেন, কত ভাল ভাল বই আছে। ইতিহাস, ভূগোল, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, এসব পড়তে ভাল লাগে না ?

পার্থ : ধুস্। ওসব বাজে। ভাল লাগে না মোটেই।

শ্যামল : জানেন, আমি পড়ি। জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, ইতিহাস, ভূগোল পড়তে আমার ভীষণ ভাল লাগে। আমি বড় হলে সুইজারল্যাণ্ডে যাব।

পার্থ : তুই গোবরডাঙ্গায় যাবি।

শশাঙ্ক : কেন ও যেতে পারে না ?

বোধয়ন : কি করে যাবে ! ও তো সাধারণ স্কুলে পড়ে। ভাল চাকরি-বাকরি পাবে না। স্কুল মাস্টারি করবে।

শশাঙ্ক : তাই নাকি ? কে বলেছে !

বোধয়ন : বাবা বলেছে।

শশাঙ্ক : আই সি। তা শ্যামল তোমার ওই রীলে শোনার বাতিক নেই ? সারাদিন কানের কাছে রেডিও খুলে বসে থাকা ?

শ্যামল : আমার ও সব ভাল লাগে না মামা। আমার বাবা

বলতেন, সব সময় নিজেকে কাজে ব্যস্ত রাখবি। কাজ না থাকলে পড়ে পড়ে ঘুমোবি। হুজুগে মাতবি না।

পার্থ : সেই কথাটাও বলে দে। আইড্ল ব্রেন ডেভিলস্ ওয়ার্কশপ। মামা, ও কিন্তু ভাল ক্রিকেট খেলে। ব্যাট ধরলে আউট করা যায় না। বল করলে সামনে দাঁড়ান যায় না।

শ্যামল : না মামা, ও বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলছে। আমাকে কেউ খেলতে শেখায়নি।

শশাঙ্ক : তবে তুমি ভাল খেল কি করে?

শ্যামল : আমার কি রকম একটা রোখ চেপে যায়। মনে হয় কিছুতেই হারব না।

শশাঙ্ক : গুড্, ভেরী গুড্। তোমার হবে ভাগ্নে। তুমি জীবনে অনেক বড় হবে।

শ্যামল : আমি এখন আসি। বাড়ি গিয়ে জামা কাপড় কাচতে হবে।

শশাঙ্ক : তুমি বুঝি নিজেই নিজের জামাকাপড় কাচ, বাঃ! সুন্দর অভ্যাস। বোধয়ন তুমিও তোমাদের টেবিল ক্লথটা কেচে ফেল না।

বোধয়ন : না না, ওটা তো লণ্ড্রীতে যাবে।

শশাঙ্ক : তাহলে চল না চারিদিকে ভীষণ ঝুল হয়েছে, ঝেড়ে ফেলা যাক্।

বোধয়ন : ও তো শঙ্করীর মার কাজ।

শশাঙ্ক : তাহলে চল বই গুছাই। চারিদিক বড় এলোমেলো হয়ে আছে!

বোধয়ন : আমাদের তো ওই রকমই থাকে মামা।

শশাঙ্ক : আই সি! তাহলে তোমরা মজা করে গানই শোন। কই কাগজটা তো আমাকে দিয়ে এলে না!

বোধয়ন : ভুলেই গেছি মামা। ওই যে সোফার ওপর রয়েছে।

শশাঙ্ক : ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। সকাল থেকেই বন্ধু, বান্ধব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। নিষ্ঠার বড়ই অভাব।

[মামা চলে গেলেন]

পার্থ : সত্যিই তোর মিলিটারী মামা। কি মেজাজ রে বাবা! ক-দিন থাকবেন ?

বোধয়ন : শুনছি একমাস।

পার্থ : এই একমাস তোদের বাড়ি আর আসব না।

[দৃশ্য পরিবর্তন। উদয়ন বন্ধুদের নিয়ে তাস খেলছে]

উদয়ন : টু হার্টস। তখন থেকে হাতে কি যে তাস আসছে। আজ গ্রহ লেগেছে। নাও কল দাও।

[মামার প্রবেশ]

শশাঙ্ক : কি হে এখনও তোমাদের চলছে!

উদয়ন : আরে দাদা যে, আসুন, আসুন।

শশাঙ্ক : অনেক বেলা হল। এইবার রাখ না।

উদয়ন : এই তো একটাই রবিবার দাদা। রোজই তো নাকে-মুখে গুঁজে সকাল নটার সময় দৌড়োই।

শশাঙ্ক : রবিবারটা তো আর একটু অন্যভাবেও খরচ করা যায় উদয়ন ? যেমন ধর সপরিবারে কাছাকাছি কোথাও বেড়াতে গেলে। একটু আউটিং হল সকলের।

উদয়ন : এ আপনি কি বলছেন ? থিওরেটিক্যাল কথাবার্তা।

উদয়নের বন্ধু : এ যেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারিবারিক প্রবন্ধ শুনছি। সারা সপ্তাহ বাস ঠেঙিয়ে কারুর ইচ্ছে করে মশাই, রোববার লটবহর নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে নাচতে! ওই বছরে একবার চিড়িয়াখানা। আর মাঝে মধ্যে বিয়ে-টিয়ের নেমন্তন্ন। আরে মশাই, আর বছর খানেক পরে ওরা তো নিজেরাই হিল্লি-দিল্লী করবে।

শশাঙ্ক : বেশ বাইরে না গেলেও বাড়িতে থেকেও তো ছেলে-মেয়েদের একটু সঙ্গ দেওয়া যায়। সারা সপ্তাহ দেখতে পার না, এই একটা দিন ওদের সঙ্গেই বই-টই নিয়ে একটু বসতে পার তো!

উদয়ন : কেন? ভাল ইস্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, ভাল শিক্ষক রেখেছি! আমি বই নিয়ে বসে কি করব?

শশাঙ্ক : পড়ার বই ছাড়াও তো অনেক ভাল বই আছে উদয়ন। আজকাল ভাল ভাল সচিত্র শিশুপাঠ্য ভূগোল, ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী, সাধারণ জ্ঞানের বই বেরিয়েছে। সেই সব বই নিয়েও তো একটু বসা যায়, নানা দেশের গল্প বলা যায়। পড়ার একটা নেশা ধরিয়ে দেওয়া যায়। যায় না?

উদঃ বন্ধু : নাও, নাও, টু স্পেডস্।

উদয়ন : আমার অত সময় কোথায় দাদা? নো কল।

শশাঙ্ক : তা ঠিক। সময় কোথায়। সত্যিই তো সময় কোথায়!

[দৃশ্য পরিবর্তন—রাস্তার দৃশ্য]

(ঢং ঢং করে চারটা বাজল)

শশাঙ্ক : বাঃ এদের বাড়ির কাছের এই রাস্তাটা বেশ ভাল। পড়ন্ত বেলায় রোদ পড়েছে গাছের ফাঁক দিয়ে। যাই একটু বেড়িয়ে আসি।

শ্যামল : মামা, কোথায় যাচ্ছেন?

শশাঙ্ক : কে, শ্যামল? কোথায় গিয়েছিলে?

শ্যামল : কেরোসিন তেল আনতে। বিশাল লাইন। ছুটোর সময় লাইন দিয়ে এই পেলুম।

শশাঙ্ক : যাই একটু বেড়িয়ে আসি। তোমাদের এই রাস্তাটা ভারি সুন্দর।

শ্যামল : হ্যাঁ মামা। এটা সোজা গঙ্গার দিকে চলে গেছে।

একটু দাঁড়াবেন, আমিও তাহলে আপনার সঙ্গে যাব। টিনটা বাড়িতে ছুটে দিয়ে আসি। বেশি দেরি হবে না। ওই তো আমাদের বাড়ি।

শশাঙ্ক : যাও, যাও, আমি দাঁড়াচ্ছি। [শ্যামল চলে গেল] ছেলেটি ভারি মিশুকে। বোধয়নকে বললুম চল না বেড়িয়ে আসি। কোন উৎসাহই দেখাল না। কি নিয়ে মেতে আছে তাও বুঝলাম না—নাঃ ছেলেটাকে ওরা নষ্ট করে ফেলল। আরে বাবা ছেলে মানুষ করা কি অত সহজ! ত্যাগ চাই. নিষ্ঠা চাই।

শ্যামল : (হাঁপাতে হাঁপাতে শ্যামলের প্রবেশ) চলুন মামা!

শশাঙ্ক : তুমি যে হাঁপাচ্ছ!

শ্যামল : খুব জোরে দৌড়েছি তো পন পন করে। ছোলা খাবেন মামা?

শশাঙ্ক : কোত্থেকে পেলে?

শ্যামল : মা আমার জন্যে ভিজিয়ে রেখেছিলেন। নিয়ে এসেছি।

শশাঙ্ক : দাও, দাও ভিজে ছোলা অমৃত সমান।

শ্যামল : ওই দেখুন। গঙ্গার জল দেখা যাচ্ছে—রোদ পড়ে কি রকম চক্‌মক্ করছে দেখুন মামা।

শশাঙ্ক। একি শ্যামল, তুমি কাঁদছ কেন? তুমি কাঁদছ কেন বাবা? এসো এই ঘাটের পৈঠেটায় কিছুক্ষণ বসি। তোমার হাতের ছোলাগুলো সব রাস্তায় পড়ে গেল। এস বস। হঠাৎ কি হল তোমার?

শ্যামল : হঠাৎ আমার বাবার কথা মনে পড়ে গেল। এই রকম এক বিকেলে বাবা চলে গিয়েছিলেন হঠাৎ। ওই তো শ্মশান। ওই যে ধোঁয়া উঠছে। সেই দিন গঙ্গার জলে দাঁড়িয়ে আছি—চিতার ছাই নিয়ে, আর দেখছি টলটলে জলে শেষ বেলার রোদ খেলা করছে। ছাইগুলো ভাসতে

ভাসতে কোথায় চলে গেল। জানেন মামা, বাবা আমাকে শ্যাম বলে ডাকতেন। মৃত্যুর আগের দিন রাতে আমাকে হঠাৎ কাছে ডেকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন, শ্যাম জীবনে কখনও ভয় পাবি না। ভয়ই হল মৃত্যু!

শশাঙ্ক: ঠিক বলেছেন। আসল কথাটাই তোমাকে বলে গেছেন। আমাদের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ উপনিষদে বারে বারে ওই একটি কথাই আছে। অভী! ভয়শূন্য হও। পৃথিবীতে যে কজন মানুষ বড় হয়েছেন তাদের সকলেরই ছিল দুর্জয় সাহস। তোমাকেও বড় হতে হবে শ্যামল। দেশে অনেক দিন তেমন সাহসী লোক জন্মাননি।

শ্যামল: কি করলে বড় হওয়া যায় মামা?

শশাঙ্ক: মহাপুরুষের জীবনী পড়ে নিজের জন্যে একটা আদর্শ বেছে নাও। নিজেকে হারিয়ে ফেলো না। মিশিয়ে ফেলো না। সব সময় মনে রাখবে, তুমি এখানে এসেছো কিছু একটা করে যাবার জন্যে। স্বামীজী বলতেন, একটা দাগ রেখে যা। আমাদের বেঁচে থাকার সময়টা বড় কম শ্যামল, ওই দেখ সূর্য ডুবলেই দিন শেষ। দিনের কাজ তাই দিনে দিনেই করে ফেলতে হবে। কাল করা যাবে বলে কিছু ফেলে রেখো না।

শ্যামল: আমার মা বলেছেন, তুই পড় খোকা। যতদূর পড়া যায় তুই ততদূর পড়ে যা। আমি গয়না বাঁধা দিয়ে, লোকের বাড়ি কাজ করে টাকার ব্যবস্থা করব। আমার মার বড় কষ্ট। শীতকালে হাঁপানিটা বেড়ে যায়। ভোরবেলা উঠে রাঁধতে হয়। সকলের মা কেমন সুখে আছে, আমার মা'রই যত কষ্ট!

শশাঙ্ক: তাই তো তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমি বড় হবই। মাকে বলবে একটু ধৈর্য ধর মা, আমি আসছি।

তখন তোমার কত সুখ। শ্যামল, আমাদের বড় মাও ভীষণ কষ্টে আছেন।

শ্যামল : বড় মা ?

শশাঙ্ক : আমাদের দেশমাতা।

শ্যামল : মাঝে মাঝে মনে হয় আমি বেশ সন্ন্যাসী হয়ে যাই। গেরুয়া পরে হাতে মস্ত একটা লাঠি নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই। ওই দেখুন ওপারে সূর্য নেমে পড়েছে। মন্দিরের চুড়োটা কেমন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এখন কোথাও তো দিন হচ্ছে! কি মজা।

শশাঙ্ক : তুমি বাইরে সন্ন্যাসী হবে কেন। মনে সন্ন্যাসী হও, ত্যাগী হও, লোভশূন্য হও, ভালবাসতে শেখ। সংসারে থেকেই তো তোমাকে সংসারের, সমাজের কাজ করতে হবে। তোমাকে রাতেও চলতে হবে, দিনেও চলতে হবে।

শ্যামল : মামা ভগবান কি আছেন ?

শশাঙ্ক : নিশ্চয়ই আছে! সব ভালর মধ্যে, 'সু'-এর মধ্যেই ভগবান। তোমার মধ্যে আছেন। আমার মধ্যে আছেন। সকলের মধ্যে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন। তাঁকে জাগাতে হবে। ভাল কাজের মধ্যে, ভাল চিন্তার মধ্যে তিনি জেগে ওঠেন। তোমাকে আমি যাবার সময় কিছু ভাল বই দিয়ে যাব। পড়বে। দেখবে পৃথিবীটা কত বিশাল।

শ্যামল : আরতি হচ্ছে। যাবেন মামা—মন্দিরে যাবেন ?

শশাঙ্ক : চল চল। আজকের সন্ধেটা ভারি সুন্দর। তুমি থাকাতে আরো সুন্দর হয়েছে।

[দৃশ্য পরিবর্তন—বাড়ির বাইরে]

মনোরমা : কি গো দাদা। তুমি এখানে একা চুপ করে বসে আছ ?

শশাঙ্ক : তোদের এই বারান্দাটা বেশ ভাল। মাঝে মাঝে

মানুষের একটু নির্জনে থাকা ভাল, মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর।

মনোরমা : ভেতরে চল। খাবার দেওয়া হয়েছে।

শশাঙ্ক : চল। কটা বাজল?

মনোরমা : সাড়ে ন'টা বোধ হয়।

(কুকুরের ডাক)

[শশাঙ্কর প্রবেশ—বাড়ির ভেতরে]

উদয়ন : আসুন দাদা। আপনি যেন কেমন মিইয়ে পড়েছেন। বলুন, আর্মির গল্প একটু বলুন।

সোমা : জান মা, মামার বোধহয় রাগ হয়েছে।

মনোরমা : রাগ হবে কেন? তোরা রাগাবার মত কিছু করেছিস?

সোমা : দাদার সঙ্গে একবার খালি ঝগড়া করেছি।

মনোরমা : কি নিয়ে?

সোমা : ওই শয়তানটা আমার পেনসিল নিয়ে নিয়েছে।

মনোরমা : আবার শয়তান বলছ।

বোধয়ন : কান ধরে তুলে দাও না মা!

মনোরমা : তোমরা একদম অসভ্যতা করবে না। ভীষণ মাথা ধরেছে আমার। মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে।

উদয়ন : মাথার আর কি দোষ। সিনেমা দেখলেই তো তোমার মাথা ধরে। চিরকালের রোগ।

মনোরমা : রবিবার হলেই তো তোমার তাস। অবেলায় খাওয়া রাতে পেটভার, অম্বল, সোমবার সকালে মেজাজ সপ্তমে। ওটাও তোমার চিরকালের রোগ।

সোমা : মা, দাদাকে সাবধান কর। পা দিয়ে তখন থেকে আমার পায়ে খোঁচা মারছে।

মনোরমা : (উত্তেজিত ভাবে) এই তোরা উঠে যা তো। দুজনেই বেরো। আমাদের একটু শান্তিতে খেতে দে।

উদয়ন ঃ দাদা ! একটু গল্প-টল্প বলুন। ওয়ারের গল্প।

শশাঙ্ক ঃ এই তো ওয়ার। এখানেই হচ্ছে। শোনার চেয়ে দেখাই তো ভাল।

উদয়ন ঃ একে ওয়ার বলে না। এ হল স্কারমিশ, অনবরতই হচ্ছে।

শশাঙ্ক ঃ এইভাবেই তো যোদ্ধা তৈরি হয়। আমি উঠি।

মনোরমা ঃ সেকি ! তুমি তো কিছুই খেলে না।

শশাঙ্ক : আমি সন্ধেবেলা একগাদা ভিজে ছোলা খেয়েছি।

উদয়ন ঃ—ছোলা ? পেলেন কোথায় ?

শশাঙ্ক ঃ ভালবেসে একটি ছেলে আমাকে খাইয়েছে, তার নাম শ্যামল।

উদয়ন ঃ ও, শ্যামল। নাইস্ বয়। আমার ছেলেটা যদি শ্যামলের মত হত !

শশাঙ্ক ঃ (হেসে) হ্যাড আই বিন দি উইংস অফ এ ডাভ। আমার যদি পাখির মত দুটো ডানা থাকত। তাহলে উড়তে পারতুম। গুড নাইট !!

শশাঙ্ক ঃ (গান গাইছে)—

যদি কুমড়োর মত ডালে ধরে রত

পান্তুয়া শত শত

ওরে যদি কুমড়োর মত ডালে ধরে রত

(হাসি)

সব এই সি তো আয়ে গা—তাই না উদয়ন। সব আই সি হো যায় গা। তুমি সারাদিন তাস পিটবে। তোমার স্ত্রী যাবে সিনেমায়। তোমার ছেলেমেয়েরা একা একা বাড়িতে হুল্লোড় করবে। ছেলে মানুষ হচ্ছে। আবার ব্যঙ্গ করে বলা হচ্ছে আপনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়। ভোগ বিলাসিতা প্রাচুর্য সব আছে, তবু এই শূন্য উদ্যান। ঠিক আছে, বুঝবে বুঝবে, কত ধানে কত চাল !

[দৃশ্য পরিবর্তন]

শশাঙ্ক : শুয়ে পড়ি, গুড নাইট। আহা এক আকাশ তারা। আরে, আজ আবার একফালি চাঁদ উঠেছে।

* * * *

মনোরমা : (চিৎকার) শঙ্করীর মা, শঙ্করীর মা।

শঙ্করীর মা : যাই দিদি। কি বলছেন।

মনোরমা : সবকটাকে ঘুম থেকে টেনে টেনে তোল তো। দাদা উঠেছে! দেখো তো ও পাশের বারান্দায়। ডাকা-হাঁকা মানুষ, সাড়া শব্দ পাচ্ছি না কেন?

শঙ্করীর মা : (দূর থেকে) বারান্দায় নেই গো দিদি।

মনোরমা : ঘরের দরজা ঠেলে দেখ তো।

শঙ্করীর মা : দেখেছি। ঘর খালি গো দিদি—

মনোরমা : সে কি? গেল কোথায়। বাথরুমেও তো নেই। চা হয়ে গেল। তুমি একবার সদরটা দেখ তো।

উদয়ন : হল কি! দাদা মিসিং? এই নাও! চিঠিটা পড়।

মনোরমা : কার চিঠি—

উদয়ন : তোমার দাদার। খাবার টেবিলে চাপা দেওয়া ছিল।

মনোরমা : চিঠি কেন? দাদা কোথায়?

উদয়ন : পড়ছি, শোন। মনু, যেখান থেকে এসেছিলুম, সেখানেই ফিরে চললুম। যাবার পথে খুশীদের বাড়িতে কয়েকদিন থাকার চেষ্টা করব। জানি না থাকা যাবে কি না! আমরা পুরোনো আমলের মানুষ। আধুনিক কালটাকে বুঝতে পারি না বলেই বোধহয় সহ্য করতে পারি না। ভেবেছিলুম ভাগ্নের মধ্যে মামাকে দেখতে পাব। দেখলুম ভবিষ্যৎহীন একটি মানুষকে। তোমাদেরও মনে হল জেগে ঘুমোচ্ছ। আমাকে খুব অসহ্য মনে হবার আগেই সরে পড়লুম। ঘরের টেবিলের উপর

শ্যামলের জন্যে কয়েকটা বই আছে। ডেকে দিয়ে দিও। এনেছিলুম আমার ভাগ্নে-ভাগনীর জন্যে। ওদের কাছে এ জিনিসের কোন দাম নেই। আমাকে ভাল না বাসলেও তোমাদের জন্যে ভালবাসা রইল!
শুনলে তো চিঠিটা? ফানি ম্যান! নাটকীয় প্রবেশ, নাটকীয় প্রস্থান। সাবেক কালের মাস্টারমশাইদের মত মেজাজ।

মনোরমা: যাকে বোঝা যায় না সেই তো আমাদের কাছে মজার লোক। ফানি ম্যান।

পেন্টাগন

আমরা পাঁচ বন্ধু। আমি, শ্যামল, মলয়, সুখেন আর নিতু। পাড়ায় আমাদের নাম হয়েছে পেন্টাগন। আমরা ছিলুম চারজন, নিতু আসায় চতুর্ভুজ পঞ্চভুজ হয়েছে। নিতু বিহারের ছেলে। ডেরি-অন-শোনে বাড়ি ছিল। মা বাবা দু'জনেই মারা যাবার পর এখানে চলে এসেছে মামাদের কাছে। আমাদের মধ্যে নিতুকেই সবচেয়ে সুন্দর দেখতে। এক মাথা কোঁকড়া চুল। বিহারের জল হাওয়ায় সবল শরীর। যা খায় তাই হজম হয়। সর্দি নেই, কাশি নেই, জ্বর নেই, মাথা ব্যাথা নেই। নিতুর অনেক গুণ। ভারী সুন্দর গান গায়। সুন্দর ছবি আঁকে। কখনও রেগে যায় না। রাগালেও রাগে না। হেসে সব ভুলিয়ে দেয়।

আমরা চারজন এক স্কুলে, একই ক্লাসে পড়ি। নিতু হঠাৎ বিহার থেকে চলে এসেছে। মামারা নিতুকে নিয়ে কী করবেন, মামারাই জানেন। তিন মামার তিন রকম মত। বড় মামার স্টেশনারি দোকান। বড় মামা বলেন, নিতুকে ব্যবসা শেখাব। মেজমামা একটা কারখানায় কাজ করেন। তাঁর মত, সুযোগ পেলেই, নিতুকে অ্যাপ্রেন্টিস করে ঢুকিয়ে দোব। ছোটমামার কোনও মত নেই। তিনি সেতার বাজান। শিল্পী শিল্পী ভাব। সাতেও নেই পাঁচেও নেই। সাধনা নিয়েই ব্যস্ত। সব দেখেশুনে নিতুর ধারণা হয়েছে, তার কিছুই হবে না। সকলেই চাইছেন, নিতু রোজগারে নেমে পড়ুক। নিজের পায়ে না দাঁড়ালে কে বসে বসে খাওয়াবে।

বেলা চারটের সময় রোদের তেজ যখন কমে আসে, রাস্তায় যখন লম্বা-লম্বা ছায়া নেমে আসে, তখন বই বগলে হই-হই করতে করতে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আসে। খেলার মাঠে ফুটবল পড়ার শব্দ ওঠে। পিঁ পিঁ করে বাঁশি বাজতে থাকে। আমরা খেলি না।

খেলার মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখি। তারপর আমাদের একটা জায়গা আছে, সেখানে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসি। নিতু আসে। গানে-গল্পে সন্ধে, নেমে আসে যে-যার বাড়ি গিয়ে পড়তে বসি।

জায়গাটা হল গঙ্গার ধারের একটা ভাঙা ঘাট। পাশেই বিশাল বটগাছ। শিবের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের মন্দির। পাড় ঢালু হয়ে জলের দিকে নেমে গেছে। শ্যামল খুব ভাল ছবি আঁকতে পারে। তার পকেটে থাকে স্কুল থেকে কুড়িয়ে আনা রঙবেরঙের চক। ভাঙাঘাটের পৈঠেতে সে রোজই কিছু না কিছু ছবি আঁকে। কোনও দিন প্রধান শিক্ষকের মুখ। কোনও দিন অঙ্কের স্যার। কোনও দিন স্কুলের দারোয়ান। মাঝে মাঝে পড়ার বইয়ের গল্পের চরিত্র। ছবিতে সকলেরই স্বভাব সুন্দর ফুটে ওঠে। হেডস্যারের তিরিক্ষি মেজাজ। অঙ্কের স্যারের মারমুখী স্বভাব। দারোয়ানের দেহাতি মুখ। রোজই আঁকে। রোজই মুছে যায়। কে যে মুছে দেয়। মনে হয় মাঝরাতে যখন আমরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ি তখন চুপিচুপি জোয়ারের জল এসে সব মুছে দিয়ে যায়।

আজ আমরা অনেকক্ষণ বসে আছি। সূর্য সেই কখন ছ্যাঁক করে জলে ডুব দিয়েছে। আকাশে কত রকমের মেঘ, কত রকমের রঙ। রং-বেরঙের পাল তুলে নৌকো চলেছে, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ। কোথায় যাচ্ছে কে জানে। সবই মহাজনী নৌকো। নুন বোঝাই, খড় বোঝাই।

শ্যামল বললে, "নিতুর আজ কী হ' বল তো?"

মলয় বললে, 'বড় মামা হয়তো দোকানে বসিয়ে কলকাতায় সিনেমা দেখতে গেছে।"

"নিতুটার যে কী হবে?" সুখেনের ভাষণ ভাবনা।

মলয় বললে, "নিতুটা না এলে বড় বিপদে পড়ে যাব। একটা অঙ্ক খুব আটকে গেছে রে! একটা করতে পারলে পুরো চ্যাপটারটা হয়ে যাবে।"

নিতুর অঙ্কে ভীষণ মাথা। খড়ি দিয়ে ভাঙা ঘাটের শান-বাঁধানো ধাপে ঝটাপট অঙ্ক কষে আমাদের অবাক করে দেয়।

সুখেন বললে, "দেখবি নিতুটা মস্ত বড় গাইয়ে হবে। ওর যা গলা! যে কোনও গান একবার শুনলেই অবিকল গাইতে পারে।"

নিতুর ভাবনায় আমাদের গল্পটল্প সব থেমে গেছে। পকেটের চানাচুর মিইয়ে এল। নিতু না এলে খেতে পারছি না। এদিকে সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে ওড়ার আগে বটের ডালে বসে পেঁচা ডাকছে চ্যাঁ চ্যাঁ করে।

সুখেন জলের দিকে একটা ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে বললে, "নিতুটাকে ওর মামারা আমাদের হাতে ছেড়ে দিক না? স্কুলের সেক্রেটারিকে ধরে ওকে আমাদের ক্লাসে ঠিক ভর্তি করে দিতে পারব। দেখবি ও ঠিক ফার্স্ট হবে। স্কুলের মাইনেও লাগবে না, কিছু না।"

আমরা উঠে পড়ব ভাবছি, হঠাৎ নিতু এসে হাজির হল?

"কি রে এত দেরি করলি! কী হয়েছিল?"

নিতু পান খেয়েছে। ঠোঁট লাল। হঠাৎ সন্ধেবেলা পান! ভাল খাওয়া-দাওয়া হয়েছে বলে মনে হয় না। ঠোঁট লাল, মুখ শুকনো। সুখেন বেশ কিছুক্ষণ নিতুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "তোর আজ একটা কিছু হয়েছে। নিশ্চয় কিছু হয়েছে।"

"কী আবার হবে?" যাই হোক না কেন, নিতু কখনও কারুর নিন্দে করে না। সবাই ভাল।

আমি চানাচুরের ঠোঙাটা বের করে বললুম, "তুই আসছিস না বলে খেতে পারছি না। নে, ধর।"

নিতু হাত পেতে চানাচুর নিল। সুখেন বললে, "তুই লুকোচ্ছিস। সত্যি করে বল তোর কী হয়েছে।"

"আমার আবার কি হবে। আমার যা হবার সবই তো হয়ে গেছে।"

নিতু চানাচুর খেতে লাগল। নিতুর ডান গালটা বাঁ গালের চেয়ে

লাল হয়ে আছে। আমি লক্ষ্য করে করে ঠিক ধরেছি। চানাচুর চিবোতেও যেন বেশ কষ্ট হচ্ছে।

"নিতু, তোর গালটা কেন লাল হয়ে আছে রে?"

"মনে হয় রক্ত বেড়েছে। স্বাস্থ্য ভাল হলে মানুষের গাল গোলাপি হতে থাকে।"

"তা একটা গাল হবে কেন?"

"একটা-একটা করেই তো হয়। প্রথমে ডান, তারপর বাঁ।"

"ও।" ও বলেই চুপ করতে হল।

দিনের আলো নিবে আসছে দেখে মলয় পকেট থেকে অঙ্কটা বের করে ফেলল। সেই বিশ্রী ঝামেলা। পিতা পুত্রের বয়স নিয়ে চিরকালের ঝামেলা। দশ বছর আগে আর দশ বছর পরে। ক্লাসে অঙ্কের স্যার একদিন মলয়কে ব্ল্যাকবোর্ডের সামনে দাঁড় করিয়ে এই রকম একটা অঙ্ক কষতে দিয়েছিলেন। মলয় অ্যায়সা অঙ্ক করেছিল, আমরা হেসে মরি। পুত্রের বয়েস পিতার বয়সের চেয়ে দশ বছর বেশি হয়ে গেল। মলয় প্রথমটায় ধরতেই পারেনি, কেন সবাই হাসছে। মলয় সমানে তর্ক করে গেল, আজকাল ওরকম হয় স্যার, সব পুত্র তো ভবিষ্যতে হতে পারে। অতীতের পুত্র ভবিষ্যতের পিতা। এই তো জগতের নিয়ম। মাথায় ডাস্টারের গাঁট্টা খেয়ে ব্ল্যাকবোর্ড থেকে সরে এসে কান ধরে বেঞ্চিতে দাঁড়িয়ে রইল। স্যার মুখ ভেঙচে বললেন, "ওরে আমার দার্শনিক রামছাগল রে!"

সেই অঙ্ক নিতু ধরেই করে দিলে। পিতা পিতাই রইল, পুত্র পুত্র। কোনও স্থান-পরিবর্তন হল না। উত্তরও মিলে গেল। আমরা অবাক হয়ে যাই, নিতু এত অঙ্ক কবে কোথায় শিখল। বিহারের স্কুলে। খুব কাঁচা লঙ্কা খেলে অঙ্কের মাথা খোলে। নিতুর ধারণা। মলয়ও খেতে শুরু করেছে। এখনও মাথা তেমন খোলেনি। দেখা যাক ফাইনালে কী হয়।

নিতু এইবার গান ধরেছে, "তু গঙ্গা কি মৌজ ম্যায় যমুনা কি

ধারা।” ওপারের মন্দিরে ফুট-ফুট করে আলো জ্বলে উঠছে। এপারের মন্দিরে আরতির তোড়জোড় শুরু হচ্ছে। টিং-টিং করে ঘণ্টা বাজছে। আমাদের উঠতে হবে। একটা দিন শেষ হয়ে গেল। কড়া নিয়ম। সন্ধের সময় বাড়ি ফিরতে হবেই। বটের ডাল থেকে হুস হুস করে বাদুড় উড়ে যাচ্ছে।

নিতু কিন্তু উঠল না। বসেই রইল।

“কী রে, তুই যাবি না?”

“কোথায় যাব?”

“কেন? বাড়িতে?”

“আমার বাড়ি বলে কিছু আছে?”

কথাটা ঠিকই। নিজের বাড়ি আর মামার বাড়িতে অনেক তফাৎ। মা মারা গেলে মামার বাড়িতে আর কী থাকে?

“তুই তা হলে কী করবি?”

“এখানে অনেকক্ষণ বসে-বসে গান গাইব। মন্দিরে আরতি শুরু হবে দেখব। তারপর শ্যামলদের বাড়ির রকে গিয়ে বসে থাকব।”

আমি বললুম, “তুই আমাদের বাড়িতে চল।”

“না রে, তোরা এখন লেখাপড়া করবি। আমি গেলে তোদের মা-বাবা বিরক্ত হবেন।”

“কিচ্ছু বিরক্ত হবেন না, তুই চল না। তুইও বসে-বসে পড়বি।”

এমন একগুঁয়ে ছেলে, কিছুতেই উঠল না। বললে, “যার যা জায়গা। তোদের বাড়ি আছে, মা বাবা আছে, ভবিষ্যৎ আছে, আমার কী আছে বল?”

নিতু আবার গান ধরল, “বচপনকে দিনকো দিলসে না জুদা কর না।”

নিতু একা বসে রইল গঙ্গার ভাঙাঘাটে। আমরা খেলার মাঠের পাশ দিয়ে বাড়িমুখো হলুম। কিছুটা পথ যেতেই নিতুর ছোট-মামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হন্তদন্ত হয়ে আসছেন।

"তোমরা নিতুকে দেখেছ? আমাদের নিতু।"

"হ্যাঁ, গঙ্গার ধারে একা-একা বসে আছে।"

"দেখেছ, কী কাণ্ড, সারাদিন না খেয়ে আছে।"

নিতু সারাদিন না খেয়ে আছে। কই একবারও তো সে কথা আমাদের বলল না! আবার পান খেয়েছে। নিতুর ছোটমামাকে অনুসরণ করে আবার আমরা ঘাটে ফিরে এলুম! ফিরে আসতে আসতে দূর থেকেই নিতুর গলা কানে এল, "ও জি ও ওও 'তু গঙ্গা কি মৌজ মৈ যমুনা কি ধারা।"

আমাদের আবার ফিরে আসতে দেখে নিতু অবাক হয়ে গেল, "এ কি তোরা?"

নিতু প্রথমে তার ছোটমামাকে দেখতে পায়নি। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। বটের ডালে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে পেঁচা ডাকছে।

"নিতু।" ছোটমামার গলা শুনে নিতু উঠে দাঁড়াল।

"ছোটমামা তুমি।"

"হ্যাঁ আমি। চল বাড়ি চল।

'না, আমি যাব না।

"যাবি না কেন?"

নিতু চুপ করে আছে। আমরা একসঙ্গে প্রশ্ন করলুম, "কেন যাবি না? তোর কী হয়েছে? তুই সারাদিন না-খেয়ে আছিস কেন? তুই সে কথা আমাদের বললি না কেন?"

আমাদের খুব অভিমান হয়েছে। কেন হবে না! নিতু আমাদের বন্ধু। তার কিছু হওয়া মানে আমাদের হওয়া।

নিতু ধরা-ধরা গলায় বললে, আমি ঘরের কথা কাউকে বলতে চাই না। মা মারা যাবার দিন আমাকে বলে গিয়েছিলেন, তোর কী হবে জানি না, তবে তোকে মুখ বুজে অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। যাই হোক, হাসিমুখে থাকবি। নিজের দুঃখের কথা পরকে বলবি না।"

নিতুর কথা শুনে আমাদের খুব রাগ হল। আমরা এত নিতু-নিতু করি। আমরা হলুম নিতুর পর! বেশ তবে তাই হোক। নিতুর ছোটমামাই বুঝুন নিতুর ব্যাপার। আমাদের কী?

"চ রে, চ।" আমরা ফাঁকা খেলার মাঠের পাশ দিয়ে অন্ধকার পথ ধরে যে যার বাড়ি ফিরে গেলুম।

পরের দিন আবার যখন আমরা গঙ্গার ধারে ফিরে এলুম বিকেলের আসরে, তখন নিতুর ওপর আমাদের রাগ পড়ে গেছে। নিতুর ওপব কি রাগ করা যায়? মলয়ের আবার একটা অঙ্ক আটকেছে। এবার সেই বিদঘুটে চৌবাচ্চাটা। এক দিক দিয়ে জল ঢুকছে আবার দু'দিক দিয়ে জল বেরোচ্ছে। মলয় বলল, "সারা সকাল চেষ্টা করেও এই চৌবাচ্চা ভরতে পারলুম না।"

শ্যামল বললে, "আগে একটা মিস্ত্রি ডেকে ফুটো বন্ধ করা, তবে যদি ভর্তি হয়।"

"সে তো অ্যালাউ করবে না। ওই তিনফুটোঅলা সর্বনেশে জিনিসটাই ভরতে হবে, তা না হলে অঙ্ক!"

সুখেন বললে, "আমি পকেটে করে আজ খাবার এনেছি। নিতু খাক, পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে ধাপ্পা মারুক, আজ আর ভুলছি না। আগে খাও, তারপর অন্য কথা"

গল্পে-গল্পে সময় কাটছে, নিতুর কিন্তু আসার নাম নেই। সূর্য ডুবে গেল। মন্দিরে-মন্দিরে আলো জ্বলে উঠল। শ্যামলই প্রথমে আবিষ্কার করল লেখাটা। নিচু হয়ে ঘাটের পৈঠাতে আগের দিনের আঁকা ছবি দেখতে দেখতে লাফিয়ে উঠল, "এই দেখ। নিতু কী লিখে রেখে গেছে।"

আমরা ঝুঁকে পড়লুম। দিনের শেষ আলোয় লেখাটা পড়া গেল "আমি চলে যাচ্ছি। কোথায় যাচ্ছি জানি না। এখানে আমার স্থান হল না। যেখানেই থাকি তোদের কথা চিরকাল মনে থাকবে—নিতু।"

আমরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই বিশাল পৃথিবীতে নিতু বেমালুম হারিয়ে গেল। আমরাও তার কথা ভুলে বড় হতে হতে প্রায় বুড়ো হয়ে এলুম। আমাদের সেই পেণ্টাগন আর নেই। পাঁচটা বাহু পাঁচ দিকে ছিটকে গেছে। আর কেউ নিতুকে মনে রেখেছে কি না জানি না, আমার মন থেকে নিতু কিন্তু মুছে যায়নি। আমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনেও নিতু বড় হয়েছে। নিতুকে আরও বেশি মনে পড়ত যখনই রেডিওতে বৈজু বাওরার ওই গান দুটো শুনতুম। কতদিন নিতুর মামাদের জিজ্ঞেস করেছি, বিরক্ত হয়ে বলেছেন, জানি না।

কী ভাবে কী হয়! মনে ইচ্ছে থাকলে হারানো মানুষের সঙ্গে এইভাবেই বোধ হয় যোগাযোগ হয়ে যায়। অফিসের কাজে আন্দামান গেছি। আন্দামান থেকে জাহাজে 'হাটবে' বলে একটা দ্বীপে গিয়ে নেমেছি। জেটিতে সরকারী জীপ এসেছে। দ্বীপের ভেতরে একটা স্কুল দেখতে যাব। বিশাল-বিশাল গর্জন গাছের সারির মধ্যে দিয়ে ট্রাঙ্ক রোড। জীপ ছুটছে। আমি সামনে বসে আছি ড্রাইভারের পাশে। আমাদের পেছনে বসে আছেন আরও তিনজন। প্রকৃতিতে তন্ময় হয়ে গেছি। এমন দৃশ্য জীবনে দেখিনি। ঘাড়ের কাছে আঙুলের ছোঁয়ায় চমকে উঠেছি।

"চিনতে পারিস?"

ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে ফিরে তাকালুম। ফর্সা একটি মুখ। হালকা নীল ডোরাকাটা শার্ট। খুব চেনা মুখ। কোথায় দেখেছি, কোথায় দেখেছি।

"তুই নিতু?"

"ইয়েস, আমি নিতু।"

আনন্দের ওপর আনন্দ। ডবল আনন্দ। যে স্কুলে চলেছি, নিতু সেই স্কুলের শিক্ষক। আনন্দে চোখে জল এসে গেছে। পরশমানিক পেলেও মানুষের বোধহয় এত আনন্দ হয় না।

কথা ছিল স্কুল আর দ্বীপের অন্যান্য অংশ দেখে সন্ধের মুখে জাহাজে ফিরে যাব। রাত একটার সময় জাহাজ নোঙর খুলে বহু দূরে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের দিকে চলে যাবে। রাতের খাওয়া জাহাজেই হবে। নিতু বললে, "তুই আমার এখানে রাতের খাওয়া সেরে যা। আমি ঠিক সময়ে তোকে বন্দরে পৌঁছে দোব।"

রাজি হয়ে গেলুম। তিরিশ বছর পরে নিতুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। তিরিশ বছর ধরে যে-প্রশ্নটা মনে মনে ঘুরছিল সেইটা দিয়েই শুরু করলুম, "তুই খাসনি কেন? তোর গালের ডান দিকটা লাল কেন?"

নিতু হো-হো করে হেসে উঠল। আমরা তিরিশটা বছর পেছিয়ে গিয়ে সেই গঙ্গার ধারে যেন বসে আছি। আসলে বসে আছি একটা ঢালু সবুজ মাঠে, পাঁচশো ফুট উঁচু একটা গর্জন গাছের তলায়। সামনে ট্রে-তে চা-বিস্কুট।

নিতু বললে, "তা হলে শোন। চড়-চাপড় রোজই দু একটা জুটত, গ্রাহ্য করতুম না। সেদিন যা হয়েছিল তাকে বলে ধোলাই, আড়ং ধোলাই! কারণটা শুনবি? সকালে বড়মামা আমাকে দোকানে বসিয়ে কেনাকাটায় গেলেন। যে-সব জিনিস বিক্রি হয় তার দামও বলে গেলেন। কেবল একটা জিনিসের দাম বলতে ভুলে গেলেন, আর আমিও খেয়াল করিনি, সে জিনিসটা হল সুতোয় বাঁধা হাতলাট্টু। সেই যে ছেলেবেলায় যাকে আমরা বলতুম ইয়োইয়ো। জিনিসটা তখন খুব চলেছিল।"

নিতু এক চুমুক চা খেল। "দোকানে খদ্দেরপাতি তেমন হত না। প্রথমেই যে এল সে একটা ছেলে। কিনবে ওই লাট্টু। মহা বিপদ। দাম জানি না। আবার খদ্দের লক্ষ্মী, হাতছাড়া করতে মনে লাগে। অনেক ভেবে মনে হল ও জিনিসের দাম আর কত হবে, এক আনা। ছেলেটা লাফাতে লাফাতে কিনে নিলে। ছেলেটা চলে যাবার কিছুক্ষণ পরেই ব্যবসা একেবারে জমজমাট হয়ে উঠল। মনে মনে ভাবলুম, কী পয়া দোকানদার! মামা বসলে একটাও

খদ্দের আসে না, ভাগ্নে বসতে-না-বসতেই লাইন দিয়ে খদ্দের আসছে। দেখতে দেখতে দু'ডজন লাট্টু শেষ। দুপুরে দোকান বন্ধ করার সময় বড়মামা এলেন। খুব গদগদ হয়ে বললুম, কী বিক্রী! দু' ডজন লাট্টু শেষ। কত করে বেচলি? বেশ চড়া দামে, এক আনায় একটা। হাতে হাতে পুরস্কার। সপাটে ডান গালে এক চড়। রাসকেল, এই এক লাট্টুর দাম দশ আনা, আবার এক চড়।

নীতু হো-হো করে হেসে উঠল। চাঁদ উঠেছে, গর্জন গাছের মাথার উপর। কী নির্জন দ্বীপ। নীতু আর আমি পাশাপাশি বসে আছি। পেন্টাগনের দুটো বাহু অনেকদিন পরে জোড়া লেগেছে। আর তিনটে বাহুর একটা মলয়, মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার হয়েছিল, দুর্ঘটনায় মারা গেছে তিন বছর আগে। আর দুটো বাহু শ্যামল আর সুখেন বিদেশে চলে গেছে।

"তারপর?"

নিতু বললে, "তারপর পথেই জীবন, পথেই মরণ আমাদের। মা বলতেন, মামার বাড়িতে পড়ে থাকলে মানুষ, মানুষ হতে পারে না। বাবা বলতেন, জীবন একটা খেলা, একটা চ্যালেঞ্জ। সেই খেলতে খেলতে কোথায় চলে এসেছি দেখ।"

"দেশে আর ফিরবি না?"

"দেশ? কে আছে আমার? কার কাছে ফিরব? এখানকার শ্মশানটা কত সুন্দর জানিস? সমুদ্রের বেলাভূমিতে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে চিতার আগুন নিবিয়ে দেয়। মানুষের অস্থি আর সমুদ্রের ঝিনুক পাশাপাশি থাকে।"

টম আর ডুলী

কুকুরটা আমাদের বাড়িতে একদিন এসেছিল। হঠাৎ রাস্তা থেকে চলে এসেছিল গেটের ফাঁক দিয়ে। তখন সে ছোট ছিল। খুবই ছোট। তা না হলে ফাঁক দিয়ে গলবে কি করে! সাদা ধবধবে গায়ের রঙ। মুখটা ভোঁতা মত। কান দুটো ঝোলা ঝোলা। ঢুকে কোনও শব্দ করেনি, কেঁউ কেঁউ করেনি। পাঁচিলের পাশে গুটিসুটি মেরে চুপ করে বসেছিল। চোখে মুখে ভয় ভয় ভাব। কুকুরটাকে দেখে মা তাড়াতে চেয়েছিলেন। তেড়েও গিয়েছিলেন। কে যেন বললে, 'আহা! ওর মা-টা কাল মাঝরাতে গাড়ি চাপা পড়ে মারা গেছে? এক্ষুনি একটা ইয়া বড় কেলেমত কুকুর তেড়ে আসাতেই ভয়ে তোমাদের বাগানে ঢুকে পড়েছে।'

মা-মরা কুকুর দেখে আমার মায়ের মন নরম হল। ভাল করে দেখলেন জিনিসটাকে। 'বেশ দেখতে রে! তবে বড় হলে ওই হুমদো নেড়িই হবে।'

মনুদি আমাদের বাড়ি কাজ করে। বাগানের রাস্তা ঝাঁট দিচ্ছিল। সে ত অনেক কিছু জানে। সেই বললে, 'না গো দিদি, ওর মা-টাকে খুব ভাল দেখতে ছিল গো। বেলেতি কুকুরের মত।'

মা বললেন, 'এসেছে, থাকে থাক। কিন্তু টম যদি দেখতে পায়? সেটা ত একটা মহা গুণ্ডা? সে ত সহ্য করবে না। হিংসেতে জ্বলে মরবে।'

মনুদি সেই বোকাবোকা কুকুর ছানাটাকে তখন বোঝাতে লাগল, 'এসেছিস, থাক। তবে ভুলেও ভেতরের উঠোনে যাবিনা। ওখানে টম আছে। টমের জমিদারির বাইরে থাকবি।'

চোখ পিট পিট করে, পুটুক-পুটুক করে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে সব কথা শুনল। মনে হয় বুঝতে পেরেছে, সে গরীবের ছেলে। গরীবের ছেলের মতই বাগানে, বড় জোর সদরের সিঁড়ির ধাপে তাকে থাকতে হবে। খেতে পায় ভাল, না পায় নিজেকেই যোগাড় করে নিতে হবে।

কুকুরটা সেই থেকেই রয়ে গেল। মায়েরও কেমন মায়া পড়ে গেল। টম একদিন কেবল বকাঝকা করেছিল। পরে বুঝেছিল দিশী কুকুর তার মত খাস বিলিতির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। ওটাকে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও দরকারই নেই।

রোজ মাংস দিয়ে টমের ভাত রান্না হয়। বেলা একটার সময় চানটান করে বাবু হয়ে খেতে বসে। তখন তার কি মেজাজ! কাছে গেলে গড়ড় গড়ড় শব্দ করে। তখন পৃথিবীর কাউকেই সে চেনেনা। কোন কোন দিন খিদে কম থাকলে দুটি ভাত পড়ে থাকে। মাংস থাকে না। টম আমাদের চেয়ে চালাক। ভাত ফেলে রাখলেও বেছে বেছে সব মাংস খেয়ে ফেলে। সেই মহাপ্রসাদ পায় ওই কুকুরটা। তিন চারদিনের মধ্যে তার একটা নামও রাখা হয়েছে। নামটা তেমন ভাল নয়। দুলী। দুলীর খাওয়া-দাওয়ার তেমন ঠিক-ঠিকানা থাকে না। যে যখন পারে এই নে দুলী বলে মুখ থেকে বের করে দেয়। দুলীর রাতের খাওয়াটা মোটামুটি ঠিক থাকে। খানকতক শুকনো রুটি। টম তখন চকর চকর করে এক বাটি দুধ খায়, চার-দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

টম ঘুমোয় খাটে। নরম-গরম বিছানায়। দুলী শুয়ে থাকে বাড়িতে ঢোকার দরজার বাইরে সিঁড়ির ধাপে, পাপোসের ওপরে। শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই দুলী দরজার বাইরে শুয়ে, এঁটো-কাঁটা খেয়ে বড় হয়ে উঠল।

দুলীর ওপর মায়া পড়ে গেল। কেমন যেন ভয়ে ভয়ে থাকে। করুণ চোখে তাকায়। খিদে পেলে ন্যাজ নাড়ে, বসে বসে দুলতে

থাকে দুপাশে। ডাকেনা। লাফিয়ে উঠে আমাদের আদুরে টমের মত হাত থেকে খাবার কেড়ে নিতে চায়। সদর সিঁড়ির ধাপে শোয় বটে, কেউ এলে কি গেলে সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে একপাশে সরে যায়। 'কি-রে দুলী' বলে ডাকলে অবাক হয়ে তাকায়।

মা মাঝে মাঝে বলেন, 'আমাদের বাঁদর টমের চেয়ে দুলী শত-গুণে ভাল। ' কোনও বায়নাক্কা নেই। শুকনো ভাত, ডাল ভাত যাই দাওনা কেন লক্ষ্মী মেয়ের মত খেয়ে নেয়। মোটা মোটা শুকনো রুটি তাই ওর কাছে অমৃত। আর আমাদের টম, যেন নবাব। এক-বাটি মাংস না হলে বাবু মুখ ভার করে বসে থাকবেন। খাবার ছোঁবেনই না। বেষপতিবার বেষপতিবার ওকে খাওয়াতে আমার জীবন বেরিয়ে যায়।

টমের সঙ্গে মা আমার নাম, স্বভাব সবই জুড়ে দেবেন। আমরা দুজনে নাকি টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। একজন মানুষের ভাষায় কথা বলে আর একজন কুকুরেব ভাষায়—এই যা তফাৎ।

টম যখন খেতে চায়না, খাবার ফেলে রেখে খেলতে দুষ্টুমি করতে ছোটে, কাক তাড়া করে, মা তখন বলেন, 'দুলী টমের খাবারটা খেয়ে যা ত?' তখন টম ঘেউ ঘেউ করে অদৃশ্য দুলীকে বারকতক বকে ধমকে সড়সড় করে খেতে চলে আসে। দুলীর যখন খুব খিদে পায় তখন বাইরে থেকে রান্নাঘরের জানলায় সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে কুঁই কুঁই করে। মাকে বোধ হয় বলতে চায়—তোমরা ত সারা সকাল অনেক কিছুই খেলে, তোমাদের টম বিস্কুটের পর বিস্কুট সাবাড় করল, আমাকে কিছু দাও। মা যা দেবেন তা ত জানাই আছে, রুটি, দুধ, ছানা, মাংস সব টমের।

খুব বৃষ্টি পড়ছে। দুলী গুটিসুটি মেরে বাইরে সিঁড়ির ধাপে শুয়ে আছে। বৃষ্টির ছাটে গা ভিজে যাচ্ছে। দরজা খুলে কেউ দুলীকে ভেতরে ডাকে না। টম আছে যে। নেড়ীর সঙ্গে মিশলে বিলিতির জাত যাবে। পুরো বর্ষাটাই দুলী ভিজে কাটিয়ে দিলে।

শীতেও গিয়ে শোয় বাগানে, যেখানে গাছের শুকনো পাতা জড়ো করা আছে। টম শোয় নরম বিছানায়। শীতে তার গায়ে থাকে লেপ! সেই লেপটাকেই ও আবার মাঝে মধ্যে খুব খেলা পেয়ে গেলে দাঁত দিয়ে ধরে ঝটাপটি করে।

তুলীর ওপর মায়ের খুব মায়া পড়ে গেছে। রোজ তুপুরে আর রাতে খাবার নিয়ে বাইরে এসে ডাকলেন—তুলী আয়, তুলী! তুলী যেখানেই থাক দৌড়ে চলে আসবে। মা আদরের গলায় বলবেন—'কখন থেকে ডাকছি! আসবি ত! আয়! এক্ষুনি কাক আর কাঠবেড়ালীতে সব খেয়ে যাবে।'

সেদিন মা বাইরে এসে কতবার ডাকলেন। তুলী কিন্তু এল না। মা রাগ করে গাছতলায় ভাত রেখে চলে এলেন। 'যখন তোমার খুশী এসে খেও। পাড়া বেড়াতে বেরিয়েছেন।' সারা বেলা চলে গেল তুলী এল না। কাক আর কাঠবেড়ালীতে মারামারি করে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে সব খেয়ে গেল। রাতে রুটি নিয়ে মা ডাকাডাকি করলেন। তুলী এল না। সিঁড়ির ধাপে রুটি কখানা ফেলে রাখলেন। কোথায় গেছে কে জানে। যদি আসে খেয়ে শুয়ে পড়বে। মায়ের মনটা খুব খারাপ হয়ে গেছে। মাঝরাতে উঠে দরজা খুলে দেখে এসে বললেন 'নাঃ আসেনি। বোধ হয় মারাই গেছে।' সকালে সিঁড়ির ধাপে সেই রুটি পড়ে রইল! তুলী আর এল না।

দাদুর কাঁঠাল

দাদু সকালবেলাই ঘুম থেকে উঠে ঘোষণা করলেন, "আজ আমি দেশের বাড়িতে যাব।" অর্থাৎ বলাগড়ে। আমি একবার মাত্র সেখানে গিয়েছিলুম। অনেক ছেলেবেলায়। ভাল মনে নেই। এইটুকু মনে আছে, একটা ছোট্ট রেলগাড়িতে চেপেছিলুম, অনেকটা টয় ট্রেনের মতো। ছোট-ছোট কামরা যেন দেশলাইয়ের বাক্স। ইঞ্জিনের সে কি শব্দ ভটঅ, ভটঅ। এর বাড়ির উঠোন দিয়ে, তার বাড়ির পুকুরপাড় দিয়ে ট্রেন চলত পোষা কুমিরের মতো। সেই ট্রেনটা ছিল গ্রামের মানুষের বড় আদরের। ঘরের ছেলের মতো। ট্রেনটা তেমন জোর কদমে ছুটতেও পারত না। সেবার এক বুড়িকে দেখেছিলুম ট্রেনের গায়ে ঘুঁটে দিতে দিতে এগিয়ে চলেছে। ট্রেনটার এক-এক কম্পার্টমেন্টের গায়ে এক-এক গ্রামের ঘুঁটে। কে একজন নেমে গিয়ে গ্রামের এক বাড়ি থেকে এক গেলাস জল খেয়ে একটু ছুটে এসে ঠিক ঠিক নিজের কামরায় উঠে পড়লেন। সে ছিল এক মজার ট্রেন। সে ট্রেন এখন আর নেই।

দাদু বললেন, "কোর্ট এখন বন্ধ। বহুদিন যাওয়া হয়নি। একবার ঘুরে আসি। আম-কাঁঠালের সময়, দেখি কি পাওয়া যায়। অত বড় বাগান। পাঁচ ভূতে লুটেপুটে শেষ করে দিলে।"

মায়ের অবশ্য মত ছিল না। এই গরমে যাওয়া-আসার কষ্ট। তা ছাড়া আম-কাঁঠাল পেলে কে বয়ে আনবে। কষ্টই হবে। কাজের কাজ কিছুই হবে না। দাদুর মন টেনেছে। মন যেখানে শরীর সেখানে এই নীতিতে দাদুর ভীষণ বিশ্বাস। আর একটা কথা তিনি প্রায়ই বলেন, আত্মাকে কখনও কষ্ট দেবে না।

আমাকে ছাড়া দাদুর কোন কাজ হয় না। প্রায়ই বলেন, দুটো জায়গায় তুই আমার সঙ্গে যেতে পারবি না। এক এখানে,

সেটা হল কোর্ট, তুই ওখানে, সেটা হল স্বর্গ। আমিও তো কম যাই না। আমি বলি, দেখা যাবে, আমিও তো একদিন স্বর্গে যাব, তখন আবার দেখা হয়ে যাবে। সেখানে আমার দাদাও আছে। দাদাকে আমার মনেই পড়ে না। দাদার কথা উঠলে মা এখনও কেঁদে ফেলে। তার ফেলে-যাওয়া যত-সব জিনিস, জামা, জুতো পুতুল, সোনার আংটি, সব মা একটা লাল বাক্সে জমা করে রেখেছে। মাঝে মাঝে দুপুরবেলা নির্জনে বের করে দেখে আর কাঁদে। সেই দাদার সঙ্গে মায়েরও নিশ্চয়ও দেখা হবে। একটা জিনিস বুঝেছি, এখানে মৃত্যু আছে, ওখানে নেই।

আমরা যখন বলাগড়ে পৌঁছলুম তখন একটা বেজে গেছে। বুক পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দাদু দেখলেন। ট্রেনটা উঠে গিয়ে আমার খুব কষ্ট হয়েছে। তিনবার বাস পালটাতে হল। তেমনি ভিড়। বাসের ছাদে বসে লোক চলেছে। দাদুর ফর্সা টকটকে মুখ গোলাপী হয়ে উঠেছে। পাঞ্জাবির পিঠ ঘামে ভিজে। তবু দাদুর কি আনন্দ। একটা বটগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে-খেতে বললেন, "আহা জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। এই আমার সেই ছেলেবেলার বটতলা। এখনও তুমি ঠিক আছ। কতদিন হয়ে গেল। কত লোক চলে গেল, কত লোক এল, তুমি এখনও ঠিক আছ।" বটগাছের সঙ্গে কিছুক্ষণ মনের কথা বলে, দাদু আমার হাত ধরে গ্রামের পথ ধরলেন।

পথে দাদুর একটিও চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হল না। "কী হল বল তো? পুরনো মানুষেরা সব গেল কোথায়? সব অচেনা মুখ। হারাণ, নিবারণ, মানিক, মুস্তাফি। এখনও তাদের মরবার বয়েস হয়নি। সব আমার সমবয়সী। আমি বেঁচে আছি যখন, তারা মরবে কেন?"

"দাদু আমার মনে হয়, এখন দুপুর তো তাই তাঁরা খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছেন।"

"ধুর ব্যাটা। তিন-তিনটে আম বাগান পার হয়ে এলুম। গাছে গাছে কী রকম আম হয়েছে দেখছিস। এই আমপাকা দুপুরে কেউ ঘরে শুয়ে ঘুমোয় না। বাগানে মাচায় বসে হুঁকো-হাতে আম পাহারা দেয়। দেখলি না মাচায় অন্য লোক বসে আছে। ওদের ছেলেটেলে হবে। তোর আমবাগান নেই, তুই দুপুরে আমবাগানে বসে থাকার নেশা বুঝবি না।"

"তাই যদি হয়, তা হলে ওদের ডেকে কেন জিজ্ঞেস করলেন না?"

"সাহস হল না। যদি সত্যিই বলে মারা গেছে, মনে বড় লাগবে রে! মনটা এখন স্মৃতিতে, ছবিতে, বেশ ভরে আছে। খালি করতে চাই না। চল, চল, পা চালিয়ে চল।"

দাদু জোরে-জোরে হাঁটতে লাগলেন, পেছনে যেন কেউ তাড়া করেছে। হনহন করে হাঁটতে হাঁটতে দাদু একটা ভাঙা আটচালার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন, "যাঃ।"

"কী হল দাদু?"

"পাঁচুসুন্দরী নেই।"

"সে কে দাদু।"

"আরে এইখানে তার মুড়ি-তেলেভাজার দোকান ছিল। চোখের সামনে ভাসছে। এইখানটায় ছিল তার উনুন। ইয়া বড়-বড় বেগুনি, আলুর চপ, ফুলুরি আর লাল-লাল, ফুলো-ফুলো, মোটা মুড়ি। সে তোরা জীবনে খাসনি, খেতেও পাবি না।"

এক পাশে উঁচুমতো একটা ঢিবি। মনে হয় ওইটাই ছিল সেই পাঁচুসুন্দরীর উনুন। দাদু ডাকলেন "পাঁচুসুন্দরী।" সঙ্গে-সঙ্গে ওপাশ থেকে একটা ছাগল ভ্যা-ভ্যা করে ডেকে উঠল। আমি হেসে ফেলেছি। দাদু বললেন, "বোকার মতো হেসো না। এখনও এখানে পাঁচুসুন্দরীর আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি সে থান কাপড় পরে পিঁড়েতে উবু হয়ে বসে কড়ার

কালো বালি থেকে খুঁচি দিয়ে সাদা-সাদা মুড়ি ছেঁকে-ছেঁকে তুলছে।" ছাগলটা আবার ব্যা ক'রে উঠল। কার ছাগল কে জানে? হয়তো পাঁচুসুন্দরীরই হবে। দাদু দু'হাত কপালে তুলে নমস্কার করলেন।

আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলুম. গ্রামটা কেমন যেন নিঝুম হয়ে আছে। গ্রামের নেশা লেগেছে। আমরা বাঁশঝাড়, এঁদো পুকুর পেরিয়ে দাদুর ভিটেয় এসে উঠলুম। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ। ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা। একগাদা পায়রা বকবকম করছে। দাদু চণ্ডীমণ্ডপের ধুলো নিয়ে কপালে ঠেকালেন। আমিও তাই করলুম। দাদু বললেন, "এক সময় কত পূজো হয়েছে এইখানে। আজ সব অন্ধকার। এক-একটা মানুষ চলে গেলে আর কিছুই থাকে না। কত বোলবোলা ছিল এই বাড়ির। দোল, দুর্গোৎসব। শহর! শহরই আমাদের জীবনের শনি। মুখুজো-বংশের সন্তান কলকাতায় পেটের দায়ে মক্কেল চরাচ্ছে। এদিকে পৈতৃক ভিটেয় ঘুঘু চরছে। গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করে।" দাদু নিজের উপরেই নিজে খুব রেগে উঠলেন। সত্যিই হয়তো নিজের হাতে নিজের গালেই এক চড় কষাতেন। তা আর হল না। কোথা থেকে একটা পায়রা পাঞ্জাবির পিঠের দিকটা নষ্ট করে দিলে। দাদু ওপর দিকে মুখ তুলে ক্ষোভের গলায় বললেন, "তোরা অতীত বুঝিস না রে। কেউ অতীতে গেলেও সহ্য করতে পারিস না। জামা নষ্ট করে কান ধরে তাকে বর্তমানে টেনে আনবি। আর ক'দিন, চণ্ডী-মণ্ডপ ভেঙে পড়ল বলে। চালিয়ে যা, চালিয়ে যা।"

চণ্ডীমণ্ডপের পাশ দিয়ে ইট-বাঁধানো ক্ষয়া-ক্ষয়া একটা পথ ভেতরবাড়িতে চলে গেছে। দোতলা বাড়ি। ওপর তলার অবস্থা শোচনীয়। খড়খড়ি বসানো জানলা ভেঙে একপাশে ঝুলছে। কার্নিশে বটগাছ, নিমগাছ। শিকড় নেমেছে নীচের দিকে। এক তলাটায় মানুষ থাকে বলে মনে হল। তারে কাপড় শুকোচ্ছে।

ঘাসের ওপর চারটে খরগোশ ঘুরে বেড়াচ্ছে। দাদু হাঁকলেন, "সরোজ, সরোজ।"

খরগোশ চারটে ডাক শুনে ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে ভেতরে চলে গেল। সংগে-সংগে বেরিয়ে এলেন ঘোমটা-টানা এক মহিলা।

"সরোজ নেই?"

মহিলা দাদুকে ঘোমটার আড়াল থেকে এক নজর দেখে নিয়ে মৃদু গলায় বললেন, "ভেতরে আসুন। তিনি শুয়ে আছেন।'

"হ্যাঁ, এই তো শুয়ে থাকার সময়। তিনি না শুলে বাড়িটা তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে কী করে?" দাদু গজগজ করতে করতে দাওয়ায় উঠলেন।

"অন্যদিন শুয়ে থাকে না। আজ তিনদিন হল জ্বর হয়েছে।"

"জ্বর? জ্বর হল কেন? খুব কাঁচা আম খেয়েছিল বুঝি?"

"আজ্ঞে না, ম্যালেরিয়া।"

"ম্যালেরিয়া? সে তো পঞ্চাশ বছর দেশছাড়া।"

ভেতর থেকে কাঁপা-কাঁপা গলায় একজন পুরুষ বললেন, "আবার ফিরে এসেছে।"

ঘরে ঢোকার চৌকাঠ এত উঁচু যে, বেড়া টপকে ঢোকার মতো করে ঢুকতে হল। গোড়ালির টিপ-টিপ শব্দ হল। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই চমকে উঠলুম। চারপাশে গাছগাছালি থাকায় ঘরে আলো তেমন আসে না। অন্ধকার-অন্ধকার। দেয়ালের পলস্তারা খসে গিয়ে বিভিন্ন দেশের ম্যাপ তৈরি হয়েছে। জানালার দিকে বিশাল উঁচু একটা বাঘথাবা খাট। সেই খাটে কাঁথা, কম্বল আর লেপের স্তূপ। মাথার দিকে দাড়িগোঁফঅলা একটা মুখ বেরিয়ে আছে। মাঝে মাঝে সারা খাট কেঁপে উঠছে, সঙ্গে হুঁ-হুঁ শব্দ।

দাদু সামনে ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগ দিয়ে ব্যাপারটা কিছুক্ষণ লক্ষ করে বললেন, "ও-রকম করছ কেন?"

"ম্যালেরিয়া করাচ্ছে মুকুজ্যেমশাই, আমি কি আর ইচ্ছে করে করছি? সবে আসছে।"

"কখন যাবে?"

"আজ্ঞে কাঁটায় কাঁটায় বারোটায় আসে, চারটের সময় ছাড়ে।"

"বাবা! এ যে দেখছি সূর্যগ্রহণ। যাক, শুনে বড় আনন্দ হল।"

"কেউ অসুস্থ হলে আনন্দ করতে নেই মুকুজ্যেমশাই। কবি বলেছেন, দু' ফোঁটা চোখের জল রেখো মোর তরে।"

"আনন্দ হবে না পলটু? তুমি বলছ কী? এত বড় একটা সংবাদ। অতীত ফিরে আসছে। ম্যালেরিয়া, শেয়ালের ডাক, সন্ধের অন্ধকার, ঝিঁঝির ঝিঁঝিট রাগিণী, সাপের কামড়, গোরুর-গাড়ি, ঠ্যাঙাড়ে, বগির হাঙ্গামা, জলদস্যু। আহা, সেই মধুর অতীত, সেই রোমান্টিক পাষ্ট আবার ফিরে আসছে। এক পয়সায় ইয়া বড় তালশাঁস সন্দেশ, খাঁটি গাওয়া ঘি, কাটারিভোগ চাল, বালি-বালি নৈনিতাল আলু। সেই সোনার অতীত আবার ফিরে আসছে।"

"ও-সব আর ফিরবে না মুকুজ্যেমশাই। শুধু ম্যালেরিয়াটাই ফিরে আসবে।"

দাদু ভাবে গদগদ হয়ে খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসলেন। আমি অত উঁচুতে উঠতে পারব না। একটা মোড়া ছিল, টেনে নিয়ে বসে পড়লুম। যা হাঁটা হেঁটেছি, আর দাঁড়াতে পারছি না।

দাদু বললেন, "আমি অত সহজে তোমার মতো হতাশ হই না। আশাবাদী মানুষ আমি। একটা বড় জিনিস যখন এসেছে তখন একে একে আবার সবই ফিরে আসবে। ঘাড়ের পেছন দিকে একটা মশা বসেছে মনে হচ্ছে। খোকা, দ্যাখ তো?"

আমি ঠিক শিকারি বেড়ালের মতো চুপি চুপি, কোন শব্দ না করে উঁচু হয়ে দেখলুম। হ্যাঁ, ইয়া বড় কালো মতো একটা মশা প্রাণপণে চেষ্টা করছে দাদুর ধবধবে ঘাড়ে হুল ফোটাতে।

মুগুরভাঁজা ঘাড়। মশাটাকে বেশ চেষ্টা করতে হচ্ছে। মাঝে মাঝে পেছনের পা দুটো উঠে পড়ছে। ফিসফিস করে বললুম, "মারব?"

দাদুও ফিসফিস করে বললেন, "ফটাস করে মার, দেখিস উড়ে পালায় না যেন।"

চড়টা বেশ কায়দা করেই তুলেছিলুম, লাগামাত্তর মরত, হঠাৎ আমার পায়ে এমন মশা কামড়াল, একটু টলে গিয়ে বেসামাল হয়ে গেলুম, আর অমনি মশাটা জানালার দিকে চলে গেল। দাদু বললেন, "অপদার্থ।"

"কী করব? আমার পায়ে এমন কামড় দিলে।"

"আমার ঘাড়ের মশা তোর পায়ে গেল কী করে?

লেপের তলা থেকে মুখ বলে উঠল, "মশা কি একটা মুকুজ্যেমশাই! লক্ষ লক্ষ। ওরে বাবা রে, হুঁ-হুঁ রে, লক্ষ লক্ষ।" সারা শরীর কেঁপে উঠল।

দাদু সেই কাঁপুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, "আহা, তোমার কী ভাগ্য পলটু, এই গরমেও তুমি কেমন শীতে কাঁপছ হুঁ-হুঁ করে। যেন দার্জিলিঙে চলে গেছ।"

"এখানে দুদিন থাকুন, আপনারও সেই ভাগ্য হবে।"

"আমি কি সে বরাত করেছি পলটু! মক্কেল চরিয়ে খেতে হয়। আমি বিছানায় পড়লে মক্কেলরা মরবে। যা একটা কেস পেয়েছি পলটু! পুরঞ্জয় ভার্সাস ধনঞ্জয়। মামা-ভাগনেতে লেগে গেছে। আমি লড়ছি ভাগনের দিকে, সিদ্ধেশ্বর লড়ছে মামার দিকে।"

"কেসটা কী?" পলটুমামা বিছানায় আধশোয়া হয়ে উঠে বসলেন।

দাদু যত কেসের কথা বলেন পলটুমামা ততই বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসেন। শেষে লেপ-কম্বল ফেলে একেবারে খাড়া। দাদু বললেন, "কী হল? তোমার ম্যালেরিয়া? সেরে গেল না কি?"

"আজ্ঞে তাই তো মনে হচ্ছে। আর তো তেমন শীত করছে না।"

"তা হলে কী বুঝলে? ম্যালেরিয়ার বেষ্ট ওষুধ হচ্ছে মক্কেল, মামলা। হোমিওপ্যাথি, বুঝলে পলটু? একে বলে হোমিওপ্যাথি। ম্যালেরিয়াতেও ম, মামলাতেও ম। দুটোই ধরলে ছাড়ে না। সিমিলি সিমিলিবাস। বিষে বিষে বিষক্ষয়। এত করে বললুম মোক্তারিটা পাশ করে নাও। শুনলে না, প্রাইমারি টীচার হতে গেলে। এইবার লিভার-পিলে কোলে নিয়ে দাওয়ায় বসে দিন কাটাও।"

"আর মুকুজ্যেমশাই কপালে যা লেখা আছে তা তো কেউ আর খণ্ডাতে পারবে না।"

দাদু নিজের গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বললেন "অসম্ভব। বসা যায় না হে তোমার ঘরে। কামড়ে ছিঁড়ে দিলে। যাই বাগানটা একবার ঘুরে আসি। খুব আম হয়েছে এবার।"

পলটুমামা আবার শুয়ে পড়লেন। শুয়ে-শুয়ে বললেন, "থাকবে না একটাও। সব পেড়ে নিয়ে যাবে।"

"মামার বাড়ি আর কি! পেড়ে নিয়ে যাবে। পাড়তে দেবে কেন! মেরে ঠাণ্ডা করে দেবে।"

"এখানে মাসখানেক থেকে চেষ্টা করে দেখুন না। হাওয়া ঘুরে গেছে।"

কথাটা দাদুর তেমন পছন্দ হল না। বিশাল বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বললেন, "কাউকেই আর বিশ্বাস করা চলে না। পাছে আম-কাঁঠালে ভাগ বসাই তাই পলটু গান গেয়ে রাখলে। তুই ইট ছুঁড়তে পারিস?"

"খুব পারি দাদু।"

"তাহলে লাগা ওই জোড়া হিমসাগরে।"

দুজনে মিলে ইট ছোঁড়াছুঁড়ি করে অনেক কষ্টে আম দুটো পাড়া গেল। আমের বোঁটা কী ভীষণ শক্ত! দাদুর পকেটে একটা ছুরি ছিল। ছায়ায় বসে গাছপাকা আম খেয়ে আমরা মোহিত

হয়ে গেলুম। দাদু বললেন, “আহা, আমরা যদি হনুমান হতুম রে তাহলে কী সুন্দর ডালে বসে পেট ভরে আম খেতে পারতুম!”

“পলটুমামা আম পাড়াবেন না দাদু?”

“পাড়াবে ঠিকই, তবে আমাদের জন্যে নয়। ওকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। দেখলি না কেমন ম্যালেরিয়ার ছুতো করে কাঁথা-মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তুই একটা কাজ করতে পারবি?”

“কী কাজ দাদু?”

“স্পাইং। ওই বাড়ির কোনও একটা ঘরে আম কাঁঠাল আছে। নিশ্চয়ই আছে। তুই তো ছোট, তুই করবি কী, এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে সেই ঘরটা চট করে দেখে নিবি। তারপর আমি পলটুকে চেপে ধরব।”

“কিন্তু আমাকে যদি ধরে ফেলে?”

“ফেললে ফেলবে। তুই তো শিশু। শিশুতে আর ছাগলে কোনও তফাত নেই।”

“ছাগল বললেন দাদু!”

“আহা ওটা হল উপমা রে হনুমান।”

প্ল্যানমতে আমরা বাড়ি ফিরে এলুম। পলটুমামার তখন জ্বর বেড়েছে। সত্যিই বেড়েছে। পলটুমামার বিধবা বোন লেপ-কম্বল সমেত তাঁকে বিছানায় চেপে ধরে রেখেছেন। পলটুমামার আর কেউ নেই। দাদু বাইরের রকে একটা বেতের চেয়ারে বসলেন। সূর্য পশ্চিমে সরে গিয়ে বারান্দায় ছায়া পড়েছে। আমার নিজেরই কেমন বিশ্রী লাগছে। তখন কেউ এক গেলাস জল পর্যন্ত খেতে বলেনি। বলবে বলেও মনে হচ্ছে না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে দাদুর খুব খিদে পেয়েছে।

গোয়েন্দাগিরিতে বেরিয়ে পড়লুম। এই হল সবচেয়ে ভাল সুযোগ। পাশাপাশি সারি-সারি ঘর। প্রথম ঘরে একটা চৌকি। ময়লা চাদর ঢাকা বিছানা। ভাঙা টেবিল, হাতলভাঙা চেয়ার।

চৌকির তলায় একগাদা মালপত্তর। নাকটা ফোঁস-ফোঁস করে গন্ধ নেবার চেষ্টা করলুম। পাকা আমের গন্ধ চাপা থাকে না, তেমন কোনও সন্দেহজনক গন্ধ নাকে এল না। তবু একবার চৌকির তলায় উঁকি মারলুম। ভাঙা বাক্স, থলেভর্তি তুলো, কাঠকুটো এক চুবড়িটিক, ছোট্ট একটা বেতের ঝুড়িতে হাত-পা ভাঙা কয়েকটা পুতুল, কাঠের গুঁড়ো ভর্তি একটা লাল ন্যাকড়ার হাতি। পুতুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি এমন সময় পেছনে পায়ের শব্দে চমকে উঠলুম। ধরা পড়ে গেছি। সামনে আয়না থাকলে চোরের মুখের ছায়া পড়ত। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। মাসিমা পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন, "কী দেখছ তুমি?"

দুবার ঢোঁক গিলে বললুল, "কার পুতুল মাসিমা?"

"আমার ছেলের। সে তো চলে গেছে। আমি মাঝরাতে এইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করি। সে এখন কোথায় কার ঘরে কার কোল আলো করে বসে আছে কে জানে। ওই দ্যাখো তার ছবি।"

উঠে দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো একটা শিশুর ছবি দেখতে পেলুম। এক মাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। কালো মার্বেলের মতো ঝকঝকে চোখ। ফোকলা মুখে খলখলে হাসি। মাসিমা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, "আমরা বড় গরিব। আমাদের দিন চলে না। ও চলে গিয়ে ভালই করেছে। রাজপুত্তুর ঘুঁটে কুড়ুনির ঘরে থাকবে কেন বাবা।"

আবার চোখ মুছলেন। আমার চোখেও জল এসে গেছে। আমার মাকেও আমার দাদার জন্যে কাঁদতে দেখেছি এইভাবে।

মাসিমা বললেন, "তুমি বাড়িটা দেখবে খোকা? চলো তোমাকে দেখাই।"

আমরা আর একটা ঘরে ঢুকলুম। সে-ঘরে একটা সেলাইকল। কলে একটা কাপড় ঝুলছে। মনে হয় কারুর ফ্রক তৈরি হচ্ছে।

"এই ঘরে বসে আমি দিনরাত সেলাই করি। যা দু-চার পয়সা রোজগার হয় তাইতেই দিনকতক সংসার চলে। শীতে সোয়েটার

বোনার কাজ পাই। পুজোয় জামার অর্ডার। সেলাই করে-করে ঘাড় বেঁকে গেল, চোখে চালশে ধরল। ভাইটা মাষ্টারি করে ক-টাকাই বা পায়। পূর্বপুরুষের দেনা শোধ করতেই সব চলে যায়।'

"মাসিমা, আপনাদের বাগানে এত ফল, সেই ফল বেচে···"

হেসে উঠলেন মাসিমা, "তিন পুরুষের বুড়ো গাছ। ফলের চেয়ে পাতাই বেশি বাবা। তার ওপর চুরি। দেখতেই বাগান। আমরা জানি, তোমরা ভাবো সব মেরে দিচ্ছি। মারব কী বাবা, সব মরে এসেছে। একই গাছ বছর-বছর আর কত ফল দেবে। এক চুবড়ি সুপুরি, গোটাকতক আম, বরাতে থাকলে এক কাঁদি কলা। এই হল তোমার বাগানের ফল। তোমার দাদু হয়তো বিশ্বাস করবেন না। মাঝে-মধ্যে চিঠি লিখে হিসেব চান। সেবার লিখলেন, রক্ষকই ভক্ষক। বড় মনে লেগেছে বাবা।"

মাসিমা আবার চোখ মুছলেন। মুখটা কেমন যেন ভারী-ভারী হয়ে উঠেছে। এক সময় মনে হয় খুব ফর্সা রঙ ছিল। এখন যেন কেমন পোড়া-পোড়া হয়ে গেছে। মাসিমা হঠাৎ হেসে ফেললেন, "তোমাকে কত দুঃখের কথা বলে ফেললুম, তাই না? দুঃখী মানুষের এই বড় দোষ। যাকেই সামনে পাবে তার কাছেই কাঁদুনি গাইবে। যাও তুমি দাদুর কাছে বোসো। আমি চায়ের জল বসাই। মুকুজ্যে-মশাই অনেকক্ষণ এসেছেন। ভাবছেন এরা কী-রকম ছোটলোক।"

দাদু বেতের চেয়ারে হাতলে তবলা বাজাচ্ছিলেন। আমাকে ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বুঝলে?"

আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলুম, "সঙ্গে কত টাকা এনেছেন?"

অবাক হলেন, "কেন বলো তো?"

"সে আমি বলতে পারব না দাদু। এঁদের ভীষণ খারাপ দিন পড়েছে। কোথাও কিছু নেই। এমন কি দুবেলা খাবার মতোও কিছু নেই। হাঁড়ি চড়ে না। সেলাই করে-করে মাসিমার

ঘাড় বেঁকে গেছে। এত অভাব, না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না।"

"রাসকেল পলটু।" দাদু চিৎকার করে উঠলেন।

পলটুমামা বিছানা থেকে উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে মুকুজ্যেমশাই।"

দাদু ধমকে উঠলেন, "তোমার লজ্জা করে না! জোয়ান মানুষ ম্যালেরিয়ার ছুঁতো করে বিছানায় পড়ে আছ রাসকেল। বেরিয়ে এসো! মাত্র দুটো পেট চালাবার ক্ষমতা নেই, তুমি গোঁফদাঁড়ি রেখে ম্যালেরিয়া-বাবাজী সেজেছ। এটা হিমালয় নয়, বলাগড়।"

মাসিমা সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। হাতে একথালা আম। দাদু বললেন, "গেট আউট।"

"গাছের আম। গোটাকতক কুড়িয়ে রেখেছিলুম। খেয়ে দেখুন মুকুজ্যেমশাই।"

"গেট আউট।"

মাসিমা অবাক হয়ে গেছেন, "হঠাৎ কী হল মুকুজ্যেমশাই?"

"তোমাদের অহঙ্কার। দারিদ্র্যের অহঙ্কার। তখনও দেখেছি, আজও দেখলুম। তোমার ছেলের অসুখ, একবার জানালে না পর্যন্ত, বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। খুব...খুব অহঙ্কার বাড়ল। গেট আউট। তোমাদের মুখদর্শন করাও পাপ।" বেতের চেয়ার ছেড়ে দাদু উঠে পড়লেন। সাংঘাতিক রেগে গেছেন, "তোমার লজ্জা করে না, আইড্‌ল-ম্যালেরিয়ালিস্ট। এক পয়সা রোজগার করতে পারো না, তোমরা আমাকে আম দেখাতে এসেছ।"

দাদু বাঘের মতো পায়চারি করছেন। মাসিমা থালা হাতে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চোখ দুটো আবার ছলছল্ হয়ে উঠেছে। দাদু বললেন, "ও-সব চালাকি চলবে না উমা। চালাকির দ্বারা কোনও মহৎ কর্ম হয় না। কর্ম করতে হবে। খেটে খেতে হবে। ম্যালেরিয়া গায়ে দিয়ে বোনের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়া চলবে না। এই হল আমার রায়।" দরজার দিকে মুখ এগিয়ে

দিয়ে বললেন, "এই হল আমার রায়, বুঝলে ম্যালেরিয়াবাবু ?" মাসিমার দিকে ফিরে বললেন, "পাওয়ার কত ?"

মাসিমা বুঝতে পারেননি।

"চোখের পাওয়ার কত ?"

"দেখাইনি।"

"ও, অন্ধ হবার ইচ্ছে হয়েছে। ভেবেছ অন্ধ হলে অবস্থা ফিরে যাবে শ্যামাসংগীত গেয়ে। তাই না ?"

"আমি তো গান জানি না।"

"অন্ধ হলেই গলা দিয়ে সুরে বেসুরে গান বেরোবে। পতিত পাবন মুকুজ্যের মেয়ে হাটতলায় বসে প্যাঁ-পোঁ করে সিঙ্গল রীডের হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইবে, দোষ কারো নয় গো মা, আমি স্বখ্যাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা। পড়বে, পড়বে, দু-চার পয়সা ভিক্ষে পড়বে।"

দাদু জলস্পর্শ করলেন না। একটা একশো টাকার নোট পলটুমামার বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "তুমি তিন দিনের মধ্যে ম্যালেরিয়া ছাড়িয়ে আমার কাছে আসবে, তারপর তোমার একদিন কি আমার একদিন। হাত-পা-অলা মানুষ খেতে পায় না, আরে ছি ছি, লজ্জার কথা।"

আমরা ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত। মাসিমা কোথা থেকে ইয়া বড় একটা কাঁঠাল নিয়ে এলেন। দাদু আম-কাঁঠালের ভীষণ ভক্ত। পাঁচ পোয়া দুধে আধ সের কাঁঠালের রস দিয়ে ক্ষীর করে প্রায়ই খেয়ে থাকেন। বলেন, সাগর মন্থন করে যে অমৃত উঠেছিল তার ফর্মুলাও ছিল এই রকমই। খেলে যৌবন ফিরে আসে। কাঁঠালের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে খুব বিরক্তির গলায় বললেন, "এটা আবার কী ?"

"আজ্ঞে কাঁঠাল।"

"কাঁঠাল কী হবে ?"

"নিয়ে যাবেন।"

পল্টুমামা ভেতর থেকে চিঁ-চিঁ গলায় বললেন, "উনি কি নিয়ে যেতে পারবেন ?"

ব্যস, আর যায় কোথায়। দাদুর রোক চেপে গেল। চ্যালেঞ্জ।

"নিয়ে যেতে পারব না! বলো কী পল্টু ? বুড়ো হয়ে গেছি নাকি ? আমি তোমাকে কাঁধে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারি। দেখবে পারি কি না ?"

দাদু কাঁঠালটা কাঁধে ফেলে হন্‌হন্‌ করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগলেন। আমি পেছন-পেছন চলেছি প্রায় ছুটে-ছুটে। মাসিমা হেঁকে বললেন, "আবার আসবেন।"

সামনে পাক্কা তিন মাইল পথ, তারপর বাস। দাদু গলগল করে ঘামছেন। অতবড় একটা কাঁঠাল কাঁধে, এই রোদে হাঁটা যায় নাকি! বেলা পড়ে এলেও বেজায় গরম। মেটে পথে ধুলো উড়ছে।

"দাদু, আমাকে দিন। কিছুক্ষণ আমি বৈ।"

"পাগল হয়েছিস! এটার ওজন জানিস ? কাঁঠালের সব ভাল রে, কেবল এর যদি গায়ে গিরগিটির মতো কাঁটা না থাকত। দোষেগুণে মানুষের মতো, দোষেগুণে ফল। কী আর করা যাবে বল। গোলাপের কাঁটা, আর মৌমাছির হুল।"

একটা গাছের ছায়ায় এসে দাদু দাঁড়ালেন। মুখ-চোখ লাল টকটকে। সামনে ধু ধু মাঠ। দূরে-দূরে ছাড়া ছাড়া গ্রাম। কাঁঠালটা পায়ের কাছে নামিয়ে দাদু পকেট থেকে ঝাড়নের মতো একটা রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। হাতের তালুতে বিঁধ-বিঁধ কাঁঠাল-কাঁটার ছাপ পড়েছে।

"এটাকে এইখানেই রেখে যান দাদু। আপনার কষ্ট হচ্ছে। মা ভীষণ রাগ করবে।"

দাদু হা-হা করে অট্টহেসে বললেন, "কাওয়ার্ড, কাওয়ার্ড।

মহাত্মাজী বলেছিলেন, ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। জানিস এর মধ্যে কম-সে-কম আড়াইশো কোয়া আছে। তার মানে আড়াইশো বিচি। মেয়ে আমার কত খুশি হবে জানিস? ডালে দেবে, পুড়িয়ে খাবে। নে চল।"

জয় মা বলে দাদু কাঁঠালটা আবার কাঁধে তুললেন। যেতে-যেতে বললেন, "বাঁক কাঁধে লোকে কলকাতা থেকে তারকেশ্বর যায়। মনে কর আমরাও যাচ্ছি। বল, কাঁঠালবাবা পার করেগা।"

বেশ কিছু দূরে এসে দাদু বসে পড়লেন। কাঁঠাল তো আর তারকনাথ শিব নন যে তিন মাইল পথ পার করে দেবেন। সাহস করে বললুম, "দাদু, মনে হচ্ছে হবে না। একটা কাঁঠালের জন্য মরেঙ্গে হয়ে লাভ কি? আমাদের বাজারে অনেক পাওয়া যাবে।"

"কী বলিস গবেটের মতো, গাছের কাঁঠাল আর বাজারে কাঁঠাল, চাঁদ আর চাঁদমালা এক হল?" দাদু আবার উঠলেন। মাটির রাস্তা শেষ হয়ে পাকা রাস্তা শুরু হয়েছে। দাদুর হাঁটায় আর তেমন গতি নেই। দূরে কিছু দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। আমরা নেচে-নেচে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে এসে হাজির হলুম। দাদু বললেন, "আয়, এখানে বসে লাড্ডু আর জল খাই। তেষ্টা পেয়েছে।"

খাওয়াটা মন্দ হল না; কিন্তু যেই ভাবলুম আবার হাঁটতে হবে, হাত-পা অবশ হয়ে এল। দাদু হঠাৎ বললেন, "কাঁঠালের একজন উত্তরাধিকারী ঠিক কর তো খোকা। এটাকে আর কলকাতা পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। জানিস তো, সব মানুষই চায় যে-মাটিতে জন্মেছে সেই মাটিতেই মরতে। কাঁঠাল বলে কি মানুষ নয়?"

যাক বাবা, দাদুর সুমতি হয়েছে। সামনের পথ দিয়ে একজন মানুষ চলেছেন আপনমনে। চোখে তারের চশমা। কানের কাছে সুতো জড়ানো। গায়ে পাঞ্জাবি। ঘাড়ের কাছে অর্ধচন্দ্র তাপ্পি!

"ওই যে দাদু, উত্তরাধিকারী।"

দাদু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তাঁর সামনে গিয়ে বললেন, "নমস্কার।"

লোকটি হকচকিয়ে গেলেন। বললেন, "নমস্কার।"

"আপনি একটি কাঁঠাল গ্রহণ করলে বাধিত হব।" দাদু বিশুদ্ধ বাংলায় বললেন।

"তার মানে?"

দাদু একটু থতমত হয়ে গেলেন। দেখতে নিরীহ হলেও মেজাজটা তেমন সুবিধের নয়। দাদু আমতা-আমতা করে বললেন, "আপনাকে একটি গাছপাকা কাঁঠাল দান করে ধন্য হতে চাই।"

"আপনি ধন্য হতে চাইলেও আমি ধন্য হবার জন্য কেন সাহায্য করব?"

দাদু বেশ বিব্রত। কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। তবু সাহস করে বললেন, "গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব।"

"গ্রহণও করব না, কৃতার্থও হতে হবে না। আমি অপরীগ্রাহী। আমার তালিমারা পাঞ্জাবি আর ছেঁড়া পাদুকা দেখে আপনি ভেবেছেন আমি ভিক্ষুক! ভুল করেছেন মশাই। জানেন, আমার বড় ছেলে ভিলাইতে কাজ করে, আমার মেজ ছেলে দুর্গাপুরে, ছোট হলদিয়াতে, আপনি এসেছেন আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে? ভেবেছেন কলকাতার বাবুদের আমি চিনি না?"

দাদু কথা শুনে পালিয়ে এলেন। আমার পাশে বসে বললেন, "অত্যন্ত অযোগ্য উত্তরাধিকারী। চল, আমাদের কাঁঠাল আমাদেরই থাক। ওই যেমন বলে নিজের জীবন নিজেকেই বইতে হবে, সেই-রকম নিজের কাঁঠাল নিজেকেই বইতে হবে।"

আবার হণ্টন। পথ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। ওই যে বাসরাস্তা দেখা যাচ্ছে। এখন সেই গানটা গাইতে ইচ্ছে করছে, "পথের ক্লান্তি ভুলে, স্নেহ ভরা কোলে তুলে মা গো, কতদূর আর কতদূর।"

বাস আসছে। চারপাশে বাদুড়ঝোলা মানুষ। কার ক্ষমতা ওঠে। তবু দাদু একবার চেষ্টা করলেন। কন্‌ডাকটার বললে, "একসঙ্গে দুটো হবে না। হয় কাঁঠাল আসুক আপনি থাকুন, নয় আপনি আসুন কাঁঠাল থাকুক। কিংবা বাসের চালে উঠে কাঁঠাল-কোলে বসুন "

বাস চলে গেল। জানা গেল পরের বাস আসবে এক ঘণ্টা পরে। এইবার মনে হল দাদু ভীষণ রেগে গেছেন। কাঁঠালটা পায়ের কাছে পড়ে আছে। দাদু বললেন, "সারাটা জীবন পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে এখন আমার মাথায় কাঁঠাল ভাঙতে এসেছে।"

"কে দাদু?"

"ওই ম্যালেরিয়ালিস্ট পলটু।"

"আপনি বরং কাঁঠালটা এবার বেচে দিন দাদু। দান করলে কেউ যখন নিতে চাইছে না।"

"খদ্দের ভাখ।"

"আবার আমার ওপর ভার দিচ্ছেন দাদু। উত্তরাধিকারী ঠিক করতে গিয়ে ফেল করলুম।"

"তাতে কী হয়েছে? রবার্ট ব্রুস বলেছেন, ট্রাই অ্যাণ্ড ট্রাই, নেপোলিয়ান, রোমেল, নেলসন, সবলেই জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন, পারব না বলে কিছু নেই, হারব না কখনই।"

"তা হলে দাদু, ওই যে এক ভদ্রলোক আসছেন, মনে হয় শহরের মানুষ, ওই যে নীল শার্ট, কালো প্যান্ট।"

দাদু যথারীতি সবিনয়ে বললেন, "আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

"বলুন।"

"একটা গাছপাকা কাঁঠাল কিনবেন?"

ভদ্রলোক হকচকিয়ে গেলেন। "কাঁঠাল কিনব কেন? আপনি কি পাগল?"

"আজ্ঞে না, সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষ, কলকাতার কোর্টে ওকালতি করি।"

"তাই বলুন। আহা, আইন-ব্যবসার এই হাল হয়েছে। কলকাতার উকিল বলাগড়ে এসে কাঁঠাল বেচছেন? মাথায় কাঁঠাল ভাঙার মক্কেল জুটল না বলে এখানে তেড়ে এলেন কাঁঠাল বেচতে?"

দাদু প্রতিবাদ করে বললেন, "আপনি ভুল করছেন। আমি প্রতিষ্ঠিত উকিল। কাঁঠাল বেচতে আসিনি।"

"বুঝেছি, বুঝেছি। উকিলদের শেষকালটায় এই রকম স্মৃতিভ্রংশ রোগ হয়। এই বলছেন, এই ভুলছেন। আমার মেসোমশাইয়ের হয়েছিল। এ ওকালতি জীবনে ছটা না সাতটা এফিডেবিটের কেস করেছিলেন। বাস আর মক্কেল জোটেনি। বটতলায় বসে মাছি তাড়াতেন। শেষে হাতে আর এক উকিলের কামড় খেয়ে জলাতঙ্ক রোগে মারা গেলেন। একই মক্কেল ধরে ছ সাতজনে টানাটানি করছিলেন। হঠাৎ একজন ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।"

"ননসেন্‌স!"

"আপনি একটা লুন্যাটিক। ক্যারিং কোল টু নিউক্যাস্‌ল। কাঁঠালের দেশে কাঁঠাল বেচতে এয়েছেন। আমার নিজেরই কাঁঠাল-বাগান। শুনুন, ভাল কথা বলছি, জীবনে একবার ভুল পথে গিয়ে পস্তাচ্ছেন। উকিল হয়ে মরেছেন। আবার একটা ভুল পথ ধরেছেন, কাঁঠালের ব্যবসা। তার চেয়ে এখান থেকে কলা কিনে কলকাতার অফিসপাড়ায় বসুন, শেষ বয়সে অন্তত দুটো পয়সার মুখ দেখতে পারবেন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ ফর ইওর অ্যাডভাইস। আপনি যেতে পারেন।"

"বললেও যাব, না বললেও যাব। তবে শুনে রাখুন, বিপদে পড়লে মানুষের মতিভ্রম হয়। তখন ভাল কথাও খারাপ লাগে। খেঁকি স্বভাব হয়ে যায়।"

ভদ্রলোক মুচকি হেসে চলে গেলেন। দাদু বললেন, "পাজি।"

হন্‌হন্‌ করে ফিরে এসে কাঁঠালটা কাঁধে তুলে নিলেন, "আয়, চলে আয়।"

বাস স্টপ ছেড়ে দাদু আবার কোথায় চললেন ? মাঠের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। হাঁটতে হাঁটতে আমরা একটা নির্জন জায়গায় এসে পড়লুম। বহুদূরে বাসরাস্তা। গ্রাম। লোকজন নেই। একটা পুকুর। জলে লাল আকাশ ভাসছে।

"নে, এখানটায় বোস।"

বসে পড়লুম। দাদু বেশ জুতসই হয়ে বসে কাঁঠালটা ভেঙে ফেললেন।

"শোন, এতক্ষণে বুদ্ধিটা এল। কাঁধে করে না নিয়ে যেতে পারি, পেটে করে তো সহজে নিয়ে যেতে পারব। আঃ, কোয়া দেখেছিস ? আয় শুরু করা যাক। চালা চালা। এই নে, রুমালে বিচিগুলো জমা। বাড়ি নিয়ে যেতে হবে।"

কাঁঠাল খেতে খেতে সন্ধে হয়ে গেল। শেয়াল ডাকল হুক্কাহুয়া। দাদু বললেন, "পালাই চ, ব্যাটারা গন্ধ পেয়েছে। আধখানা ওদের জন্যে রইল।"

রাত দশটার সময়, কাঁঠালবিচি হাতে আমরা বলাগড় জয় করে বাড়ি ফিরে এলুম।

দাদুর দাঁদানো দাঁত

দাদু যখন সকালে বেড়াতে বেরোবেন তখন হাতে থাকবে পাকানো-পাকানো বেতের লাঠি। সে লাঠির কী বাহার। বাবা এনে দিয়েছিলেন মুসৌরি থেকে। আর যখন কোনো কাজে বেরোবেন তখন আর লাঠি নয়, তখন আমি তাঁর পাশে এক চলন্ত লাঠি। দাদুর ভারী ডানহাত আমার কাঁধে। আমার উচ্চতাও ওই লাঠিটার মতোই। দাদুর হাতে আমার কাঁধটা বেশ ফিট করে যায়। চলন্ত লাঠির গতি যখন বেড়ে যেতে চায় দাদুর হাত তখন কাঁধ খামচে ধরে পাশাপাশি টেনে আনে। আমার চেহারাটাও ঠিক লাঠির মতো। মা বলেন, খ্যাংরা কাঠির মাথায় আলুর দম। হবে না! অত খেলে কারুর চেহারা ভাল হয়। অষ্টপ্রহর মুখ চলছে। দুঃখ হয় কথা শুনে কিছু বলতে পারি না। দেওকীনন্দন বলেছে, ঘাবড়াও মাত। চানা চালাও, বৈঠকি লাগাও, পবননন্দন বন যাও। ঘাড় তো যায়গা লোটা কা মাফিক। হাত হো যায়গা ডাম্বেল কা মাফিক। সমঝা ছোটা বাবু?

এখন আমরা চলেছি দাঁতের ডাক্তারের কাছে। আমাদের শহরে যেখানে বাজার সেখানে একটা জুতোর দোকানের পাশে ছোটমতো ডাক্তারখানা। ভাঁজ করা দরজার একদিকে একটা কাচের কেসে দুপাটি দাঁত সব সময় আমার স্কুলের পণ্ডিতমশাইয়ের মতো শীত নেই গ্রীষ্ম নেই খিঁচিয়েই আছে। আর একপাশের দরজায় মাফলার জড়ানো গালফুলো এক মুখের ছবি। যন্ত্রণাকাতর। তলায় গোটা-গোটা অক্ষরে লেখা, দন্তশূল, তিন শূলের এক শূল। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা না দিলে মরতে হয়। সামনের দিকে গালফুলোদের বসার জন্যে দুপাশে দুটো বেন্চ। ভেতর দিকে পর্দার আড়ালে একটা উঁচু চেয়ার। সেইখানেই ঠেসে ধরে সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত

তোলা হয়। কোনের দিকে জলের কল, বেসিন। আমি দাদুর সঙ্গে চৌষট্টিবার এই দোকানে এসেছি। কোথায় কী আছে সব মুখস্থ।

দাদুর ওপরের পাটিতে ষোলো, নিচের পাটিতে ষোলোটা দাঁত ছিল। সবই এই ডাক্তারবাবু একটা-একটা করে টেনে-টেনে তুলেছেন। বত্রিশ মাস সময় লেগেছে। দাদুর সে কী গর্ব। সকলের নাকি বত্রিশটা দাঁত থাকে না। ঠিক ঠিক ওপরে ষোলোটা আর নিচে ষোলোটা, দুই মিলিয়ে ঠিক বত্রিশ দাঁত, লম্বা খাড়া টানা-টানা চোখ, মহাপুরুষের লক্ষণ। দাদুর সব-কটা লক্ষণই স্পষ্ট। তবে একটাই যা দুঃখ, দাদুর সব-কটা দাঁতই এই সিধুডাক্তারের সাঁড়াশি শেষ করে দিয়েছে। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাদু বোঝেননি। মা আমাকে বকেন। দাদুকে তো বকতে পারেন না। দাদু যে মায়ের বাবা। অত মিষ্টি খেলে কারুর দাঁত ভাল থাকে। দাদু আবার বাবাকে উপদেশ দেন, মিষ্টি খেয়েই বেশ ভাল করে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে ফেলবে, দেখবে দাঁত ঠিক থাকবে, একেবারে ছবির মতো। আশি বছরেও বসে বসে ছোলাভাজা চিবোচ্ছ। কচি কলাপাতা থেকে চেটে চেটে তেঁতুলের আচার খাচ্ছ টকাস্-টকাস্ শব্দ করে। দাদু যখন এই সব বলেন, আমি মনে মনে হাসি। যিনি বলছেন তিনি নিজেই এখন ফোক্‌লা।

সন্ধে-সন্ধে হয়ে এসেছে। সিধুডাক্তার লিক্‌লিকে একটা ধূপ জ্বেলে দেয়ালে টাঙানো তাঁর গুরুদেবের ছবির সামনে কপালে দু'হাত ঠেকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মাথার চুল ছুঁয়ে পিন্‌পিন্ করে ধূপের ধোঁয়া উঠছে। গুরুদেবকে মোটেই ভাল দেখতে নয়। দাঁতের ডাক্তারের গুরুদেব বলেই বোধ হয় দাঁত দুটো অত বড় বড়। ছবির দিকে তাকালেই আগে চোখ পড়ে যায় দাঁতে, তারপর গলার রুদ্রাক্ষের মালায়, তারপরই ভুঁড়িতে। কাউকে বলিনি, ছবিটা দেখলেই আমার মনে হয়, একেই বলে টাস্ক ফোর্স। টাস্ক হল হাতির দাঁত, সেইটাই ফোর্সে বেরিয়ে এসেছে সামনে। নিশ্চয়ই

দেহ রেখেছেন। মহাপুরুষদের মৃত্যুকে বলে মহাপ্রয়াণ। আহা দাঁত দুটো ডাক্তারবাবু যদি খুলে নিয়ে ওই শো-কেসে রাখতেন, যেখানে দুপাটি দাঁত মুখ ছাড়াই পড়ে পড়ে হি হি করে ভূতের হাসি হাসছে। গুরুদেবের ছবির মাথার ওপর কাঠের ব্র্যাকেটে একটি মাটির গণেশ। ভারী ভাল মানিয়েছে। না বাবা, এসব ভাবব না। ওরা যেখানেই থাকুন যদি মনের কথা জেনে ফেলেন নির্ঘাত অঙ্কে ফেল করিয়ে দেবেন।

আমি হুড়মুড় করে দোকানে উঠতে যাচ্ছিলাম। দাদু টেনে ধরলেন, "দেখছ না পুজো হচ্ছে! হুড়মুড় করে ঢুকলেই হল। একাগ্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।"

দাদুর পাশেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরেই সিধুডাক্তার ওই রকম কপালে ধূপসমেত হাত ঠেকানো অবস্থাতেই আমাদের দিকে ফিরলেন। চোখ আধবোজা! ঠোঁট নড়ছে বিড়-বিড় করে। সেই ঠোঁটে আমাদের দেখে একটু হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে গেল। আমরা যে দিকে দাঁড়িয়ে আছি সেটা পশ্চিম। সূর্য ওই দিকে ডুবে গেছে অনেক আগে। উনি ওই দিকেই নমস্কার জানাচ্ছেন। ঘুরে গেলেন দক্ষিণে। দক্ষিণ থেকে পূবে। পূবেই সেই দাঁততোলার বিদ্‌ঘুটে চেয়ার। ওই দিকে একটু বেশিক্ষণ নমস্কার হল। ও দিকে সূর্য ওঠে। তা ছাড়া ওই দিকেই তো দাঁত তোলা হয়। দেয়ালে বড় বড় করে লেখা, ফাইভ রূপিজ এ টুথ, টেন রূপিজ এ ফলস টুথ। নিজের দাঁত ফেলতেও টাকা, নকল দাঁত লাগাতেও টাকা। তবে আসলের চেয়ে নকলের দাম পাঁচ টাকা বেশি।

ডাক্তারবাবু হাসি-হাসি মুখে বললেন, "আরে মুকুজ্যেমশাই, আসুন, আসুন।"

আমরা ভেতরে ঢুকে পাশাপাশি বেন্‌চিতে বসলুম। দাদু বললেন, "তোমার পিতৃভক্তি দেখে মুগ্ধ হলুম!"

ঘাড় কাত করে ডাক্তারবাবু বললেন, "আজ্ঞে ওই জোরেই তো করে খাচ্ছি। ঘুষি মেরেও তো দাঁত ফেলা যায়, কিন্তু এমন খুস করে দাঁত ফেলতে কটা লোক পারে। ওই তো বিলেতফেরত জোয়ারদার। টেন রূপিজ এ টুথ। এমন হ্যাঁচকা টান মারে চোয়াল উপড়ে চলে আসে। এক দাঁত তুলতে আর-এক দাঁত তুলে ফেলে।"

"সে যদি বলো, আমার বেলাতেও তোমার হাতে একবার সেই কেস হয়েছে।"

"আজ্ঞে না মুকুজ্যেমশাই, ওটা আমি ইচ্ছে করে করেছিলুম। আমার চয়েস। দুপাটি দাঁতই তো আমার হাতে ছিল। সব-কটাই তোলার কেস, আগে আর পরে।"

"ও যতই বলো তুমি, মানব না, আমি উকিল মানুষ। ও তোমাদের আদত। দাঁত বুঝতে পার না। আমরাও যে কিছু বুঝতে পারব, সে উপায়ও রাখ না। ইনজেকশান দিয়ে অসাড় করে দাও। আর দাঁত তোলার সময় তোমাদের চোখ মুখের চেহারাও অসুরের মতো হয়ে যায়।"

"হেঁ হেঁ, কী যে বলেন।"

"হেঁ হেঁ নয়, চিরকাল তাই হয়ে আসছে। চোখেও ওই এক কিত্তি। ডান চোখে ছানি বাঁ চোখ কেটে ব্লাইণ্ড করে দিলে। এরকম কেস আখচার হচ্ছে, যাক ওসব কথা। আমি এসে গেছি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বসুন। আপনার দাঁত রেডি।"

ডাক্তারবাবু ভেতর থেকে নীল ভেলভেটে মোড়া দুপাটি দাঁত নিয়ে এলেন। টেবিলে খুলে রাখতেই মনে হল মুখ ছাড়াই দাদু হেসে উঠলেন। জিনিসটা দেখতে আসল দাঁতের মতো অমন ধবধবে সাদা নয়, একটু হলদেটে। নকল দাঁতের সঙ্গে নকল মাড়ি লাগানো। ভেলভেট দিয়ে ডাক্তারবাবু দাঁত দু'পাটি দাদুর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, "ফাসক্লাশ।"

দাদু ফোঁস করে উঠলেন, "তুমি ফাসক্লাশ বললেই তো আর ফাসক্লাশ হবে না, আমাকে পরে দেখতে হবে।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে তো নিশ্চয়, আপনি পরে নিন। পরে দেখে নিন।"

দাদু এতবড় হাঁ করে দাঁত দু'পাটি একে একে পরে ফেললেন। খট্‌খট করে দুবার আওয়াজ হল। থল্‌থলে মাংস ঝোলা ভালমানুষ ভালমানুষ মুখটা কেমন যেন একটুখানি কঠোর কঠোর হয়ে উঠল। দাদু আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী, কেমন বুঝছ?"

প্রত্যেকটা শব্দ উচ্চারণের সময় দাঁতের বাদ্য হল। দাদুর ভুরু কুঁচকে উঠল। অসুবিধে ধরে ফেলেছেন। আমি বললুম, "বেশ দেখাচ্ছে। তবে মুখটা যেন কী রকম বদলে গেল।"

ডাক্তারবাবু বললেন, "বাঃ তা দেখাবে না। যৌবন ফিরে এল যে। গালটাল সব ভরাট হয়ে গেল।"

দাদু বললেন, "সে আমি আয়নায় দেখব; কিন্তু কথা বলতে গেলে দুই রকম দন্তবাদ্য হচ্ছে কেন! মনে হচ্ছে শীতকালে বরফ-জলে চান করে কথা বলছি।"

সত্যিই তাই। কথার পরেও কথা থেকে যাচ্ছে।

"ও মুকুজ্যেমশাই প্রথম প্রথম একটু হবেই। নিজের দাঁত আর পরের দাঁত। তাছাড়া এতদিন মাড়ি খালি পড়ে ছিল, সেখানে হঠাৎ দাঁত এসে গেছে। অ্যাডজাস্ট করে নিতে দু-একদিন লাগবে।"

"আরে, কালই যে আমার বড় আদালতে কেস আছে। ফ্রীডাম অফ স্পীচ না থাকলে বিপক্ষের উকিল তো আমাকে পথে বসিয়ে দেবে।"

"তা হলে কাল না-হয় দাঁত খুলেই সওয়াল করবেন।"

"তুমি বুঝছ না ডাক্তার, ফোক্‌লা মুখে আইনের ভাষা ফসকে যায়, যেমন ধরো জুরিসপ্রুডেন্স, ম্যালাফাইড, লিটিগেশান,

সাবজুডিস, অ্যাবরিভিয়েশান, অ্যাডজোর্নমেণ্ট, অ্যালিমনি, সবই তো দন্তোষ্ঠ্য বর্ণ। দাঁত ছাড়া সওয়ালে কামড় কমে যায়। আদালত তো কামড়াকামড়ির জায়গা। পাকা নয়, ডাঁসা পেয়ারার কামড়। কাল আবার সেশান কোর্টে লড়াই।"

"তা হলে আজ বরং বাড়ি গিয়ে আপনি ঘণ্টা তিনেক অনর্গল কথা বলে যান, যত সব শক্ত শক্ত ল্যাটিন, ফরাসী, গ্রীক আর ইংরেজি শব্দ। বেছে বেছে। তারপর কাপের জলে দাঁত দু'পাটি ভিজিয়ে রেখে শুয়ে পড়বেন।"

"তা পড়ব, তবে কিছু একটু চিবিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে। নতুন দাঁতের স্ট্রেংথ একটু টেস্ট করে দেখব না। যেমন ধরো চাল-ভাজা, ছোলাভাজা।"

"একেবারে অতটা শক্ত জিনিস দিয়ে বউনি করবেন? সেটা ঠিক হবে না। সবই পারবেন, তবে ধীরে ধীরে, সইয়ে সইয়ে। আজ আপনি ভাত বা রুটি খান চিবিয়ে চিবিয়ে, সজনেডাঁটা খান। তারপর ধরুন লেড়ো বিস্কুটে উঠলেন। প্রথম-প্রথম কামড়াবার জন্যে দাঁত একেবারে নিশপিশ করবে। মাড়ি সুড়সুড় করবে। যতই হোক নতুন দাঁত তো। শিশুদেরও নতুন দাঁত ওঠার সময় ওই রকমই হয়। জ্বর হয়, ঘ্যানঘ্যান করে, পেট খারাপ হয়, শক্ত বিস্কুট পেলে কড়মড় করে চিবোয়, আঙুল কামড়ে দেয়।"

"আমারও জ্বর, পেট খারাপ হবে নাকি ডাক্তারবাবু?"

"জ্বর হবে না, তবে পেটটা একটু সামলে। আর একটা সাবধান করে দি, দাঁত দিয়ে কোন কিছু কামড়ে ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করবেন না।"

"যেমন?"

"যেমন ধরুন শাঁকালুর খোলা, কিংবা হাড় থেকে মাংস, আখ। ওই কুকুরে যেমন ছেঁড়াছিঁড়ি করে না, ওই জিনিসটি চলবে না, পাটি থেকে দাঁত খুলে যাবে।"

"তা হলে আর কী দাঁত বাঁধালে তুমি ?"

"আজ্ঞে এ আপনি কী বলছেন। বাঁধানো দাঁত আর নিজস্ব দাঁতে একটু তফাত তো হবেই। নিজস্ব দাঁত এক-একটা মাড়িতে দু ইঞ্চি তিন ইঞ্চি শিকড় চালিয়ে বসে আছে।"

"আচ্ছা ডাক্তার, নিমদাঁতন করা যাবে ?"

"সে কী। দাঁতন কেন করতে যাবেন শুধু শুধু।"

"শুধু শুধু ? নিমদাঁতন শুধু শুধু ? তুমি কী বলছ ডাক্তার ? ডু ইউ নো হোয়াট ইজ নিম।" দাদু ভীষণ চটে উঠলেন। সিধুডাক্তার মিউমিউ করে বললেন, "আজ্ঞে না, আমি সেভাবে বলিনি, তবে এ দাঁতের তো মাজন আলাদা, তাই আর কি।"

"নিম কি শুধু মাজন, নিম হল অ্যান্‌টিসেপটিক, নিম ইজ এ মেডিসিন, পঞ্চবটের এক বট। আমি এই দাঁতেই নিমদাঁতন করব, আই মাস্ট, নিম ইজ মাই হেলথ, ওয়েলথ এণ্ড ফ্রেণ্ড।"

কড়কড়ে তিনশো টাকা গুনে গুনে ডাক্তারের হাতে গুঁজে দিয়ে দাদু আমার হাত ধরে উঠে পড়লেন। টেন রুপিজ এ টুথ হলে তিনশো কুড়ি হবে। কি জানি, পাইকারি দাম বোধ হয় তিনশো।

বাড়ি ফিরে দাঁত পরে দাদু চেয়ারে বসলেন। মা তেল দিয়ে মুড়ি মাখছেন। প্রথমে মুড়ি চিবিয়ে দাঁত পরীক্ষা হবে। দেওকি-নন্দন নারকেল ভাঙছে। দু-এক কুচি নারকেলও পরীক্ষা করবেন। বাবা এর আগে মুখ ভাল করে দেখে রায় দিয়ে গেছেন, ন্যাচারাল টিথে আপনার ফেসকাটিং যেমন ছিল, ফল্‌স টিথে একটু বদলে গেছে। ঠিক সে-রকমটি হল না। সামনের ঠোঁট উঁচু হয়ে আছে। সেই শার্পনেসটা নষ্ট হয়ে গেল।

ওপরের ঠোঁটে হাতের চাপ দিতে দিতে দাদু থেকে থেকেই বলতে লাগলেন, "ও একটু উঁচু আছে তো কী হয়েছে, হাতের চাপে চাপেই ঠিক করে দেব। ওটার জন্যে ভাবি না। ভাবছি খুলে না পড়ে যায়।"

মা মুড়ি দিতে দিতে বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে। একবার হাসুন তো।"

দাদু লাজুক-লাজুক মুখে হাসলেন। মা বললেন, "বাঃ কী সুন্দর হাসি। মুক্তোর মতো সাজানো দাঁতের সারি। আমাদের সকলের যদি এমন হত।"

"আমি খুব তাড়াতাড়ি অমন করে ফেলব মা। সামনের দুটো দাঁতে পোকা ধরিয়ে ফেলেছি।"

"বেশ করেছ। মাথা কিনে নিয়েছ।" মা হাত-পা নেড়ে মুখ ভেংচালেন। দাদুকে বলে গেলেন, "বাবা, কাল থেকে নিমদাঁতন।"

দাদু বসে বসে নতুন দাঁতে মুড়ি পরীক্ষা করতে লাগলেন, সঙ্গে আবার নারকেলকুচি। মনে মনে ভাবলুম, হয়ে গেল, নতুন দাঁতের আজই বারোটা। পরে জানতে পারব, এখন পড়তে বসি।

পরদিন দাদু কোর্ট থেকে ফিরে এলেন। ফর্সা রঙে কালো চক্‌চকে কোট। কেমন মানিয়েছে। বড় আদালতে কেমন লড়ে এলেন কে জানে। দাদুর পাশে থেকে থেকে আইনের ভাষা আমিও কিছু শিখে ফেলেছি। আজ বোধহয় সেই কেসটা ছিল, ফেলারাম ভার্সাস নগেন দাস। একটা নারকেল গাছ নিয়ে দুই মক্কেলে দশ বছর ধরে লড়ে যাচ্ছে। দাদুর মুখ গম্ভীর। বেতের মোড়ায় বসে জুতোর ফিতে খুলছেন নিচু হয়ে। মা সামনে এসে দাঁড়িয়ে ব্যাগটা হাতে তুলে নিতে নিতে বললেন, "কী হল বাবা? এত গম্ভীর?"

দাদু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আর কী হল? এই ত্যাখো। কোটের পকেট থেকে দুপাটি দাঁত বেরোল। এ কী, দাঁত মুখ থেকে পকেটে! দুটো গোল গোল চাকতি বেরোল। "দূর করে ফেলে দিয়ে আয় আঁস্তাকুড়ে।"

মা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সে কী?"

দাদু ফেটে পড়লেন, "এই দাঁতের জন্যে আজ কনটেমপট অফ কোর্ট হয়ে জেলে যেতে হচ্ছিল। নগেন দাসের উকিলকে আমি

একেবারে ঠেসে ধরেছি নারকেলগাছ ফেলারামের দিকে প্রায় এনে ফেলেছি। জজসাহেবকে প্রায় বুঝিয়ে ফেলেছি। মুখ দিয়ে ইংরেজির তুবড়ি ছুটছে। হঠাৎ ওপর পাটির দাঁত ঠকাস করে খুলে পড়ে গেল টেবিলের ওপর, আর এই চাকতির একটা সুদর্শনচক্রের মতো ঘুরতে ঘুরতে সোজা জজসাহেবের কপালে লেগে তাঁর টেবিলের ওপর। হোয়াট ইজ দিস? আমি উত্তর দেবার আগেই উকিল বলে উঠলেন, দ্যাট ইজ ওয়াশার স্যার। জজসাহেব ইংরাজিতে জিজ্ঞেস করলেন কোত্থেকে এল, কে ছুঁড়েছে। তিনি বললেন, ইট কেম ফ্রম হিজ মাউথ। আপনার মুখ এঁটো করে দিয়েছে। আমি তখন আর একপাটি দাঁত নিয়ে টানাটানি করছি। না খুলতে পারলে কথা বলতে পারছি না, ক্ষমা চাইতে পারছি না। কী অপমানজনক ব্যাপার! বিরোধী উকিল বলছেন, ইট ইজ অ্যাজ গুড অ্যাজ স্পিটিং অন ইওর ফেস মিলর্ড। প্রমাণ করতে চায় আমি থুতু দিয়েছি জজসাহেবের গায়ে। কেস ঘুরে কনটেমট অফ কোর্টের দিকে চলে যায়-যায়। তখন ফোকলা মুখে শুরু করলুম। ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করে সেই কেসকে টেনে আনলুম আমার দিকে। তরি ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠল। কী অপমানজনক ব্যাপার বল তো! ফেলে দে, ফেলে দে, ওই দাঁদানো বাঁত।”

দাঁদানো বাঁত? সে আবার কী? উত্তেজনায় বাঁধানো দাঁত বলতে গিয়ে দাদু দাঁদানো বাঁত বলে ফেলেছে। সেই দাঁত রাগ কমে যেতে দাদু পরেছিলেন। অভ্যাসও হয়ে গেল, কিন্তু দাঁদানো বাঁত আর বাঁধানো দাঁত হল না। চিরকালের মতো উলটে রইল। সোজা আর হল না। যখনই বলেন, ওই ব্যাপার আমার দাঁদানো বাঁত।

দাদুর ইঁদুর

"আজ শেক্সপিয়ারস!" বইয়ের র‍্যাক থেকে একটা মোটা বই টেনে নিয়ে দাদু লাফাতে লাগলেন, "কাল সারারাত ধরে ব্যাটারা শেক্সপিয়ার চিবিয়েছে।" বই যেখানে ছিল, সেইখানেই কুচো-কুচো কাগজ পড়ে আছে। দু-একটা টুকরো বইয়ের গায়ে লেগে ঝুলছে। "আর ক্ষমা করা যায় না। নো মারসি। এটা ধেড়েদের কাজ, নেংটিদের দাঁতে শেকসপিয়ার সইবে না।"

বইটার বুকে হাত বুলোতে বুলোতে দাদু চিৎকার করলেন, "দেওকিনন্দন, এ দেওকিনন্দন।"

নীচের বাগানে যেন মেঘ ডেকে উঠল, "জি হাঁ।"

"তুরন্ত আ যাও।"

দাদু ডেকচেয়ারে বসলেন। চোখমুখ খুবই ভীতিপ্রদ। "বুঝলে, পরশু মেটিরিয়ামেডিকা, তার আগের দিন রবীন্দ্র রচনাবলী, আজ শেকসপিয়ার। খিদে আর হজমশক্তি, দুটোই ক্রমশ বাড়ছে। মেটিরিয়ামেডিকায় ওষুধ আছে। নাকসভমিকার পাতা খেয়ে ব্যাটারা আগে খিদে বাড়িয়েছে।"

"ওষুধের নাম লেখা পাতা খেলেও ওষুধের কাজ হয় দাদু?"

"হবে না? সেই ঘটনার কথা তোমাদের মনে নেই? উত্তাল নদী পেরোতে হবে। নৌকো নেই। সাঁতার জানা নেই। শিষ্যের হাতে গুরু একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললেন, এইটা মুঠোয় ধরে হেঁটে পার হয়ে যাও। শিষ্য হেঁটে নদী পার হচ্ছে। সত্যিই সে ডুবছে না। মাঝ নদী বরাবর এসে তার মনে হল, আচ্ছা দেখি তো কী আছে এতে। খুলে দেখলে, লেখা আছে রাম-নাম। যেই মনে হওয়া রামনামের এত জোর, বাস, ভড়-ভড় করে ডুবে গেল।"

"মনে আছে, বাবা বহুবার আমাকে এই গল্প বলেছেন। তবে রামনামের জোর হিসেবে নয়, শিষ্যের বিশ্বাসের গল্প। গল্পটা শেষ করেন এই বলে—বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহু দূর।"

"সেই বিশ্বাসে আমার কথাটাও তুমি মেনে নাও, তর্ক কোরো না। মেটিরিয়ামেডিকা বুকে চেপে ধরলে খাবি-খাওয়া রোগী বিছানায় উঠে বসে।"

"তা হলে এত মানুষ মারা যায় কেন?"

"বিশ্বাস নেই বলে।"

"তার মানে সেই বিশ্বাস।"

"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। আই হ্যাভ নো টাইম। আমার মন খারাপ। আমার শেকসপিয়ার খেয়ে গেছে।"

"জি হাঁ।" হাঁ হাঁ করে দেওকিনন্দন ঘরে ঢুকল। নীচের বাগানে একা-একা বোধহয় কুস্তি করছিল।

মাথার পেছনে মাটি লেগে আছে। ভোজপুরি গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে আছে। দেওকিনন্দন সামনে থাকলে দাদুও গলাটাকে খুব গম্ভীর মতো করার চেষ্টা করেন। দেওকির আদুরে নাম রেখেছেন দাদু দেবু।

"দেবু, একটা ইঁদুরকল চাই।"

"জি হাঁ। লে আয়েগা। লেকিন জাঁতিকল কি খাঁচাকল?"

"জাঁতি নেহি, জাঁতি নেই। উ বীভৎস হ্যায়। খাঁচা মাঙতা।"

"ঠিক হ্যায় জি, হো যায়েগা। লেকিন লেংটিকে লিয়ে কি ধেড়েকে লিয়ে?"

"ইধার আও।"

দেওকি সামনে ঝুঁকে পড়ল। দাদু বইটার কুরে-কুরে খাওয়া অংশ দেওকির সামনে তুলে ধরলেন।

"এ কিসকা কাম?"

দেওকি ভাল করে দেখে বললে, "ধাড়িয়াকা।"

"তব ধেড়ে কি লিয়ে খাঁচাকল লে আও।"

কল এসে গেছে। দাদুও এসে গেছেন কোর্ট থেকে। রাতের খাওয়াদাওয়া শেষ। দাদুর লাইব্রেরি ঘরে কলের কেরামতি চলেছে। দাদু নির্দেশ দিচ্ছেন। দেওকি করে যাচ্ছে।

"ময়দাকা এতনা ছোটা-ছোটা গোলি বানাও। ময়দা কি খায়েগা ? সন্দেহ হ্যায়। লোভনীয় কুছ চিজ চাহিয়ে।"

আমি মেঝেতে থেবড়ে বসেছিলুম। বললুম "কেক।"

"ওটা তোমার প্রিয়, ইঁদুরের প্রিয় হবে কি ? ক্যেয়া দেবু, প্রিয় হোগা ?"

"লাড্ডু হোগা জি।"

"হাঁ হাঁ, লাড্ডু। লে আও।"

দেওকি সামনের দোকান থেকে এক টাকার লাড্ডু কিনে আনল। প্রথমেই একটা লাড্ডু আমার হাতে দিয়ে দাদু বললেন, "টেস্ট করো।"

মুখে দিয়ে বললুম, "ভেরি টেস্টফুল।"

দেবুকে একটা দিলেন। "ক্যায়সা ?"

"বহত বড়িয়া।"

দাদু একটা খেলেন। "হাঁ, মালুম হোতা হ্যায়, বড়িয়া।"

ঠোঙায় পড়ে আছে আর একটা। দেওকি সেটাকে কলে পুরল। এখন কলটাকে কোথায় রাখা হবে ? ইঁদুরের চোখে পড়া চাই। ইঁদুরের আবার চোখ কি ! সর্বত্র তার চোখ। দেওকির পরামর্শে কলটাকে একটা বইয়ের র‍্যাকের তলায় রাখা হল।

ভীষণ ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। অন্যান্য দিন দাদুই আমাকে টেনে তোলেন। আজ আবার দাদুর কি হল। ঘুম ভেঙেই চোখের সামনে সেই ফর্সা টকটকে মুখ দেখতে না পেলে কেমন যেন লাগে।

দাদুকে খুঁজে পেলুম লাইব্রেরি ঘরে। হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে

আছেন। সামনে ইঁদুরকল। গোঁফঅলা এইটুকু ইঁদুর দাঁড়িয়ে কাঁপছে। আশ্চর্য! কলের ভেতরের লাড্ডুটা সে চেয়েও দেখেনি। দাদুর মুখটা যেন কেমন হয়ে গেছে। দুঃখ-দুঃখ ভাব।

হাঁটুর উপর হাত রেখে শরীরটা সামনের দিকে ঝুলিয়ে ইঁদুরটাকে দেখছিলুম। এইবার থেবড়ে বসে পড়লুম।

"কী সুন্দর দেখতে দাদু।"

"বিউটিফুল।"

"গা-টা দেখেছ? তেল চুকচুকে। চোখ দুটো যেন জ্বলজ্বলে পুঁতির মতো। মুখটা কত বুদ্ধিমান।"

"অসাধারণ। এত কাছে থেকে ইঁদুর আমি কোনোও দিন দেখিনি। বড় আদরের জিনিস হে।"

"কী করবেন?"

"সারারাত বেচারা না-খেয়ে আছে? একটা বিস্কুট আন তো।"

বিস্কুট নিয়ে এলুম। দাদু গুঁড়ো-গুঁড়ো করে কলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। ইঁদুরটা কাঁপতে কাঁপতে কোণের দিকে চলে গেল। বিস্কুট ছুঁলই না। দাদু বললেন, "প্রাণভয়ে ভীত। কেমন বুঝতে পারে দেখেছ? জানে মৃত্যু এগিয়ে আসছে।"

নীচে দেওকির বাজখাই গলা শোনা গেল। দাদু কলটা তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলেন। "দেওকির হাত থেকে একে বাঁচাতে হবে খোকা। দেখলেই মারতে চাইবে। চল, বাগানের এক কোণে ছেড়ে দিয়ে আসি।"

দেওকির চোখে ধুলো দিয়ে আমরা দু'জনে বাগানের পাঁচিলের ধারে এসে কলটা খুলতেই ইঁদুরটা বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে এল এক ডজন কাক।

"তাড়াও, তাড়াও, গেল!" দু'জনে হই-হই করে কাক তাড়াতে লাগলুম! কাকের পেটে যেতে যেতেও ইঁদুরটা একটুর

জন্যে বেঁচে গেল। জল যাবার নর্দমা ধরে সোজা দৌড়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল।

"বাঁচ গিয়া। বাঁচ গিয়া। ঘরের ছেলে ঘরে গিয়া।"

দাদুর ধেই ধেই নৃত্য। আমি দম বন্ধ করে ছিলুম এতক্ষণ। আমিও নাচতে লাগলুম। দেওকি বললে, "হুয়া কেয়া?"

দাদু বিজয়ীর মতো বললেন, "বাঁচ গিয়া, বাঁচ গিয়া।"

"কৌন বাঁচ গিয়া জি?"

"চুহা। চুহা।"

দাদুর সে কী নাচ!

দাদুর দ্বিতীয় ইঁদুর

মাঝরাতে দাদু একবার বাথরুমে গিয়েছিলেন। প্যানে যতটুকু জল জমে থাকে, সেই জলে তিনি যেন সরু একটা মুখ দেখতে পেলেন। জিনিসটা কী, ঘুম-চোখে ঠিক বুঝতেও পারছেন না। চোখে চশমা নেই যে, ভাল করে দেখবেন। চশমা ছাড়া আজ-কাল কাছের জিনিস আর দেখাই যায় না। পুরো শরীরটা দেখা যাচ্ছে না। মুখটাই কেবল উঁচিয়ে আছে জলের ওপর। আপ্রাণ চেষ্টা করছে জল ছেড়ে উঠে আসার।

দাদু ভাবলেন, কী রে বাবা! একবার জগদানন্দের বালিগঞ্জের বাড়িতে দোতলার বাথরুমের প্যান থেকে গোখরো সাপ ফোঁস করে উঠেছিল। জগদানন্দ ভীতু মানুষ। ভয়ে শাওয়ারের ডাণ্ডা ধরে পাক্কা পনেরো মিনিট ঝুলে ছিল। অবশ্য জগদানন্দ মনে করেছিল ঝুলে আছে! আসলে কিন্তু তা নয়। মাটিতেই তার পা দুটো ছিল। দেহের ভারে পাইপ বেঁকে ধনুকের মতো নীচে নেমে এসেছিল। সাপ বিশেষ করে গোখরোর মতো রাজা-সাপ ভীতুদের ছোবল মারে না। একপাশে গোল হয়ে বসে জগদানন্দের নিশ্বাসের ফোঁসফোঁসানি শুনছিল। সাপ যেন কী একটা পারে না। হয় শুনতে, না হয় দেখতে। সে যাই হোক, জগদানন্দকে বাথরুম থেকে কিছুতেই বেরোতে না দেখে সকলের সন্দেহ হল, হার্ট অ্যাটাক নয় তো? বেশির ভাগ হার্ট অ্যাটাকই বাথরুমে হয়। দরজাও ভাঙা যাচ্ছে না, জগদানন্দ বাঁকা পাইপ ধরে দরজা ব্লক করে বসে আছে। বাইরে চেঁচামেচি শুনে অতি কষ্টে বললে, "বেঁচে আছি। কতক্ষণ থাকব জানি না। সাপ।" বাইরে থেকে সাহসীরা বললে, "সাপ তো কী হয়েছে, বেরিয়ে আসুন।" জগদানন্দ বেরোবে কী করে? বেরোবার পথ তো

নিজেই বন্ধ করে বসে আছে। বাথরুমের কোণ থেকে দরজার মাথার ওপর দিয়ে শাওয়ারের পাইপ ছিল। সেই পাইপ এখন বেঁকে নীচে নেমে এসেছে। দরজা কোনও রকমে একটু খুলতে পারে। সে ফাঁক দিয়ে ভুঁড়ি গলবে না।

সেই জগদানন্দ আর বাথরুমে সাপের কথা ভেবে দাদু প্রথমটায় খুব ভয় পেয়েছিলেন। তারপর ওকালতি বুদ্ধি খেলিয়ে বুঝতে পারলে, ওটা সাপ নয়। সাপের সরু সরু গোঁফ থাকে না। তাহলে কী? সেপটিক ট্যাঙ্কে পোকা হয়। লাখ পোকা। সেই পোকা নয় তো? সর্বনাশ! লাখে লাখে সেই পোকা তেড়ে-মেরে বেরিয়ে আসতে চাইছে নাকি? আঁতকে উঠলেন। আর একবার ভাল করে ঝুঁকে দেখতেই মনে হল, চিনি গো চিনি, তুমি নেংটি ইঁদুর। ভিজে বেড়ালের মতো চেহারা হয়েছে মানিক। মরতে ওখানে গিয়ে পড়লে কী করে? বেশ তো ছিলে আমার বইয়ের র‍্যাকে। যেখানে গিয়ে পড়েছ, সেখান থেকে তো আর উঠতে হবে না।

দাদু এক বালতি জল নিয়ে হুড়-হুড় করে প্যানে ঢেলে দিলেন। চোখ বুজে প্রার্থনা করলেন, আমার মূল্যবান বই সমূহ কেটে কুঁচি-কাটা করলেও ঈশ্বর নির্বোধ প্রাণীর আত্মার সদ্‌গতি করে দাও। আসচে বার ও যেন পণ্ডিত হয়ে জন্মায়। বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দাদু বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। এ আমি কী করে ফেললুম? আমার কী দরকার ছিল এক বালতি জল হুড়-হুড় করে বাথ-রুমে ঢালার। পরোক্ষে আমিই হয়ে গেলুম ওই প্রাণীটির মৃত্যুর কারণ। একটা জীবন দিতে পারি না, একটা জীবন নিয়ে নিলুম। বিছানায় উঠে বসে আবার প্রার্থনা করলেন, "ঈশ্বর, এই নির্বোধ বৃদ্ধকে ক্ষমা করো প্রভু! ঝোঁকের বশে জল ঢেলে ফেলেছি। ও কি আর ওই গাড্ডা থেকে উঠতে পারত প্রভু? পারত না। তাই আমি জল দিয়ে ঢেইয়ে দিয়েছি। ওই অপবিত্র শরীরে বেঁচে

থাকার চেয়ে মৃত্যুই কি ভাল নয়? আমি নিজে যদি কখনও ম্যানহোলে পড়ে যাই, কথা দিচ্ছি আমি বাঁচতে চাইব না। দমকলের লোককে গর্ত থেকে হেঁকে বলব, হোস দিয়ে আমাকে পদ্মার পাড়ে পাঠিয়ে দাও। সত্যি বলছি প্রভু। মিথ্যে নয়। তুমি আমাকে একবার ফেলেই দেখো।"

এত করেও দাদু শান্তি পেলেন না।। ইশ, জলটা না ঢাললেই হত। আবার উঠলেন। বাথরুমে গিয়ে একবার দেখে আসি। মুখটা বেরিয়ে আছে না কি! বেরিয়ে থাকলে আর জল ঢালব না। ওর নিজের বরাতের ওপরেই ছেড়ে দোব। নাঃ, সে বরাত করিনি আমি। কোথায় কী? প্যানের গর্তে পরিষ্কার টলটলে জল। সেই ছুঁচলো মুখ অদৃশ্য। খুনের দায়েই পড়তে হল। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের আদালতে বিচার হবে। এখানকার আদালতে আমি মানুষের বিচার করি। সেখানকার আদালতে আমার বিচার হবে। বেলিফ হেঁকে বলবে, আসামি হাজির।

বিষণ্ণ মনে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন। অনুশোচনায় ঘুম এসে গেল। নাক ডেকে উঠল ফুড়ুত ফুড়ুত। এদিকে তলিয়ে যাওয়া ইঁদুর আবার ভেসে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা করে উঠে এল ওপরে। অদম্য ইচ্ছা-শক্তি, বাঁচতে আমাকে হবেই। বুড়োর লাইব্রেরিতে এখন হাজারখানেক বই। একেবারে টাটকা। দাঁত পড়েনি একবারও। ওই বইয়ের একটা পাতায় লেখা আছে, আয়ু অল্প, বহু বিঘ্ন, অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার, হাঁসের মতো জল থেকে দুধটুকু টেনে নিতে হবে। আমি ইঁদুর। আমার আয়ু ওদের চেয়ে আরো কম। আমার শত্রু অনেক। বেড়াল, কাক, পেঁচা, সাপ, ইঁদুরকল। কটা ইঁদুর আর স্বাভাবিকভাবে মরে! সবাই তো অপঘাতে শেষ হয়ে যায়। এই তো আমিই! এখুনি মরতে মরতে বেঁচে এলুম আমাদের ভগবানের জোরে।

ইঁদুরটা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সেই রাত বারোটা থেকে

ক্রমান্বয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। এখন প্রায় তিনটে। মানুষ হলে রেকর্ড করেছি, রেকর্ড করেছি, বলে গলায় পদক-টদক ঝুলিয়ে বসে থাকত। মরতে মরতে বেঁচে ফিরে আসার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী লিখে ফেলত। সিনেমা হত। হীরো বনে যেত। ইঁদুরের সংবাদ-পত্রও নেই, সাংবাদিকও নেই। একমাত্র উল্লেখ আছে সেই কবির লেখায়ঃ উই আর ইঁদুরের দেখ ব্যবহার।

ইঁদুরও ক্লান্ত হয়, ইঁদুরেরও ঘুম পায়। এখন একটু বিশ্রাম দরকার ভেবে বাথরুমের ভেতরেই ইঁদুরটা একটা শান্তির জায়গা খুঁজতে লাগল। ইঁদুর বলে কি মানুষ নয়? দাদু যে বালতি থেকে জল ঢেলেছিলেন, কলের তলায় সেই বালতিটা ইতিমধ্যে শুকিয়ে এসেছে। মানুষেরই মাথামোটা হয়, ইঁদুর বুদ্ধিমান হলেও কোনও কোনও ইঁদুর বেশ গবেট। একগুঁয়ে। গণ্ডার না হয়ে ইঁদুর হলে যা হয়। এই ইঁদুরটাও সেই রকম। ভেজা ইঁদুরও লাফাতে পারে। সেটা সহজেই বোঝা গেল। ইঁদুরটাও বুঝতে পারল। যখন সে তিড়িং করে লাফ মেরে ওই খালি বালতিটায় গিয়ে পড়ল। মূর্খ জানে না, বালতি বালতিই। বালতিটা খাট নয়। তার ওপর মাথার সামনেই কল। সেই কল আবার খোলা। খোলাই থাকে। ভোর ছ'টার জল এলে কেউ উঠুক না উঠুক বালতি ভরে থাকবে। শিয়রে শমন রেখে মানুষ ঘুমোতে না পারলেও ইঁদুর ঘুমোতে পারে। 'বাঃ কি সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা প্লাস্টিকের বাড়ি' বলে ইঁদুরটা এক পাশে শুয়ে পড়ল। মাথার ওপর বাথরুমের গোল আকাশ। আহা। ইঁদুরটার তখনও একটা সন্দেহ ছিল, ভিজে ইঁদুর কি কিছু কাটতে পারে। তা না হলে আর একটু লাফিয়ে বেসিনে উঠলে দাদুর পা পরিষ্কার করার স্পঞ্জটা পেত, একটা ছোবড়াও ছিল।

ইঁদুর ঘুমুলে মানুষের মতই অসহায়। শেষ রাতে মানুষ গভীর ঘুমোয়, ইঁদুরও তাই। ছ'টার আগে ঘুম থেকে উঠলে ওই অবস্থা

হত না ঠিক ছ'টার তেড়ে জল এল। ধোঁয়ার মতো। ইঁদুর নায়েগ্রাপ্রপাত দাঁতে কেটেছে হয়তো! তাতে তো আর ঠিক ধারণা হয় না জিনিসটা কী! পিরামিডও কাগজের মতো খেতে, নায়েগ্রাপ্রপাতও কাগজের মতো। তফাত, কোনোটা আর্ট প্রিন্ট, কোনোটা হোয়াইট প্রিন্ট। এখন বুঝল নায়েগ্রা কাকে বলে। মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়ল। একেই বলে ক্লাউড বার্স্ট। ছ' লিটার বন্যা। বালতির মাপ ছ' লিটার। ছ' লিটার জলে ইঁদুরের আবার হাবুডুবু। যেখানে জল পড়ছে সেখানে ঘূর্ণি। সেই আকর্ষণে বালতির কানা থেকে থাবা ছেড়ে যাবার মতো হচ্ছে। পেছনের পা দিয়ে সাঁতার কাটছে। সামনের হাত দুটো দিয়ে বালতির কানা ধরে আছে। তোড়ে জল পড়ছে। ইঁদুরের মৃত্যুভয় আছে। কান দুটো পিছনে খাড়া। চোখ দুটো বেরিয়ে আসছে ঠেলে। চোঁচাঁ দৌড়লে মানুষের মুখ যে রকম সরু হয়ে যায়, এর মুখটাও তেমনি সরু দেখাচ্ছে।

সাড়ে ছ'টার সময় দাদুই প্রথমে বাথরুমে ঢুকলেন। বেসিনে চোখ-মুখ ধুলেন। হাত দিয়ে অ্যা অ্যা করে জিভ ছুললেন। এই শব্দটা শুনলেই বুঝতে হবে প্রভাত হল। পাখি ডাকে। দাদু অ্যা অ্যা করেন। কলটা বন্ধ করতে গিয়ে দাদুর নজর পড়ল। বালতিতে এটা কী রে? অ্যা, সেই ইঁদুর। লোম-টোম ভিজে ছাল ছাড়ানো অবস্থা। আরে ছি ছি। তুই ব্যাটা প্যান থেকে উঠে এসে ফের বালতিতে পড়েছিস! তোর দেখছি নির্ঘাত জলে ডোবার ফাঁড়া আছে! একেই বলে মানুষের ভাগ্য। আমারও ওই রকম পাতকী যোগ ছিল। মাদুলি পরে বেঁচে আছি। তোর কোষ্ঠীও নেই। বাপ-মাও নেই। এতবড় এই বিরাট বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে এইটুকু একটা শরীর নিয়ে বাঁচা যায়? তার ওপর অত্যাচারী। কেউ ভাল চোখে যে দেখবে, সে-পথও রাখেনি।

ইঁদুরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে দাদুর মনে হল, সেই গল্পটা

কত সত্যি। জলে ডোবা মানুষকে উদ্ধার চেষ্টা না করে তীরে দাঁড়িয়ে তিরস্কার করা। উদ্ধারের কথা মনে হতেই দাদুর আবার ভীষণ ঘেন্না এসে গেল। ইশ্ প্যান থেকে এসে মুখ ধোবার জলের বালতিতে পড়েছে। উত্তেজিত হলেই দাদুর ভাষা ভাবনা সব হিন্দিতে চলে যায়। ইসকো হাটাও, আভি হাটাও, সব বাহারমে ফেক দেও। রামখেলোয়ান, রামখেলোয়ান।

দাদু বাথরুমের দরজা খুলে নটরাজের মতো নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলেন। সামনেই রামখেলোয়ান। হাতে তোয়ালে। ভেবেছিল বুড়াবাবু হয়তো তোয়ালে চাইছেন। দাদু বালতিটা দেখিয়ে বললেন, বিলকুল বাহার ফেকো।

দরজা পেরোলেই বাগান। দাদুর কথা শেষ হওয়ামাত্রই রামখেলোয়ান পালোয়ানি শরীর নিয়ে এক ঝটকায় বালতিটা তুলে বাইরের বাগানে জলটা ফেলে দিল। পরিষ্কার তকতকে কচ্ছপের পিঠের মতো মাটি। চারপাশে জল গড়িয়ে গেল। রামখেলোয়ান জল ফেলে লাল বালতিটা করবী গাছের তলায় রাখতেই দাদুর খেয়াল হল, আরে বাইরে তো কাক আছে, ওই তো পাঁচিলে বসে ডাকছে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, "কাঁহা ফেকা ?"

রাম বললে, "বাহারমে ফেকিয়ে দিয়েছি, যেমন বলিয়েছেন।"

"আরে মূর্খ, উসমে এক চুহা থা। কৌয়া লে যায়েগা। সর্বনাশ হো গিয়া!"

দু'জনেই উর্ধ্বশ্বাসে বাইরে ছুটলেন।

রামখেলোয়ান বললে, "আপ য্যায়সা বোলা।"

দাদু খুব রেগে বললেন, "হাম মূর্খ হ্যায় তো তোম গোমূর্খ হোগা।"

পরিষ্কার মাটি। ঘাস-টাস ঝোপঝাপ কিছুই নেই। জল পড়ে ভিজে ভিজে মাটি। ইঁদুরের চিহ্ন নেই। তিনটে কাক একটু আগে পাঁচিলে বসে ছিল। কাক তিনটে আর নেই। দাদু হায় হায় করে উঠলেন। "তোর জন্যেই প্রাণীটা বেঁচেও বাঁচল না। জলে ডোবা

থেকে যদিও বা বাঁচল, কাকে নিয়ে গেল। পাষণ্ড, আভি নিকালো তোমকো হাম নেহি মাঙতা।"

রামখেলোয়ান মুখ কাঁচুমাচু করে বাইরের রকে গিয়ে বসে রইল। দাদু নিজেই বাগানটা তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কোথাও নেই। আবার আমি। আমিই একটা প্রাণীর এতক্ষণের জীবন-সংগ্রাম শেষ করে দিলুম। আমি এক যমদূত। হে প্রভু, আমি যদি জলে ডুবি, তাহলে আমাকে কেউ যেন এই ভাবেই তুলে বাঘের মুখে ফেলে দেয়। আমি তোমাকে স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিয়ে যাব। আমার ওই সাজাই হওয়া উচিত।

দাদু উদ্‌ভ্রান্তের মতো বাগান থেকে বাড়ি ঢুকলেন। খুব মন খারাপ। পা ধুয়ে তোয়ালেতে পা মুছলেন। পাশেই বিদ্যাসাগরী চটি। প্রথমে বাঁ পা ঢোকালেন। তারপর ডান পা-টা ভাল করে মুছে জুতোতে ঢোকালেন। ডগার দিকে নরম-মতো কী একটা নড়ে উঠল। শুধু নড়লই না। চিক্ করে আওয়াজ করে উঠল। পা বের করে উলটে-পালটে পা'টাকেই ভাল করে দেখলেন। মানুষের পা তো চিঁকচিঁক করে ডাকে না। তবে কি জুতো ডাকছে? জুতোর সামনে থেবড়ে বসে পড়লেন। সেই ইঁদুর। জুতোর ভেতর ঢুকে গুটিসুটি মেরে বসে আছে।

"রামখেলোয়ান, এই রামখেলোয়ান।" বাজখাই চিৎকার। একটু আগেই যার চাকরি গিয়েছিল, সে দৌড়ে এল। সারাদিনে বেচারার মিনিটে চাকরি যায়, আবার হয়। দাদুর নির্দেশে সে সাবধানে চটিটা তুলে নিল। দাদু বললেন, "সামালকে, উসকা ভিতর সেই বীর চুহা হ্যায়। চলো।"

"কাঁহা চলেগা বড়া সাব।"

"তোমহারা ঘর।" বাইরের দিকে রামের ঘরে, সেই ঘরে জুতোসুদ্ধু ইঁদুর থাকবে। একদম ডিসটার্ব করা চলবে না। সন্ধ্যের দিকে সুস্থ হয়ে নিজেই চলে আসবে দাদুর লাইব্রেরিতে।

সামনে রামখেলোয়ান চলেছে জুতো হাতে। ভেতরে ভিজে ইঁদুর। পেছনে দাদু চলেছেন পাহারাদার। বলা যায় না, রাম যদি ফেলে দেয়। রাম বললে, "এ চিজ কাঁহাসে আয়া জি?"

দাদু গম্ভীর গলায় বললেন, "মুলুকসে।"

তেঁতুল গাছে ডাক্তার

বিধানবাবুর গলায় ট্যাংরামাছের কাঁটা আটকে গেল। বড়মামা যখন গেলেন তখন হাঁ করে ভদ্রলোক দাওয়ায় বসে আছেন। স্ত্রী আর পুত্রবধূ দু'পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নাড়ছেন প্রাণপণে। বড়মামা গিয়েই ধমক দিয়ে দুজনকে সরিয়ে দিলেন।

বিধানবাবুর নারকেল-তেলের ব্যবসা। প্রচুর পয়সা। তেমনি মেজাজ। সকলকেই ধমকে কথা বলেন। একমাত্র বড়মামাকেই ভয় করেন। বিধানবাবু বোয়ালের মত হাঁ করে আছেন। বড়মামা টর্চ ফেললেন। যেন কুয়োর মধ্যে আলো নেমে গেল। তারপর পাশে পড়ে থাকা বেতের মোড়ায় বসে বললেন, 'মানুষের কী ভাগ্য! সেলুনওলা সুকুমার লটারিতে সাড়ে চার লাখ টাকা পেয়ে গেল।'

বিধানবাবুর চোখ ছানাবড়ার মতো। বড়মামার কথা শুনে আঁক করে একবার আওয়াজ করে পর পর তিনবার ঢোঁক গিললেন সাপে ব্যাঙ গিললে যেমন হয়, গলার কাছে তিনবার ঢেউ খেলে গেল।

বড়মামা বললেন, 'কী বুঝলেন?'

'সাড়ে চার লাখ! ওরে বাবারে!'

'এখন কেমন লাগছে?'

'নিজের গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছে করছে ডাক্তার, আমার পোড়া বরাতে একটা পাঁচটাকাও উঠল না!'

'গলার কাঁটার কী খবর?'

'কাঁটা? কী কাঁটা?'

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। আমাদের কাজ শেষ। গলার কাঁটা তিন ঢোঁকে সরে গেছে।

সেই বিধানবাবু আন্দামান থেকে বড়মামাকে একটা সুন্দর কোকো কাঠের ছড়ি এনে দিয়েছেন।

হঠাৎ বড়মামার আজ কী খেয়াল হল, আমাকে বললেন, 'ছড়িটা নামা।'

আলনায় ঝুলছিল একা একা। নামিয়ে আনলুম। বড়মামার কুকুর লাকি টেস্ট করতে চাইল। বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে আমাকে ধমকাতে লাগল।

'আজ ছড়ি নিয়ে মর্নিং ওয়াক হবে ?'

'ইয়েস।'

'কেন, কোমরে ব্যথা হয়েছে ?'

'আজ্ঞে না। এ কোমব সে কোমর নয়। আজ একটু স্টাইলে বেড়াব। সায়েবদের মত, ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে।'

চুড়িদার পাজামা, ফিনফিনে পাঞ্জাবী। হাতে ছড়ি। সাঁই সাঁই করে হাঁটছেন বড়মামা। পথের ধারের মানুষ অবাক হয়ে দেখছে। হাঁটার মত হাঁটা। পেছন পেছন আমি প্রায় ছুটছি। বেশিব ভাগ কুকুর ভয়ে সরে যাচ্ছে। দু একটা অসন্তুষ্ট হয়ে গোঁ গোঁ করছে।

আজকে বড়মামার চোখমুখের চেহারাই অন্যরকম। জ্বল জ্বল করছে। এই সময় অনেকেই বেড়াতে আসেন। বেড়াতে বেড়াতেই ডাক্তারি করতে হয়। কারুর লো-প্রেসার, কারুর প্রেসার হাই। কারুর হার্ট মাছের মতন খাবি খায়, কারুর হাই সুগার। ঘুরতে-ফিরতে চিকিৎসা। করলার রস খান। নুন বন্ধ করুন। তেল ঘি ছেড়ে দিন।

আজ আর রুগীরা বড়মামাকে ধরতেই পারছেন না। তিনি বুলেটের মত ঠিকরে বেড়াচ্ছেন।

গাছের ডালে হঠাৎ একটা কোকিল ডেকে উঠল। অসময়ের কোকিল। চক্কর মারতে মারতে বড়মামা থেমে পড়লেন।

'আহা-শুনছিস ?'

'কোকিল। অসময়ের কোকিল।'

'কী মিঠে তান!

বটতলার বেদীতে আসন নিলেন। মুখে একটা অন্যভাব।

'পাখি প্রকৃতির জীব।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পাখি সাধক।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে কাক ছাড়া।'

'ঠিক। কাক পাখির মধ্যে পড়ে না। যেমন তিমি মাছের মধ্যে পড়ে না।'

'যদিও তিমি মাছ বলে।'

'তিমি কেন মাছ নয়?'

'ডিম হয় না, বাচ্চা হয়।'

'একশোর মধ্যে একশো। কিছু একটা করতে হবে।'

'ইট কী গুলতি মারা চলবে না।'

'রাইট! খাঁচায় বন্দী করা চলবে না।'

'আপনার কথা কে শুনবে বড়মামা?'

'শোনাতে হবেরে পাগলা। পৃথিবীর সব কাজ ধীরে ধীরে হয়েছে। প্রথমে চাই প্রচার। তারপর চাই সংগঠন। চাই জনমত।'

'আপনার বাহুবল নেই।'

'ঠিক। আমার ঢাল নেই তরোয়াল-রাইফেল নেই। কিন্তু বৎস আমার মনোবল আছে। সেই বলে আমি পৃথিবীর সমস্ত খাঁচার পাখিকে আকাশে উড়িয়ে দেব!'

'পৃথিবী যে অনেক বড় বড়মামা!'

'সো হোয়াট! আমি ছোট করে নোব। নে ওঠ, আমার ভেতরটা ছটফট করছে খাঁচার পাখির মত।'

'চায়ের জন্যে?'

'নারে মুখ্যু। ছটফট করছে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। অ্যাকশন! অ্যাকশন!'

ফেরার পথে ছড়ি বড়মামার কাঁধে। ভীষণ উত্তেজিত। লম্বা-

লম্বা পা ফেলছেন যেন রণপা পরে হাঁটছেন। এক জায়গায় একগাদা মুরগী ছাই গাদায় খাবার খুঁজছে! ফুলকো ফুলকো এক ঝাঁক বাচ্চা।

'বড়মামা মুরগী কী পাখির মধ্যে পড়ে?'

'না। জেনে রাখ, পাখির সংজ্ঞা হল, যাহা আকাশে ওড়ে তাহাই পাখি। যেমন পরান-পাখি। আমাদের প্রাণও একরকম পাখি। দেহ-খাঁচায় অবিরত ছটফট করছে।'

'ঠিক বলেছেন, কেবল কী খাই, কী খাই করে। আর যেই পড়তে বসব অমনি বই-এর পাতা থেকে আকাশের দিকে উড়ে যায়।'

'ও হল তোমার মন। আমি বলছি প্রাণের কথা। আমাদের দেহে দুটো পাখি। এক হল প্রাণ পাখি। খুব দামি, বড়দরের পাখি। আর ছোটদরের পাখি হল মন পাখি। অনেকটা বদরি, মুনিয়া কি টুনটুনির মত। ভীষণ ছটফটে। এ সব বোঝার বয়স তোমার হয়নি।'

বাড়ির গেটের সামনে এসে গেছি। বাগানে বকুলতলার বাঁধানো বেদীতে বড়মামা ধপাস করে বসে পড়লেন। বেশ হাঁপাচ্ছেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলেন, 'এত জোরে জোরে হাঁটলুম কেন?'

'তা তো জানি না।'

কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়ে রইলেন! তারপর চোখ খুলে বললেন—'পাখি!'

'পাখি তো হয়ে গেছে।'

'কী হয়ে গেছে? কিছুই হয়নি। এইবার হবে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, চ্যাবিটি বিগিন্‌স্ অ্যাট হোম।'

কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললেন, 'দেখে আয় তো মেজ কোথায়?'

সারা বাড়ি একবার চক্কর মেরে এলুম। মেজমামা বাথরুমে। তারস্বরে চিৎকার চলেছে, যদা যদা হি ধর্মস্য···বেদীতে বড়মামা। আমাকে দেখে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায়···কোথায়?' বেশ অধৈর্য হয়ে পড়েছেন।

'বাথরুমে যদা যদা হি···'

'তার মানে ঘণ্টাখানেকের ধাক্কা।'

'কখন ঢুকেছেন তাতো জানি না।'

'ধ্যার বোকা। যদা যদা তো ধরতাই। নে, ওঠ পা টিপে টিপে।'

'কোথায় বড় মামা?'

'প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন নয়। মামানুসর।'

গীতা আর নিজের প্রতিভা মিলে তৈরি, মামাকে অনুসরণ মামানুসর।

পেছন পেছন দোতলার বারান্দা। দক্ষিণে মেজমামার ঘর। পা টিপে টিপে চলেছি আমরা চোরের মত। বেশ ভয় ভয় করছে। মেজমামার ঘরের সামনে বিশাল খাঁচা। মুনিয়া আর বদরিতে মিলে গোটা দশেক হবে। কিচিরমিচির করছে। বড়মামা খাঁচার সামনে দাঁড়ালেন।

'তোর সেই গল্পটা মনে আছে?'

'কোনটা?'

'হাজী মহম্মদ মহসীন।'

'হ্যাঁ, নিজে মিষ্টি খাওয়া ছেড়ে তারপর বিধবার ছেলেকে মিষ্টি ছাড়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। আজ আমিও তাই করব। আমি আর এক মহসীন। জগৎবাসীকে, ওহে তোমরা পাখি মুক্ত করে আকাশে উড়িয়ে দাও বলার আগে আমি এদের মুক্ত করে দোব।'

'বড়মামা, ও কাজ করবেন না। মেজমামার পাখি, মাসিমার আদরে মানুষ। মাসিমা আপনাকে শেষ করে দেবেন।'

'রাখ তোর মাসিমা। জগাই-মাধাই কলসির কানা মেরে শ্রীচৈতন্যকে থামাতে পেরেছিল? পারেনি মানিক। ধর্মের জয়।'

খাঁচার দরজা খুলে বড়মামা নাটক করার মত করে বললেন, 'যাও বিহঙ্গ। অনন্ত নীল আকাশ হাতছানি দিয়ে ডাকছে।'

অত সুন্দর করে বললেন, কিন্তু একটিও বিহঙ্গ খাঁচার দরজা গলে

বেরিয়ে এল না।

বড়মামা রেগে গিয়ে বললেন, 'সব ব্যাটাকে বাতে ধরেছে!'

'বড়মামা, দরজা বন্ধ করে দিন। যে কোনো মুহূর্তে মাসিমা এসে পড়বেন। আর মেজমামা জানতে পারলে দক্ষযজ্ঞ হবে।'

আমার কোনো কথাতেই বড়মামার কান নেই। পাখিদের বললেন, 'যাও বিহঙ্গ, মুক্ত আকাশে মেল স্বাধীন ডানা।'

তেমনি পাখি। বোকার মত খাঁচাতেই নাচতে লাগল। খোলা দরজা নজরেই আসছে না।

বড়মামা বললেন, 'ঠিক আমাদের অবস্থা। স্বাধীন করে দিলেও স্বাধীনতার সুযোগ নিতে পারছে না। অপ্রস্তুত মন।'

'ছেড়ে দিন বড়মামা।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দোবই।'

খাঁচার ভেতর হাত ঢুকিয়ে একটা একটা করে পাখি বের করে আকাশে ওড়াতে লাগলেন। এক একটাকে নীল আকাশের দিকে ছুঁড়ছেন আর বলছেন, 'যাও যাও, তুমি মুক্ত, তুমি স্বাধীন।'

প্রথম পাখিটা ওড়ার চেষ্টা করে নিচের উঠনে পড়ে গেল। একটা বসে ছাদের কার্নিশে। কেউই বেশিদূর উড়তে পারেনি। একটু উড়েই যে যেখানে পেরেছে বসে পড়েছে। শেষ পাখিটাকে বড়মামা কিছুতেই বের করতে পারছেন না। 'স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এতবড় বিদ্রোহ। এ ব্যাটা নিশ্চয় বাঙালী পাখি। মুক্ত জীবনের চেয়ে বদ্ধ জীবনই বেশি ভালবাসে।' পাখি আঙুলে এক একবার ঠোকর মারছে, আর বড়মামা রেগেমেগে জ্ঞানের কথা বলছেন। কোনোরকমে বের করছেন খাঁচা থেকে, আকাশে ওড়াতে যাবেন, এমন সময় মাসিমা। হাতে চায়ের কাপ।

'এই নাও তোমার চা। দুধ ছাড়া, চিনি ছাড়া। একি, একি, কী করছ?' পাখিটাকে উড়িয়ে দিয়ে বড়মামা যেন স্কুলে আবৃত্তি কম্পিটিশনে কবিতা পড়ছেন—

'স্বাধীনতা-হীনতায়
কে বাঁচিতে চায় রে
কে বাঁচিতে চায় ।'

পাখি এক চক্কর উড়ে সাঁ করে মেজমামার ঘরে। মাসিমা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'মেজদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!' মেজমামার শুরু আর শেষ এক। 'যদা যদা হি' চলছিল, থেমে গেল। বেরিয়ে এলেন। পিঠে ধবধবে সাদা ভিজে তোয়ালে। চুলে মুক্তার দানার মত কয়েক বিন্দু জল। সারা গায়ে বিলিতি সাবানের ভুরভুরে গন্ধ।

মাসিমা হাঁউপাঁউ করে বললেন, 'যদা যদা করছ, ওদিকে ধর্মের কী গ্লানি দেখ। সব পাখিগণ।'

'তার মানে?'

'ইনি সব ধরে ধরে উড়িয়ে দিলেন।'

'সে আবার কী? এতকাল টাকা ওড়াচ্ছিলেন। টাকা থেকে পাখিতে চলে এলেন! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি? তুমি ওড়ালে না উড়ে গেল? এই তো আমি দানাপানি দিয়ে খাঁচার দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেলুম।'

বড়মামা বীরের মত হাসতে হাসতে বললেন, 'একদিন উড়বে, সাধের ময়না।'

'তুমি কি আরম্ভ করেছ। সব পাখি উড়িয়ে দিলে?'

'আমি ত্রাতা। সব বন্দী পাখির স্বাধীনতা আমি ফিরিয়ে দেবো।'

'তুমি উন্মাদ।'

'শ্রীচৈতন্য, বুদ্ধ, শ্রীরামকৃষ্ণকে সবাই তাই ভেবেছিল প্রথমে।'

মেজমামার ঘরে একটা ঝটাপটির শব্দ হল। বড়মামার পেয়ারের কুকুর লাকি কী একটা মুখে করে ঘর থেকে বেরিয়েই নেচে নেচে বড়-মামার ঘরের দিকে চলে গেল। মাসিমা একঝলক দেখেই, 'যাঃ সর্বনাশ হয়ে গেল, সর্বনাশ হয়ে গেল,' বলে পেছন পেছন ছুটলেন।

মেজমামা বললেন, 'ব্যাপারটা কী আবার আমার চটি? তিন

জোড়া চিবিয়ে শেষ করেছে।'

মাসিমা ছুটন্ত অবস্থায় বললেন, 'চটি নয়, চটি নয়, পাখি।'

'অ্যাঁ, পাখি!' মেজমামাও ছুটলেন। 'কুকুর আবার বেড়াল হল কবে থেকে?'

বড়মামার বীরভাব কেটে গেল। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।

'হ্যাঁরে সত্যিই পাখি লাকি ধরেছে?'

'না বড়মামা, লাকি পাখি ধরেছে।'

'তুই দেখলি?'

'হ্যাঁ।'

'ইডিয়েট।'

'কে বডমামা? আমি?'

'না, তুই না, আমি। আর একবার প্রমাণিত হল, স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। স্বাধীনতা অর্জন করতে হয়। লড়াই করে, বিপ্লব করে ছিনিয়ে নিতে হয়। চল্ চল্ দেখি পাখিটাকে বাঁচানো যায় কিনা।'

বড়মামার ঘরে খাটের তলায় লাকি। মুখে পাখি। মাসিমা আর মেজমামা উঁকি মেরে দেখছেন। তলা থেকে একটা গোঁ গোঁ শব্দ আসছে। ডানার ঝটপটানি। ঘরে ঢুকেই বড়মামা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন 'লাকি!!' দরজা-জানলা কেঁপে উঠল। 'বেরিয়ে এসো। কাম আউট।'

লাকি বেরিয়ে এল গুটি গুটি। মুখে সেই পাখি। কী সুন্দর কচি কলাপাতার মত গায়ের রঙ। আমি হাউমাউ করে কেঁদে ফেললুম। অমন সুন্দর একটা পাখি চোখের সামনে মারা যাবে? আমার কান্না শুনে লাকি ঘাঁউ করে উঠল। লাকি কান্না সহ্য করতে পারে না। ভীষণ বিরক্ত হয়। ডাকামাত্রই পাখিটা মুখ থেকে খসে পড়ে গেল। ঝটপটিয়ে ওড়ার চেষ্টা করল, পারল না। ঠিকরে মুখ থুবড়ে পড়ল গিয়ে ঘরের কোণে।

পাখির চারপাশে গোল হয়ে আমরা। ছোট্ট পাখি নিঃশ্বাস

ফেলছে জোরে জোরে। ছোট্ট বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। এবার মাসিমাও কেঁদে ফেললেন। মেজমামাও ফোঁস ফোঁস করছেন। এমন কি লাকিও কেঁদে ফেলেছে। ওর কান্নার শব্দ আমি বুঝি। খাবার না পেলে হ্যাংলা ঠিক এইরকম কুঁ কুঁ করে কাঁদে।

বড়মামা ধরা ধরা গলায় বললেন, 'আমি ক্ষমা চাইছি। বন্দী পাখির বেদনায় কাতর হয়ে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলুম। ভুল করে ফেলেছি আমি। স্বাধীনতা দুর্বলের জিনিস নয়, সবলের। তোরা শুধু দেখ ওর জীবন আমি ফিরিয়ে দেব।'

মাসিমা কাঁদো কাঁদো গলায় বললেন, 'তুমি আর কী করবে বড়দা? তুমি তো আর ভগবান নও। ওর গলায় ফুটো করে দিয়েছে।'

'ভগবানের কাছে শক্তি ধার করে আমি ওর ফুটো মেরামত করব। তোরা পরে আমাকে গালাগাল দিস। এখন শুধু প্রার্থনা কর!'

বড়মামার ডাক্তারি শুরু হল। বড় একটা প্লাস্টিকের গামলায় তুলোর বিছানা। বিছানায় পাখি। দুপাশে ডানা ছড়িয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। ডানার তলায় নরম তুলতুলে শরীরে সরু ছুঁচ দিয়ে পুট করে একটা ইনজেকশন দিলেন। ছোট্ট ফুটো দুটোর মুখে কী একটা লাগালেন। রক্ত বন্ধ হয়েছে।

বড়মামা বললেন, 'কুসি, বিছানায় আমার মশারিটা ফেল। পাখি এখন বিশ্রাম করবে। লম্বা ঘুম। লাকি তুমি বাইরে যাও।'

বারান্দায় সভা বসেছে।

বড়মামা বললেন, 'মেজ, খাঁচায় কটা পাখি ছিল?'

'এখন আর তা জেনে লাভ কী?

'রাগারাগি নয়। হাতে হাত মেলাও ব্রাদার! সব কটাকে ধরতে হবে। ধরে খাঁচায় পুরতে হবে। নইলে তোমার অপদার্থ পাখিরা বেড়ালের পেটে যাবে।'

'দায়ী তুমি।'

'অবশ্যই। বিচার পরে হবে। আগে কাজ। চল পাখি ধরতে বেরোই। সেই ছোট খাঁচাটা কোথায়?'

'পাখি ধরবে তুমি? পাখি ধরা অত সহজ?'

'বেশ আমি আমার দলবলকে ডাকছি।'

উঠে গিয়ে ফোনের ডায়াল ঘোরাতে লাগলেন।

মেজমামা বললেন, 'ও তোমার হাসপাতালের চেলাচামুণ্ডার কাজ নয়।'

'হাসপাতালে করছি না বৎস। ফোন করছি অনামিকা সংঘে। যে ক্লাবের আমি প্রেসিডেণ্ট। এখুনি দু-ডজন ছেলে আসবে। শুরু হবে চিরুনি অভিযান।' মেজমামা উঠে চলে গেলেন।

বড়মামা আমাকে বললেন, 'বুঝলে, চ্যালেঞ্জ করে গেল। ঠিক হ্যায় মেজো। তোমার চ্যালেঞ্জ আমি নিলুম। ডু অর ডাই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

এক ঘণ্টার মধ্যে বাড়ি জম-জমাট। বিভিন্ন মাপের, মেজাজের, বয়সের দু-ডজন সৈনিক বড়মামার ভাষায় মাসিমার ভাষায় ভূতপ্রেত! মহাদেবের চেলা।

নেতা অতনু বললে, 'পাখি ধরতে হবে। কী পাখি? ডাকপাখি? বক? হরিয়াল? তাহলে গোটা দুই বন্দুক নিয়ে আসি।'

বড়মামার হাত উঠল বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে। 'অতনু, আমি ধরতে বলছি, মারতে বলিনি। ভাল করে শুনে নাও। খাঁচার পাখি। আমাদের পোষা পাখি।'

'পোষা বলছেন কী করে? পোষা পাখি পালায় না।'

'পালাবে কেন? আমি ধরে ধরে উড়িয়ে দিয়েছি।'

'তাহলে আবার ধরবেন কেন?'

'সে আমার ইচ্ছে।'

'বেশ, আপনার ইচ্ছে। তা কী জাতীয় পাখি ?'

'বদরি, মুনিয়া।'

'কোথায় তারা আছে ?'

'আশেপাশেই আছে। কারুর বাড়ির ছাদে। গাছের ডালে। ঘুলঘুলিতে।'

'অসম্ভব। আমরা ধরব কী করে ?'

'অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে, তবে না তুমি অতনু।'

'বেশ। চব্বিশটা খাঁচা কেনার দাম দিন।'

'এগারোটা পাখির জন্য চব্বিশটা খাঁচা, তোমার মাথা...'

'না মাথা খারাপ নয়। চব্বিশটা ছেলে চব্বিশটা দিকে যাবে। পাখি একটা হলেও চব্বিশটা খাঁচা লাগত। হিসাব মেলাতে হলে আরো তেরটা পাখি কিনে উড়িয়ে দিন। ওয়ান পাখি পার খাঁচা। মাছের জন্যে যেমন ছিপ, পাখির জন্যে তেমনি খাঁচা।'

'অনেক পড়ে যাচ্ছে অতনু।'

'তাতো যাবেই সুধাংশুদা। খাঁচার পাখিকে খাঁচায় ফেরাতে চান। সেরকম বুঝলে নতুন পাখি কিনুন।'

'না না। সেতো পরের পাখি। আমরা চাই ঘরের পাখি।'

'তাহলে শ-তিনেক টাকা ছাড়ুন। যত দেরি করবেন, তত দেরি হয়ে যাবে!'

বড়মামার কম্পাউণ্ডাব সুধন্যকাকু পাশে বসেছিলেন। বয়স্ক মানুষ। এক মাথা এলোমেলো কাঁচাপাকা চুল। তিনি বললেন, 'খাঁচা কী হবে ? বড় ঠোঙাতেই কাজ হয়ে যাবে। শুধু শুধু পয়সা নষ্ট এই বাজারে। আর তা না হলে প্লাস্টিকের থলে।'

'কী যে বলেন!' অতনু বিরক্ত হল। একি আপনার ওষুধের পুরিয়া ? যে কাজের যা। কথায় বলে খাঁচার পাখি। পাখির খাঁচা। খাঁচার পাখি খাঁচা ছাড়া ফিরবে না।'

অনেক বচসার পর তিনশো টাকা নিয়ে দলবল বেরিয়ে গেল।

সুধন্যকাকু মাসিমাকে বললেন, 'এঃ বড়বাবু বাজে পাল্লায় পড়ে গেলেন। একেই বলে খাল কেটে কুমীর আনা!'

মেজমামা ঠিকই বলেছিলেন। জল অনেক দূর গড়াল। খাঁচা কেনার টাকা নিয়ে পাখি ধরার দল হাওয়া হয়ে গেল। বড়মামা সন্ধানে বেরিয়ে বেপাত্তা। একটা বাজল, দুটো বাজল। মাসিমা ঘর-বার করছেন। খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠল। রোগীরা অপেক্ষায় থেকে থেকে চলে গেল। সুধন্যকাকু সাইকেলে সারা পাড়া চক্কর মেরে এসে, এক গেলাস গ্লুকোজ গোলা জল খেয়ে খালি ডিসপেনসারিতে রোগীদের পেট টেপা বেঞ্চে চিৎপাত। চারটে বাজল। সাড়ে চারটের সময় মেজমামা কলেজ থেকে এসে গেলেন। মশারির ভেতর আহত পাখি মশগুল হয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মেঝেতে লাকি ধনুকের মত পড়ে আছে। ছাদের ঠাকুরঘরে দুটো মুনিয়া ঢুকেছিল। মাসিমা আবার খাঁচায় ভরে দিয়েছেন।

মেজমামা বললেন, 'এই বড়দার জন্য আমাকে বাড়ি ছাড়তে হবে। এমন একটা দিন নেই যেদিন কোনো না কোনো একটা কাণ্ড ঘটায়নি। একা রামে রক্ষা নেই, তায় সুগ্রীব দোসর।'

সুগ্রীব মানে আমি। আমার কী দোষ? কী বলব। তর্ক করে লাভ নেই। মেজমামা বললেন, 'চল হে, বড়বাবুকে খুঁজে আনি। পাখির শোকে সন্ন্যাসী।'

মেজমামার হাতে টর্চ। একটু পরেই সন্ধে হবে। আর হবে লোডশেডিং। ভুতুড়ে অন্ধকার। আলো আসতে রাত দশটা তো বটেই।

উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, ব্যায়লা পাড়া, ধামাপাড়া, ঘোরা হয়ে গেল। খেলার মাঠ থেকে ছেলেরা চলে গেল। পথঘাট নির্জন হয়ে আসছে। মন্দিরে শাঁখ ঘণ্টা কাঁসর বাজতে শুরু করেছে। বৃদ্ধরা রক ছেড়ে উঠে গেছেন। কোথাও পাত্তা নেই। না বড়মামার, না পাখি ধরা দলের।

মেজমামা রেগে বললেন, 'ওরা সব সিঙ্গাপুর চলে গেছে।'

'কেন মেজমামা?'

'যে জায়গার পাখি, সেই জায়গা থেকে ধরে আনতে গেছে। মনে নেই, সেই একবার চা কিনতে দার্জিলিং চলে গিয়েছিল? প্ল্যান করেছিল গোমুখ থেকে গঙ্গাজল আনবে। তোমার বড়মামা সব পারে। ডেনজারাস লোক।'

কথায় কথায় আমরা সাঁই বাগানের কাছে এসে গেছি। বহুকালের পুরনো বাগান। ভেতরে একটা দীঘি আছে। এক সময় পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়ে গেছে। বেওয়ারিশ বাগান। দিনের বেলা দীঘিতে সব নাইতে আসে। কেউ কেউ ছিপ নিয়ে বসে। সন্ধের দিকে বড় কেউ একটা আসে না। ভয় পায়। বাগান না বলে জঙ্গল বলাই ভাল।

মেজমামা বললেন, 'এই সেই সাঁই বাগান। এক সময় কী ছিল আজ কী হয়েছে?'

কথা শেষ হবার আগেই ভেতরের ঝোপঝাড় দুলে উঠল। সাদামত কী একটা জিনিস ঝোপঝাড় ভেঙে তীরবেগে ছুটে আসছে আমাদের দিকে! ভয়ে মেজমামার কোমর জড়িয়ে ধরেছি, 'মেজমামা বাইসন!'

বড়মামা শিখিয়েছিলেন ভয় পেলেই চোখ বুজিয়ে ফেলবি। সে শিক্ষা ভুলিনি। ধড়াস করে একটা শব্দ হল। মানুষের গলা। চোখ খুললাম। রাস্তায় মুখ থুবড়ে কে একজন পড়ে আছে। গোঁ গোঁ শব্দ করছে। সন্ধের ঝাপসা আলোয় চেনা চেনা মনে হচ্ছে। মেজমামা টর্চ ফেললেন। চেনা গেল আমাদের রামুদা। গঙ্গার ধারের বটতলায় ইটালিয়ান সেলুন যাঁর। মাঝে মাঝে আমাদের চুল ছাঁটেন।

মেজমামা ডাকলেন, 'রামু, রামু!'

রামুদা বললেন, 'ওরে বাবারে। আর করব না। আমায় ধরো না।' টর্চের আলো না সরিয়ে মেজমামা বললেন, 'কে ধরবে?'

'ভূত !'

'আমরা মানুষ। মুকুজ্যে বাড়ির শান্তি।'

রামদা পিট পিট করে তাকালেন।

'কোথায় তোমার ভূত?'

রামুদা উঠে বসলেন, 'ওই যে ওখানে। তেঁতুল গাছে।'

'কী করতে গিয়েছিলে ওখানে?'

'ছাগল খুঁজতে।'

'ভূত দেখেছ?'

না গলা শুনলুম। শুধু গাছের ওপর থেকে বললে, 'ব্যাটা রামু আমাকে নামা।'

'তোমার নাম ধরে ডেকেছে?'

'হ্যাঁ—স্পষ্ট—তিনবার।'

'ব্যাটা বলেছে?'

'হ্যাঁ মেজবাবু, ব্যাটা বলেছে। আর আমি বাঁচব না। ভূতে ডাকলে আর বাঁচে না মানুষ।'

'তোমার মাথা! চলো দেখি কোন গাছ?'

'মেজবাবু, আমি আর নাই বা গেলুম। গরীব মানুষ।'

'চলো! আমার গলায় পইতে আছে, ভূতে কিছু করতে পারবে না।'

'অঘোর কত্তা। বুড়ো পয়সা দিত না বলে ভোঁতা খুর দিয়ে দাড়ি চেচে খুব ফটকিরি বুইলে দিতুম। সেই অঘোর কত্তা তেঁতুল গাছে বাসা বেঁধেছে।'

'তোমার মুণ্ডু। ভূত কি পাখি? চলো আমার সঙ্গে।' পাঁচিল টপকে বাগানে। 'আজ আর আমায় কেউ বাঁচাতে পারবে না, মৃত্যুই লেখা আছে কপালে।' শীতের ভোরে গঙ্গা স্নান করা গলায় রামুদা রামনাম করছে।

তেঁতুলতলায় আসতেই মগডাল নড়ে উঠল। বড়মামার ট্রেনিং, চোখ বুজিয়ে ফেলেছি, ঘাড় মটকাক—আমি দেখছি না!

গাছের ওপর থেকে ক্ষীণগলায় কে বললে, 'কে আছো ?'

মেজমামা হেঁকে বললেন, 'কে ? বড়দা ?'

গাছ বললে, 'কে ? মেজো ?'

'ওখানে কী করছ তুমি ?'

'পাখি ধরতে ডালে উঠেছি ভাই। আর নামতে পারছিনে !'

'বেশ করেছ। ওইখানেই থেকে যাও। পাকলে আপনিই খসে পড়বে।'

'ভাইরে ! একি রাগারাগির সময় ? আমাকে নামা ভাই।'

'নামা ভাই !' মেজমামা রেগে উঠলেন, 'নামাবো কী করে ? নিজে নিজে নেমে এস।'

'সে আমি পারবো না। পারলে অনেক আগেই নেমে পড়তুম।'

'আমরা কীভাবে নামাবো ? এ কী সহজ কাজ ?'

'ফ্রায়ার ব্রিগেডে খবর দে ভাই। আর পারছি না। সারাটা দুপুর শালিকে ঠুকরে ঠুকরে মাথার ঘিলু বের করে দিয়েছে। এখন মশা আর লাল পিঁপড়েতে ছিঁড়ছে ! এইবার সত্যি সত্যি আমি ধুম করে পড়ে যাব।'

ফোন করার পনের মিনিটের মধ্যে দমকলের ঘণ্টা শোনা গেল। দমকল আসছে। পেছন পেছন ছুটে আসছে সারা পাড়া—'আগুন লেগেছে ! আগুন !'

দমকলের অফিসার গাড়ি থেকে নেমেই জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় সেই পাগল ?'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'পাগল নয়, বড়মামা।' মেজমামা আমার মুখ চেপে ধরলেন।

বললেন, 'তেঁতুল গাছের মাথায় চড়ে বসে আছে। এ মশাই সেই পাগলাটা। কাল হাওড়া ব্রিজের মাথায় চড়ে পাক্কা সাড়ে চার ঘণ্টা আমাদের নাচিয়ে মেরেছে।' মেজমামা বললেন, 'এ সে নয়, অন্য আরেকটা !'

'সে আমরা দেখলেই চিনতে পারব।'

দমকল ছুটলো সাঁই বাগানের দিকে। পেছন পেছন ছুটছে সারা পাড়ার লোক। বাচ্চারা চেল্লাচ্ছে, 'দমকল আসছে, দমকল।'

বড়মামা নামলেন। পাড়ার লোক চিনতে পেরেছে, 'আরে, এ যে আমাদের ডাক্তারবাবু গো!' হই হই ব্যাপার। সার্চলাইটের আলোয় সাঁইবাগানে উৎসব লেগে গেছে। ঘুম ভাঙা হনুমানেরা হুপহাপ করছে। পিঁপড়ের কামড়ে আর লজ্জায় লাল বড়মামা বাড়ি ঢুকেই বললেন, 'এ তোদের ষড়যন্ত্র।'

মেজমামা বললেন, 'তার মানে? এই ভজঘট করে নামানোটা ষড়যন্ত্র হল?'

'অবশ্যই হল। তোরা ঘণ্টা বাজাতে দিলি কেন? কেন তোরা নীরবে নিঃশব্দে আমাকে নামালি না? সারা পাড়ার লোক কেন জানবে আমি গাছের মাথায় আটকে গিয়েছিলুম? জানিস আমাকে প্র্যাকটিস করে খেতে হয়।'

পরের দিন সকালে আরও মজা—কে যেন খবরটা সংবাদপত্রে ছেড়ে দিয়েছে—

'তেঁতুল গাছে ডাক্তার'

শাপে বর হল। বড়মামার পসার বেড়ে গেল। চেম্বারে রোগী ধরে না। তবে উল্টো পসার। কেউ নিজেকে দেখাতে আসেন নি। সবাই ডাক্তারকে দেখতে এসেছেন।

মেজমামা আর মাসিমা পেছনের আসনে। আমি সামনে বড়মামার পাশে। গাড়ি চলেছে। বড়মামার হাত বেশ তৈরি হয়ে গেছে। এই সেদিন গাড়ি থেকে 'এল' প্লেটটা খোলার অনুমতি মিলেছে।

'বাঃ, তোমার হাত তো বেশ তৈরি হয়ে গেছে হে।'

মেজমামা পেছন থেকে নাকিস্ুরে বললেন। সুর নাকি হবার কারণ আছে। মেজমামা পুরীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একা একা। হঠাৎ টেলিগ্রাম এল, 'কাম শার্প। ব্রাদার ইল।' বড়মামা ছুটলেন, সঙ্গে গেলেন কম্পাউণ্ডার দাদা। পরের পরের দিন ফিরে এলেন মেজমামাকে নিয়ে। খুব কাহিল অবস্থা মেজমামার। কোমরভাঙা দ হয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মুখে লেগে আছে করুণ বীরের হাসি। কারুর বারণ না শুনে সমুদ্রে চান করতে নেমেছিলেন। ঢেউ এসে তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে। ডুবেই যেতেন। চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু পিনাকী রুদ্র সেই সময় পুরীতেই ছিলেন। সমুদ্রে চান করছিলেন সুইমিং কস্ট্যুম পরে। মেজমামার নড়া ধরে ডাঙায় তুলে এনেছিলেন। তুলতে তুলতেই নোনা জল খেয়ে মেজমামার ভুঁড়িটি গণেশঠাকুরের মত হয়ে গিয়েছিল। সেই নোনাজলের চুবুনিতে সুর নাকি হয়ে গেছে। বড়মামা বলেছেন, 'সারতেও পারে, না-ও সারতে পারে।'

মেজমামা বললেন, 'আহা, হাত আর দুটো পা তোমার বেড়ে সুরে বলছে, যেন কনসার্ট।'

মাসিমা বললেন, 'অ্যাতো আস্তে চালাচ্ছ কেন? এর চেয়ে বেশি স্পিড দেওয়া যায় না?'

মেজমামা বললেন, 'গাড়িটা বৃদ্ধ হয়েছে তো, তাই ধীরে চলছে। সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি চলছে যে এই না কত! না, না, ধড়ফড় করে

দরকার নেই, তুমি ধীরেই চলো। খরগোশও গন্তব্যে পৌঁছোবে, কচ্ছপও গন্তব্যে পৌঁছোবে। একদিন আগে আর পরে।'

আড়চোখে বড়মামার দিকে তাকালুম। রাগে মুখ লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'খরগোশ পৌঁছোতে পারেনি, কচ্ছপই পৌঁছেছিল। স্লো অ্যাণ্ড স্টেডি উইনস দি রেস।'

মাসিমা বললেন, 'পেছন থেকে অন্য সব গাড়ি হুশ হুশ করে চলে যাচ্ছে। যাবার সময় আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। হাসছে। আমার ভীষণ অপমান লাগছে।'

'তুমি চোখ বুজে থাকো। চোখ খুলো না। চিড়িয়াখানা এলে আমি বলে দোব।' মেজমামা মুচকি হেসে বললেন।

'দাদা, তোমার ভয় করছে বুঝি?' মাসিমা ভালমানুষের মতো বড়মামাকে প্রশ্ন করলেন।

বড়মামা বললেন, 'একটা অ্যাকসিডেণ্ট হোক, এই বোধহয় চাইছিস কুসি!'

মেজমামা বললেন, 'সে ভয় নেই বড়দা। তুমি তো একপাশ দিয়ে হেঁটে-হেঁটে চলেছ। তোমার মার নেই। অ্যাকসিডেণ্ট হবে কী করে? একে বলে ওয়াকিং-স্পিডে গাড়ি চালানো।'

বড়মামা শাঁত করে গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ পাশে গাছতলায় দাঁড় করিয়ে দিলেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল, গাড়ির জলতেষ্টা পেয়েছে?'

বড়মামা হাত জোড় করে বললেন, 'আপনারা দয়া করে নেমে যান। পেছনে বসে বসে আরাম করে কাছা ধরে টানা চলবে না, চলবে না। যেখানে একতা নেই, সেখানে গতিও নেই। ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড, ডিভাইডেড উই ফল। সেই পতনই এইবার হবে, দয়া করে আপনারা দুজনে নেমে যান।'

মেজমামা বললেন, 'কি হবে রে কুসি। বড়বাবু যে খেপে গেছে।'

'তুমি কান ধরে ক্ষমা চাও মেজদা। বলো, আর করব না। অন্যায় হয়ে গেছে।'

'আমি একা কেন? যত দোষ নন্দ ঘোষ। তুইও কিছু কম যাস না। তুইও ক্ষমা চা।'

'আমার সঙ্গে বড়দার অন্য সম্পর্ক, স্নেহের সম্পর্ক। তুমি মেজদা চিরটা কাল সুযোগ পেলেই বড়দাকে খোঁচা মারো।'

বড়মামা বললেন, 'তোমরা কেউই কম যাও না। মিটমিটে শয়তান। গাড়িটা কেনার আগে তুই কুসি সবচেয়ে বিরোধিতা করেছিলিস। ঠ্যালাগাড়ি, ছ্যাকরাগাড়ি, যার পাঁঠা সেই বুঝুক, এই সব অনেক চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝেড়েছিলে। একে রামে রক্ষে নেই, দোসর লক্ষ্মণ। মেজ তখন তালে তাল বাজিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আমি হাড়ে-হাড়ে চিনি। সব এক-একটি ধানি-লঙ্কা।'

দুজনে একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'বড়দা, আমাদের ক্ষমা করে দাও। তোমার দয়ার শরীর। সাক্ষাৎ মহাদেব। বাবা ভোলানাথ মাইনাস জটাজুট। ক্ষমা করে দাও প্রভু!'

'না, সম্ভব নয়। এ তো ক্ষমা চাওয়া নয়, এ এক ধরনের ব্যঙ্গ।'

মাসিমা বললেন, 'তুমি আর-একবার আমাদের চান্স দিয়ে ছ্যাখো বড়দা, এবার আমরা একেবারে চুপচাপ থাকব।'

'চুপ করে থাকলেই হবে! ভেতরে সব ব্যঙ্গবিদ্রূপ পুষে রাখবে, বাইরেটা সব সাজানো-গোছানো, চকচকে, চমৎকার। ওতে আমি আর ভুলছি না ভাই। তোমরা নেমে ট্যাকসি-ম্যাকসি ধরে বাড়ি চলে যাও। আমি আর আমার ভাগনে, পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ নেই।'

'কেন, তোমার ঈশ্বর!'

'আঃ, চুপ করো না মেজদা। তোমার স্বভাবটা বড় বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে।'

'ক্ষমা চাইলে যে-মানুষ ক্ষমা করতে জানে না, সে কেমন মানুষ?'

বড়মামা বললেন, 'বনমানুষ। তোমরা হলে সব শহর-মানুষ, আমি একটা শিম্পাঞ্জি।'

'শুধু শুধু তোমরা কেন ঝগড়া করছ বলো তো। দিন-দিন তোমাদের বয়েস বাড়ছে না কমছে? বড়দা, তুমি স্টার্ট দেবে কি-না বলো, এবার কিন্তু আমি নিজ-মূর্তি ধরব। লোক জড়ো হয়ে যাবে। ভাল হবে?'

আড়চোখে মাসিমার দিকে তাকিয়ে বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। চিউয়িংগাম খাবার মতো মুখ নড়ছে। তার মানে কিছু একটা বলতে চান। না বলতে পেরে চিবিয়ে গিলে ফেলছেন। এবার সব চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। মেজমামা হুঁহুঁ করে গানের সুর ভাঁজছেন। গানটা আমার চেনা। বিশেষ সুবিধের গান নয়। বাণীটা বড়মামার চেনা হলে গাড়ি আবার থেমে পড়ত।

মেজমামার হুঁহুঁ ক্রমশ জোরদার হচ্ছে। ভাব এসে গেছে। বড়মামা মেজমামাকে চাপা দেবার জন্যে কার-স্টিরিওর দিকে হাত বাড়ালেন। মেজমামা গান থামিয়ে বললেন, 'তুমি কি টেপ চালাচ্ছ? তাহলে কীর্তন নয়, ইংরিজি কিছু চালাও।'

মাসিমা বললেন, 'রবীন্দ্রসংগীত নেই?'

আমি বললুম, 'বড়মামা, আধুনিক আছে?'

বড়মামা হাত টেনে নিতে নিতে বললেন, 'আমার কাছে কিছুই নেই।'

মেজমামা বললেন, 'অ' ওটা তাহলে তোমার ডামি-স্টিরিও। খোলস আছে, ভেতরে মাল নেই, ফর শো। কত কায়দাই জানো তুমি! তোমার গাড়িতে ইঞ্জিন আছে তো?'

মাসিমা বিরক্তির গলায় বললেন, 'আঃ, মেজদা, কেন বকবক করছ। এই একটু আগে চুক্তি হল, চুপচাপ বসে থাকবে, ফ্যাচর ফ্যাচর করবে না। এরই মধ্যে ভুলে গেলে?'

বড়মামা বললেন, 'স্বভাব কুসি, স্বভাব। স্বভাব সহজে পালটানো

যায় না। দোয়েল কি কোয়েলের মতো ডাকতে পারবে? ছাগল কি ভেড়ার মত গুঁতোতে পারবে। ঘোড়া কি হাতির মতো স্থির ধীর হতে পারবে?'

'শুনছিস কুসি, শুনছিস? গাড়িধারী বড়লোকের বোলচাল শুনছিস?'

মাসিমা বললেন, 'বড়দা, তুমি গাড়ি থামাও, আমি নেমে যাই। অষ্টপ্রহর গজকচ্ছপের লড়াই আমার অসহ্য লাগে।'

মেজমামা বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, এই আমি চুপ করছি। স্পিকটি নট। তবে আমিও বলে রাখছি, গাড়ি আমি কিনবই। নতুন গাড়ি, ধ্যাদ্ধেড়ে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড নয়। তখন কিন্তু আমি এই গাড়িতে পা দোব না। এর ত্রিসীমানায় আসব না। সাধলেও না।'

'যখন কিনবে তখন দেখা যাবে, আগেই এত আস্ফালন ভাল নয়। তোমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্টে কত টাকা আছে, আমার জানা আছে। তোমার পাসবই তো আমার কাছে।'

'ধার করব।'

'কে তোমাকে ধার দেবে?'

'ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক দেবে।'

বড়মামা হঠাৎ বললেন, 'কে গ্যারাণ্টার হবে?'

'কেন, তুমি। তুমি হবে। তুমি ছাড়া আমার কে আছ?'

বড়মামা হাহা করে হেসে উঠলেন, 'এই জন্যেই তোকে আমি এত স্নেহ করি। বুদ্ধিশুদ্ধি তোর একদম পাকেনি। বুড়োখোকা।'

মাসিমা বললেন, 'আমি বুঝি তোমার কেউ নই?'

মেজমামা বললেন, 'কেন অভিমান করছিস, তুই ছাড়া আমার জগৎ অন্ধকার।'

ঠ্যাং ঠ্যাং, ঠ্যাং ঠ্যাং ঘণ্টা বাজিয়ে উলটো দিক থেকে একটা দমকল আসছে। বড়মামা বাঁ পাশে সরতে সরতে বললেন, 'সেরেছে, দমকল যে রে বাবা!'

মেজমামা বললেন, 'ভয় পেও না বড়দা, দমকল আগুন নিবিয়ে ফিরছে। যতই ঘণ্টা বাজাক সে, তাড়া নেই। স্টিয়ারিং সোজা রাখো।'

বড়মামা শব্দ করে হেসে, গাড়িটাকে ঠেলে রাস্তায় তুললেন। ডান দিক দিয়ে ঝড়ের বেগে একটা দৈত্য-লরি বেরিয়ে গেল। বড়মামা চমকে বাঁ পাশে আমার দিকে কাত হয়ে পড়লেন। মেজমামা পেছন থেকে বলে উঠলেন, 'জয় ঠাকুর, প্রাণে বাঁচলে হয়।'

মাসিমা বললেন, 'ভয় পেও না, রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে।'

বড়মামা বললেন, 'ঘাবড়াও মাত। তোমরা শুধু লরিগুলোকে একটু কনট্রোলে রাখো।'

মেজমামা প্রশ্ন করলেন, 'কীভাবে?'

'পেছনে যারা আছ, তারা পেছনে তাকিয়ে থাকো। লরি এলেই আমাকে জানাবে।'

'তোমার মাথার ওপর একটা আয়না আছে। কী জন্যে আছে?'

'আয়না দেখে বোঝা যায় না, আসছে না যাচ্ছে। গুলিয়ে যায়।'

গাড়ি চলেছে গুড়গুড় করে। আর কতদূর! ভীষণ ভয় করছে। বড়মামা গাড়ি চালাচ্ছেন, না কোদাল চালাচ্ছেন, বোঝা শক্ত।

বড়মামার গাড়ি বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে বাঁক নিল। রাস্তাটা তেমন চওড়া না হলেও, পাকা। নতুন পিচ পড়েছে। দু'পাশে বিশাল দুই কারখানার জেলখানার মতো পাঁচিল। বাঁ পাশের দেয়ালে একটা সাইনবোর্ড। আমরা যেদিকে চলেছি সেই দিকে তীর-চিহ্ন। গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ফুলবাগানের ঝিল। উদয়াস্ত মাছ ধরার ব্যবস্থা। পাশের জন্যে যোগাযোগের ঠিকানা, বোকুবাবু, ছোকোন ঘোষের চায়ের দোকান, কুলতলি। দশটা-পাঁচটা। পাশের হার, দশ টাকা।

স্টিয়ারিং নিয়ে যুদ্ধ করতে করতে, বড়মামার নজরে সাইনবোর্ডটা পড়ে গেল। গাড়ি আড় হয়ে ঢুকছিল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বাঁ দিকে হেলে, আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে, বড়মামা বললেন, 'পড় তো, পড় তো। কী লেখা আছে পড় তো!'

গাড়ির পেছন দিকে ভুম করে কী একটা ধাক্কা মারল সামান্য একটু ভুলে উঠলুম আমরা। ভুমদাম করে নানা রকমের জিনিস পড়ে যাবার শব্দ হল। শুধু পড়ল না, পড়ে গড়াতে শুরু করল। মাছ ধরার নোটিস আর পড়া হল না। সব কটা মাথা ঘুরে গেল পেছন দিকে। একটা সাইকেল-রিকশা। পেছনের কাঁচে ভাসছে রিকশা-চালকের মুখ। আরোহী আসছিলেন একগাদা বিভিন্ন মাপের অ্যালুমিনিয়ামের কৌটো নিয়ে। ধাক্কার ঝাঁকুনিতে সব ছিটকে পড়েছে। গড়গড়িয়ে কিছু চলে গেছে নর্দমায়। কালো জলের ওপর ভাসছে সাদা চকচকে কৌটো।

বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে নেমে পড়লেন। গাড়ির গায়ে চোট লেগেছে, আর রক্ষা আছে? গাড়ি হল বড়মামার প্রাণ। বড়মামা নামার সঙ্গে সঙ্গে আমিও নামলুম। পেছন দিকে তাকিয়ে মাসিমা আর মেজমামা বসে রইলেন।

বড়মামা ঝুঁকে পড়ে পেছনের বাম্পারটা দেখে বললেন, 'এটা কী হল?'

রিকশাচালক বললে, 'আমার কী দোষ, আপনি হঠাৎ থামলেন কেন?'

'সামনের গাড়ি থামলে পিছনের গাড়িকেও থামতে হয়। গাড়ি চালাবার ব্যাকরণ না শিখেই সিটে উঠে বসেছ?'

'আপনিও ব্যাকরণ তেমন জানেন বলে মনে হচ্ছে না। জানলে এমন ভুম করে মোড়ের মাথায় থেমে পড়তেন না।'

রিকশার আরোহী নামার জন্যে হাঁচড়পাঁচড় করছেন। পারছেন না। অ্যালুমিনিয়ামের হাজার হাজার কৌটো নড়াচড়া বন্ধ করে

দিয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে কৌটো-মানব। মুখটি শুধু জেগে আছে কৌটো-মানব বললেন, 'আপনার আর কী হয়েছে! রিকশার ধাক্কায় মোটর-গাড়ির কিছু হয় না। ক্ষতি হল আমার। নর্দমার দিকে তাকিয়ে দেখুন। আমার এত দামের কৌটো খানায় ভাসছে।'

বড়মামা ঢুলুঢুলু চোখে খানার দিকে তাকালেন। কারুর ক্ষতি হলে বড়মামা বুক মুচড়ে ওঠে। মেজমামা নেমে এসেছেন। অবাক হয়ে আরোহীকে দেখছেন। থাকতে না পেরে প্রশ্ন করলেন, 'কী করে আপনি অমন হলেন?'

'কী রকম?'

'অমন কৌটোময়, কৌটোসমৃদ্ধ! কে আগে উঠেছে? আপনি আগে, না কৌটো আগে?'

'এটা একটা প্রশ্ন হল? দেখলেই তো বোঝা যায়। আগে আমি, তারপর কৌটো।'

'কী করে নামবেন?'

'হ্যাঁ, এটা একটা প্রশ্ন। সে এক সমস্যা মশাই। আমাকে না নামালে, আমার ক্ষমতা নেই নামার।'

'কেউ যদি না নামায়, সারা জীবন ওইভাবে বসে থাকতে হবে? আপনার তো মশাই আচ্ছা লোভ!'

'লোভের কী দেখলেন?'

'কৌটোর লোভ অবশ্য আমারও আছে, তবে আপনার চেয়ে অনেক কম। আপনি একেবারে গোটা একটা কৌটো-কারখানা কিনে এনেছেন।'

উঁহু, উঁহু, বর্তমান কাল নয়, অতীত কাল হবে। কিনেছিলুম, এখন চলেছি ফেরত দিতে।'

'এত কৌটো সব আবার কিনে ফেরত দেবেন? বড় দুঃখ হচ্ছে।'

'দুঃখ! একটা কৌটোরও আপনি ঢাকনা খুলতে পারবেন না। যদি পারেন, আমার কান কেটে ফেলে দোব।'

'সে কী? কোথা থেকে কিনেছিলেন?'

'কে এক মশাই, ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়, কুলতলিতে দুঃস্থ মহিলা সমিতি খুলেছেন, এ হল সেই সমিতির কারখানায় তৈরি ডিফেকটিভ মাল। মহিলা সমিতির নামে চালাতে চেয়েছিল। কৌটোর ধর্ম কী?'

'আজ্ঞে টানলেই ঢাকনা খুলবে।'

'এ সব হল বিধর্মী কৌটো।'

'ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এই মুহূর্তে আপনার সামনে দণ্ডায়মান।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি? আপনিই সেই পরোপকারী ডাক্তারবাবু?'

বড়মামা লাজুক-লাজুক মুখে বললেন, 'নমস্কার, নমস্কার।'

'আমাকে নমস্কার করে আর লজ্জা দেবেন না, আপনাকেই আমার শত কোটি প্রণাম করা উচিত। কী জিনিস বানিয়েছেন ডাক্তারবাবু, মানুষের প্রাণ ভরে রাখলে, যমেও ছুঁতে পারবে না। দেখা হয়ে ভালই হয়েছে। রিকশাটাকে ছেড়েই দি। মাল সব গাড়ির পেছনে ভরে দেওয়া যাক। নর্দমায় যে কটা ভাসছে, নিজেই গুনে নিন। আমার এদিককার হিসেব ঠিক আছে।'

মোটাসোটা চৌকো ধরনের ভদ্রলোক কৌটোর স্তূপ ঠেলে রিকশা থেকে নেমে এলেন। মালকোঁচা মারা ধুতি। গায়ে শার্ট। বুক-পকেটে অ্যাতো কাগজপত্র ঠেসেছেন, ফেটে বেরিয়ে না যায়। গায়ের রঙ মিশকালো। দু' পাটি ঝকঝকে সাদা নিম-দাঁতন করা দাঁত। হাসিটা সেই কারণেই বড় স্পষ্ট।

বড়মামার গাড়ির বুটে একে একে সব ঢুকে গেল। ভদ্রলোক পেছনের আসনে জাঁকিয়ে বসলেন। এমন ভাবে বসেছেন, যেন নিজের গাড়ি। মেজমামা মাঝখানে। মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

ভদ্রলোক হাত জোড় করে মাসিমা আর মেজমামার দিকে মুখ

ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার নাম শ্রীআশুতোষ দাস। মল্লারচকে আমার মিষ্টির দোকান। এই রিসেন্টলি বেলের মোরব্বার কারবারে নেমেছি। ভেরি গুড মার্কেট। মিডল ইস্ট, জাপান, হংকং, হনলুলু, কামস্কাটকা, ফ্রান্স্, আমেরিকা, জার্মানি, কোথায় না, সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, এ দাস্স বেঙ্গলকুইন ইন থিক সিরাপ।'

কথা শেষ করে হাত খুললেন। মেজমামার মুখের চেহারা পাল্টে গেল ভদ্রলোকের মুখে পরিষ্কার ইংরেজি শুনে। বেশ শিক্ষিত বলেই মনে হচ্ছে, অথচ মিষ্টির কারবারি! বড়মামার গাড়ি চলেছে ফুরফুর করে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনলে মনে হবে বড়দাদু ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক খাচ্ছেন।

মেজমামা শুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মশায়ের শিক্ষাদীক্ষা?'

আশুবাবু খুব বিনয়ের সঙ্গে বললেন, 'যৎসামান্য। বায়ো কেমিস্ট্রিতে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট করার পর কিছুকাল একটা ফার্মে চাকরি। ভাল লাগল না দাসত্ব। কী করি, কী করি? পিতার মৃত্যুর পর বসে পড়লুম দোকানে। ইনস্টিট্যুট অব কেটারিং টেকনোলজি থেকে একটা ডিপ্লোমা বাগিয়ে আনলুম। শিক্ষার কি শেষ আছে। মিষ্টির জগতেও যে কত কী দেবার আছে!'

'মিষ্টির জগৎকে কী আর দেবেন? সবই তো দেওয়া হয়ে গেছে। রসগোল্লা, সন্দেশ, ক্ষীরমোহন, রাজভোগ, লেডিকেনি, সীতাভোগ, মিহিদানা, চমচম, দধি, পয়োধি। নতুন আর কী দেবার আছে?'

'আছে, আছে মুকুজ্যেমশাই। সব বিভাগেই রিসার্চের প্রয়োজন আছে। দুর্বোঘাসের কচুরি খেয়েছেন?'

'দুর্বোঘাসের কচুরি? জীবনে শুনিনি।'

'দয়া করে আমার দোকানে একদিন পায়ের ধুলো দেবেন। দুর্বোর মতো খাদ্যগুণে ভরপুর জিনিস আর দুটো নেই। গোরুরা জানে। সেই দুর্বোকে আমি বাঙালির নোলায় ফেলেছি।'

'নোলা শব্দটা পাল্টানো যায় না আশুবাবু?'

'কেন বলুন তো? নোলা কি খুব খারাপ শব্দ। নোলা শব্দটা মনে হয় ইংরেজি নলেজ শব্দ থেকে এসেছে।'

'প্লিজ, আপনি আর ভাষাতত্ত্ব নাড়াচাড়া করবেন না। মিষ্টান্ন-তত্ত্বেই আপনার নলেজকে ধরে রাখুন। আজেবাজে কথা শুনলে আমার ভীষণ ইরিটেশান হয়। সারা গা লাল-লাল চাকা-চাকা হয়ে ফুলে ওঠে।'

'অ্যাঁ, সে কী? অ্যালারজি! ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে এক দাগ ওষুধ খেয়ে নিলেই তো সেরে যায়!'

'খেয়ে দেখেছি। কিস্যু হয় না।'

'কিসে সারে তা হলে?'

'গোটা-দুই চড় কষাতে পারলেই সেরে যায়।'

'তা হলে থাক, ভাষাতত্ত্ব না আলোচনা করাই ভাল। গায়ে লাল-লাল চাকা-চাকা হয়েছে?'

'না, এখনও তেমন হয়নি।'

'জয় গুরু!'

'হ্যাঁ, জয় গুরু। আপনার ওই খাবার নিয়ে রিসার্চের কথা বলুন। শুনতে বেশ ভাল লাগছে।'

'খেতে আরও ভাল লাগবে। কচুরিপানা দিয়ে একটা আইটেম বানিয়েছি। ক্ষারকচুরি. অসাধারণ জিনিস। এক সপ্তাহ খেলে তিন কেজি ওজন বাড়বে। বাড়বেই বাড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'ওজন কমাবার কিছু নেই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাগজের সন্দেশ।'

'সে আবার কী?'

'উঃ, সে এক অসাধারণ জিনিস। ছানার কোনো ব্যাপার নেই। কাগজের মণ্ড চিনি দিয়ে ভাল করে পাক করে ছাঁচে ফেলে সন্দেশ। একটা খেয়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল চালিয়ে দিন। ধীরে ধীরে পেট

ফুলতে শুরু করবে। এক সময় জয়ঢাক। বুক আর পেট এক হয়ে যাবে। কম-সে-কম দু' দিন আর হাঁ করতে হবে না।'

'বাঃ, বেশ ভাল জিনিস বানিয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। একেবারে আমাদের দেশের উপযোগী। এই আক্রা-গণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে প্রাণান্ত। যে বাড়িতে দশ-বিশটা মুখ কেবল হাঁ-হাঁ করছে, সেখানে একটি করে এই সন্দেশ আর এক গেলাস কলের জল। দু' দিন সব ঠাণ্ডা।'

'খেতে কেমন হয়েছে?'

'অতি সুস্বাদু। একটা খেলে আর একটা খেতে ইচ্ছে করবে, তবে দুটো না খাওয়াই ভাল'

'এক-একটার দাম কত?'

'মাত্র এক টাকা।'

বড়মামা আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন আর সেই হাসিই হল সর্বনাশের কারণ। স্টিয়ারিং বাঁ দিকে বেমক্কা মোচড় খেল। গাড়ির সামনের বাঁ দিকের চাকা গোঁত করে পড়ে গেল পথের পাশের খানায়। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। বেশ বড় রকমের ম্যাজিক দেখাবার পর ম্যাজিশিয়ান দুটো হাত যেভাবে আকাশের দিকে তোলেন, বড়মামা সেই ভাবে হাত দুটো ওপরের দিকে তুলে চুপ করে বসে রইলেন।

আশুবাবু জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে বললেন, 'কী হল স্যার?'

বড়মামা হালকা সুরে বললেন, 'অধঃপতন, পদস্খলনও বলা চলে।'

মাসিমা বললেন, 'এবার তা হলে কী হবে?'

বড়মামা বললেন, 'কিছুই না। কী আবার হবে! স্টার্ট তো অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আমার গাড়ি কত ভদ্র দেখেছিস কুসি! যেই দেখলে ভুল পা পড়েছে, অমনি চলা বন্ধ হয়ে গেল। একেই বলে জেন্টলম্যান।'

মেজমামা বললেন, 'তোমার লেকচার বন্ধ করে গাড়িটা ব্যাক করে তোলার চেষ্টা করো।'

'অতই যদি সোজা হত ব্রাদার! এ তো আর মানুষ নয়, এ হল গাড়ি। পতন আছে, উত্থান নেই।'

'তুমি এখন তা হলে কী করবে?'

'তোমাদের সকলকে নামাব। তারপর ঠেলে তোলাব।'

'আমরা একটা সভা করতে যাচ্ছি। আমি হলুম গিয়ে সেই সভার সভাপতি। সভাপতি গাড়ি ঠেলবে?'

'কেন, যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না! তুমিই না থেকে থেকে বলো, সেল্‌ফ হেলপ ইজ বেস্ট হেলপ। নাও, মেজাজ খারাপ না করে লক্ষ্মী ছেলের মতো আশুবাবুকে নিয়ে নেমে পড়ো। কিছুই না, একটু পেছন দিকে ঠেলে দিলেই রাস্তায় উঠে পড়বে।'

'আর তুমি কী করবে?'

'আমাকে তো স্টিয়ারিং-এ বসতেই হবে ভাই। আমি যে কাণ্ডারী।

'এমন জানলে তোমার গাড়িতে কে উঠত বড়দা। তোমার মতো এমন ব্যাড ড্রাইভার কী করে লাইসেন্‌স পেল কে জানে! ঘুষের খেলা।'

'আমি খুব একটা খারাপ ড্রাইভার নই ব্রাদার। আশুবাবুর হাজারখানেক কৌটো গাড়িকে বেটাল করেছে। গাড়ি কাত হওয়ামাত্রই গড়িয়ে ডান থেকে বাঁ দিকে চলে গেছে। দোষ আমার নয়, দোষ গাড়ির নয়, দোষ হল কৌটোর। আর দোষ হল তাদের, যারা পথের পাশে গাড়ি ধরার জন্যে নর্দমা পেতে রাখে।'

পেছনের আসন থেকে মেজমামা, আশুবাবু নেমে পড়লেন। মেজমামা সমানে গজগজ করে চলেছেন। আশুবাবুর মুখে লেগে আছে মিষ্টি হাসি। এমন মুখ দেখলে তবেই মনে হয়, জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমিও ঠেলব বড়দা?'

'না, তোকে আর ঠেলতে হবে না, তুই নেমে দাঁড়িয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিচালনা কর। তোর ভূমিকা হল, ডিরেক্টার অপারেশান।'

সামনের আসন থেকে আমিও নেমে পড়লুম। আমাকেও তো একটা কিছু করতে হয়। সামনের দিক থেকে ঠেলেঠুলে গাড়িটাকে পেছোতে হবে। একটা পাশ নর্দমায় কেতরে গেছে। ডানপাশ উঁচু হয়ে আছে। মেজমামা দেখেশুনে বললেন, 'অসম্ভব ব্যাপার। ইমপসিব্‌ল। সামনে দাঁড়ার জায়গা নেই। ঠেলব কী করে?'

আশুবাবু বললেন, 'অসম্ভব বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। সবই সম্ভব। ইচ্ছে থাকলেই উপায় বেরোবে।'

'আমার ইচ্ছেও নেই, উপায়ও দেখতে পাচ্ছি না। আপনি তাহলে একাই ঠেলুন। অনেক রকম মিষ্টির ফিরিস্তি তো শোনালেন, সে সব নিজেও নিশ্চয় খেয়েছেন। ভেতরে অনেক হর্স-পাওয়ার জমা হয়েছে। আজ তার পরীক্ষা হয়ে যাক।'

আশুবাবু মৃদু হেসে বললেন, 'তবে তাই হোক। আমি এক হাতে পেছনের বাম্পার ধরে টেনে তুলে দোব। একটা গাড়ির ওজন আর কত হবে? বিশ-বাইশ মণ!'

'আমি আমার ওজন জানি মশাই। গাড়ির ওজন জানা নেই।'

'ওই বিশ-বাইশ মণই হবে।'

আশুবাবু ঘুরে পেছন দিকে চলে গেলেন। আজ আশুবাবুর কপালে গভীর দুঃখ লেখা আছে। ব্যায়ামবীরের কাজ কি সাধারণ মানুষে পারে? হেরে ভূত হয়ে যাবেন। আর মেজমামা তালি বাজাবেন।

আশুবাবু প্রথমে মালকোঁচা মেরে নিলেন। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন, 'জয় মহাবীরজি কি জয়!'

চোখ বুজে হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে বললেন, 'জয় মহাবীরজি কি জয় !'

চোখ খুলে বললেন, 'আপনারা সেই মন্ত্রটা সমস্বরে, তালে তালে, সুর করে পড়তে পারবেন ?'

মেজমামা বললেন, 'কোনটা ?'

'ওই যে, সেই শক্তিসঞ্চারী মন্ত্র, ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।

'ওসব আমার দ্বারা হবে না।'

'খোকাবাবু, তুমি পারবে ?'

খোকাবাবু বলায় ভীষণ রাগ হলেও বললুম, 'হ্যাঁ, পারব !'

'দেন স্টার্ট।'

ঘাস-বিচুলি হেঁইও, আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।

আশুবাবুর ডান হাত বাম্পারে, বাঁ হাত কোমরে। ধীরে ধীরে টানছেন। গাড়ি দুলছে। 'আউর থোড়া হেঁইও, বয়লট ফাটে হেঁইও।' ভদ্রলোকের মুখ জবাফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে। গলার শিরা ফুলে উঠেছে।

হঠাৎ কী হল কে জানে ! বড়মামার গাড়ি ঘোঁত ঘোঁত করে দু'বার শব্দ করে উঠল। সামনের চাকা দুটো ফর্‌র্ ফর্‌র্ করে দুবার ঘুরে গেল অকারণে। একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটে গেল। চরকির মতো নর্দমার থকথকে কাদা ছিটকে উঠে মেজমামাকে স্প্রে-পেন্ট করে দিলে। সাদা জামা-কাপড় আর সাদা রইল না। হরিণের মতো চাকা-চাকা কালো দাগ সারা শরীরে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ফর্সা মুখে খাড়া উঁচু নাক। চোখে ব্রহ্মতেজ। পারলে গাড়িটাকে ভস্ম করে দেন। ওদিকে গাড়িটা ঝিঁকি মেরে হাতখানেক পেছিয়ে গেছে আচমকা। আশুবাবু উল্টে পড়ে আছেন মাটিতে। করুণ সুরে বলছেন, 'আর করব না, কক্ষনো করব না। দোহাই মহাবীর, মাপ করো মহাবীর।' মাসিমা গাড়ির আড়ালে ছিলেন

বলে বেঁচে গেছেন ছেটকানো কাদার হাত থেকে। মাসিমা ছুটে গিয়ে আশুবাবুকে ভূমিশয্যা থেকে টেনে তুললেন। গাড়ি অবশ্য দু'ধাপ পেছিয়ে থেমে পড়েছে। নর্দমা থেকে চাকাও উঠে পড়েছে।

'জয় মহাবীরের জয়', বলতে বলতে আশুবাবু উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত ঠেকিয়ে আবার প্রণাম করলেন। মেজমামা ধীরে ধীরে বড়-মামার দিকে এগোতে লাগলেন। দাঁত কিড়িমিড়ি করছে।

'এটা কী হল বড়দা ?'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'তোকে অস্‌সাধারণ দেখাচ্ছে রে! অনেকটা ডালমেশিয়ানের মতো, সাদার ওপর কালোর স্পট।'

'তোমার রসিকতা রাখো। এটা কী করলে তুমি ?'

'আমি কেন করব রে বোকা। করেছে আমার গাড়ি।'

সাইকেলে রাগী-রাগী চেহারার এক ভদ্রলোক আসছিলেন। হঠাৎ থেমে পড়ে বললেন, 'কী, হল কী ? ভিড়িয়ে দিয়েছে বুঝি! বেশ ভাল করে চাবকে দিন মশাই। হাতে স্টিয়ারিং পড়লে, কাপ্তেনদের আর জ্ঞান থাকে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে না না, এ আমাদের নিজেদের ব্যাপার। আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান। মাথা গরম করবেন না।'

'অ, তাই নাকি, সেমসাইড হয়ে গেছে !'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, বড় ভাই আর মেজ ভাইয়ে হচ্ছে। এখুনি মিটমাট হয়ে যাবে।'

'অ, ভাইয়ে ভাইয়ে হচ্ছে। সহজে মিটমাট হয়ে যাবে ভেবেছেন ? কোথায় আছেন আপনি ? কোর্ট অবধি গড়াবে। বছরের পর বছর চলবে। ভিটেতে পাঁচিল পড়বে। গাড়ির নাট-বল্টু খুলে খুলে ভাগাভাগি হবে। আছেন কোথায় মশাই ? শোনেননি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।'

মেজমামা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ধ্যার মশাই। বাজে কথা না বলে যেখানে যাচ্ছেন সেখানে যান। বাঙালির স্বভাবই হল সব ব্যাপারে নাক গলানো।'

ভদ্রলোক তড়াক করে সাইকেল থেকে নেমে পড়লেন, 'কী হল? কথাটা কী হল? খুব মেজাজ লিচ্ছেন মনে হচ্ছে। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে খুব বড়ছোট কথা হচ্ছে? জানেন আমি কে?'

মেজমামা রাগের মাথায় বলে ফেললেন, 'জানি জানি, লাটসাহেবের নাতি।'

'মুখ সামলে। খুব সাবধান।'

'আরে মশাই যান, সব করবেন আপনি!'

'দেখবেন তা হলে?'

'হ্যাঁ দেখব।'

বড়মামা নেমে এলেন, 'কী হচ্ছে কী? তিল থেকে তাল।'

ভদ্রলোক বললেন, 'তিল মানে? এটা তাল। তালকে আমি তাল-তাল করে ছাড়ব।'

আশুবাবু দু'ধাপ এগিয়ে এসে বললেন, 'নাঃ, আর সহ্য হচ্ছে না। এবার একটু হাত লাগাতে ইচ্ছে করছে।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে আশুবাবুকে থামিয়ে বললেন, 'মুখটা খুব চেনা-চেনা মনে হচ্ছে! হ্যাঁ, চেনাই তো! তোমার নাম সরোজ মাইতি না! আজ থেকে বছর-তিনেক আগে মাঝরাতে তোমার অ্যাপেন্‌ডিক্‌স ফাটো-ফাটো হয়েছিল, মনে পড়ে? তোমার মা এসে কেঁদে পড়েছিলেন। সেই রাতেই তোমাকে অপারেশান করেছিলুম। অপারেশান না করলে মরে ভূত হয়ে যেতে এত দিনে! অপারেশানের ফি-টা অবশ্য এখনও বাকি আছে! তোমার বোলচাল তো বেশ ফুটেছে কার্তিক!'

লোকটি কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। মুখে আর কথা সরছে না। নাকি সুরে বললে, 'কে, ডাক্তারবাবু? চিনতে পারিনি

স্যার। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে আছেন তো, চেহারাটা কেমন যেন পালটে গেছে। ক্ষমা করবেন স্যার। বড় কষ্টে আছি।'

'কষ্টে কেন?'

'ব্যবসাটা লাটে উঠে গেল স্যার।'

'কী ব্যবসা ছিল তোমার?'

'আজ্ঞে, তেলেভাজার দোকান।'

'তেলেভাজা! আহা, বড় ভাল জিনিস! একেবারে উঠে গেল! একটুও নেই?'

'আজ্ঞে না। এমনকি উনুনটাও ভেঙে গেছে।'

'উনুনটা ভাঙলে কী করে?'

'পাওনাদারে লাথি মেরে ভেঙে দিয়ে গেছে।'

'দোকান ঘরটা আছে?

'তা আছে। তালাবন্ধ পড়ে আছে।'

'কী কী তেলেভাজা হত? আলুর চপ হত?'

'ওইটাই আমার স্পেশাল আইটেম ছিল স্যার। বনগাঁ, বসিরহাট থেকেও খদ্দের আসত গাড়ি চেপে কার্তিকের লড়াইয়ের চপ খেতে!'

'লড়াইয়ের চপ! বলো কী? লড়াইয়ের চপ! কত টাকা হলে আবার দোকানটা চালু করা যায়?'

মাসিমা বড়মামার হাত খামচে ধরলেন। বড়মামা ঝটকা মেরে মাসিমার হাত সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'বেড়ালের মতো আঁচড়াচ্ছিস কেন কুসি? খিদে পেয়েছে?'

মাসিমা ফিসফিস করে বললেন, 'আবার টাকা পয়সার মধ্যে ঢুকছ কেন বড়দা?'

কার্তিকবাবু শুনতে পেয়েছেন ঠিক, বললেন, 'ওঁর যে দয়ার শরীর দিদি। দু'হাতে যেমন রোজগার করছেন, দু'হাতে তেমনি গরিব-দুঃখীদের মধ্যে বিলিয়েও যাচ্ছেন। জানেন যে, যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।'

আশুবাবু বললেন, 'আরে মূর্খ, সেটা টাকা নয়, বিদ্যে। উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে।'

'মূর্খ আপনি।'

'আবার চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। এ দেখি ধরলে চিঁ চিঁ করে। ছেড়ে দিলে তুড়ি লাফ মারে!'

বড়মামা বললেন, 'আহা, বেচারার মাথার ঠিক নেই। হ্যাঁ, কত টাকা হলে দোকান আবার চালু করা যায়?'

'সে অনেক টাকা বড়বাবু। অত টাকা কি আপনি দিতে পারবেন? আপনি দিতে চাইলেও এঁরা কি দিতে দেবেন? হাত চেপে ধরবেন।'

ইলেকট্রিক শক খেলে যেমন হয়, বড়মামা চমকে উঠলেন। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'আমার টাকা, আমি তোমাকে দোব, কে তাতে বাধা দেবে! হু আর দে! তুমি, আমি আর আমাদের তেলেভাজার দোকান। বলো কত টাকা?'

'আজ্ঞে তা প্রায় হাজার-তিনেক টাকা। হাজার খানেকের মতো দেনা আছে। একটা বড় কড়াই কিনতে হবে। উনুনটাকে ফের বানাতে হবে। তারপর তেল, ব্যাসন, আলু, বেগুন।'

'বেগুন? বেগুন কী হবে? তুমি তো বানাবে আলুর চপ!'

'আজ্ঞে স্যার, বেগুনি ছাড়া তেলেভাজার দোকান জমে না।'

'না,না, বেগুন-ফেগুন চলবে না। বেগুনে আমার অ্যালার্জি আছে।'

'আপনার অ্যালার্জি থাকলে কী হবে স্যার। চিরকাল লোকে চেয়ে আসছে, আলুর চপ, বেগুনি।'

আশুবাবু বললেন, 'লাইক ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার, মিল্ক অ্যাণ্ড হানি, রোজ অ্যাণ্ড থর্ন, সাবজেক্ট অ্যাণ্ড প্রেডিকেট।'

বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুলে বললেন, 'ব্যাস, ব্যাস হয়েছে, হয়েছে। বেগুনি হলে আমি একটি ফার্দিংও দোব না। আমি হলুম গিয়ে এক কথার মানুষ। বেগুনের গুণ নেই।'

'তা হলে স্যার পটলি কি কুমড়ি ?'

'হ্যাঁ, তা চলতে পারে। এমনকি ফুলুরিও অ্যালউড।'

আশুবাবু বললেন, 'ফুলুরি খুব টেস্টফুল, তবে কিনা উচ্চারণটা বড় গোলমেলে। মাঝে মাঝে ফুরুলি বেরিয়ে যায়। যেমন বাতাসটা মাঝে মাঝেই বাতাসা হয়ে যায়। যেমন পুঁটি মাছ। সেদিন বাজারে গিয়ে কিছুতেই আর মুখ দিয়ে বেরোল না. কেবলই বলি পুঁচি মাট। যেমন ফুলে ঢোল। হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে যায় ঢুলে ফোল! যেমন হাউসফুল আর হাউল ফুস। কী যে সব ডেনজারাস ডেনজারাস মুশকিলের ব্যাপার।'

মেজমামা এতক্ষণ ধৈর্য ধরে ছিলেন। এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ধ্যাত তেরি ক। পাগলের পাল্লায় পড়ে জীবনটা গেল। চল্ কুসি, আমরা চলে যাই।'

'আমি তো যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি। শুনলে না, একটু আগেই বলেছে, হু আর দে।'

'ঠিক ঠিক। আমরা হলুম গিয়ে ঠ্যালার লোক। নর্দমায় গাড়ি পড়লে ঠেলে তুলে দিতে হবে।'

বড়মামা একগাল হেসে দু'জনের দিকে তাকালেন। 'কেন রাগ করছিস পাগলা ? ইউনাইটেড উই স্ট্যাণ্ড। দেখলি না সকলের চেষ্টায় গাড়ি কেমন গাড্ডা থেকে উঠে পড়ল। গাড়ির শিক্ষা আমাদের জীবনের শিক্ষা। ঐকতান মাস্টার, ঐকতান। অনৈকতানে বাঙালি জাতটাই নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।'

'তোমার লজ্জা করে না বড়দা, এই কাদামাখা অবস্থায় আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছো ! লোকে কী ভাবছে ?'

'লোকভয় ! এখনও এই বয়েসে তোর লোকভয় ! অশ্বিনী দত্ত মশাইয়ের লেখাটা আর একবার পড়িস। জীবনে জ্ঞানের আলো ফেল পাগলা, জ্ঞানের আলো ফেল। নে, গাড়িতে উঠে পড়।

ওখানে গিয়ে তোর জামাকাপড় পালটে দোব। তোরটা আমি পরব, আমারটা তুই পরবি।'

'আহা! কী কথাই বললে! তুমি আমার চেয়ে আধহাত লম্বা। তোমার পাঞ্জাবি তো আমার গায়ে লটরপটর করবে।'

'হাতার বাড়তি অংশটা কাঁচি দিয়ে ছেঁটে দেব। লোকে বলে হাতে পাঁজি মঙ্গলবার, আমি বলি হাতে কাঁচি হাতা লটরপটর। নে, উঠে পড়। অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। টাইম ইজ মানি।'

'তোমাকে দেখে তা মনে হয় না বড়দা। তোমার কাছে টাইম ইজ গানি।'

'তার মানে? গানি মানে কী?'

'গানি হল চট। তোমার কাছে সময় হল চটের মতোই মূল্যহীন।'

'ওরে পাগলা, চটের দাম জানিস? জানলে আর মানির সঙ্গে গানি মেলাতিস না। চট সায়েবদের দেশে চালান যায়।'

বড়মামা বীরের মতো স্টিয়ারিং-এ বসলেন। আমরা সুড়সুড় করে যে যার আসনে। মাসিমা সিঁটিয়ে বসেছেন মেজমামার স্পর্শ বাঁচিয়ে।

মেজমামা বললেন, 'তুই অমন সিঁটিয়ে আছিস কেন কুসি?

'তুমি নর্দমা ছুঁয়েছ মেজদা। গায়ে গঙ্গাজল না ছিটোলে শুদ্ধ হবে না।'

'অ, তাই নাকি? অদ্ভুত বিচার!'

'ছোঁয়াছুঁয়ি মানতে হয় মেজদা। তুমি এখন অপবিত্র।'

'আমি না তোর মেজদা!'

'হতে পারো মেজদা তবে অপবিত্র মেজদা।'

বড়মামা গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছেন। ঘুরর্ ঘুরর্ আওয়াজ হচ্ছে, গাড়ি মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে, স্টার্ট কিন্তু ধরছে না। বড়মামা দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরেছেন।

আশুবাবু বললেন, 'কী হল, গড়বড় করছে মনে হচ্ছে?'

'তাই তো মনে হচ্ছে। সেল্‌ফটা কাজ করছে না। আমাদের মধ্যে কেউ একজন অপয়া আছে।'

পেছনের আসন থেকে তিনজনে সমস্বরে বললেন, 'কে কে, কে অপয়া?'

'সেইটাই তো বুঝতে পারা যাচ্ছে না।'

আশুবাবু বললেন, 'আমি অপয়া নই তো?'

মাসিমা বললেন, 'অপয়াদের চেনার কোনো উপায় আছে? চেহারা দিয়ে বোঝা যায়?'

আশুবাবু বললেন, 'যেমন ধরুন, আমি দৈর্ঘ্যে সামান্য খাটো, প্রস্থে একটু বিশাল, মুখটা কেমন?'

মেজমামা বললেন, 'গোল আলুর মতো। একটু লালচে রঙ।'

'লালচে? বলেন কী, লালচে? তা হলে রক্ত। শরীরে রক্ত বেড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'আনন্দের কিছু নেই। এই বয়েসে বেশি রক্ত ভাল নয়। হাই প্রেশারে মরবেন। মাথার মাঝখানে টাক আছে?'

মেজমামা বললেন, 'হ্যাঁ আছে। চিকচিক করছে।'

'আমি কি তাহলে অপয়া?'

'সকালে আপনার নাম করলে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়? শুনেছেন কিছু?'

'আজ্ঞে না, তেমন অভিযোগ তো কানে আসেনি।'

'আচ্ছা, আপনি একবার নেমে দাঁড়ান তো, দেখি স্টার্ট নেয় কি না!'

আশুবাবু নেমে দাঁড়ালন। বড়মামার কেরামতি শুরু হ'ল সেল্‌ফ নিয়ে। কোথায় কী। গাড়ি স্টার্ট নিল না। আশুবাবু বড়মামার পাশে সরে এসে বললেন, 'কী মনে হচ্ছে, আমি কি তাহলে অপয়া?'

বড়মামা বললেন, 'মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে উঠে বসি ডাক্তারবাবু?'

'আর উঠে কী হবে। এবার ঠেলতে হবে। ঠেলে ঠেলে নিয়ে যেতে হবে। কতটাই বা পথ। বড় জোর এক মাইল!'

মেজমামা বললেন, 'আমি ঠেলতে পারব না। আমার ক্ষমতা নেই!'

'ছিঃ মেজ। সবে মিলে করি কাজ, হারিজিতি নাহি লাজ। একটু হাত লাগাও ভাই। মানুষ তো চিরকালই গাড়ি চেপে এল, গাড়ির যদি একদিন মানুষ চাপার শখ হয় তাতে মেজাজ খারাপ করলে চলে? একদিনের তো মামলা রে ভাই। ইংরেজ হলে হাসিমুখে নেমে আসত, আমায় কিছু বলতে হত না।'

'আমি বাঙালি, ইংরেজ নই।'

'তা বললে চলে? সব সময় ইংরেজির খই ফুটছে মুখে। নাও, নেমে পড়ো। দুর্গা বলে যাত্রা শুরু করা যাক। অনেক দেরি হয়ে গেল রে পাগলা।'

'পাগলা বলে যতই আদর করো, গাড়ি আমি ঠেলছি না। দিস ইজ টু মাচ।'

'এই তো ইংরিজি এসেছে, তার মানে ইংরেজ ভর করেছে। নাও, নেমে পড়ো। ঠেলতে শুরু করলেই দেখবে কী মজা! গাড়ি-ঠেলার যে কত আনন্দ! তখন থামতে বললেও আর থামতে ইচ্ছে করবে না। ঠেলে দ্যাখ, বয়েস তিরিশ বছর কমে যাবে।'

'আমি প্রতিজ্ঞা করছি বড়দা, জীবনে আর কোনোদিন তোমার গাড়িতে মরে গেলেও পা দোব না।'

'ছিঃ, প্রতিজ্ঞা করতে নেই মেজ। বাঙালির প্রতিজ্ঞা জানিস তো মেজ, এই করে এই ভাঙে। কাঁচের বাসনের মতো। তিন দিন পরেই তোমার গাড়ির দরকার হবে ভাই। মনে নেই, হাওড়ায়

যাবে। প্রফেসার চিদাম্বরম আসছেন সকাল আটটা দশ মিনিটে। নাও, নেমে পড়ো। একটু ব্যায়ামও হবে। শরীরটা দিন-দিন বেঢপ হয়ে যাচ্ছে।'

দু'পাশের দরজা খুলে পেছনের আসন থেকে তিনজন নেমে পড়লেন। তেলেভাজার দোকান ফেলে সরোজবাবু এগিয়ে এলেন, 'আমিও একটু হাত লাগাই স্যার!'

মেজমামা খ্যাঁক করে উঠলেন, 'তুমি হাত না লাগালেও টাকা পাবে। এখন বুঝছি অপয়া কে? কাল সকালে উঠেই তোমার নাম করে দেখব, কপালে অন্ন জোটে কি না!'

'ঠিক ধরেছেন স্যার। এতক্ষণ বলিনি কিছু, চুপচাপ ছিলুম। সবাই আমাকে অপয়া বলে। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

বড়মামা সামনের আসন থেকে বললেন, 'তুমি তাহলে ত্রিসীমানায় আর দয়া করে থেকো না। সরে পড়ো। আর সকালের দিকে দয়া করে বাড়িতে যেও না।'

সরোজ মাইতি সাইকেল নিয়ে সরে পড়লেন। ধীর গতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। আশুবাবু আর মেজমামা প্রাণপণে ঠেলছেন। মাসিমা আসছেন পায়ে পায়ে ইন্দিরা গান্ধীর মতো গম্ভীর চালে। বড়মামা গান ধরেছেন:

মুক্তির মন্দির সোপান-তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে।

আমি বনেটে টুকুস-টুকুস করে তাল বাজাচ্ছি। বেশ জমে গেছে ব্যাপারটা।

॥ ৩ ॥

বিরাট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। কুলতলি দুঃস্থা মহিলা সমিতি। হলদের ওপর কালো অক্ষরে লেখা। তলায় ছোট ছোট

করে লেখা, প্রতিষ্ঠাতা: ডাক্তার সুধাংশু মুখোপাধ্যায়। ফুল দিয়ে সাজানো গেট। মোটা মোটা গাঁদার মালা ঝুলছে। একপাশে একটা বাছুর, আর একপাশে একটা ছাগল মনের সুখে চিবিয়ে যাচ্ছে। মাইকে স্তোত্র পাঠ হচ্ছে, যা দেবী সর্বভূতেষু। কিছুই তেমন বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাড়ক্যাড় শব্দ হচ্ছে। গেটের ভেতরে মাঠে একদল মহিলা লালপাড় শাদা শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রত্যেকের হাতে শাঁখ।

বেশ স্বাস্থ্যবান এক ভদ্রলোক গাড়ি দেখে চিৎকার করে উঠলেন, 'এসে গেছেন, এসে গেছেন। স্টার্ট।'

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখ বেজে উঠল। যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। ভদ্রলোক দু'হাত তুলে বড়মামাকে জানালেন, 'এইখানে স্যার, এইখানে স্যার। পার্ক করুন।'

সামনে থেকে বোঝার উপায় নেই, গাড়ি নিজের জোরে আসছে না, আসছে ঠেলার জোরে। গলদ্‌ঘর্ম দুটি মানুষ লেগে আছে পেছনে।

বড়মামা চিৎকার করছেন, 'স্টপ, স্টপ, নো মোর, নো মোর।'

ভদ্রলোক চিৎকার করছেন, 'ব্রেক মারুন, ব্রেক মারুন।'

মেজমামাদের ঠেলার নেশায় পেয়ে গেছে। মাথা নিচু। ঠেলছেন তো ঠেলছেন। গেট ছেঁচড়ে, মালাফালা ছিঁড়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তবু থামার নাম নেই। মহিলারা দৌড়ে সমিতির রকে। শাঁখ কিন্তু থামেনি, সমানে বেজে চলেছে। আরও জোরে। যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে।

মাসিমা বলছেন, 'ও মেজদা, থামো থামো।'

মেজমামা বললেন, 'আমি কি আর ঠেলছি। আমি তো শুরু থেকেই থেমে আছি। গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চলেছি। ঠেলছেন আশুবাবু।'

মাসিমা বললেন, 'আশুবাবুকে থামতে বলো।'

'নিজের ইচ্ছেয় আর থামেন কী করে! উনি তো ঘুমিয়ে

পড়েছেন। নাক ডাকছে। আর গাড়ি না থামলে আমি সোজা হই কী করে! মুখ থুবড়ে পড়ে যাব যে!'

সমিতির উঁচু রকে গাড়ি গিয়ে ঠেকল। মেয়েরা চিৎকার করে উঠল, 'যাঃ, রকটা বোধহয় ভেঙে গেল!' ভাঙল না, একটা কোণ শুধু থেঁতলে গেল। গাড়ি থেমেছে। মেজমামা সোজা হলেন। আশুবাবু গাড়ির গায়ে ঢলে পড়লেন। গভীর ঘুম। ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকছে। বড়মামা হাসিমুখে নেমে এলেন, এই যে আমার মেজভাই। অধ্যাপক শান্তি মুখোপাধ্যায়। আপনাদের স্প্রে-পেণ্ট করা সভাপতি। আশুবাবু কোথায় গেলেন? আমাদের এক নম্বর পেট্রন। কোথায় তিনি?'

'তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

'সে কী, বিছানা পেলেন কোথায়?'

'বিছানার দরকার হয়নি। গাড়ির পেছনে শুয়ে পড়েছেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরিশ্রম হয়েছে। একটু বিশ্রাম করে নিন।'

আশুবাবু ঠিক এই সময় স্বপ্ন দেখে ডুকরে উঠলেন, 'মা মা, আমি কোথায়?'

মাসিমা বললেন, 'খুব হয়েছে, এবার উঠে পড়ুন।'

'অ্যাঁ, ভোর হয়ে গেছে! চা হয়ে গেছে!' ভদ্রলোক তড়বড় করে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলেন।

'আরে মশাই, ওদিকে চললেন কোথায়?'

'যাই, দাঁতটা মেজে আসি।'

বড়মামা হাত চেপে ধরলেন, 'ধ্যাত মশাই, চোখ মেলে দেখুন কোথায় আছেন।'

কথা শেষ হতে না-হতেই শাঁখ বেজে উঠল।

ফট-ফট করে গোটা দশ-বারো পটকা ফাটল। আশুবাবু বললেন, 'কী রে বাবা, কালীপুজো শুরু হয়ে গেল নাকি?'

রকের একধারে মঞ্চ তৈরি হয়েছে। বড় বড় চেয়ার। লম্বা একটা টেবিল। সাদা টেবিল ক্লথ। বড় দুটো ফুলদানি। নানা রঙের ফুল। পেছনে সাদা কাপড় ঝুলছে। তার ওপর বাসন্তী-রঙে সমিতির নাম। তার তলায় লেখা, প্রথম প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী। বড়মামা বলতে লাগলেন, 'আহা, কী আয়োজন! একেবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। সুহাস একেবারে সুযোগ্য সেক্রেটারি…।'

বাকি কথা আর শোনা গেল না। মাইক ঘ্যাড়ঘ্যাড় করে উঠল, 'হ্যালো, হ্যালো টেস্টিং। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর।'

সুহাসবাবু বড়মামার কানে কানে কী বললেন। বড়মামা বললেন, 'কোথায় সে, কোথায় সে?'

'আজ্ঞে পেছন দিকের ঘরে বসে আছে।'

'চলো, চলো, কী বিপদ, কী বিপদ!'

পেছন ঘরে এক মহিলাকে ঘিরে আরও অনেক মহিলা বসে আছেন। সকলেই বলছেন, 'একটু খোলার চেষ্টা করো। নিচেরটা নিচের দিকে ওপরেরটা ওপরের দিকে জোরে ঠেলো না। অমন করে বসে থাকলে চলে!'

মাসিমা দু'পা সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েচে, কী হয়েচে?'

'দাঁতে দাঁত লেগে গেছে।'

'মৃগী আছে বুঝি?'

সুহাস বললেন, 'আজ্ঞে মৃগী নয় দিদিমণি। ক্যাণ্ডি-ফ্লস টেস্ট করতে গিয়ে দাঁতকপাটি লেগে গেছে।'

'সে আবার কী? ক্যাণ্ডি-ফ্লস জিনিসটা কী?'

'দেখবেন? আমাদেরই তৈরি।' কাঁচের বয়াম থেকে ভদ্রলোক পাতলা কাগজে মোড়া চৌকোমতো কী একটা বের করে মাসিমার হাতে দিলেন।

'এ তো লজেন্‌স দেখছি।'

'আজ্ঞে ঠিক লজেন্‌স নয়। লজেন্‌স কড়মড় করে চিবিয়ে খাওয়া যায়। এ জিনিস আঠা-আঠা, চটচটে। সর্বক্ষণ চুষতে হবে। দাঁত দিয়ে কেরামতি করতে গেলেই ওপর পাটি, নিচের পাটি জুড়ে যাবে, ওই সীমার যেমন হয়েছে।'

'ট্রাই করে দেখব?'

চারপাশ থেকে সমস্বরে আর্তনাদের মতো শোনা গেল, 'না, না, খবরদার না। এখুনি আটকে যাবে।'

'কী এমন জিনিস মশাই, দাঁতে ভাঙা যায় না!' আশুবাবু মাসিমার হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। 'এ কি গীতার সেই আত্মপুরুষ! অস্ত্রে ছেদন করা যায় না, আগুনে পোড়ানো যায় না, জলে গলে না! কী করে বানালেন এমন জিনিস?'

'করতে করতে হয়ে গেছে। তেমন কিছু চেষ্টার দরকার হয়নি। একটা মুখে ফেললে এক মাস কেন, মনে হয় সারা জীবন চলে যাবে!'

'ভাল করে প্রচার করুন। এ এক যুগান্তকারী আবিষ্কার!'

সুহাসবাবু সবিনয়ে বললেন, 'সবই তাঁর ইচ্ছা। মানুষ নিমিত্তমাত্র।'

বড়মামা হাঁটু মুড়ে মহিলার পাশে বসেছেন। চামচ এসেছে নানা মাপের। সাহায্য করার জন্যে তিন-চারজন হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। বড়, ছোট সব চামচই ব্যর্থ হল। দাঁতকপাটি খোলা গেল না। বড়মামার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চারপাশে তাকিয়ে বললেন, 'খুন্তি লে আও।'

'খুন্তি? যে খুন্তি দিয়ে বেগুন ভাজে?'

চারজন চারদিকে ছুটলেন। বড় ছোট চার-পাঁচ রকমের খুন্তি এসে গেল।

বড়মামা বললেন, 'শুইয়ে দাও।'

আশুবাবু বললেন, 'এখানে সবই দেখছি না-খোলার কেস। কৌটোর ঢাকনা খোলে না, দাঁত থেকে দাঁত খোলে না।'

'আপনি চুপ করুন।' মেজমামা ধমকে উঠলেন।

রুগিকে চার-পাঁচজনে শুইয়ে ফেললেন। মাসিমা জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার তোমার কায়দাটা কী হবে শুনি বড়দা?'

'ভেরি সিম্পল। ঝিনুকের মুখ ফাঁক করে যেভাবে মুক্তো বের করে আনে সেই কায়দায়...।'

'সেই কায়দায়? ইনি মানুষ। সামুদ্রিক ঝিনুক নন। ঠোঁট দুটো আস্ত থাকবে?'

'তা হলে কী করব? এমন কেস তো জীবনে আমার হাতে আসেনি।'

মাসিমা বললেন, 'একটু মোটা সুতো আর মোম আছে?'

সুহাসবাবু বললেন, 'অবশ্য আছে, অবশ্য আছে।'

মোম আর সুতো এসে গেল। বড়মামাকে সরিয়ে দিয়ে মাসিমা চিকিৎসায় লেগে গেলেন। প্রথমে মোটা সুতো জলে ভিজিয়ে দু'সার দাঁতের ফাঁকে ধরে ধীরে ধীরে ঘষতে লাগলেন। সকলে হাঁ করে দেখছেন। বড়মামা বলছেন, 'জয় বাবা বিশ্বনাথ, খুলে দাও বাবা। হ্যাঁ রে, চিচিং ফাঁক বললে কোনো কাজ হবে?'

মাসিমা বললেন, 'তুমি চুপ করো।'

বেশ কিছুক্ষণ কেরামতি চলার পর ভদ্রমহিলার দাঁত খুলে গেল। সকলে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, 'খুল গিয়া, খুল গিয়া।'

মাসিমা দ্রুত হাতে মোমের টুকরোটা দু দাঁতের ফাঁকে গুঁজে দিলেন।

বড়মামা বললেন, 'ও আবার কী হল?'

'দাঁতে দাঁত ঠেকলেই আবার জুড়ে যাবে। যে সাংঘাতিক জিনিস তৈরি করেছ! যে কটা আছে সব গঙ্গাজলে ফেলে দিয়ে এসো।'

সুহাসবাবু বললেন, 'এঁকে সারা জীবনই কি তাহলে মোমের টুকরো দাঁতে নিয়ে ঘুরতে হবে ?'

'তা কেন ? এইবার বেশ করে ছাই দিয়ে দাঁত মেজে আসুন। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

বড়মামা বললেন, 'কুসি, তোর এই চিকিৎসাটা মেডিকেল জার্নালে প্রকাশ করতে হবে !'

'থাক, এমন ঘটনা পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ঘটবে বলে মনে হয় না।'

মেজমামা বললেন, 'এইবার আমার একটা ব্যবস্থা করো। এই কাদামাখা জামা পরে সভাসমিতি করা যায় ?'

বড়মামা চনমন করে উঠলেন, 'ঠিক ঠিক। এক কাজ কর, তুই আমার এই ধুতি-পাঞ্জাবিটা পর।'

'আবার তোমার সেই এক কথা। তোমার জামা আমার গায়ে বড় হবে।'

বড়মামা সুহাসবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'চুন আছে, চুন ?'

'চুন কী করবেন ডাক্তারবাবু ?'

'হোয়াইট ওয়াশ। দেয়াল যদি চুনকাম করা যায়, ধুতি-পাঞ্জাবি কেন করা যাবে না। আলবাত যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'থাক বড়দা, খুব হয়েছে। তোমার চিকিৎসা যেমন উদ্ভট, পরিকল্পনাও তেমনি উদ্ভট। আমি আর সভাপতি হতে চাই না ! যা পারো তাই করো।'

বড়মামা বললেন, 'তা বললে চলে রে পাগলা ! এই সভার প্রধান আকর্ষণ তো তুই। তোর ওই কাতলা মাছের মতো মাথা থেকেই তো পথের নির্দেশ বেরোবে। তোর যা মাথা একদিন তুই এম, এল, এ. হবি। এম. এল, এ, থেকে মন্ত্রী। তখন আমাদের জোর কত বেড়ে যাবে।'

মেজমামা বললেন, 'আমার মাথায় সাংঘাতিক এক আইডিয়া এসেছে বড়দা।'

'আসবেই তো, আসবেই তো, তুই যে আমারই ভাই। আমার মাথাটা দেখেছিস, আইডিয়ার পিন-কুশন। বল তোর কী আইডিয়া?'

'কাপড়ের কাদামাখা অংশটা তো টেবিলের তলায় থাকবে, কেউ দেখতে পাবে না। সমস্যা পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবিটা উলটে পরলেই সব সমস্যার সমাধান। কী বলো?'

'বাহা, বাহা, একেই বলে মাথা। কার মাথা দেখতে হবে তো! আমার ভাইয়ের মাথা! এ-সব মাথা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখতে হয়।'

'তা হলে পরে ফেলি সেইভাবে?'

'অবশ্যই. অবশ্যই। আর দেরি নয়।'

মেজমামা সমস্যা সমাধানের আনন্দে গান গেয়ে উঠলেন, 'আমার আর হবে না দেরি, আমি শুনেছি ওই ভেরি।'

মাসিমা বললেন, 'পাগলামির একটা সীমা আছে, বুঝলে? যা বাড়িতে চলে, তা সভায় চলে না। উল্টো পাঞ্জাবির পকেট দুটো দু'-পাশে জপের মালার ঝুলির মতো ঝুলবে, কী সুন্দর দেখাবে তাই না!'

বড়মামা দরাজ হেসে বললেন, 'ডাক্তারের কাছে ওটা কোনোও সমস্যাই নয়। অ্যাম্পুটেট করে দোব। পরিষ্কার অস্ত্রোপচার। কাঁচি দিয়ে কুচকুচ করে ছেঁটে ফেলে দোব।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছেঁটে ফেলে দাও। ও তো একটা কাঁচির ব্যাপার।' কথা বলতে বলতে মেজমামা পাঞ্জাবিটা উল্টো করে পরে ফেললেন। তারপর বোতাম আটকাতে গিয়ে গভীর চিন্তায় মাথা নিচু হয়ে গেল, 'দাদা বোতাম!'

'বোতাম?'

'হ্যাঁ গো, বোতাম লাগাব কী করে?'

'কেন? যেভাবে সবাই লাগায়! বোতাম ঘরের মধ্যে খুস্ করে বোতাম ঢুকিয়ে দিবি।'

'তুমি একেবারে গবেট হয়ে গেছ দাদা।'

'কেন, কেন ? জানিস আমি ডাক্তার, তোর মতো ছেলেঠ্যাঙানো অধ্যাপক নই !'

'ওই রুগি-মারা ডাক্তারিটাই জানো, উল্টো জামায় বোতাম লাগাবার কিস্যুই জানো না। বোতাম আর ঘর দুটোই যে ভেতর দিকে চলে গেছে। বুকে খোঁচা মারছে।'

'মারছে মারুক। সহ্য করো। সবাই কি আর সুখের হয় ভাই রে! জীবন দুঃখময়। যে কারণে রাজার ছেলে গৌতম সংসার ছেড়ে বুদ্ধ হলেন।'

'আমি গৌতমও নই, বুদ্ধও নই, বোতাম না লাগিয়ে বুক খোলা অবস্থায় অসভ্য ইয়ারের মতো সভায় যেতে পারব না। আমার একটা মানসম্মান আছে।'

'ওরে মূর্খ, সংস্কৃত জানিস, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, নির্বোধেস্তু কুতঃ বলং! চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়। ভাগ্নে আমার হামা দিয়ে পাঞ্জাবির ভেতর ঢুকে বোতাম লাগিয়ে দিক। ভেরি সিম্পল, ভেরি সিম্পল।'

'তা কী করে হয়?'

'খুব হয় রে ভাই, খুব হয়। গাড়ি কী করে মেরামত হয় ছাখোনি? মিস্ত্রি তলায় চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তারপর ওপর দিকে তাকিয়ে খুট্স-খাট্স করে তার-মার জুড়-জাড়ে দেয়।'

মেজমামা একটু চিন্তা করে বললেন, 'তা হলে শুয়েই পড়ি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুয়েই পড়ো। একেবারে চিত হয়ে শুয়ে পড়ো।'

মাসিমা এতক্ষণ চুপ করেছিলেন। এইবার বললেন, 'তোমরা বাড়ি চলো, বাড়ি চলো, তোমাদের আর সভা করে দরকার নেই, খুব হয়েছে।'

দু'জনে সমস্বরে বললেন, 'বাড়ি চলে যাব ? এ তুই কী বলছিস কুসি ?'

সুহাসবাবু বললেন, 'আমার একটা বিনীত নিবেদন আছে।'

'বলে ফেলো, বলে ফেলো।'

'খুব সহজ সমাধান আমার মাথায় এসেছে।'

'এসেছে? এসেছে নাকি? নিবেদন করো. নিবেদন করো। নিবেদনমিদং।'

'আমাদের তাঁত বিভাগ থেকে একটা সাদা চাদর নিয়ে আসি সেইটি গায়ে দিয়ে—'

বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'সুহাস, তোমার আইনস্টাইন হওয়া উচিত ছিল। তুমি আলেকজেণ্ডার দি গ্রেট। তুমি চেঙ্গিজ খান।'

মেজমামা ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আঃ, উচ্চারণটা ঠিক করো বড়দা। চেঙ্গিজ নয়, জিঙ্গিজ।'

'হ্যা. হ্যা. সারা জীবন চেঙ্গিজ বলে এলুম। ম্যাট্রিক ইতিহাসে লেটার পেলুম। তুই এখন উচ্চারণ শেখাতে এলি! জানিস সায়েবরা আমার নাম কী ভাবে উচ্চাবণ করে. সু-ড্যাংশু।'

'করো. তাহলে ভুল উচ্চারণই করো। শেখালে যখন শিখবে না, অশিক্ষিতই থেকে যাও।'

দু'জনের ঝগড়া আর তেমন এগোল না। পাড় বসানো সুন্দর একটা সাদা চাদর এসে গেল। উল্টো করে পরা পাঞ্জাবির ওপর চাদর ফেলে মেজমামা হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'চলুন তাহলে শুরু করে দেওয়া যাক। এদিকে যত রাত হবে ওদিকে তত দিন হবে।'

মাসিমা বললেন, 'তোমারও মাথাটা গেছে। কী বলতে কী যে বলছ? বলো. এদিকে যত দেরি হবে ওদিকে তত রাত হবে।'

বড়মামা বললেন, 'তা হলে একটা গল্প শোন।'

'এখন আর গল্প শোনার সময় নেই। তোমার গল্প ভীষণ বড় বড় হয়।'

'এটা খুব ছোট। সত্যি ঘটনা কি না।'

'কাল শোনা যাবে।'

'না, আজই শুনতে হবে। তা না হলে এই সভা আমি হতে দোব না।'

মেজমামা বললেন, 'যাঃ-ব্বাবা। বেশ মজার লোক তো! নিজের সভা নিজেই পণ্ড করবে?'

'আমার পাঁঠা আমি যেদিকে খুশি কাটতে পারি। ন্যাজেও পারি, মুণ্ডুতেও পারি।'

সুহাসবাবু বললেন, 'ছোট্ট যখন শুনেই নিন না! ঝামেলা চুকে যাক।'

'বেশ, বলো তাহলে।'

'একদিন সকালে চেম্বারে বসে আছি।'

'কত সকালে?'

সুহাসবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেন বাগড়া দিচ্ছেন মেজবাবু!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। তুমি বলে যাও।'

'একটি ছেলে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, শিগগির চলুন, মা আবার ঢুলে ফোল হয়ে গেছে। বলেই বেরিয়ে চলে গেল। আমি হাঁ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছেলেটি ফিরে এল। সেই একই ভাবে উর্দ্ধশ্বাসে, ডাক্তারবাবু ঢুলে ফোল নয়, ফুলে ঢোল! ছুটতে ছুটতে চলে গেল।'

বড়মামা সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে বললেন, 'কই, তোমরা হাসলে না?'

'হাসব কেন? এটা একটা গল্প হল?'

'গল্প হল না! তা হলে কী হল?

'ঘোড়ার ডিম হল।'

'এটা গল্পের মতো সত্য।'

'সে আবার কী? বলো সত্যের মতো গল্প।'

'দাঁড়া, দাঁড়া, সব গুলিয়ে গেল। গল্পের মতো সত্য, সত্যের মতো গল্প। ট্রু স্টোরির ইংরেজি কী হবে?'

সুহাসবাবু বললেন, 'সত্য গল্প।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ সত্য গল্প। সত্য হাসির গল্প।'

মেজমামা বললেন, 'ভেরি সরি। আমাদের কিন্তু হাসি পেল না।'

'তার মানে তোমরা সমঝদার নও। তোমাদের মন তেমন সরল নয়। শিশুর মতো সরল মন না হলে প্রাণ খুলে হাসা যায় না রে পাগলা!'

সুহাসবাবু বললেন, 'আপনি লক্ষ্য করেননি, আমি কিন্তু ফিক্‌ফিক্ করে হেসেছি।'

'লক্ষ্মী ছেলে। লক্ষ্মী ছেলে।' বড়মামা পিঠ চাপড়ালেন।

'তবে আর বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না বড়বাবু। অনেক সব প্রবলেম আছে।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার স্টার্ট।'

॥ ৪ ॥

ফুল, লতা, পাতা, রঙিন কাগজ, লাল নীল পতাকা। সভা একেবারে জমজমাট। লাউডস্পিকার কাসসে। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে একজন চিৎকার করছেন, টেস্টিং, টেস্টিং। বড়মামা বললেন, 'টেস্ট করে আর কী পাবে! এ তো ব্রংকাইটিসের কাসি। বুকে সর্দি জমেছে।'

যে ভদ্রলোক টেস্ট করছিলেন তিনি যেই ওয়ান, টু, থ্রি বলতে গেলেন, মাইক চ্যাঁ করে চিৎকার করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ফেলে দাও, ফেলে দাও। মাচান থেকে নামিয়ে দাও। অসুস্থ, অসুস্থ। হাসপাতালে পাঠাও।'

ফোর, ফাইভ, সিক্স। সেভেনে এসে মাইক সুস্থ হল। স্বাভাবিক স্বর বেরোল। বড়মামা বুদ্ধদেবের মতো হাত তুললেন। মাইক নিয়ে ধস্তাধস্তি শেষ হল। সভা একেবারে লোকে লোকারণ্য। পুরুষ, মহিলা, ছেলে মেয়ে, কেমন একটা গজর-গজর, ভজর-ভজর শব্দ হচ্ছে।' একসঙ্গে অনেক মাছি উড়লে যেমন হয়।

সুহাসবাবু বললেন, 'সাইলেন্স্! সাইলেন্স্!' প্রায় ধমকে

উঠলেন, 'একদম চুপ, একদম চুপ।' ঠিক যেন আমাদের স্কুলের হেডমাস্টার! এখুনি পড়া ধরলেন। না পারলে মাথায় ডাস্টার।

সুহাসবাবু বললেন, 'আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন।'

গুনুর গুনুর গোলমাল তখনও চলেছে। ছুঁচ পড়লে আওয়াজ হয় এমন নিস্তব্ধ তখনও হয়নি। একেবারে সামনের সারিতে দুটো বাচ্চা, এ ওর কান, ও এর কান ধরে কান-টানাটানি খেলা খেলছে। সুহাসবাবু মাইক ছেড়ে লাফিয়ে সভায় নামলেন। প্রথমেই দু'হাতে দুই থাপ্পড়। তারপর দুটোকেই বেড়ালছানার মতো নড়া ধরে তুলে ঝোলাতে ঝোলাতে সভার বাইরে ছেড়ে দিয়ে এলেন। এসেই আবার মাইক ধরলেন, 'আজ আমাদের অতিশয় আনন্দের দিন। গত বছর ঠিক এমনি দিনে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।'

পেছনের সারি থেকে একসঙ্গে অনেকে বলে উঠলেন, 'এবার উঠে যাবে!'

বড়মামা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন, 'কে বললে? কে বললে উঠে যাবে? কার এত সাহস? উঠে যাবে কেন?'

পেছনের সারিতে পরপর দশ-বারোজন উঠে দাঁড়ালেন, 'আমরা বলেছি স্যার। আজ আমাদের আনন্দের দিন নয়, দুঃখের দিন স্যার।'

'কেন, কেন? দুঃখের দিন কেন? কোনো কিছু জন্মালে কেউ কি দুঃখ করে, না আনন্দ করে? আমি যখন জন্মেছিলুম তখন আমার বাড়ির সবাই হেসেছিল না কেঁদেছিল? আমি অবশ্য ভ্যাঁ, ভ্যাঁ করে কেঁদেছিলুম। সে তো ভাই তুলসীদাসজি বলেই গেছেন—তুমি যখন এসেছিলে, জগৎ হেসেছিল, তুমি কেঁদেছিলে। তুমি যখন যাবে, জগৎ কাঁদবে আর তুমি হাসবে।'

'ডাক্তারবাবু, আমরা সে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলছি না, আমরা এই কুলতলি মহিলা সমিতির কথা বলছি স্যার।'

'অবশ্যই, অবশ্যই, সেই কথাই তো বলবেন। সেই কথা বলারই তো দিন আজ।'

'তা হলে বলেই ফেলি।'

'উঁহু, আপনারা তো শুনবেন। আমরা আজ বলব। সভাপতি বলবেন, প্রধান অতিথি বলবেন। আপনারা শুধু কানখাড়া করে শুনবেন। শোনা শেষ হ'লে চটাপট-পটাপট হাততালি দেবেন।'

'সবই বুঝলুম। তবে আপনারা বলার আগে, আমরা যা বলতে চাই শোনা দরকার। অনেক টাকার ব্যাপার তো।'

'ও, এই প্রতিষ্ঠানকে আপনারা অর্থ দান করতে চান? বাঃ বাঃ, অতি মহৎ প্রস্তাব। পৃথিবীতে দাতা তাহলে এখনও আছেন!'

'ভাল করে শুনুন। আমরা নিতে এসেছি, দিতে আসিনি। আমরা ক্ষতিপূরণ চাই।'

'ক্ষতিপূরণ! সে আবার কী রে ভাই! আমরা তো কারুর কোনোও ক্ষতি করিনি। আমরা তো মানুষের উপকার করার জন্যেই বাজারে নেমেছি।'

'ওই আনন্দেই থাকুন। এদিকে আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেছে।'

'কী রকম, কী রকম?'

'বলছি, বলছি। একে একে বলছি। আমিই প্রথমে বলি, তারপর এরা বলবে।'

বড়মামা ধপাস করে চেয়ারে বসে পড়ে বললেন, 'সুহাস, সব যে বেসুরে বাজছে গো।' মাইকে বড়মামার আস্তে মন্তব্য বড় হয়ে সভায় ছড়িয়ে পড়ল।

মেজমামা বললেন, 'তা তো একটু বাজতেই পারে। সব সময় সবকিছু কি সুরে বাজে?'

মেজমামার মন্তব্যও সবাই শুনে ফেলল।

সুহাসবাবু মাইক টেনে নিয়ে বললেন, 'আজ আমাদের জন্মদিন,

বড় আনন্দের দিন, আজ কোনো গণ্ডগোল করা কি ঠিক হবে। আসুন আমরা হাতে হাত মেলাই।'

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের সারি থেকে মন্তব্য হল, 'জন্মদিন আর মৃত্যুদিন একও তো হয়ে যেতে পারে।'

'মৃত্যুর কথা আসছে কেন ভাই। এই তো সবে এক বছর হল আমরা জন্মেছি।'

'তা হলে শুনুন, আপনাদের কীর্তিকাহিনী শুনুন। আপনাদের সেই প্যাকেটে ভরা মুড়কি, যার নাম রেখেছিলেন হরিভোগ। সেই মুড়কি আমার দোকানের কী সর্বনাশ করেছে!'

'ভাই, হরিভোগ তো সত্যিই হরির ভোগ। আমরা নিজেরা টেস্ট করে তবে বাজারে ছেড়েছি। ওতে বাদাম আছে, জিবেগজার সুস্বাদু টকরো আছে, নকুলদানা আছে, আদার কুচি আছে। ভাবলেই আমাব জিভে জল এসে যাচ্ছে রে ভাই!'

'আপনার জিভে জল, আর আমার চোখে জল। যা মাল তুলেছিলুম দু'চার প্যাকেট মাত্র বেচতে পেরেছি। এ বাজারে ওসব বৈষ্ণব-পথ্য চলে না মশাই। এ হল মাটনরোল, ফিশরোল, মোগলাইয়ের যুগ। আপনাদের হরিভোগ সব ধেড়ে-ইঁদুর-ভোগ হয়ে গেছে। তাও ইঁদুরে ভোগ করে ছেড়ে দিলে বাঁচতুম। হরিভোগ খেয়ে, ধেড়েবা এমন খেপে আছে, আমার দোকানের সব কাঁচের জার তো ভেঙে চুরমার করেছেই, আমাকেও দোকান খুলতে দিচ্ছে না, তেড়ে তেডে আসছে। কামড়েও দিয়েছে পায়ের বুড়ো আঙুলে। তলপেটে এখন ইনজেকশান নিতে হচ্ছে।'

বড়মামা হাসতে হাসতে বললেন, 'এই ব্যাপার! আপনি আমাদের এই সমিতির তৈরি গোটাকতক আগমার্কা ইঁদুরকল এই হরিভোগ দিয়েই পেতে রাখুন, সব ব্যাটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।'

'আগমার্কা ঘি হয় শুনেছি, ইঁদুরকলও হয় নাকি?'

'আরেব্বাপু রে, সেরা জিনিস মানেই আগমার্ক। আমাদের

ইঁদুরকল বাজারের এক নম্বর। নাম্বার ওয়ান। লিকপ্রুফ। ইঁদুর এদিক দিয়ে পড়ে ওদিক দিয়ে ফুড়ুত করে বেরিয়ে যাবে, সে আর হচ্ছে না। আমরা সব জিনিস টেস্ট করে তবে বাজারে ছাড়ি।'

'ইঁদুরকল কী করে টেস্ট করবেন স্যার? ওটা তো খাদ্য নয়। কেক নয়, রুটি নয়।'

'ওই কেক আর রুটির কথা যখন উঠল, তখন বলেই ফেলি।' এবার দ্বিতীয় আর এক ভদ্রলোক। সুন্দর চেহারা। একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। বড়-বড় চোখ।

বড়মামা বললেন, 'আপনার আবার কী অভিযোগ? এ দেখছি আমদরবার বসে গেল। অ্যাতো অভিযোগ সামলাই কী করে?'

'আপনাদের ওই কেক আর রুটি স্যার আমার এতকালের ব্যবসার একেবারে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। ও দুটোও কি টেস্ট করে ছেড়েছিলেন স্যার?'

'অবশ্যই, অবশ্যই। আমি খাইনি, তবে এরা অবশ্যই খেয়েছে। খাবার জিনিস, না খেয়ে পারে?'

'আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে বেশ খিদে পেয়েছে। আমাদের সামনে দয়া করে একটু চাখুন না!'

'তা চাখতে পারি। আমার আবার খাওয়ার ব্যাপারে তেমন লজ্জাটজ্জা নেই।'

'তা হলে সভাপতি, প্রধান অতিথি দু দু-জনেই একটু একটু টেস্ট করুন। আমরা দেখি।'

মেজমামা লজ্জা-লজ্জা করে বললেন, 'কী যে বলেন?'

সুহাসবাবু কেক আর রুটি নিয়ে এলেন। দেখেই মনে হল বেশ গরম গরম। সুন্দর গন্ধ নাকের পাশ দিয়ে ভেসে চলে গেল। যেন ডাকছে—আয়; আয়, কপাকপ খেয়ে যা। বড়মামা একটুকরো কেক ভেঙে মুখে পুরলেন। মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে চটাপট, পটাপট

হাততালি। দেখতে দেখতে বড়মামার চোখ কপালে উঠে গেল। কী রে বাবা, এখুনি ফিট হয়ে যাবে নাকি।

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'কী বুঝলেন স্যার? নুনে যবক্ষার। জিভ হেজে গেল। তাই না!'

বড়মামা ঢোক গিলে ডাকলেন, 'সুহাস।'

'বলুন স্যার। পাশেই আছি।'

'পাশেই আছ। আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'তা হতে পারে স্যার। অন্য কাজে ব্যস্ত রয়েছেন তো!'

'আজ্ঞে না, সেজন্যে না। এমন বিদঘুটে স্বাদ হল কী করে? অমানুষিক টেস্ট।'

'হতে পারে স্যার। খুব ভাল কারিগরের তৈরি কিনা!'

'ছাঁটাই করো, ছাঁটাই করো। সব পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে, হাতে পায়ে ধরে আজই বিদায় করো!'

সেই সুন্দরমতো ভদ্রলোক বললেন, 'তা হলে, আমার হাজার-পাঁচেক টাকা পাওনা হল। দোকান নতুন জায়গায় তুলে না নিয়ে গেলে যেখানে আছি সেখানে আর ব্যবসা করে খেতে হবে না। সব খদ্দের ভয়ে সরে পড়েছে।'

বড়মামা বললেন, 'মিথ্যে কথা। এমন কিছু খারাপ খেতে হয়নি।'

'তা হলে আর-একটুকরো খান। আমরা বসছি।'

বড়মামা একটু ঘাবড়ে গিয়ে মেজমামা আর মাসিমার মুখের দিকে করুণ মুখে তাকালেন।

মাসিমা বললেন, 'পাঁচ হাজারের চেয়ে জীবন অনেক দামী বড়দা।'

বাইরে একটা হই-হই শোনা গেল। 'কোথায়, কোথায় সেই ডাক্তারবাবু? আমি তাঁকে একবার দেখে নিতে চাই।'

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'ওরে কুসি, আবার কে আসছে রে তেড়ে?'

মেজমামা বললেন, 'নাও এবার পরোপকারের ঠ্যালা বোঝো।'

মারমার করে রাগী চেহারার এক বৃদ্ধ সভায় এসে ঢুকলেন। 'ডক্টর মুখার্জী নাকি এসেছেন। তিনি কোথায়?'

পেছনের সারির ভদ্রলোকরা একসঙ্গে বলে উঠলেন 'ওই যে, ওই যে মঞ্চে বসে আছেন। বসে বসে কেক খাচ্ছেন।'

'হ্যাঁ, সকলকে দেখিয়ে দেখিয়ে কেক তো খাবেনই। কারুর সর্বনাশ, কারুর পোষ মাস। ডক্টর মুখার্জী!'

ভদ্রলোক বুক চিতিয়ে পা দুটো ফাঁক করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। যেন যুদ্ধ করবেন!

বড়মামা ঘাবড়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার কী সর্বনাশ হয়েছে?'

'কী সবনাশ হয়েছে দেখতে চাও ছোকরা? তোমাদের কৌশল কি আমি বুঝি না ভাবছ। সামনের চৈত্রে আমার বয়েস হবে সত্তর। দাঁতের ডাক্তারদের সঙ্গে ষড় করে তোমরা বাজারে টফি ছেড়েচ। ছেড়েচ কি না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, টফি আমরা ছেড়েচি, তবে দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে কোনোও ষড় নেই।'

'তাই যদি হবে মানিক, তাহলে এই বুড়োর বাঁধানো দাঁত দু'-পাটির এ-হাল হবে কেন?'

পকেট থেকে খবরের কাগজের একটা মোড়ক বের করে টেবিলে মেলে ধরলেন। খিঁচিয়ে আছে দুপাটি দাঁত। বাঁধানো সারি থেকে গোটা-দুই খুলে পড়ে গেছে।

বড়মামা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'আজ্ঞে টফি তো শিশুদের জন্যে, আপনি কেন খেতে গেলেন?'

'এটা কী কথা তুমি বললে হে ডাক্তার! তুমি কি জানো না, আমার এখন দ্বিতীয় শৈশব চলেছে। টফি আমার নাতিও খায়, আমিও খাই। তুমি কি আইন করে আমার টফি খাওয়া ঠেকাবে? এ তো মজা মন্দ নয়!'

'আমাদের টফি একটু কড়াপাক ধরনের। বেশ পাকলে-পাকলে ধৈর্য ধরে না খেলে দাঁত আপনার ভাঙবেই। এ আপনার নকল দাঁতের জিনিস নয়, আসল দাঁত চাই।'

'ছ্যাখো বাপু, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে চেও না। আমি এই দাঁতে এখনও মাংসর হাড় চিবোই বৎস। যৌবনে সত্তর আশি পাউণ্ড ওজনের বারবেল তুলতুম। এখনও নেমন্তন্ন বাড়িতে গিয়ে ছাপান্নখানা লুচি মেরে দি। কী উল্টোপাল্টা বোঝাতে চাইছ আমাকে? শোনো ডাক্তার, পাঁচশোটি টাকা আমি গুনে নিয়ে এখান থেকে যাব। আমাকে তুমি চেনো না। আমার নাম চিদানন্দ বণিক আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা সিপাহী বিদ্রোহের সময় ঘোড়ার পিঠে চড়ে তরোয়াল দিয়ে ইংরেজদের মুণ্ডু উড়িয়েছিল ক্যাচাক্যাচ।'

বড়মামা ঢোঁক গিলে মেজমামার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালেন। মেজমামা চোখের ইশারা করলেন। কী তার মানে কে জানে। বড়-মামা আজ বেজায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। পাশে দাঁড়াবার মতো কেউ নেই। সুহাসবাবু কোন ফাঁকে সরে পড়েছেন।

হঠাৎ আশুবাবু এগিয়ে এলেন মরেছে, ইনি আবার কোটো সমস্যা তুলবেন নাকি? আশুবাবু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা এইভাবে আজকের অনুষ্ঠান পণ্ড করবেন না। যার যা পাওনা, ডাক্তারবাবু সবই মিটিয়ে দেবেন। আপনারা একটা করে দরখাস্ত পেশ করুন।'

'দরখাস্ত? তার মানে? এ কি সরকারি দপ্তরে ডোলের আবেদন নাকি? আমরা আমাদের ন্যায্য পাওনা আগে বুঝে নোব, তারপর আমাদের অন্য কথা। ফেলো কড়ি মাখো তেল।'

দাঁতভাঙ্গা বৃদ্ধ বললেন, 'অ্যাঃ, সব উল্টোপাল্টা বকছে। এ-কথায় ওই কথা আসে কী করে? ফেলো কড়ি মাখো তেল। এর পরেই মূর্খরা বলবে, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।'

পেছনের সারির ওঁরা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন, 'তার মানে? আমরা মূর্খ! কী আমার জ্ঞানী, মহাপণ্ডিত বৃদ্ধ রে? দাঁত ভেঙেছে, দাঁত! প্রমাণ কী, টফি খেয়ে দাঁত ভেঙেছে। ডাক্তারের সার্টিফিকেট কোথায়?'

'ওরে মূর্খের দল! এর আবার সার্টিফিকেট কী?'

'বাঃ, মানুষ মরলে পোড়াবার আগে সার্টিফিকেট লাগে না!'

'আরে গাধা, মানুষ মরা আর মানুষের দাঁত ভাঙা এক হল?'

'মানুষের দাঁত কেমন করে হল মানিক? ও তো ছুঁচে ঢালাই নকল দাঁত। তাঁর জন্যে পাঁচশো। টাকা যেন খোলাম রে।'

'যা না ব্যাটারা, একবার খপর নিয়ে দেখ না, দু'পাটি দাঁত বাঁধাবার খরচ কত? এ তোদের খাতা বাঁধানো নয়, ছবি বাঁধানো গবেটের দল।'

'যা তা গালাগাল তখন থেকে চলেছে। এবার আমরা আর চুপ করে থাকব না। অ্যাকশান নিয়ে নোব।'

'একবার চেষ্টা করে ভ্যাখ না চামচিকের দল।'

'তবে রে।'

মহা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। আশুবাবু বড়মামার কানে কানে বললেন, পেছনের দরজা দিয়ে সরে পড়ুন। হাওয়া খুব ভাল নয়। এলোমেলো বইছে।'

পেছনে ঝোপঝাড়, জঙ্গল, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, জোড়া পুকুর। ভাগ্য ভাল, সূর্য অনেক আগেই ডুবে গেছে। আকাশে যেন ঘোর লেগে গেছে। কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি কে জানে। চোরের মতো। ছোট চোর, বড় চোর। আমার তেমন অসুবিধে হচ্ছে না। ঝোপেঝাড়ে বল খোঁজার অভ্যাস আছে। অসুবিধে হচ্ছে মেজমামা আর মাসিমার। মাসিমার শাড়ির আঁচল।

মেজমামার চাদর। কেবলই জড়িয়ে যাচ্ছে ডালপালায়। ওদিকে খুব হই-হই হচ্ছে। ভাগ্যিস দাঁতভাঙা বৃদ্ধ এসেছিলেন।

বড়মামা ফিসফিস করে বললেন, 'টাকা তো আমাকে দিতেই হবে আশুবাবু! ক্ষতি যখন হয়েছে!'

'কারুর কিস্যু ক্ষতি হয়নি। সব হল ধান্দাবাজ। বেড়ালের জাত মশাই! নরম মাটি দেখেছে কি অমনি আঁচড়াও।'

মাসিমা বললেন, 'দেখেশুনে মনে হল, কম-সে-কম হাজার-দশেক টাকার ধাক্কা।'

মেজমামা বললেন, 'আজ তোমার মহিলা সমিতি আর পরোপকারের শেষ দিন। আজ ওরা সব একখানা একখানা করে ইট খুলে নিয়ে যাবে।'

আশুবাবু বললেন, 'আপনার সেক্রেটারি সুহাসবাবু কোথায় গেলেন বলুন তো?'

আমগাছের মোটা গুঁড়ির আড়াল থেকে উত্তর এল, 'আজ্ঞে আমি এখানেই আছি। মশায় সর্ব অঙ্গ জ্বলিয়ে দিয়েছে ডাক্তারবাবু।'

'তুমি আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে এলে সুহাস?'

'আর যে কোনো পথ ছিল না দাদা! জানেনই তো কথায় আছে —চাচা আপন প্রাণ বাঁচা।'

বড়মামা বললেন, 'এ জায়গাটা তোমার কী রকম মনে হয়, বেশ নিরাপদ? এক কাপ চা পেলে হত।'

'চা? চা এখানে পাবেন কোথায়। সাপখোপ পেতে পারেন।'

'আমরা এখন তাহলে যাই কোথায়?'

'আমি একটা ভাল কাজ করেছি স্যার। কাজের কাজ। ওই ধোবিডাঙার মাঠে আপনার গাড়িটা এনে রেখেছি।'

'সে কী হে! আমার গাড়ি তো বিগড়ে বসে আছে। স্টার্ট নিচ্ছে না।'

'সে আমি ঠিক করে দিয়েছি। এক ফুঁয়ে সব ঠিক হয়ে গেছে। কারবুরেটারে ময়লা জমেছিল।'

'লক্ষ্মী ছেলে, সোনা ছেলে। একবার গাড়িতে উঠে বসতে পারলে আর আমাদের পায় কে! চলো চলো, তাড়াতাড়ি পা চালাও।'

ঝোপঝাড় ভেঙে আমরা ধোবিডাঙার মাঠে এসে উঠলুম। একফালি চাঁদ মুচকি হাসছে আকাশে। গোটাকতক তারা এলোমেলো ছড়িয়ে আছে। আমার তেমন কোনো ভয় লাগছে না। মাঝে মাঝে আমার কেবল হাসি পাচ্ছে। কী থেকে কী হয়ে গেল! এ যেন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

সুহাসবাবু বললেন, এ হল ওই ঘোষালের কাজ। ভাল কিছু হতে দেখলেই লোক লাগিয়ে সব পণ্ড করে দেয়!'

'অ, তাই বলো, ঘোষাল কলকাঠি নেড়েছে! 'ওকে আর কিছুতেই টিট্ করা গেল না!'

'যাবে না কেন? সহজেই যায়। ওকে যদি প্রেসিডেণ্ট করে দেন!'

'বেশ তো! এ আর এমন শক্ত কী! আজই করে দাও না।'

'আজ কী করে করবেন। প্রথমে টাকা দিয়ে ওকে সভ্য হতে হবে। তারপর নির্বাচন। সব ব্যাপারেরই তো একটা ইয়ে আছে। আজ ওরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করুক। আপনি দিনকতক বরং গা-ঢাকা দিয়ে থাকুন।'

'গা-ঢাকা দোব কেন? আমি কি কাপুরুষ? তা ছাড়া আমার কোনো শত্রু নেই।'

'এখন আপনার অনেক শত্রু। সমাজসেবা অত সহজ নয় ডাক্তারবাবু। বেড অব রোজেস।'

'ভুল বললে। বেড অব থর্ন।'

'আজ্ঞে কাঁটা ছাড়া কি গোলাপ হয়!'

কথায় কথায় আমরা গাড়ির কাছে এসে পড়েছি। ফিকে চাঁদের

আলোয় চকচক করছে। আমরা উঠে বসলুম। আশুবাবুও উঠলেন। বড়মামা বললেন 'সুহাস, তুমি ?'

'আজ্ঞে, আমি বেশ আছি।'

'বেশ আছি মানে! এই বললে, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। ওরা তোমাকে একা পেলে তো ঠেঙিয়ে শেষ করে দেবে।'

'এই তো পাশেই আমার দিদির বাড়ি। সেইখানেই গা ঢাকা দোব।'

'দেখো মার খেয়ে মোরো না। তুমি আমার রাইট-হ্যাণ্ড।'

স্টার্ট দিতেই গাড়ি স্টার্ট নিয়ে নিল। গোল একটা বৃত্ত তৈরি করে, সোজা রাস্তায় গিয়ে উঠল। আশুবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'সুহাসবাবু আপনার কত দিনের চেনা স্যার?'

বড়মামা স্টিয়ারিং-এ পাক মারতে মারতে বললেন, 'এই বছর-খানেক হবে।'

'লোক মোটেই সুবিধের নয়, বুঝলেন বড়বাবু? এ হল গিয়ে ঘরের শত্রু বিভীষণ। ঘোষালের নিজের লোক। ভেতর থেকে সব চুরমার করতে চাইছে।'

'কী আশ্চর্য। আমি তো খারাপ কিছু করতে চাইনি। আমি তো সকলের উপকার করতেই চেয়েছি।'

'সেই অপরাধেই তো আপনার বাঘের পেটে যাওয়া উচিত। মনে নেই নবকুমারের কী হয়েছিল।'

'এবার আমি সব ছেড়ে দোব। এমনকি ডাক্তারিও। এ দেশেই আর থাকব না।'

ফাঁকা রাস্তা ধরে বড়মামার গাড়ি ফরফর করে চলেছে। এটা আবার কোন্ রাস্তা কে জানে। মেজমামা বললেন, 'আজ যে কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছিলুম। মনে হয় কুসির মুখ দেখে।'

মাসিমা বললেন, 'আমি যে তোমার মুখ দেখে উঠেছিলুম, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

বড়মামা বললেন, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম ?

'রোজ যা করো। নিজের মুখ দেখেই উঠেছিলে।'

আমি বললুম, 'আমি তাহলে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম ?'

মেজমামা বললেন, 'তুমি উঠেছিলে বড়মামার মুখ দেখে। ও মুখ দেখলে সারাদিন বড় আনন্দে কাটে।'

আশুবাবু হই-হই করে উঠলেন, ডানদিক, ডানদিকে চলুন। বাড়ি যাবেন তো।

'বাড়ি যাব কেন ? বাড়ি গেলে আর গা-ঢাকা দেওয়া হল কী ?'

মেজমামা বললেন, 'সে কী। তুমি তাহলে কোথায় চললে ?'

'সোজা মধুপুর।'

মাসিমা বললেন, 'মধুপুর ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল বড়দা ?'

'কবে আর ভাল ছিল বোন ?'

আশুবাবু বললেন, 'সত্যি মধুপুর ?'

'আমি বড় একটা মিথ্যে বলি না আশুবাবু। আমার মন্ত্রই হল করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে।'

মেজমামা বললেন, 'এতে তোমার মরার মতো কী করা হল ? তুমি যেখানে খুশি যাও, আমাদের নামিয়ে দাও।'

'এক যাত্রায় পৃথক ফল কি হয় ভাই ! আমরা সদলে মধুপুর যাব।'

আশুবাবু বললেন, 'কোথায় থাকবেন ?'

'সেখানে আমাদের ফাসক্লাস বাগানবাড়ি আছে। বড় বড় গোলাপ।'

'কী মজা।' আশুবাবু আনন্দে আটখানা।

মাসিমা বললেন, 'গাড়ি থামাও। আমরা নেমে যাই।'

আশুবাবু বললেন, 'মাঈজি আপনাদের আনন্দ হচ্ছে না ? কী সুন্দর আমরা চেঞ্জে যাচ্ছি !'

মেজমামা বললেন, 'বাড়ির কথা ভেবেছ ?'

'খুব ভেবেছি, দশ দশটা কুকুর পাহারা দেবে। কাকাতুয়া ধমকাবে।'

'ওদের দেখবে কে?'

'লক্ষ্মী আছে, জনার্দন আছে, শামুকাকা আছে।'

'না ফিরলে ওরা ভাববে না?'

'সখি ভাবনা কাহারে বলে, সখি যাতনা কাহারে বলে···।' বড়মামা গান ধরলেন। গাড়ির গতি বাড়ল।

আশুবাবুও হুঁ-হুঁ করছেন। খুব ফুর্তি! হুঁ-হুঁর মাঝেই সুরে বললেন, 'এইবার একটু চা হলে ভাল হত। ওই দেখা যায় দোকান দূরে।'

বড়মামা গানের সুরে উত্তর দিলেন, 'গাড়ি থামালেই। গাড়ি থামালেই। ওরা নেমে পালাবে। পালাবে, পালাবে, পালাবে। গাড়ি থামালেই।'

মেজমামা বললেন, 'আমরা চেঁচাব। চিল চেল্লান চিল্লে লোক জড়ো করে তোমাকে ছেলেধরার ধোলাই খাওয়াব। তোমাদের আহ্লাদ তখন বেরোবে।'

'ছেলেধরা?' বড়মামার অট্টহাসি। 'বল বুড়োধরা। তোরা নিজেদের এখনও ছেলে ভাবিস?'

আশুবাবু বললেন, 'ছোড়দা, কেন বাগড়া দিচ্ছেন? কী মজা করে, কেমন কোথায় চলেছি। এখন একটু বেশ ছেলেমানুষ হয়ে যান না। একেবারে শিশু।'

'হ্যাঁ মশাই। শিশু হব বললেই শিশু হওয়া যায়? খুব তো লাফাচ্ছেন। ওদিকে আপনার দোকানের সব মিষ্টি তো পচে ভ্যাট হয়ে যাবে।'

'সেই আনন্দেই থাকুন মেজবাবু। আমার মিষ্টি পচে না। সবই তো কাগজের তৈরি।'

হুহু করে গাড়ি ছুটছে। বড়মামা বললেন, 'ব্যাণ্ডেল ছাড়ালুম।

বুঝলি মেজ। শান্ত হয়ে বোস। বেশি ছটরফটর করিসনি। দুর্গাপুর আসার আগে দুর্গানাম জপ কর। ডাকাতের হাতে না পড়ে যাই। তার আগে শক্তিগড়ে পেট ভরে ল্যাংচা খাব। জয় বাবা তারকেশ্বর।'

মেজমামা বললেন, 'তাহলে আমরা চেল্লাই।'

'চেল্লাও বসে। আমিও গান ছেড়ে দিচ্ছি।'

বড়মামা টেপ ছাড়লেন, 'প্রেমদাতা নিতাই বলে গৌর হরি হরি বোল।'

সঙ্গে আশুবাবুর চটাস-চটাস হাততালি। ভোঁ ভোঁ গাড়ি ছুটছে। বড়মামার হাত খুলেছে। গাড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল। ভটাস্ করে একটা শব্দ।

'যাঃ, টায়ার গেল।'

গাড়ি ল্যাংচাতে-ল্যাংচাতে পথের বাঁ পাশে একটা বটগাছের তলায়। আশুবাবু গেয়ে উঠলেন, 'বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা!'

এরপর যা হল সে আর এক গল্প।

উৎপাতের ধন চিৎপাতে

জগন্নাথ গোস্বামীর গাড়িটা বড়মামা শেষে কিনেই ফেললেন।

বড়মামার যাঁরা ভালো চান, তাঁরা সকলেই বারণ করেছিলেন, 'সুধাংশু কাজটা ভালো করলে না। জগন্নাথ ঘোড়েল লোক। বোকা পেয়ে তোমার মাথায় টুপি পরাতে চাইছে। গাড়িটা পেট্রলে চলে না। ইঞ্জিনের অশ্বশক্তিতে নড়তে দেখিনি। মনুষ্যশক্তিতেই এতকাল চলে এসেছে। কিনতে হয় নতুন গাড়ি কেনো তোমার কি বাপ, অত ঠেলাঠেলির লোক আছে! ধড়্ধড়ে জিনিস। খোলটাই আছে। ভেতরে আত্মা নেই।'

জীবনে যে মানুষ কারুর কথাই শোনেননি, শুধু নিজের কথাই শোনাতে চেয়েছেন তিনি বুক ঠুকে গাড়িটা কিনেই ফেললেন।

গাড়ি সোজা চলে গেল কারখানায়। ছিল কালো, ফিরে এল গাঢ় বাদামী হয়ে। ফোম লেদারের ঝকঝকে গদি। বামপারে মরচে ধরেছিল, নিকেল পড়ে ঝকঝকে হয়েছে। হাতল-টাতল সব ঝিলিক মারছে। কার রেডিও স্টিরিও। আয়োজনে কোনও খুঁত নেই। পেছনের কাঁচে আধুনিক স্টিকার! ঘোড়া ছুটছে। বড়মামার ইচ্ছে গাড়ি চলবে কীর্তনের সুর ছড়াতে ছড়াতে।

'তুই একবার ভেবে দ্যাখ পিণ্টু, কারুর পাশ দিয়ে হুস্ করে গাড়ি বেরিয়ে গেল, কানে ঠোক্কর মারলো ইঞ্জিনের শব্দ নয়, প্রেমদাতা নিতাই। পৃথিবীতে প্রেমের বড় অভাব রে!'

মেজমামা বললেন, 'তোমার এই কীর্তনাঙ্গ গাড়ি চলবে না দাদা। আসল যে ইঞ্জিন সেইটাই তো নেই।'

'কি করে বুঝলি মেজো? তুই তো সারাজীবন ফিলজফি পড়িয়ে এলি। ঈশ্বর আছেন না নেই। আজ পর্যন্ত সে সমস্যার সমাধানও হল না। ইঞ্জিনের তুই কি বুঝিস?'

'সবাই বলছে !'

'আজও তুই প্রতিবেশীদের চিনলি না। প্রতিবেশী মানে প্রতিবাঁশি। বেসুরে বাজাই হল তাদের কাজ। বাগড়া ছাড়া তারা আর কি দিতে জানে ? এই গাড়ি চেপে তুই কলেজ যাবি। কুসী স্কুলে যাবে। আমার কুকুর ডগ-হসপিটালে যাবে। ছুটির দিনে আমরা সবাই মিলে পিকনিকে যাবো। জীবনটা একেবারে অন্যরকম হয়ে যাবে। সায়েবদের মত। লোকের কথায় নেচো না ব্রাদার। কানপাতলা লোক জীবনে সুখী হতে পারে না।'

মেজমামা বললেন, 'ভালো হলেই ভালো, তবে দশ হাজার টাকায় গাড়ি হয় না দাদা। ছ্যাকড়া গাড়ি হতে পারে।'

'আচ্ছা দেখাই যাক না কি হয়। নো রিস্ক, নো গেন। ইংরেজিটা ভোলোনি নিশ্চয় ?'

বড়মামা একটা ফ্ল্যানেলের টুকরো দিয়ে গাড়ির পালিশকে আরও পালিশ করতে লাগলেন। পেয়ারের কুকুর লাকি পাশে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে। আমার দায়িত্ব লাকির ওপর নজর রাখা। লাকির স্বভাব হল, আদরের জিনিসে সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে পেছনের পায়ে খাড়া হয়ে জিভ বের করে হ্যাহ্যা করা। মানুষের গায়ে আঁচড় লাগলে হরেক রকম ওষুধ আছে। গাড়ির পালিশে আঁচড় লাগলে একমাত্র ওষুধ আবার পালিশ চড়ানো !

নিকেলের হাতল ঘষতে-ঘষতে বড়মামা লাকিকে অনবরত সাবধান করে চলেছেন, 'লাকি খুব সাবধান, পা তুলবে না !'

আমার একটাই প্রশ্ন, আজ পর্যন্ত যার সঠিক উত্তর কারোর কাছেই পেলুম না কুকুরের চারটেই পা, না সামনের দুটো হাত পেছনের দুটো পা ?

প্রশ্নটা বড়মামাকে আবার একবার করতুম, সুযোগ পেলুম না। বাঘাদা এসে গেলেন। বড়মামাকে গাড়ি চালানো শেখাবেন। সাংঘাতিক চেহারা। রয়াল বেঙ্গলের মত গোঁফজোড়া। প্রায়

ফুট-ছয়েক লম্বা। ছাপ্পান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি। বাঘের মত গলা। টাইট প্যাণ্ট-জামা পরা। আমাকে একটা টুসকি মারলে উলটে পড়ে যাব। লাকি যথারীতি হাত তিনেক পেছিয়ে গিয়ে ঘেউ-ঘেউ শুরু করল।

বাঘাদা বললেন, 'আপনার কুকুরটা আমাকে দেখলেই অমন করে কেন বলুন তো?'

বড়মামা বললেন, 'ওর তো দৈত্য দেখার তেমন অভ্যাস নেই। ছু-একদিন দেখতে দেখতেই অভ্যাস হয়ে যাবে।'

বাঘাদা বাঘের মত গলায় হেসে উঠলেন। লাকি আরও একপা পেছিয়ে গিয়ে আরও জোরে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

মাসিমা দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা সাত-সকালেই কি আরম্ভ করলে? লোকে সকালে প্রভাতী গান শোনে, কীর্তন শোনে, এ বাড়ির যেন সবই অদ্ভুত। রাতে ছুঁচোর কীর্তন, সকালে কুকুরের কনসার্ট।'

বাঘাদা ওপর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমাকে ঠিক সহ্য করতে পারছে না দিদি!'

'তোমাকে নয়, তোমার ওই কাঠবেড়ালীর ল্যাজের মত গোঁফ ও সহ্য করতে পারছে না। কাল আসার আগে কামিয়ে এসো।'

মাসিমা ভেতরে চলে গেলেন। বাঘাদা করুণ গলায় বললেন, 'আচ্ছা সুধাংশুদা, আমার ভেতরে কি একটা চোর আছে? শুনেছি কুকুর মানুষ চিনতে পারে!'

'তুমি কি আচার চুরি করে খাও?'

'ছেলেবেলায় খেতুম।'

'অ্যায়, ঠিক ধরে ফেলেছে। কুকুরের নাক বড় সাংঘাতিক। আমি যেদিন সিরাপ চুরি করে খাই, আমাকে খুব ধমকায়।'

'সিরাপ চুরি?'

'ওই যে গো, ডাক্তারখানায় সিরাপ থাকে না, মিকশ্চার তৈরি

হয়। ওই জিনিসটার ওপর আমার অনেকদিনের লোভ, যেই দেখি কম্পাউণ্ডার চা কি সিগারেট খেতে গেছে অমনি বোতল খুলে খানিকটা মুখে ঢেলে দি।'

'সিরাপ তো আপনার নিজেরই জিনিস, নিজে খেলে চুরি হয় না কি?'

'ধুস, সিরাপ তো রুগীদের। মাঝে মাঝে কম্পাউণ্ডার ধরে ফেলে, কি হল, এই দেখে গেলুম আধ বোতল সিরাপ এরই মধ্যে সিকি বোতল হয়ে গেল! আমি ভয়ে চুপ করে থাকি। ফ্যাস-ফোঁস করে খুব মন দিয়ে রুগীব ব্লাড-প্রেসার দেখতে থাকি। চুরি করে খাওয়ার যে কি আনন্দ কুকুর বুঝবে কি করে!'

বাঘাদা বললেন, 'চলুন এইবার বেরিয়ে পড়া যাক। এরপর রাস্তাঘাট আর ফাঁকা পাওয়া যাবে না।'

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ, বড়মামা পাশে। আমি পিছনে। লাকিও আসার জন্যে বায়না ধরেছিল। বেশ মোটা একটা মাংসেব হাড়ের লোভ দেখিয়ে হরিয়ার কোলে তুলে দিয়ে আসা হয়েছে।

গাড়ি বি-টি রোডে বেরিয়ে এল। সবে রোদ উঠেছে। চারপাশ ঝকঝক করছে। দু-চারটে লরি হুস-হাস করে আসছে যাচ্ছে। গাড়িটাকে রাস্তার বাঁ-পাশে দাঁড করিয়ে বাঘাদার সঙ্গে বড়মামার জায়গা বদল হল। বাঘাদা এক রাউণ্ড বক্তৃতা দিয়ে নিলেন ক্লাচ কাকে বলে, ব্রেক কোন পায়ে, গিয়ার কাকে বলে।

বড়মামা বললেন, 'হাত-পা কেন কাঁপছে বলো তো?'

'ভয়ে। ও ভয় এখুনি কেটে যাবে। ভয়ের কি আছে! একটা জিনিস শিখিয়ে দি, অসুবিধে দেখলেই থেমে পড়বেন। থামার আগে জানালা দিয়ে ডান হাতটা বের করে দেবেন।'

'তার মানে?'

'মানে বুঝবে পেছনের গাড়ি। মানে তোমরা পাশ দিয়ে এগিয়ে পড় আমি একটু বিপদে পড়েছি। আপনাকে রোড্সাইনের যে

বইটা দিয়েছি সেটা ভালো করে দেখেছেন ? নো রাইট টার্ন, নো লেফট টার্ন, ক্রসিং অ্যা-হেড।'

'ও আমি সব দেখে নেবো। এখন তো আর লাগছে না। এখন তো সোজা যাবো, সোজা ফিরে আসব।'

'না না, ওটা আপনি সবার আগে ভালো করে বুঝতে শিখুন। সোজা রাস্তায় সব সময় চলা যায় না। জীবন অত সোজা নয়। পদে পদে বাঁক, ক্রসিং, বাম্প।'

বড়মামা ক্লাচ ছাড়লেন, গাড়ি সাংঘাতিক রকমের একটা ঝাঁকুনি দিয়ে উল্কার বেগে সামনে এগিয়ে গিয়ে আবার একটা ঝাঁকানি মেরে থেমে পড়ল। স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। ঝড়ের বেগে একটা লরি দু-ইঞ্চি তফাত দিয়ে চলে গেল। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম।

বাঘাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি করলেন ?'

'কি জানি কি করলুম, কোন্ পা কোথায় চলে গেল !'

'কোন্ পা কোথায় চলে গেল মানে ? একটা পা ক্লাচে, একটা পা ব্রেকে, স্টিয়ারিং-এ গিয়ার। এই তো আপনার মোট তিনটে যন্ত্র। এটা ছাড়বেন, প্রয়োজন হলে ওটা চাপবেন।'

'আমি ভুলে লেফট-রাইট করে ফেলেছিলুম। অনেক দিনের অভ্যাস তো।'

'এখুনি তো আমরা তিনজনই মারা পড়তুম।'

'তুমি তো আমার পাশে আছ।'

'পাশে আছি, কিন্তু পায়ে তো নেই !'

'নাও, নাও অনেক বকেছ। আর ভুল হবে না।'

গাড়ি স্টার্ট নিয়ে আবার চলতে শুরু করল। একটু লগবগ করলেও বেশ চলছে। সোজা রাস্তা চলে গেছে ব্যারাকপুরের দিকে। টিটাগড়ের কাছে এসে গাড়ি হঠাৎ গোঁত করে রাস্তার বাঁ পাশ থেকে ছুটে সোজা নেমে গেল পাশে। স্টিয়ারিং নিয়ে শিক্ষক আর ছাত্রের যুদ্ধ চলছে। ধামা, কুলো, ধুচুনি সাজানো ছিল, মড়মড় করে মাড়িয়ে

দরমার বেড়া ঠেলে গাড়ি সোজা ঢুকে পড়ল আটচালায়। চারদিকে গেলো গেলো শব্দ।

একটা উনুনের দু-হাত দূরে গাড়ি থেমে পড়ল। মনে হচ্ছে দরমার গাড়ি। যমদূতের মত গোটা চারেক লোক চারপাশে দাঁড়িয়ে। নামলেও মারবে, না নামলেও মারবে। এত বিপদেও বাঘাদার সেই এক প্রশ্ন, 'এটা কি করলেন?'

মারমুখী লোক চারটির একজন বড়মামার রুগী। বড়মামা লোক বুঝে, অবস্থা বুঝে বিনা পয়সায় চিকিৎসা করেন। এ সেই রকম একজন রুগী। বড়মামাকে দেখেই চিনেছে, 'আরে ডাক্তারবাবু যে!'

বড়মামা হাসিমুখে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। যেন প্লেন থেকে পাইলট নেমে এল। বড়মামা বললেন, 'রামু হিসেব কর কত টাকা গেল।'

রামু বললে, 'হিসেব পরে হবে। রামজী আপনাকে পাঠিয়েছেন। 'ওই দেখুন, আমার বহু, বোখার হয়ে পড়ে আছে।'

হাত-পাঁচেক দূরে মাচার ওপর একজন মহিলা শুয়ে আছেন আপদমস্তক মুড়ি দিয়ে। গাড়ি আর কিছু দূর এগোলেই অসুখ সেরে যেত!

রুগীর মুখ দেখেই বড়মামা বললেন, 'ম্যালেরিয়া। পিলে বেশ বড় হয়েছে রে। ডিসপেনসারিতে আয় ওষুধ দিয়ে দেবো। এক পুরিয়ার ব্যাপার।'

রুগী দেখতে দেখতে হিসেবও হয়ে গেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ শ-তিনেক টাকা।

বাঘাদা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন, 'ছ-টা দরমা আর গোটা-কতক ঝুড়ির দাম তিনশো টাকা? ভালোমানুষ পেয়ে টুপি পরাতে চাইছ? ধর্মে সইবে?'

'ধর্ম-টর্ম বলবেননি বাবু, দিন-কাল কি পড়েছে?'

বড়মামা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তাতো বটেই। তাতো বটেই!'

'তাতো বটেই ?' বাঘাদা হুঙ্কার ছাড়লেন। 'ওই দরমা আর ঝুড়ি সব আমি নিয়ে যাবো।'

'আঃ, বাঘা নীচ হয়ো না।' বড়মামা শাসনের গলায় বললেন।

'রাখুন মশায় আপনার নীচ। মূল্য যখন ধরে দিতেই হবে, মাল আমাদের।'

'কি করবে ?'

'পুড়িয়ে দেবো, জ্বালিয়ে দেবো।'

বাঘাদার গোঁ বাবা। দরমা আর ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে গাড়ি বাড়ি ফিরে এলো নটার সময়! এবার আর বড়মামা নয়, বাঘাদাই গাড়ি চালালেন। রাস্তার দুপাশ থেকে বড়মামার যাঁরা চেনা তাঁরা চিৎকার করে বলতে লাগলেন, 'ভালো সওদা হয়েছে ডাক্তারবাবু। তবে একটু দেখেশুনে আস্ত মাল কিনতে পারলে আরও ভালো হত!'

মাসিমা বাগানে খরগোসদের ঘাস খাওয়াচ্ছিলেন; দেখেই হই-হই করে উঠলেন, 'একি, একি ? মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা তোলা গাড়ি না কি ? এ সব কোথা থেকে তুলে নিয়ে এলে ?'

বাঘাদা বললেন, 'তুলে আনিনি। কিনে এনেছি দিদি। তিনশো টাকা দাম।'

মেজমামা আমগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একমনে জগিং করছিলেন। তিনশো মনে হয় এখনও হয়নি। মাঝপথেই থেমে পড়লেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'মাথায় আবার কি ব্রেন্‌ওয়েভ খেলে গেল, ভাঙা কঞ্চি আর বাঁখারি দিয়ে কি বানাবে, গ্রীন হাউস ?'

বড়মামা এতক্ষণে কথা বললেন, 'আরে না রে বাবা। এরা চাপা পড়েছিল। এসব হল ডেড-বডি, ক্যাজুয়েলটিস ?'

'অ্যাঁ বলো কি, এক চাপাতে অনেক নামিয়েছ তো, প্রায় লরির রেকর্ড।'

মাসিমা বললেন, 'উঃ, মানুষ হলে কি করতে ? তোমাকে নিয়ে আর পারি না বড়দা! তোমার ভাবনা ভাবতে ভাবতে আমার

রাতের ঘুম গেছে। মেজদা তুমি বললে কিচ্ছু ভাবিসনি কুসী ও গাড়ি চলবে না। গাড়ি চলছে না শুধু চাপা দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

বাঘাদা বললেন, 'চাপা নয়, ভাঙা দিদি। এটা একটা দরমার ছাউনি ভাঙা অংশ। আমরা ভেঙে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলুম। আপনি কলও বলতে পারেন। ওঁরা মনে মনে ডাক্তারবাবুকে ডাকছিলেন। গাড়ি একেবারে রুগীর বিছানার পাশে গিয়ে থামল। ডাক্তারবাবু নেমেই রুগীর নাড়ী টিপে ধরলেন। ভালো ডাক্তার তো, শুধু ওষুধের ব্যবস্থা নয়, তিনশো টাকা দিয়ে পথ্যের ব্যবস্থাও করে দিলেন।'

'ভিটে-মাটির যেটুকু আছে সেটুকু এবার খেসারত দিতে দিতেই শেষ হয়ে যাক। তারপর একদিন ভালো করে পাবলিকের হাতে আড়ং-ধোলাই হোক। তবে যদি তোমার চেতনা হয়!'

মেজমামা আবার জগিং-এর জন্যে প্রস্তুত হতে হতে বললেন, 'তুমি চালিয়ে যাও বড়দা। এইভাবে রেকর্ড করতে করতে একদিন তুমি ট্রাক-ড্রাইভার হতে পারবে। এখন থেকে পাগড়ি বাঁধাটা অভ্যাস করে রাখো, খইনি ধরো, তোমার ব্রাইট ফিউচার।'

মেজমামা লাফাতে শুরু করলেন এক দুই-তিন।

বাগানের একপাশে ধামা ধুচুনি দরমা ভাঙা পড়ে রইল। গাড়ি ব্যাক করে ঢুকে গেল গ্যারেজে। বাঘাদা হাসি হাসি মুখে মাসিমাকে বললেন, 'দিদি অনেক বকেছেন, এবার বেশ বড় এক কাপ চা।

॥ ২ ॥

দিন পনের হয়ে গেল, বড়মামা গাড়ি চালানো শিখছেন। মাসিমা আমাকে আর বড়মামার সঙ্গে যেতে দেন না। বিপদ হলে কে দেখবে! তাছাড়া সকালে লেখাপড়া করবে না বড়দের সঙ্গে হই-হই করে বেড়াবে? বাঘাদা বলছেন বড়মামার হাত পা দুটোই নাকি বেশ ধাতে এসে গেছে।

আজ রবিবার। পড়ার ছুটি। বড়মামা বললেন, 'কুসী বাঘা সার্টিফিকেট দিয়েছে। আজ আমি পিণ্টু আর লাকিকে নিয়ে বেরোই? ছেলেটা রোজ মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আর লাকিটা একদিনও গাড়ি চাপেনি। কুকুর বলে কি মানুষ নয়।'

বাঘাদা বিশাল গলায় বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ আজ ওরা চলুক। ঘরে থেকে থেকে সব ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে। এ যুগ হল ফাইটিং-এর যুগ। কিন্তু—।'

কিন্তুতে এসে বাঘাদা কেমন যেন কিন্তু কিন্তু হয়ে গেলেন।

বড়মামা বললেন, 'থামলে কেন, শেষ করো, শেষ করো।'

'কিন্তু লাকি যদি পেছন থেকে ঘাড়ে ঘ্যাঁক করে দেয়!'

'আমার কুকুর সে কুকুর নয় বাঘা। ও মানুষ হলে নেতা হত, বুঝলে! ধমকায়, ভয় দেখায়, কদাচ কামড়ায় না। চলো বেরিয়ে পড়ি। হাত পা নিসপিস করছে।'

মাসিমা হ্যাঁ না বলার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম। লাকি চনমন করছে। বেড়াতে যাবার নাম শুনলেই আনন্দে আটখানা! পেছনের ডান পাশের জানালায় লাকির জিভ বের করা মুখ। বাঁ পাশের জানালায় আমার মুখ। ফরফর করে গাড়ি চলছে। জানি না এই কদিনে বড়মামা কি কি করেছেন। তবে অনেককেই দেখলুম, গাড়ি দেখে হয় নর্দমা টপকে রকে, না হয় খুব দ্রুত পা চালিয়ে কোনও দোকানে ঢুকে পড়ছে।

বাঘাদা খালি বলছেন, 'অত শক্ত হচ্ছেন কেন? বেশ নরম হয়ে চালান, নরম হয়ে চালান।'

আজ আবার গান চলেছে, 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে।'

শুকচর চলে গেল, চলে গেল সোদপুর। টিটাগড়ের সেই ধামা-ধুচুনি-ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে গেল। লাকি মাঝে মাঝে নেচে উঠছে। বাতাসে ফুরফুর লোম উড়ছে। ফুটফুটে, খুশি খুশি মুখ,

ঢুলুঢুলু চোখ। গান চলেছে 'এরে পরতে গেলে লাগে, এরে ছিঁড়তে গেলে বাজে॥ কণ্ঠ যে রোধ করে···।'

বড়মামা অকারণে মাঝে মাঝে হর্ন বাজাচ্ছেন। বাঘাদা বলছেন, 'শুধু শুধু হর্ন দিচ্ছেন কেন? মিসিয়ুস্ অফ হর্ন।'

'যাঃ, ওটাও তো রপ্ত করতে হবে। শিখছি যখন সব ভালো করে শিখব। ফাঁকিবাজি আমার কোষ্ঠীতে নেই। সাফল্যের চাবিকাঠি কার হাতে? নিষ্ঠার হাতে।'

কথা শেষ করেই একবার হর্ন দিলেন। বাঁ পাশ দিয়ে ভুঁসকো চেহারার গোটা কতক মোষ যাচ্ছিল; একটা ভীতু মোষ চমকে লাফিয়ে উঠতেই, লাকি বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করে পেছনের আসন টপকে সামনের আসনে।

তারপর পরপর সব ঘটতে লাগল। গাড়ি কোনা মেরে রাস্তা ছেড়ে গড়িয়ে একটা মাঠে নেমে গেল। বাঘাদা বলছেন, 'ব্রেক ব্রেক।'

বড়মামা বলছেন, 'ব্রেক কোন্‌টা, ক্লাচ কোন্‌টা?'

লাকি বলছে, 'ঘেউ ঘেউ।'

স্টিরিও বলছে, 'কণ্ঠ যে রোধ করে স্বর তো নাহি সরে।'

ওদিকে হুহু করে এগিয়ে আসছে একটা জলা। কচুরিপানা ভাসছে। আমার বেশ মজা লাগছে। মনে হচ্ছে ইংরেজি সিনেমা দেখছি।

বাঘাদা কোনও রকমে পা বাড়িয়ে, হেলে কাত হয়ে কি একটা করলেন। পুকুরপাড়ে এসে গাড়ি থেমে পড়ল। চান করা আর হোলো না।

বড়মামা হাসি হাসি মুখে বললেন, 'কি রকম হোলো?'

বাঘাদা বললেন, 'দারুণ, তুলনাহীন! আর একটু হলেই ভরাডুবি হত।'

বড়মামা নেমে পড়লেন, 'আঃ কি সুন্দর! সবুজ সবুজ, যেন সবুজের সাহারা। ঘাসের গন্ধ, জলের গন্ধ, মাটির গন্ধ। মাথার ওপর নীল আকাশ উপুড় হয়ে আছে! ফড়িং দেখেছো ফড়িং?'

বাঘাদা বললেন, 'আপনি প্রাণ খুলে ফড়িং দেখুন। আমি ততক্ষণ বেল ঘর থেকে একটা ক্রেন নিয়ে আসি। টো করে গাড়িটাকে ওপরে তুলতে হবে।'

বড়মামা করুণ মুখে বললেন, 'তুমি কখন ফিরবে?'

'তাতো বলতে পারছি না।'

বাঘাদা দূরে ক্রমশ ছোটো হতে হতে একটা পুতুলের মত হয়ে গেলেন। গাড়ির ভেতরে গান বাজছে 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।'

বড়মামা হঠাৎ আনন্দে লাফাতে লাফাতে বললেন, 'উঃ! কোথায় নেমে এসেছি দ্যাখ। একবার তাকিয়ে দ্যাখ। রাস্তাটা মনে হচ্ছে পাঁচতলা উঁচুতে।'

ছিপ হাতে দু'জন এদিকেই আসছেন। বড়মামা বললেন, 'সেরেছে, চেনা হলেই বিপদ।'

চেনা হবে না মানে! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র বড়মামার রুগী ছড়িয়ে আছে।

'আরে ডাক্তারবাবু যে!' দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন, 'গাড়ি চান করাচ্ছেন?'

'না হে না এসেছিলুম মাছ ধরতেই, তোমাদের চিন্তায় আজকাল সব ভুলে যাই। এখন দেখছি ছিপ আনতেই ভুলে গেছি।'

'আর তার জন্যে মাছ ধরা আটকাবে? আমরা কি করতে আছি! একস্ট্রা ছিপ আছে। চলুন বসে যাই। আপনার খুব সাহস ডাক্তারবাবু, গাড়ি নিয়ে নামলেন কি করে?'

বড়মামা বীরের মত হাসলেন, হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে পুকুর ধারে চলে গেলেন। হয়ে গেল আজ। বড়মামার সাংঘাতিক মাছধরার নেশা। একবার বসে পড়লে, সহজে আর উঠছেন না।

'লাকি, আজ আমাদের উপোস।'

লাকি উত্তরে আমার গাল চেটে দিল। কখন যে বাঘাদা

আসবেন ক্রেন নিয়ে, ঈশ্বরই জানেন। মাসিমার কথা শুনলে এই দুর্ভোগ আর হত না। এতক্ষণ ছাদে উঠে চাঁদিয়াল ঘুড়িটা ওড়াতুম ফড়ফড় করে। বড়মামা ওদিকে চার করে ছিপ নিয়ে বসে পড়েছেন। চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। আকাশ একেবারে ঘন নীল। হাত নেড়ে রঙ বেরঙের ঘুড়িকে ডাকছে—আয়, আয়, উঠে আয় আমার বুকে। পকেটে একটা চকোলেট আছে। মুখে ফেলতে পারছি না লাকির জন্যে। ও বেচারা কি খাবে?

মনে মনে বাঘাদাকে ডাকতে লাগলুম। বাঘাদা এসো, বাঘাদা এসো। ডাকের কোনও জোর নেই। ঘণ্টা ছয়েক পরে বাঘাদা এলেন পান চিবোতে চিবোতে। সঙ্গে ক্রেন নয়, ভীম ভবানীর মত চারটে লোক, মোটা একটা কাছি। আমাব কাছে এসে বললেন, 'ফাসক্লাস।'

'কি ফাসক্লাস?'

তরুণের দোকানের ফিসফ্রাই। এক একটা প্রায় আধ হাত চওড়া। স্যালাড আর রাই দিয়ে খেতে যা লাগল না, টেরিফিক। অনেক ঝামেলা তো, তাই গায়ে একটু জোর করে নিলুম। পেটে খেলে পিঠে সয়। সুধাংশুদা গেলেন কোথায়?'

'ওই তো মাছ ধরতে বসে গেছেন।'

'অ্যাঁ, একেই বলে ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়। যাক আমার কাজ আমি করে যাই।'

পেছনের বাম্পারে দড়ি বাঁধা শুরু হল। সে এক এলাহি ব্যাপার। লাকি তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করছে। এক দৈত্যতেই ওর মাথা খারাপ হয়ে যায়। সামনে পাঁচ-পাঁচটা দৈত্য।

একজন দৈত্য বললে, 'ইতনা চিল্লাতা কেঁউ।'

লাকি উত্তর দিলে, 'ঘেউ-ঘেউ।'

বেলা বারোটার সময় আমরা তিনজন বাড়ি ফিরে এলুম। বড়মামা পুকুর ধারেই রয়ে গেলেন। কার ক্ষমতা ওঠায়। মাসিমার

ভয় দেখালুম, তাতেও কোনও ফল হল না। হাত নেড়ে বললেন, 'তোমার মাসিমাকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি, এ লস্ট চাইল্ড!'

মাসিমা শুনে বললেন, 'দাঁড়া, আমি ওই গাড়ি টুকরো টুকরো করে জলে ভাসিয়ে দেবো। বড়কত্তার বড় বাড় বেড়েছে।'

মেজমামা বললেন, 'কি করে খুলবি?'

'হাতুড়ি মেরে তাল তুবড়ে দোবো। এতবড় সাহস, বলে কিনা তোমার মাসিকে গিয়ে বলো, আমি হারিয়ে গেছি। হারাচ্ছি ড়াও আমাকে চেনে না?'

তিন সেন্টিমিটার একটা মাছ হাতে সন্ধের মুখে বড়মামা বাড়ি ঢুকলেন। সারাদিনের রোদে আর মাসিমার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে! ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কুসী কোথায়?'

'বাথরুমে চান করছেন।'

'মেজাজ?'

'ফায়ার। বলেছেন, নিলডাউন করিয়ে রাখবেন আপনাকে, আর গাড়িটাকে খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলে দেবেন জলে।'

'এসে কি বলেছিস?'

'যা বলেছিলেন।'

'ইস্, এখন কি হবে? কে আমাকে বাঁচাবে? মশারি ফেলে শুয়ে পড়ি। খোঁজ করলে বলবি, হাই ফিভার। তোর কাছে রসুন আছে?'

'রসুন কি করবেন?'

'সেই যে ছেলেবেলায় যেমন করতুম। চেপে শুয়ে থাকব। দেখতে দেখতে জ্বর এসে যাবে।'

॥ ৩ ॥

বাঘাদা বটতলায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাঃ আপনার হাত মোটামুটি ভালই তৈরি হয়েছে। এখন দরকার সাহস।

বড়মামা হাসলেন, 'সাহস? পৃথিবীতে কুসীকে ছাড়া আমি কাউকে ভয় পাই না বাঘা।'

গাড়ির পেছনে একটা এল অক্ষর লেগে গেছে, বড়মামা লাইসেন্স পেয়ে গেছেন।

'আপনাকে ব্যাকগিয়ারটা আর একটু ভাল করে সাধতে হবে।'

'এখন থেকে দিনকতক তাহলে অনবরত পেছন দিকেই চালাই।'

না, তার দরকার নেই। সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। গ্যারেজ থেকে বার করতে গ্যারেজে ঢোকাতে ঢোকাতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। আজ গাড়িটা আপনি একা বের করুন। দেখি কেমন পারেন।'

গ্যারেজের উল্টো দিকে নিত্যবাবুর বাড়ি। রাস্তাটা তেমন চওড়া নয়। বাঘাদা একবারেই গোঁত করে বের করে ফেলেন। বড়মামা স্টার্ট দিলেন। স্টিয়ারিংকে নমস্কার করলেন। বাঘাদা সামনে দাঁড়িয়ে হাতের ভঙ্গি করে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বাঘাদা যে ভাবে বের করেন, বড়মামা সেই ভাবে ওস্তাদী কায়দায় সাঁৎ করে ঘুরে বেরবার চেষ্টা করলেন। হলো না। বাঘাদা লাফিয়ে সরে গেলেন। গাড়ি ক্যারাচে হয়ে নিত্যবাবুদের দেয়ালে ধাক্কা মারার আগেই বড়মামা ব্রেক কষলেন। গাড়ি টুক করে দেয়ালে ঠোক্কর মারল।

সাহসী বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে ব্যাক করলেন। এবার গাড়ির পেছন দিকটা গ্যারেজের দেয়ালে লেগে গেল। তারপর সামনে পেছনে পরপর এমন সব কায়দা করলেন, দু'বাড়ির দেয়ালের মাঝে গাড়ি কোনাকুনি আটকে গেল। এগোতেও পারে না, পেছতেও পারে না।

বাঘাদা স্টিয়ারিং-এ বসে নানা ভাবে চেষ্টা করলেন। ঘেমে নেয়ে গেছেন। 'অসম্ভব। কি করে এমন করলেন?' বড়মামা হেসে বললেন, 'সে এক রকমের কায়দা।'

'কায়দা? সারাজীবন গাড়ি এই কায়দাতেই পড়ে থাক।'

'অ্যাঁ, সে কি ? হ্যাঁ, সে কি !'

'কেন তুমি একে ম্যানেজ করতে পারবে না ? তোমার তো পাকা হাত।'

'স্বয়ং ঈশ্বর এলেও পারবেন না।'

'বাঘাদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন।' বড়মামা চিন্তিত।

'বাঘা কী, হবে তাহলে ? ওই নিত্যবাবুর বাড়িটাকে ঠেলে একটু পেছিয়ে দিতে পারলে বেশ হত।'

'গাড়ি ঠ্যালা যায় সুধাংশুদা, বাড়ি ঠ্যালা যায় না।'

গাড়ির এ-পাশে ওপাশে ঘুরে ঘুরে দুজনের নানা রকম গবেষণা চলেছে। বড়মামা মাঝে মাঝে হতাশ মুখে নিত্যবাবুর নতুন তিনতলা বাড়িটার দিকে তাকাচ্ছেন, পারলে ডিনামাইট দিয়ে ভেঙে উড়িয়ে দিতেন। এদিকে সারি সারি সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে পড়েছে দু'পাশে ! মানুষের লাইন পড়ে গেছে। কারুর হাতে বাজারের ব্যাগ, কারুর মাথায় ঝাঁকা, কারুর কাঁধে ফুলঝাড়ু। পিঠে কাগজের বস্তা। একটি দুঃসাহসী ছেলে গাড়ির চাল টপকে চলে গেল। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

সোনপাপড়িঅলা হাঁকছে, 'চাই সনপাপড়ি !'

কাগজওয়ালা হাঁকছে, 'পুরানা কাগজ।'

ফুলঝাড়ু হাঁকছে 'চাই ঝাড়ু।'

এরই মধ্যে একটি সাইকেল রিকশায় মাইক নিয়ে বসে কবিরাজী দাঁতের মাজন। তিনিও চুপ করে বসে নেই, 'দাঁত কন কন, গরম খেতে পারেন না, ঠাণ্ডা সহ্য হয় না, মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে, মুখে দুর্গন্ধ হয়, এই কবিরাজী কালো দাঁতের মাজনটা…।'

রিকশা, সব কটা হাঁসের মত প্যাঁক প্যাঁক করছে !

'কি হোলো দাদা !'

বাঘাদা চিন্তিত মুখে বললেন, 'এ তো দেখছি ল অ্যাণ্ড অর্ডার প্রবলেম ! গ্যারেজটা ভাঙা ছাড়া উপায় নেই।'

'তাহলে যে দোতলাটাও নেমে আসবে বাঘা ?'

'উপায় কি ? কতক্ষণ এদের আটকে রাখবেন ?'

হই হট্টগোলে মাসিমা আর মেজমামা এসে গেছেন।

মাসিমা বললেন, 'যা চেয়েছিলুম তাই হয়েছে। বাঘাদা এই আপদটাকে খণ্ড খণ্ড করে লণ্ডভণ্ড করে দাও !'

বড়মামা আর্তনাদ করে উঠলে, 'না, কুন্টী, না !'

'না মানে ? এছাড়া আর কি উপায় আছে ? বাড়ি তুমি ভাঙতে পারবে না। তোমার এই ভাঙা গাড়ি কিন্তু ভাঙা যায়। উৎপাতের ধন চিৎপাতেই যাক।'

বড়মামার সেই গাড়ি আজও আছে। সবটাই আছে। গ্যারেজেই আছে। জুড়ে নিলেই হয়। চারটে চাকা চার দেয়ালে ঠেসানো। চলতে চায়, পারে না, কারণ ইঞ্জিন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একপাশে। গাড়ির খাঁচায় আমাদের পুষি ছটা বাচ্চা নিয়ে চোখ বুজিয়ে ধ্যানস্থ। সামনের আর পেছনের গদি বড়মামার ঘরে। লাকি চাখাচাখি করছে। ফোম লেদার তেমন সুবিধে করতে পারছে না। ব্যাটারিটা খুব সার্ভিস দিচ্ছে। আলো চলে গেলে ছুটো ফ্লোরেসেণ্ট বাতি জ্বলে।

সবই আছে। নেই কেবল বড়মামার উৎসাহ। তিনি এখন রিসার্চ করছেন অন্য বিষয় নিয়ে। গোটা তিরিশ বাঁদর এনে বারান্দায় রেখেছেন, সার সার খাঁচায়। যুগান্তকারী একটা কিছু করবেন। নোবেল পুরস্কার নাকি আর বেশি দূরে নেই।

'খাচ্ছে দাচ্ছে আর বড় বড় বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। কেবল কথা আর কথা। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা।' 'কাদের কথা বলছেন স্যার?'

অধ্যাপক বটকৃষ্ণ বসু খুব বেজার মুখে চেয়ারে বসে আছেন। চারপাশে কাগজপত্র ছড়ানো। অধ্যাপক বসু একজন গবেষক। আমরা তাঁর ছাত্র। সহকারীও বলা যেতে পারে। আমরা নিজেরা কিছু করি না। করার স্বাধীনতাও নেই। যা করতে বলা হয় তাই করি। যখন কিছু করার থাকে না তখন অধ্যাপক বসুর সামনে বসে তাঁর আক্ষেপ শুনি। পৃথিবীর তাবৎ বৈজ্ঞানিকদেব বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার। যেমন এই এখন হচ্ছে। বিকেলের চা-পর্ব শেষ হয়েছে। একটু আগে পর্যন্ত আমরা আমাদের ল্যাবরেটারি সংলগ্ন জমিতে কাজে ব্যস্ত ছিলুম। এখনও হাতে পায়ে কাদা লেগে আছে। মাথার চুলে গাছের পাতা আটকে আছে। হাত-পা পরিষ্কার করা হয়নি। চা শেষ করে আবার জমিতে নামতে হবে। যতক্ষণ না সূর্য ডুবছে ততক্ষণ আমাদের কাজ চলবে। গবেষণায় আমরা সফল হতে পারব কিনা জানি না। যদি সফল হতে পারি তা হলে কৃষিবিজ্ঞানের ইতিহাসে সেই সাফল্য সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

অধ্যাপক বসু একটা ছুরি হাতে উঠে দাঁড়ালেন, 'কাদের কথা বলছি? সেই সব অপদার্থ বিজ্ঞানীদের কথা, যারা শুধু পৃথিবীতে সেমিনার আর বক্তৃতা করে বেড়াচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই করছে না। কটা বাজল?'

'আজ্ঞে চারটে।'

'ফাইন। এখনও ফুল টু আওয়ার্স কাজ করার সময় আছে।'

আমাদের দুই সহকারীকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক বসু আবার জমিতে এসে নামলেন। বিঘে খানেক জায়গার ওপর আমাদের পরীক্ষা-

নিরীক্ষা চলেছে সবজি নিয়ে। প্রথম যেদিন আমরা কাজে যোগ দিতে এলুম, সেদিন অধ্যাপক বসু আমাদের যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সারমর্ম ছিল এই রকম, হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে নানা পরিবর্তন এসেছে। বনমানুষ মানুষ হয়েছে। অসভ্য মানুষ ক্রমশ সভ্য হয়েছে। মোমবাতি থেকে ইলেকট্রিক লাইট হয়েছে। লাসার বিম আবিষ্কৃত হয়েছে। ঘোড়ায় টানা ট্রামের জায়গায় ঠ্যাং উঁচু ইলেকট্রিক ট্রাম এসেছে। স্টিম ইঞ্জিনের জায়গায় ইলেকট্রিক লোকো এসেছে। দু চাকার ফোর্ডের আমলের মোটর গাড়ির জায়গায় আধুনিক আমলের হাওয়া গাড়ি এসেছে। মানুষ বেলুন ছেড়ে জেট বিমানে উঠেছে। রকেট ছুটছে গ্রহান্তরে। টোটকা আর ভুতুড়ে ওষুধের জায়গায় পেনিসিলিন এসেছে। গাদা বন্দুকের জায়গায় স্টেনগান, ব্রেনগান, মেশিনগান এসেছে। গাইডেড মিসাইল এসেছে। বিজ্ঞানের সব রাস্তা ধরেই মানুষ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় একটা দিকে বিজ্ঞানের কোনও দৃষ্টিই নেই। বিবর্তনের ধারাও সেখানে মিইয়ে গেছে। যে বিবর্তনে বাঁদর মানুষ হয়েছে, পৃথিবীতে জেব্রা, জিরাফ এসেছে, যে বিবর্তনে ডায়নাসর, টেরোড্যাকটিল পৃথিবীতে এসেছে চলে গেছে সেই বিবর্তন শাকসবজির জগৎকে ভুলে বসে আছে। হাজার হাজার বছর ধরে আলু আলুই আছে, ঢেঁড়স ঢেঁড়সই থেকে গেছে, ঝিঙে ঝিঙে হয়ে গ্যাট মেরে বসে আছে কতকাল! লাউ, কুমড়ো, উচ্ছে, করলা, চিচিঙ্গা, পেঁপে, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, বিট, শালগম, যা ছিল তাই আছে, যেমন ছিল তেমনি আছে! সবজির জগতে কোনও পরিবর্তন আসেনি, কোনও পরিবর্তন আনার চেষ্টাও হয়নি। সেই একঘেয়ে সবজি বছরের পর বছর আমরা খেয়ে চলেছি। খেতে বাধ্য হচ্ছি। ক্যাটকেটে ছোলা দিয়ে কুমড়োর ছক্কা। পাতে দেখলেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে ওঠে। ভেণ্ডির তরকারি। দেখলেই পরিবেশনকারীকে ঠেঙাতে ইচ্ছে করে। ঝিঙে! যেমন

তার চেহারা, তেমনি তার স্বাদ। পোস্তর সঙ্গে পড়লে তবে মুখে তোলা যায়। অন্য আর কিছু জোটে না বলে আমরা খেতে বাধ্য হই। সবজি না খেলে ভিটামিনের অভাবে মারা পড়ার ভয়ে খেতে হয়। তা না হলে সাধ করে কেউ পেঁপের ঝোল, কুমড়োর ঘ্যাঁট, বিট, গাজর, মূলো খেত না। কাবাব, কিমাকারি, ফিশফ্রাই, প্রনকাটলেট, বেজ্ঞালা, রোগনজুস, রেশমীকাবাব খেয়ে মনের আনন্দে থাকত। মাছ, মাংস, ডিম খান না এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নয়। তাঁদের মুখের আব মনের কি অবস্থা! মানুষের গো-যন্ত্রণা।

বৈজ্ঞানিক বসুর বক্তৃতা শুনে সেদিন আমাদের চোখ খুলে গেল। সত্যিই তো। সবজির জগতে কোনও পরিবর্তনই আসেনি সেই আলু, সেই পটল, সেই ঢেঁড়স, সেই বেগুন। আমাদের তা হলে কি করতে হবে! নতুন নতুন সবজি তৈরি করতে হবে। একটার সঙ্গে আর একটা মিলিয়ে নতুন নতুন আনাজ আনতে হবে। যা পৃথিবীর মানুষ আগে কখনও দেখেনি।

নানা ধরনের গাছে আমাদের বাগান ভবে গেছে। খোন্তাখুন্তি, কোদাল গাঁইতি, সার, ওষুধ এই নিয়ে সকাল থেকে সন্ধে আমাদের হিমসিম অবস্থা। এ-সব কাজে সবার আগে যা থাকা চাই তা হল ধৈর্য আর কল্পনা।

বৈজ্ঞানিক বসু, আমাদের স্যারের কল্পনার খুব জোর। আগামী পাঁচ বছরে আমরা যে-সব নতুন ফসল উৎপাদন করব তার একটা তালিকা সব সময় চোখের সামনে ঝুলছে। উচ্ছে আর পটল এক করে একটা নতুন আনাজ হবে, নাম উপটল। স্বাদ কেমন হবে জানা নেই তবে অনুমান করা গেছে। সামান্য তিক্ত। উচ্ছের মতো অতটা নয়। কুমড়োর তরকারিতে আলু দিতেই হয়। কুমড়োও মাটিতে ফলে আলুও তাই। দুটোকে এক করে নতুন একটা আনাজ—কুমড়ালু। ঝিঙের সঙ্গে চিচিঙ্গে মিলিয়ে ঝিচিং।

সিমের সঙ্গে কড়াই শুঁটি এক করে সিশুঁটি। পালম আর পুঁই দুটোই ভিটামিনে ভরপুর শাক। দুটোকে এক করে পাপুঁই। শশা আর করলা এক করে হবে শরলা। মাংসে পেঁয়াজ আর রসুন আলাদা আলাদা দিতে হয়। না দিলে চলে না। দুটোকে এক করে আমরা উৎপাদন করব পেঁসুন। লাউ আর পেঁপে এক করে হবে লাপেঁ। নাম শুনেই মনে হচ্ছে ফরাসী কোনও আনাজ। খেতে নিশ্চয়ই বিলিতি বিলিতি হবে। প্রফেসারের ধারণা, গাছটা নিশ্চয়ই লতানে হবে। গাজর আর বিট এক করে হবে গাবিট। বাঁধা আর ফুল এক করে বাঁফুল কপি। উঃ কি কাণ্ড যে হবে, ভাবা যায় না!

বড়মামার বেড়াল ধরা

বড়মামা মিলের হাসপাতালের ডাক্তার। রসুল সেই হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়। বড়মামার ডান-হাত বাঁ-হাত। প্রাইভেট সেক্রেটারি। যেমন ইঞ্জেকসান দিতে পারে তেমনি ভাল কাটলেট ভাজতে পারে। ফোঁড়াও কাটে। কচাকচ মুর্গীও কাটে। মিল এলাকায় মুর্গীর ছড়াছড়ি। বড়মামার ইদানিং আবার মুরগীতে অরুচি। হিসেব করে দেখেছেন হাজারখানেক মুরগী খেয়েছেন। এখন একটু মালপো-টালপোয় রুচি এসেছে! গোবিন্দভোগ চালের ভাত। একটু গাওয়া ঘি। আলুভাতে। ঘন দুধ। আমসত্ত্ব। আচার। পায়েস। একটু বৃন্দাবন বৃন্দাবন ভাব। রসুলের মহা দুঃখ। ডাক্তারবাবু মুরগী খাবেন বলে মিল কোয়ার্টার থেকে আগে যখন তখন একটা করে ধরে এনে জবাই করত। এখন সে উপায় নেই। রসুল বলছে, 'কেন এমন হলো ডাক্তারবাবু? একটু ওষুধ-টষুধ খেয়ে দেখুন না। মুরগী না খেলে শরীর থাকবে কি করে?'

বড়মামা বললেন, 'দূর বেটা, তুই এসবের বুঝবি কি? আমি বৈষ্ণব হয়ে গেছি। মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ, রসুনের নাম আমার কাছে করবি না। পারিস তো এক টিন ভাল গাওয়া ঘি জোগাড় কর। দেখ কে দেহাতে যাচ্ছে, আমার নাম করে বলে দে।' রসুল মনমরা হয়ে লম্বা টেবিলের কাছে গিয়ে চা বানাতে শুরু করল। ডাক্তারবাবু সারাদিনে বার পঞ্চাশ চা খান।

বড়মামা এইমাত্র একটা অ্যাক্সিডেন্ট কেস অ্যাটেণ্ড করে নিজের চেম্বারে এসে বসেছেন। আজকাল মেডিকেল লিটারেচার খুব কমই পড়েন। ড্রয়ারে একটা ঢাউস ভাগবত রেখেছেন। সময় পেলেই টেবিলের তলায় পা নাচাতে নাচাতে ভাগবত পড়েন। হাসপাতালের ওয়ার্ডে যে ক'টা বেড়াল ঘোরে সবকটাই বড়মামার বন্ধু। তাদের

একটার গোটা চারেক বাচ্চা হয়েছে। বেড়ালটা সবকটাকে বড় মামার চেম্বারে এনে তুলেছে! কোণের দিকে ওষুধের একটা খালি পেটি ছিল। সেইটা হয়েছে বাসা। বাচ্চা ক'টার চোখ ফুটেছে। অনবরত মিউ মিউ করে। মা'টার দেখা পাওয়াই ভার। সব সময় রান্নাঘরের সামনে ওত পেতে বসে আছে। বাচ্চা সামলাবার ভার বড়মামার! চোখ ফুটেছে। জগৎ দেখতে শিখেছে। প্যাকিং বাকস ভাল লাগবে কেন? প্রায়ই খচখচ করে গা বেয়ে বেয়ে একটা দুটো করে মেঝেতে ডিগবাজি খেয়ে পড়ছে। সারাঘরে থৈ থৈ সাদা বেড়াল। খেলছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে। যেন বেড়ালদের নার্সারী। বড়মামা পা নাচিয়ে নাচিয়ে ভাগবত পড়ছেন। রসুল দুধ গুলছে। বাচ্চা চারটে টেবিলের তলায় বড়মামার পায়ের কাছে গুলতানি করছে। মোটা মোটা দুটো বুড়ো আঙ্গুলের ওপর তাদের নজর। মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠে আঙ্গুলের মাথাটা কুড়কুড় করে কামড়াচ্ছে। যেই বড়-মামার সুড়সুড়ি লাগছে অমনি পাটা ঝাড়া দিয়ে বলছেন, 'ডোণ্ট ডিসটার্ব'। বেড়ালগুলো ছিটকে মিউ মিউ করে উঠছে। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বলছেন, 'আহা লাগল নাকি?' রসুল, 'সবকটাকে এক চামচে করে দুধ দে।' রসুল সঙ্গে সঙ্গে হুকুম তামিল করে আবার নতুন করে দুধ গুলছে। এই রকম বার চারেক হবার পর রসুল বিরক্ত হয়ে বাচ্চা চারটেকে প্যাকিং বাকসে ভরে ঢাকা বন্ধ করে দিল যাতে বেরিয়ে আসতে না পারে। বাচ্চাগুলো তারস্বরে মিউ মিউ করছে। বাকসর ভেতরটা আচড়াচ্ছে। বড়মামা ভাগবতে মশগুল হয়ে বলছেন, 'রসুল, দুধ দে, দুধ দে।' রসুল চারবারের চেষ্টায় এই একবার দুধে চায়ে এক করতে পেরেছে। সে বলছে, 'দিয়েছি তো, দিয়েছি তো।'

'দিয়েছিস তো চেঁচাচ্ছে কেন? আরো দে।'

'দুধে হবে না বাবু, মাকে চাইছে।'

'রাসকেলটার কান ধরে নিয়ে আয়।'

'কামড়ে দেবে যে।'

'কামড়ায় কামড়াক। তুই একটা এ-টি-এস নিয়ে যা। আয়, দিয়ে দি।'

'না কামড়াতেই এ-টি-এস!'

'তুই তো বলছিস কামড়াবে! কতরকম কথা বলিস বেটা?'

রসুল বড়মামার টেবিলে চায়ের কাপ ধরে দিতে দিতে বললে, 'বেঠিক কিছু বলিনি বাবু। খেয়ে খেয়ে তার যা চেহারা হয়েছে! ইয়া তাগড়া।'

বড়মামা বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন, জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘাগরা আবার কি হবে?'

'ঘাগরা নয়, ঘাগরা নয়, তাগড়া।'

'কে তাগড়া?' বড়মামা আগের কথা ভুলে গেছেন। বড়মামার এই বড় দোষ। এমনি একটু অন্যমনস্ক, তার ওপর ভাগবতে মন!

রসুল বেশ জোরে জোরে ঘরফাটানো গলায় বললে, 'বেড়ালটা খেয়ে খেয়ে এই কদিনে ইয়া তাগড়া হয়েছে!'

বড়মামা বই থেকে মুখ তুলে রসুলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'চেঁচাচ্ছিস কেন রাসকেল? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিস কেন? আমি কি কালা?'

রসুল গলটা আগের চেয়ে একটু খাটো করে বললে, 'আপনি যে শুনছেন না।'

'শুনছি না? সব শুনেছি। তুই জানিস না। বেশি মোটা হয়ে যাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। হার্ট উইক হয়ে যায়। দেখিসনি গুপ্তবাবুর কি হয়েছে? জেনেশুনেও যখন মোটা হচ্ছিস, হয়ে যা। আমার কি? আমার কাঁচকলা। মরবি ব্যাটা তুই।' বড়মামা ফড়াস করে চায়ে চুমুক দিয়ে আবার ভাগবতের পাতায় চোখ নামালেন।

রসুল বললে, 'খুব শুনেছেন! আমি মোটা হব কেন? আমি তো আপনার সামনেই দাঁড়িয়ে। দেখুন না, আমাকে কেউ মোটা বলবে?'

বড়মামা মুখ না তুলেই হুঁ হুঁ করে একটু হেসে বললেন, 'আজ মঙ্গলবার, কারুর চেহারায় নজর দিতে নেই, তবু যখন জিজ্ঞেস করলি বলতেই হচ্ছে, তুই যখন চাকরিতে ঢুকলি এই রোগা লিকলিকে ছিলিস, এখন ?'

বড়মামা আবার একটু হাসলেন, 'এখন তুই রিয়েলি ফ্যাট। ফ্যাট রসুল। রুগীদের খাবার চুরি করে করে ওদের দুধ সাবড়ে সাবড়ে ইয়া কেঁদো বাঘ। তুই ভাবিস আমি কিছু দেখি না, না ? ওরে আমার চোখ সবসময় খোলা। চারিদিকে আমার চোখ। মাথার পেছনেও আমার চোখ।'

রসুল বললে, 'কি মুশকিল ! হচ্ছে অন্য কথা, আপনি বলছেন আর এক কথা।'

বড়মামা বললেন, 'কার কথা ? তুই কি বলতে চাস আমি মোটা হচ্ছি ! তুমি চুরি করে করে কিচেন থেকে খাবার সাবড়াবে আর মোটা হব আমি, তাই না রাসকেল ! তোদের সব অপকর্মের ভাগ আমার ! ভুল ওষুধ দিবি, দায় আমার। হাণ্টার মাসকুলার ইঞ্জেকসান হাণ্টার ভেনাস করে দিবি, দায় আমার। আজ বলছিস, তুই চুরি করে খাবি মোটা হব আমি ! মামার বাড়ি পেয়েছিস, তাই না ? দিস ইজ হসপিটাল, দিস ইজ নট ইওর মামার বাড়ি।'

রসুল বললে, 'যাঃ বাবা।'

বড়মামা রসুলের কথার উপর দিয়েই মেল ট্রেনের মতো কথা চালিয়ে দিলেন, 'আমি মোটা হচ্ছি আমার নিজের পয়সায়। নিজের রোজগারের পয়সায় ঘি খেয়ে মোটা হচ্ছি। তাতে তোর এত চোখ টাটাচ্ছে কেন ? বেরো ! গেট আউট ! দূর হয়ে যা রাসকেল।'

রসুল বললে, 'ঠিক আছে আমি আবার প্রথম থেকে বলছি। একেবারে ফার্স্ট থেকে বলছি, তা না হলে আপনি সারাদিন চেঁচাতেই থাকবেন। আমি চা করছিলুম।' বড়মামা ভাগবত থেকে মুখ না তুলেই বললেন, 'কে তোকে চা করতে বলেছিল হতভাগা ? আমি

জানি না ভাবো ? তুমি দুধ খাবার লোভে চা করতে আস। এক টিন দুধে ক কাপ চা হয় বল্ রাসকেল !

'সে হিসেব পরে হবে সায়েব, আমি আগে ফার্স্ট থেকে বলি। প্রথমে আমি চা করছিলুম। জল ফুটছে। আমি দুধ গুলছি, এমন সময়ে চারটে বাচ্চা বাকস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সায়েবের পায়ের আঙ্গুল নিয়ে খেলা করছে। সায়ের মাঝে মাঝে বিরক্ত হয় যেই না পা ছুঁড়ছেন বাচ্চাগুলো মিউ করে উঠছে। সায়েব অমনি বলছেন রসুল দুধ দে। আমি অমনি যেটুকু দুধ গুলেছিলুম দিয়ে আবার চায়ের জন্য নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন, বাচ্চাগুলো আবার মিউ করে উঠল, সায়েব আবার দুধ দিতে বললেন, আমি দিলুম, আবার নতুন করে গুলতে শুরু করলুম, সায়েব আবার লাথি মারলেন, বেড়াল বাচ্চা মিউ করে উঠল, সায়েব বললেন দুধ দিতে, আমি আবার দুধ দিলুম, দিয়ে নতুন করে দুধ গুলতে শুরু করলুম।'

বড়মামা একটু একটু করে মুখ তুলছিলেন এবার পুরো মুখ তুলে রসুলকে ধমকে উঠলেন, 'তুই আমার খাটাল দেখেছিস, তাই না ! তোর মামার বাড়ির দুধ। আমিও বললুম, তুইও দিয়ে দিলি ! অতবার দুধ খাইয়ে বেড়ালগুলোকে মারবার তাল করেছ। জানিস না বেশি দুধ খেলে বাচ্চাদের ইনফ্যানটাইল লিভার হয়।'

রসুল বললে, 'জানি বলেই তো বাচ্চাগুলোকে ধরে ধরে প্যাকিং বাকসে ঢুকিয়ে দিয়েছি। ঢুকিয়ে যাতে বেরোতে না পারে তার জন্যে মাথায় ঢাকনা লাগিয়ে দিয়েছি। তখন থেকেই শুরু হয়েছে মিউ মিউ। ওই যে শুনুন এখনো মিউ মিউ করছে।'

বড়মামা কান খাড়া করে শুনলেন। শুনে বললেন, 'সত্যি তো, ভীষণ মিউ মিউ করছে। একটু দুধ দে।'

রসুল বললে, 'না] দুধে হবে না। আগেও আপনি এই কথাই বলেছিলেন। তখন আমি বলেছিলুম দুধে হবে না বাবু, ওদের মাকে চাই।'

বড়মামা বললেন, 'ঠিক বলেছিস। কোথায় সে রাসকেল? বেটাকে কান ধরে নিয়ে আয়!'

রসুল বললে, 'তখনো আপনি এই কথা বললেন। আমি বললুম, সেটা খেয়ে খেয়ে অ্যায়সা তাগড়া হয়েছে কান ধরে টেনে আনতে গেলেই আঁচড়ে কামড়ে দেবে। তখন আপনি সব গুলিয়ে ফেললেন। কে মোটা, কেন মোটা, বেড়ালের মোটা থেকে আমি মোটা, আপনি মোটা, তারপর আমাকে চোর বলেছেন, গেট আউট করে দিয়েছেন, সাতবার রাসকেল বলেছেন।'

বড়মামা খুব চিন্তিত হলেন। চিন্তা-টিন্তা করে রসুলকেই প্রশ্ন করলেন, 'কেন এসব বলেছি বল তো! যে ভাগবত পড়ে, যে আজ একমাস মাছ, মাংস, ডিম, পেঁয়াজ স্পর্শ করেনি, তার মুখে এসব কথা কেন? তার জানা উচিত কাউকে চুরি করতে না দেখে চোর বলা ভীষণ অপরাধ। তোকে তো আমি চুরি করতে দেখিনি। আমি শুনেছি রসুল চুরি করে। সেই শোনা কথা রাগের মাথায় তোর ওপর চালান করলুম কেন? এত রাগ তো ভালো নয়। যাক্‌গে, যা হয়ে গেছে গেছে। কিছু মনে করিস নি বাবা। এখন কড়া করে দু'কাপ চা কর। আর বিসকুটের টিনটা খোল। যা ঝামেলায় ফেলেছিলি, সব জট পাকিয়ে গিয়েছিল। এর চে ডাক্তারি সোজা রে!'

বড়মামা আবার ভাগবতে চলে গেলেন। রসুল চলে গেল চায়ে। এদিকে প্যাকিং বাকসের ভেতরে দক্ষযজ্ঞ চলেছে। চারটে বাচ্চার মধ্যে দুটো হুলো। সে দুটো মাঝে মাঝে কর্কশ গলায় মিয়াও, মিয়াও করে উঠছে। বাকসর ধারগুলো খচর-মচর করে আঁচড়াচ্ছে। ডালাটা খোলার জন্যে গোঁত্তা মারছে। বড়মামা আর থাকতে না পেরে করুণ গলায় রসুলকে বললেন, 'একটা কিছু করনা রে। আর তো পারা যায় না। কানের পোকা বের করে দিলে। তুই দেখ না চুক চুক করে লোভ দেখিয়ে, দুধের লোভ দেখিয়ে মা'টাকে যদি ধরে আনতে পারিস।'

রসুল চা আনছিল। কাপটা রাখতে রাখতে বললে, 'এ মা সে মা নয় সায়েব। বরং এক কাজ করি, বাকসটাকে বাইরে মাঠে ফেলে দিয়ে আসি দূর করে।'

বড়মামা আঁতকে উঠলেন, 'না না না। চিলে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে! মরে যাবে রে!'

'কিন্তু স্যার ডাক্তারখানায় বেড়ালছানার ডাক খুব ভাল শোনায় না। এই নিয়ে কিন্তু কমপ্লেন হতে পারে।'

'কমপ্লেন!' বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন, 'কে কমপ্লেন করবে রে! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে! জানিস আমি ডক্টর-ইন-চার্জ! মানুষ রুগী হতে পারে, বেড়াল পারে না!'

'পারে। তবে তার জন্যে তো পশু হাসপাতাল আছে স্যার। সেই কথা যদি কেউ বলে?'

'বললে মারবো মুখে এক থাবড়া। এখানে দশ মাইলের মধ্যে পশু চিকিৎসালয় কোথা রে? তুই যখন কমপ্লেনের ভয় দেখালি বেড়াল আমার চেম্বারেই থাকবে, যদ্দিন না বড় হয় তদ্দিন থাকবে। আর তোর মতো ওয়ার্থলেসের দ্বারা চা-ই হতে পারে, বেড়াল মানুষ হতে পারে না। আমি নিজেই যাচ্ছি ওদের মায়ের খোঁজে। করপোরেশান সাঁড়াশী দিয়ে পাগলা কুকুর ধরতে পারে আর আমি ডাক্তার হয়ে একটা বেড়াল ধরতে পারবো না! চ্যালেঞ্জ!'

এক চুমুকে চা শেষ করে বড়মামা উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়েই আবার বসে পড়লেন। বসে পড়ে বললেন, 'রসুল, আমি একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছি তাই না?' রসুল বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা একটু হয়েছেন বটে।'

'কেন হলুম?'

'ওই বেড়াল স্যার! অনবরত চেল্লাচ্ছে।'

'না, ঠিক নয়। সামান্য বেড়াল আমাকে উত্তেজিত করছে। ভেরি ব্যাড। ভাগবতের কোনো ফল পেলুম না রে! দপ করে রেগে

যাচ্ছি কথায় কথায়। রাগটা যেন আগের চেয়ে বেড়েই যাচ্ছে। এটা ঘি খেয়ে হচ্ছে বোধ হয়। ডাক্তার, কাল থেকে তোমার ঘি বন্ধ।' বড়মামা নিজেই নিজের ঘি বন্ধ করে আবার ভাগবত নিয়ে বসলেন।

রস্থল বললে, 'এই যে বললেন বেড়াল ধরতে যাবেন!'

'বেড়াল ধরতে যাব মানে? ইয়ারকি পেয়েছিস! ডাক্তারের কাজ বেড়াল ধরা, রাসকেল?'

বড়মামা আবার রেগে গেলেন। রস্থল বড় মামাকে হাড়ে হাড়ে চেনে। রস্থল কিন্তু ঘাবড়ে গেল না। সে বললে, 'এমনি বেড়াল নয়। মা বেড়াল। বেড়ালের মা। বিললী কা মাতাজী!' প্রায় সব ভাষাতেই রস্থল বোঝাতে চাইল। ইংরেজিটাই বাকী রইল। বললেই পারত, ক্যাটস্ মাদার বা মাদার অফ কিটেনস।

বড়মামা বললেন, 'দেখেছিস মাথার কি অবস্থা হয়েছে। এই বলছি, এই ভুলে যাচ্ছি! ঘি খেলে আগে মানুষের স্মৃতিশক্তি বাড়ত। এখন উল্টোটা হয়, কমে যায়। ঘিয়ে ভেজাল আছে রে রস্থল। লাগা আজ, লাগিয়ে দে বেশ ঝোল ঝাল।'

বড়মামার কথায় রস্থলের চোখ চকচক করে উঠল। গত দু'মাস ভোরবেলা মুরগীর ডাকই খালি শুনছে, একটা ঠ্যাঙও চিবোতে পারছে না। রস্থল লাফিয়ে উঠল, 'ইয়াসিন একটা দিয়েই রেখেছে স্যার। কাজে লাগাতে পারছিলুম না। প্রেসার-কুকারে মরচে ধরে গেল। আমি তাহলে এখুনি শুরু করে দি? একবার মল্লার হাটে চলে যাই। ফাইন বাসমতী নিয়ে আসি। কিলোটাক আলু। মশলাও কিছু লাগবে। এখন আরম্ভ করলে সন্ধে সাতটা-আটটার মধ্যে রেডি হয়ে যাবে।' রস্থল ধড়ফড় করে পালাচ্ছিল।

বড়মামা বললেন, 'রোককে! আগে বেড়াল তারপর অন্য কাজ।'

'বেড়াল তো আপনি ধরবেন স্যার। সেই রকমই তো বললেন।'

'ভুলে গেছিস বোধহয় তুই আমার অ্যাসিসটেন্ট। আমি যা করব সব সময় তুই আমার পাশে থাকবি পাঁঠা।'

বেড়াল ধরার সাজসরঞ্জাম অনেক। বড়মামার হাতে অফিসের ওয়েস্ট পেপার বাসকেট। রসুলের হাতে দুটো বিস্কুট, ক্লোরোফর্মের শিশি, একটা বড় ডাস্টার, একটা ইঁদুর ধরা কলে ছোট একটা নেংটি ইঁদুর। বড়মামার প্ল্যান একরকম, রসুলের প্ল্যান আর একরকম। কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বড়মামা ঠিক করেছেন হাসপাতালের কিচেনের কাছে গিয়ে, মিনি, মিনি, আয় মিনি করে চুকচুক করে বেড়ালদের গাদা থেকে আসল বেড়ালটাকে ডেকে এনে বিস্কুট খেতে দেবেন। বেড়াল যেই খেতে শুরু করবে ঝপ করে বাসকেটটা চাপা দিয়েই, ডাস্টারে খানিকটা ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে ওপরে চেপে ধরবেন। বেড়ালটা অজ্ঞান হয়ে যাবে তখন সেটাকে চ্যাংদোলা করে এনে বাচ্চাগুলোর কাছে চিৎপটাং করে শুইয়ে দেবেন।

রসুলের প্ল্যান অন্য। রসুল ইঁদুরের লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে বেড়ালটাকে ঘর পর্যন্ত টেনে আনবে। তারপর ঘরে ঢুকিয়ে ডাস্টার দিয়ে চেপে ধরে গলায় একটা দড়ি বেঁধে গ্রিলের সঙ্গে আটকে রাখবে। থাকো বেটা বন্দী হয়ে। ছেলেমেয়ে যদ্দিন না মানুষ হচ্ছে তদ্দিন তোমার মুক্তি নেই।

বড়মামা বলছে. 'মরবি রসুল। বেড়ালের গলায় কেউ কখনো ঘণ্টা বাঁধতে পারেনি। ঘণ্টা আর দড়িতে তফাত কতটুকু! তোর জন্যে দেখবি সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।'

দু'জনে দু'রকম প্ল্যান নিয়ে রান্নাঘরের সামনে। ছ'টা বেড়াল ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে। বড়মামা বললেন, 'কোনটা বল তো? কোন্ রাসকেলটা রে?'

বেড়ালটা মাঝে মাঝেই আসে যায়! কেউই তেমন লক্ষ করে দেখেনি। ছ'টা বেড়ালের তিনটে সাদা। দু'টো সাদাতে কালোতে। একটা কুচকুচে কালো! কালোটা নয়। সাদা তিনটের যে কোনো

একটা। কিন্তু কোনটা? বড়মামা আবার রেগে গেলেন, 'তোর মত গাধা আর দু'টো নেই রসুল। তুই একটা বেড়াল চিনতে পারিস না, রুগী চিনিস কি করে?'

রসুল বললে, 'মানুষের নাম আছে, কার্ড আছে। এক একটা মানুষকে এক এক রকম দেখতে। বেড়াল তো সব এক রকম। খালি যা একটু রংয়ের তফাৎ।'

বড়মামা বললেন, 'জানিস যখন এক, তখন চিহ্ন দিয়ে রাখিসনি কেন? গায়ে অফিসের একটা শীল মেরে দিতে কি হয়েছিল? সবেতেই ফাঁকিবাজি। আমি জানি না, আমার বেড়াল ধরে দাও।'

রসুল ইঁদুর-ধরা কলটা মেঝেতে নামিয়ে একবার চুকচুক করতেই ছটা বেড়াল বেড়াল দৌড়ে এল। একটা ফোঁস করে সামনের জালটা শুঁকছে, একটা কলের ওপপে থাবা মারছে। দু'টো পাছে শিকার হাতছাড়া হয়ে যায় সেই ভয়ে মুখোমুখি বসে ল্যাজ ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। ফ্যাঁ ফ্যাঁ গড়র গড়র গড়র। দুজনেরই পিঠ ধনুকের মতো বেঁকে উঠেছে। বড়মামা পায়ে পায়ে পেছোতে পেছোতে কোণের দিকে দেয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়েছেন। আর সরবার জায়গা নেই। কিছু করবারও নেই। একমাত্র রসুলকে গালাগাল দেবার জন্যে মুখটাই যা খোলা আছে। দু'টো হাতই জোড়া।

বড়মামা বললেন, 'রাসকেল, তখনই বলেছিলুম কাঙালদের শাকের ক্ষেত দেখাসনি। একটা ইঁদুর ছ'টা বেড়াল। সামলা এবার ঠ্যালা ইডিয়েট, তোর মাথায় কবে যে ভগবান একটু বুদ্ধি দেবেন! ও, তোর তো আবার ভগবান নয়, আল্লা।'

রসুল বললে, 'ইঁদুরটাকে ছেড়ে দিয়ে দেখি।'

'তা দেখবে না! নেংটি ইঁদুরের দৌড় জানিস? ছাড়লেই দৌড়োবে, পেছন পেছন বেড়ালও ছুটবে। তখন ধরবি কি করে! এক বালতি জল এনে গায়ে ছিটো তাহলে যদি মারামারি থামে!'

'জল ছিটোলে বেড়ালের ঝগড়া বেড়ে যায় বাবু। ছেলেবেলায়

দেখেছি তো, তার চেয়ে ইঁদুরটাকে নিয়ে ঘরে চলে যাই তাহলে লোভে লোভে সব ক'টা চেম্বারে চলে আসবে আমাদের এরিয়ায়, তখন ঠিক ম্যানেজ করা যাবে।'

'পাগল হয়েছিস? এর মধ্যে দু'টো হুলো আছে না ইডিয়েট, বাচ্চা চারটেকে সাবাড় করে দেবে। তুই ক্লোরোফর্ম ছিটো, সবক'টা অজ্ঞান হয়ে যাক। তারপর যা-হোক একটা কিছু করা যাবে।'

রসুল আর বড় মামা কথা কাটাকাটি করছেন, এদিকে ইঁদুরের সাক্ষী রেখে তিন জোড়া বিড়াল ফুলছে, গোঁ গোঁ করছে, মাঝে মাঝে থাবা তুলে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে উঠছে। বড়মামার এই দুঃসময়ের রণক্ষেত্রে প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে প্রবেশ করলেন হাসপাতালের সিস্টার। সাদা কাপড়, সাদা টুপি। বড়মামার খোঁজে চেম্বার থেকে এই পর্যন্ত ছুটে এসেছেন। ব্যাপার দেখে মুখের কথা মুখেই আটকে গেছে। রসুল আর বড়মামাকে দেখে মনে হচ্ছে চাঁদে যাবেন। হাতে নানা ধরণের সরঞ্জাম। বড়মামা রসুলকে বলছেন, 'তোর তো মানুষ মারাই কাজ, সাহস করে যে কোন একটা সাদাকে চেপে ধরতে পারছিস না ব্যাটা!' রসুল একপা এগোয় তো দশপা পেছোয়। ইঁদুর কলে ইঁদুরটা ভয়ে সিঁটকে একেবারে ভিতরের দিকে ঢুকে বসে আছে। ছ'টা বেড়ালের গন্ধে আর শব্দে সে ভবিষ্যৎ বুঝে ফেলেছে—রক্তাক্ত মৃত্যু। সিস্টার বলছেন, 'ডাক্তার-বাবু শিগগির চলুন, গুপ্তু সায়েবের অবস্থা আবার খারাপের দিকে। শ্বাস নিতে পারছেন না।'

বড়মামা বললেন, 'গুপ্তু সায়েবটা কে? একে আবার কোত্থেকে আমদানী করলেন?'

'ওই তো আমাদের ক্যাশিয়ার বাবু।'

'তার নাম তো গুপ্তো বাবু। গুপ্তু বলছেন কেন? ইংরেজীর উচ্চারণ জানেন না বুঝি!'

'আজ্ঞে উনি যে ডবল ও লেখেন।'

'ডবল কেন, চার ডবল লিখলেও গুপ্ত ইজ গুপ্ত। সিঙ্গল ডিমের ওমলেটও ওমলেট, ডবল ডিমের ওমলেট সেই ওমলেট।'

'গুপ্তু না বললে উনি রেগে যান। এই তো সেদিন যখন জ্ঞান ফিরে এল কে যেন দেখতে এসে বলেছিলেন গুপ্ত সাহেব, উনি চটেমটে বললেন, আই অ্যাম গুপ্তু, নট গুপ্তও ও। এত উত্তেজিত হলেন শেষে আপনি গিয়ে সেই আবার ঘুমের ইঞ্জেকসান দিলেন!'

বড়মামা দার্শনিকের মত বললেন, 'গুপ্ত আর গুপ্তু, মুখার্জি আর মুকার্জি, দাশ আর দশ চিতায় উঠলে সব সমান সিস্টার। কিন্তু আমি এখন যাই কি করে! দেখছেন তো আমার অবস্থা! ডু ওয়ান থিং, অকসিজেনের নলটা ঠেসে নাকে ঢুকিয়ে দিয়ে রুম কুলারের ভল্যুমটা বাড়িয়ে দিন। অত খেলে মানুষ বাঁচে? চারদিক থেকে চর্বি এসে হার্টটাকে চেপে ধরেছে। ডাক্তার কি করবে! গবগব করে খাবার সময় গুপ্তুর খেয়াল ছিল না দিন দিন আড়াইমণী কৈলাশ হচ্ছি! যেতে দিন, যেতে দিন, যো যায়েগা যাউক যো আয়েগা আউক।'

'আজ্ঞে যায়েগা যাউক বললে, আমাদেরই বিপদ। মাইনে হবে না এ মাসে। ক্যাশিয়ার ছাড়া মাইনে দেবে কে?' বড়মামা এতক্ষণে একটু হাসলেন, 'পৃথিবীতে ক্যাশিয়ারের অভাব আছে সিস্টার! এক যাবে আর এক আসবে। গুপ্ত গেলে, ঘোষ, বোস, মিত্তির যে কেউ একজন আসবে।'

'তা হলেও হাতের পাঁচ কি ছাড়া উচিত স্যার? একে তো বাঁচাবার চেষ্টা করতেই হবে।'

'তা তো হবেই, খাবার জন্যে বাঁচাতে হবে। দেশে দুর্ভিক্ষ করার জন্যে এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। চলুন দেখি।'

যাবার সময় রসুলকে বললেন, 'একটাকে পটকে ফেল তারপর ওই ডাস্টার দিয়ে জড়িয়ে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে চেন দিয়ে টেবিলের পায়ার সঙ্গে বেঁধে ফেল।'

সিস্টার আর বড়মামা পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলেন। সিস্টার যেতে যেতে শুধু একবার প্রশ্ন করলেন, 'বেড়াল কি করবেন ডাক্তারবাবু?' বড়মামার এক উত্তরে সব কথা বন্ধ, 'আমার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে দান করা হবে।'

বড়মামা চলে যেতেই রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এল ইয়াসিন। ইয়াসিনের বাড়ি বিহারে। এই হাসপাতালে রাঁধুনীর কাজ করছে বছর দশেক। থেকে থেকে বাংলা শিখেছে! ভাঙা ভাঙা বাংলা বলে। গুণ্ডার সর্দারের মত বিশাল চেহারা। ইয়া মোটা লোমঅলা হাত, গর্দান। লাল গুলি গুলি চোখ। খাকি পোশাক, কাঁধে একটা হাত-টাত-মোছা তোয়ালে। ইয়াসিন একটা বিড়ি ধরিয়ে বেড়ালের যুদ্ধ কিছুক্ষণ দেখে রসুলকে জিজ্ঞেস করলে, 'ক্যা শুরু কর দিয়া। আরে মারো না ইয়ার এক লাথ।'

'মারো না ইয়ার এক লাথ,—রসুল ভেঙচি কেটে বললে, 'আর হামারা চাকরি চলা যায়'।

'আই বাপ্। চাকরি তুমহার যাবে কেন? বিল্লী কো তো এইসি আদমী লাথাতা। দেখেগা, হাম ঝাড়েগা একঠো। এক লাথ সে ছেগোকা কো একসাথ চারদিওয়ারিকা উধার কম্পাউণ্ডমে ফেক দেঙ্গে। দেখেগা!' রসুল এমন একটা ভঙ্গী করল যেন হাবিব পেনালটি কিক নিতে যাচ্ছে।

রসুল বললে, 'লাথ মারতা হায় মারো লেকিন ইসমে ডাগদারবাবুকা একঠো সফেদ বিল্লী হায়, উ চলা যায় তো তুমহারা কেয়া হোগা, আল্লা মালুম।'

ইয়াসিন কোমর থেকে হাত নামিয়ে বললে, 'সাচ!'

'সাচ,' রসুল বললে। এদিকে একটা কালো আর একটা সাদায় খুব জমেছে। সাদাটা একটা কোণ পেয়েছে। কালোটা ল্যাজ ফুলিয়ে একেবারে ধনুক। সাদাটাকে দু একবার থাবা চালিয়েছে। কোষা কোষা লোম খসে পড়েছে। নবাবী আমলের মুরগীর লড়াই

দেখা পূর্বপুরুষের রক্ত ইয়াসিনের শরীরে। বেড়ালের লড়াই দেখে তার মহানন্দ! মুঠো পাকিয়ে ইয়াসিন কালোটাকে উৎসাহ দিচ্ছে, 'লাগ লাগা, মার এক থাবা। বহুত আচ্ছা। কালো বেটা জিতে যাবে।'

রসুল জানে, যে বেড়াল কোণ নিয়েছে তাকে হারাবার সাধ্য কারুর নেই। সে বললে, 'কালা জিতে তো দশ রুপীয়া বেট।'

ইয়াসিন বললে, 'সাদা জিতে তো বিশ রুপীয়া বেট। চলো, হো যায়।'

রসুল মাথা ঝাঁকিয়ে বললে, 'হাঁ হো যায়।'

কালো দশ, সাদা কুড়ি। টাকার লড়াই হচ্ছে। একপাশে রসুল, একপাশে ইয়াসিন। মাঝে মাঝেই তুজনে চিৎকার করে উঠছে, 'ইয়া, লাগা লাগা আওর থোড়া। আ-আ।' ইয়াসিন মাঝে মাঝে গোঁফ চুমড়ে নিচ্ছে। রসুলের সাদাটা ইয়াসিনের কালোটার চোখের কাছে একটা থাবা বসিয়ে দিতেই ইয়াসিন একটু চুপসে গেল। রসুলের ধেই ধেই নাচ, 'লাগা বাহাতুর, লাগা বাহাতুর।' ইয়াসিন কালোটাকে বলছে, 'মছলিকা বড়া দাগা দেগা, মার এক থাবা, এক বাটি তুধ দেগা, মার এক থাবা।' রসুল বললে, 'ইয়াসিন, এটা কিন্তু অন্যায় হচ্ছে। তোমার হাতে রান্নাঘর বলে তুমি মাছের লোভ, তুধের লোভ দেখাচ্ছ। এভাবে জেতালে টাকা পাবে না।' রসুল এমনভাবে বলল বেড়াল যেন মানুষের কথা বোঝে। কালোটা হঠাৎ তেড়ে গেল। ইয়াসিন মছলি মছলি বলে দালান ফাটানো চিৎকার করতেই, রসুল কনডেনস মিল্ক, কনডেনস মিল্ক বলে তার সাদাটাকে লোভ দেখাল। রান্নাঘর থেকে এদিকে আরো অনেকে বেরিয়ে এসেছে। সকলেই রসুলের বিপক্ষে, কারণ ইয়াসিনের জেতার অঙ্ক অনেক বেশি।

কে জেতে কে হারে! সাদাটা কোণ দিয়ে অ্যায়সা বসেছে, কালোটা তেড়ে গেলেও সাদাটার ফ্যাঁস আর থাবার ভয়ে ঝটাপটি

লটাপটি করতে পারছে না। ঝটাপটি লটাপটি না হলে লড়াইয়ের ফয়সালাও হবে না। এইভাবে চললে সারারাত কাবার হয়ে যাবে। ইয়াসিন সেটা বুঝেছে। ইয়াসিন বলছে 'উসকো হুঁয়াসে নিকালো।'

'হুঁয়াসে নিকালো?' রসুল প্রতিবাদ করে উঠল. 'কাহে হুঁয়াসে নিকালবে? মামার বাড়ি পা গিয়া! যে যে পোজিসানে আছে সেই পোজিসানেই লড়বে।'

ইয়াসিন বললে, 'ফুটবলমে পোজিসান চেঞ্জ হোতা নেই? আবি কালা আয়গা উধার, সাদা জায়েগা ইধার। নেহিতো দোনো চলা আয়েগা পেনালটি পোজিসানে। এ হামীদ ভাই. উসকো খোঁচাও।'

অ্যাসিসটেণ্ট হামীদ সত্যিসত্যিই সাদাটাকে খোঁচাতে গেল। রসুলের মেজাজটা এমনিই ভাল নয়। কথায় কথায় তার হাত ওঠে। রসুল খঁা করে হামীদের কলার চেপে ধরে বললে, 'এক পা আগে বাড়ে তো হালত চেঞ্জ কর দেগা।' ইয়াসিন সঙ্গে সঙ্গে রসুলের ঘাড় চেপে ধরে দুবার ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'চোপরাও জমাদার।' এদিকে সাদাটা কালোটাকে আর একটা মোক্ষম থাবা ঝেড়ে দিয়েছে। রসুল জানে, জিততে হলে এখন তাকে গায়ের জোরে জিততে হবে।

রসুল হামীদের কলার ছেড়ে দিয়ে ইয়াসিনের চিবুকের তলায় একটা ঘুষি ঝেড়ে বললে, 'চোট্টা কাঁহাকা'। আর বেশি কিছু বলার সে সময় পেল না। মাটি থেকে অল্প একটু উঁচু হয়ে, জমির হাত খানেক ওপর দিয়ে প্রায় উড়ে গিয়ে যে কোণে সাদা আর কালো বেড়াল দুটো বাজির লড়াই লড়ছিল সেই কোণে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে বেড়াল দুটোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। ক্লোরোফর্মের শিশিটা ভেঙে শিশির ভাঙা গলাটা বাঁ হাতের তালুতে বিঁধে গেল! সারা দালানে ক্লোরোফর্ম উড়ছে। একপাশে ডাস্টার, অন্যপাশে গড়াচ্ছে ওয়েস্ট

পেপার বাসকেট। রসুলকে আর উঠতে হল না। ইয়াসিনের ঘুষি আর ক্লোরোফর্ম যে কোনো একটাই তার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। একসঙ্গে দুটো! বেড়াল ছটারও সেই এক অবস্থা। বারকতক ফোঁস ফোঁস করে সবটাই পালাবার চেষ্টা করেছিল। কেউ একপা কেউ দু'পা গিয়ে লটকে পড়েছে। ইঁদুরটা খাঁচামুখে এসে মুখ থুবড়ে পড়েছে। তার লম্বা ল্যাজটা ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

বড়মামা তখন গুপ্ত সাহেবকে নিয়ে হিমসিম। আজীবন নস্যি নিয়ে নিয়ে সায়েবের নাকের ছিদ্র দুটো কামানের নলের গর্তের মত। বড়মামা সিস্টারকে বলছেন, 'এ ছেঁদা ছোটো না করলে অকসিজেন ভেতরে যাবে কি করে! সবই তো লিক করে বেরিয়ে আসবে। চারদিক থেকে প্লাস্টার অফ প্যারিস দিয়ে গোল করে বুজিয়ে আনতে হবে। এ কি আমাদের কম্ম! রাজমিস্ত্রী ডাকুন।'

স্লিপ নিয়ে সিস্টার-ইন-চার্জ এলেন। এমার্জেনসি কেস। তলার চোয়াল ঝুলে গেছে, খুলে গেছে বলেই মনে হয়। বাঁ হাতের তালু এ-ফোঁড় ও-ফোঁড়। সেনসলেস। ভিকটিম নিজেই নিজেকে অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েছে। সারা গায়ে মুখে অসংখ্য আঁচড়ের দাগ। দাগ দেখে মনে হয় বন্য জন্তুর আক্রমণ। অ্যাটেণ্ডিং ফিজিসিয়ানের রিপোর্টটাই পড়লেন। পেশেন্টের নামটা দেখেও দেখলেন না। বড়মামা বললেন, 'চলুন দেখি। সুন্দরবন তো অনেক দূরে। বাঘে কামড়েছে বলে মনে হচ্ছে!'

সিস্টার-ইন-চার্জ বললেন, 'বুঝতে পারছি না ঠিক, তবে মুখটা ফালা ফালা করে দিয়েছে। চোয়ালটা কবজা ভাঙা বাকসর ডালার মত ঝুলে পড়েছে।'

বড়মামা একটু ভেবেচিন্তে বললেন, 'হতেও পারে। সার্কাস কিম্বা চিড়িয়াখানার বাঘ হয়তো।' সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের অপারেশন টেবিলে রসুল মুখে ভেঙচি কেটে শুয়ে আছে। ডক্টর মিত্র ইতিমধ্যে

বোতল ভাঙাটা বের করে ছোটো বুরুশ দিয়ে ঝেড়ে ঝেড়ে কাঁচের টুকরো বের করছেন। বড়মামা রসুলের মুখটা দেখেই বললেন, 'রাসকেল, অপদার্থ, তখনই বলেছিলুম ছটা বেড়াল একটা ইঁদুর, মরবি রসুল। বেড়াল হল বাঘের মাসী। ইস্, চোয়ালটা পর্যন্ত খুলে নেবার চেষ্টা করেছিল! মুখে মাংসর গন্ধ পেয়েছে। সবক'টা কামড়ে ধরে টানতে শুরু করেছিল বোধহয়!'

ডক্টর মিত্র বুরুশ দিয়ে কাঁচের টুকরো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মাইনর ক্রুইজগুলো বেড়ালের। চোখটা জোর বেঁচে গেছে। আসল ঘটনা ইয়াসিনের ঘুষি। দৈত্যের ঘুষি। এক ঘুষিতেই চোয়াল খুলে গেছে। ক্লোরোফর্মটা কে ঢেলেছে বুঝতে পারছি না। চব্বিশ ঘণ্টার আগে জ্ঞান হবে বলে মনে হয় না।'

ক্লোরোফর্মের রহস্য বড়মামা জানেন। বেড়ালের আঁচড়, তাও বুঝলেন। বুঝলেন না ইয়াসিনের ঘুষি। কুক ইয়াসিন রসুলকে ঘুষি মারবে কেন? চোরাই খাবারের ভাগ-বাঁটোয়ারা নাকি? জুনিয়ার ডক্টর মিত্রকে যা নির্দেশ দেবার দিয়ে বড়মামা কিচেনের দিকে চললেন। আহা কি দৃশ্য! চোখ জুড়িয়ে যায়। শ্রীক্ষেত্রের মত, বেড়াল ক্ষেত্র! ছ'টা তাগড়া তাগড়া বেড়াল ছ'দিকে ঠ্যাং ছড়িয়ে পড়ে আছে। রান্নাঘরে সকলেই আছে, ইয়াসিন আছে, বিশু আছে, গদাই আছে, একটা বড় রুই মাছ আছে, ছ'টা মুরগী আছে, এক ঝুড়ি ডিম আছে, ঘি আছে, তেল, মশলা, নুন, মাখন সব আছে। তবে কথা বলার মত অবস্থায় কেউ নেই। ইয়াসিন সব্জি-কাটা লম্বা টেবিলে কাঁচকলা মাথায় দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। থামের মত একটা পা কিচেন র‍্যাকের ওপর। চায়ের একটা বড় কৌটা, দুটো জ্যামের টিন পায়ের দিকের মেঝেতে গড়াগড়ি। হামিদ ওই দিকেই উপুড় হয়ে আছে। সারা মাথায় চ পাতা। এক এক ভঙ্গীতে সকলেই গভীর ঘুমে। উনুনে কড়ায় একটা কিছু চাপান ছিল। কি বস্তু তা এখন বোঝার উপায় নেই।

কড়াটা উনুনের তাতে ফেটে দু'চাকলা হয়ে দু'দিকে সরে গেছে।

কাউকে ঘাঁটাবার সাহস বড়মামার হল না। সারা হাসপাতালের রুগী আর হাউস স্টাফের আজ উপবাস। সবক'টাকে দাওয়াই দিয়ে চাঙ্গা করতে হবে। ক্লোরোফর্ম সার্জিক্যাল ওয়ার্ড থেকে রান্নাঘরে আসে কি করে, রসুলকে তার জবাবদিহি করার জন্যে ফতোয়া জারি করতে হবে। পুরো ব্যাপারটার তদন্তের জন্যে কমিটি বসাতে হবে। চেয়ারম্যান বড়মামা—ডক্টর মুকার্জি। সব কিছুর মূলে বড়মামা—ডক্টর মুকার্জি, তাঁর চারটি বেড়ালছানা আর ছটি বেড়াল।

চিন্তিত বড়মামা বেছে বেছে সাদা একটা বেড়াল বগলদাবা করে চেম্বারে ফিরে এলেন। একটা রবার-স্ট্যাম্প দিয়ে সারাগায়ে দেগে দিলেন। এবার আর গুলিয়ে যাবার উপায় নেই। বেড়ালটাকে মেঝেতে ফেলে মিউ মিউ বাচ্চা চারটেকে ছেড়ে দিয়ে ঘটনার নোট লিখতে বসলেন। রসুলকেও সাসপেণ্ড করতে হবে, নিজেকেও সাসপেণ্ড করতে হবে। বড়মামা একবারও লক্ষ্য করলেন না, মা বলে যে বেড়ালটাকে ধরে এনেছেন সেটা একটা বিশাল হুলো।

দাদার ওপর বাবা ভীষণ রেগে গেছেন। পড়াশোনায় তেমন মন নেই। সারাদিন শুধু খেলা খেলা। হাফ-ইয়ারলি পরীক্ষায় সব বিষয়েই কম কম নম্বর পেয়েছে। রেজাল্টের কাগজটা মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'তুমি কী ভেবেছ? জীবনটা এইভাবেই চলবে? আমি চিরকাল বেঁচে থাকব, আর তোমাদের বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব। পড়তে ভাল না লাগে লেখাপড়া ছেড়ে দাও'

মাকে ডেকে বললেন, 'সংসারে একটা বাঁদর জন্মেছে। বাঁদরের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করা উচিত আজ থেকে ঠিক সেইরকম ব্যবহারই করবে। আমার কথা হল, তুমি ছাত্র, ছাত্র ছাত্রর কাজ দেখাক, আমরা আমাদের কাজ দেখাব। যে গরু দুধ দেবে না তার জন্যে আবার ভাবনা কিসের!'

মা সকালে জলখাবার এনেছিলেন—দুধ, রুটি, ডিমসেদ্ধ। বাবা চড়া গলায় বললেন, 'নিয়ে যাও ওসব। অত আদর চলবে না। সারা জীবন জোটাতে পারবে ওই সব খানা? করতে হবে তো মুটেগিরি, মজুরগিরি। চায়ের দোকানে বয় হয়ে কাপডিশ ধুতে হবে। হটাও ওসব। দিনে দুবার খেতে দেবে—ডাল, ভাত, যে-কোন একটা তরকারি।'

মা খুব আস্তে আস্তে বললেন, 'নাম করে এনেছি, আজকের দিনটা খেয়ে নিক।'

মেঝেতে রেজাল্টের কাগজটা হাওয়ায় উড়ছিল। বাবা নিচু হয়ে সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মায়ের চোখের সামনে নাচাতে নাচাতে বললেন, এ যার রেজাল্ট তার জন্যে ডিমও নয়, দুধও নয়, মোটা মোটা রুটি আর ডেলা ডেলা ভেলিগুড়। ভস্মে ঘি ঢেলে কী হবে?

রেজাল্টের কাগজটা দাদার মুখের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। দাদা গুম হয়ে বসে আছে। মা, পড়েছেন মহা বিপদে। খাবার নিয়ে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

চোখ দুটো যেন ছলছল করছে। খাবারের প্লেট আর দুধের গ্লাসটা দাদার সামনে রাখতে রাখতে বললেন, 'একটু ভাল করে চেপে পড় না বাবা। দেখছিস তো কী দিনকাল পড়েছে। ভাল ভাল ছেলেরাই চাকরি-বাকরি পাচ্ছে না। তোর বাবারও বয়েস বাড়ছে। চিন্তায় চিন্তায় মাথার চুল সব পেকে যাচ্ছে। আজ থেকে একটু ভাল করে লেখাপড়া কর। নে, খেয়ে নে।'

দাদা উঠে দাঁড়াল। বেশ লম্বা হয়েছে। উঠে দাঁড়ালে মায়ের মাথায় মাথায়। কপালের ওপর চুল ঝুলছে।

'খাবি না?'

'না। ওসব খাবার আমার জন্যে নয়।'

মা দাদার চুল সরিয়ে দিতে দিতে বললেন, 'তোর রাগের কোনো মানে হয় না। সত্যিই তো লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছিস। লেখাপড়া করলে কার উপকার হবে, আমাদের না তোর নিজের। বলতে গেলে রেগে যাস। সব কথা এ-কান দিয়ে ঢোকাস ও-কান দিয়ে বের করে দিস। খাচ্ছিস দাচ্ছিস, বেশ মজায় আছিস।'

'তুমি বেশি বকবক কোরো না তো। যা করছ তাই করো।'

দাদার কথা শুনে মা হাঁ হয়ে গেলেন। চোখ বেয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। ধরা-ধরা গলায় বললেন, 'তুই একেবারে উচ্ছন্নে গেছিস শুভো। সঙ্গ ছাড়তে না পারলে ভবিষ্যতে তোর অনেক দুর্ভোগ আছে।'

'আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে তোমাদের আর চিন্তা করতে হবে না।' দাদা বেরিয়ে গেল।

এক হাতে দুধের গেলাস, আর এক হাতে প্লেট, দাদার চলে যাওয়ার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

আমি জানি দাদা এখন কোথায় যাবে। প্রথমে পার্থদের বাড়ি। সেখানে একটা ছোট দল তৈরি হবে। কিছুক্ষণ ক্যারাম পিটবে,

তারপর যাবে স্বপনদের বাড়ি। সেখানে আজ ফ্ল্যাগ রঙ হবে। ময়দানে লীগের খেলা আছে। স্কুলে আজ যেতেও পারে, না-ও যেতে পারে। যদি না যায়, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় আড় হয়ে শুয়ে কিছুক্ষণ গল্পের বই পড়বে। তারপর যেই তিনটে বাজবে বইটাকে টান মেরে ফেলে দিয়ে আবার বেরিয়ে যাবে। কখন ফিরবে কেউ জানে না। সাতটা হতে পারে, সাড়ে সাতটা হতে পারে। কতদিন এমন হয়েছে, মাস্টারমশাই বসে থেকে থেকে এক সময় বিরক্ত হয়ে চলে গেছেন। সন্ধেবেলা যেদিন পড়তে বসে সেদিন পড়ার চেয়ে ঢুলটাই বেশি হয়। ঢুলে ঢুলে মাথাটা টেবিলের দিকে ঝুঁকে পড়ে, মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে ঠেলে ওপর দিকে তুলে দেন।

মা চিৎকার করে বললেন, 'আজ তুমি খাবার সময় বাড়ি ঢুকো, ভাল করে খাইয়ে দোব।'

দূর থেকে দাদা বলল, 'দেখা যাবে!'

বাবা বাথরুমের সামনে জানলার গ্রিলে আয়না ঝুলিয়ে দাড়ি কামাচ্ছিলেন, মাকে বললেন, 'দাও, আরও আদর দাও।'

সারা বাড়িতে অদ্ভুত একটা বিষণ্ণতা নেমে এল। বাবার মুখ গম্ভীর, মার চোখ ছল-ছলে, এমন কী কুকুরটা পর্যন্ত ঘেউ ঘেউ করতে ভুলে গেছে। একটা কাক কেবল পাঁচিলে বসে খা-খা করছে। মা বললেন, 'অলক্ষুনে কাকটাকে তাড়া তো।'

বাবা চান-টান করে বেরোতে যাচ্ছিলেন। কোনরকমে খাওয়া সেরেছেন। জুতো মোজাও পরা হয়ে গেছে। হঠাৎ কী হল, মাকে ডেকে বললেন, 'আজ আমি বেরোব না। একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়ব! ও কত বড় লায়েক হয়েছে আমি দেখতে চাই।'

মা যেভাবে আমাদের ভোলান সেইভাবে বাবাকে ভোলাতে চেষ্টা করলেন, 'বেরোবার সময় মাথা গরম কোরো না। তুমি বেরিয়ে পড়ো। ও এলে আমি আজ ওর চামড়া খুলে নোব। কত বাড় বেড়েছে দেখব!'

বাবার মুখে ব্যঙ্গের হাসি, 'তোমার কম্ম নয়। যা করার আমিই করব।'

জামা-জুতো খুলে সারা বাড়িতে বাবা যেন জল্লাদের মতো ঘুরতে লাগলেন। চেয়ারের পেছনে সরু একটা বেল্ট ঝুলছে সাপের মতো। বেল্টটা অপেক্ষা করে আছে, দাদা একবার এলে হয়। আমি যেন মনের চোখে দেখতে পাচ্ছি দ.দার ফর্সা 'পিঠে একটা একটা করে বেল্টের সোঁটা-সোঁটা দাগ ফুটে উঠছে।

মায়ের রান্নাবান্নায় তেমন মন নেই আজ। উদাস চোখে তাকিয়ে আছেন জানালার বাইরে আকাশের দিকে। সাদা শরতের মেঘ তুলোর পাহাড়ের মতো ক্রমশই মাথা টেনে উঠছে। একটা বিশাল মুখ তৈরি হয়েছে, যেন দেবতার মুখ। পাশে ছোট্ট একটা লোমঅলা কুকুর ল্যাজ তুলে ভেসে চলেছে। আকাশের মুখটাকে মনে মনে বলি, হে ঠাকুর, দাদাকে বাঁচাও।

পাশের রাস্তা দিয়ে শঙ্কর যাচ্ছিল আপন মনে। ভারী ভাল ছেলে। আমার দাদা যদি শঙ্করের মতো হত! সব পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে দাদার ক্লাসেই পড়ে। জানালায় দাঁড়িয়ে ডাকলুম, 'শঙ্কর-দা, শোনো।'

প্রথমে আমাকে দেখতে পায়নি। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল, 'কী বলছ।'

'তোমার সঙ্গে দাদার দেখা হবে?'

'জানি না তো।'

'যদি দেখা হয় তুমি বলবে ও যেন বাড়িতে এখন না আসে। এলেই বাবার হাতে ভীষণ মার খাবে। আমার মনে হয় ও পার্থদের বাড়িতে আছে। তুমি একটু বলে দেবে লক্ষ্মীটি।

'আচ্ছা' বলে শঙ্কর চলে গেল। শঙ্কর মাথা নীচু করে রাস্তায় হাঁটে। ভাল ছেলে কিন্তু কোনো অহংকার নেই। দাদার কথা উঠলেই বাবা শঙ্করের তুলনা দেন। দাদা তখন বাবার সামনে

দাঁড়ায় না। মুখ গম্ভীর করে উঠে চলে যায়।

একটা বাজল, দাদা তখনও ফিরল না। বাবা শুনে শুনে কাগজ পড়লেন। মার খাওয়া-দাওয়া মাথায় উঠে গেছে। আমাকে বললেন 'তুই খেয়ে নে, আমি ওদিকটা দেখে আসি।' দাদা আর আমি রোজ পাশাপাশি খেতে বসি। খেতে বসে দুজনের মধ্যে প্রায়ই একটু ঝামেলা হয়। তোর মাছের দাগাটা যেন একটু বড় মনে হচ্ছে, দাদা টপ করে আমার মাছটা তুলে নিল। তোর চাটনিটা বেশি মনে হচ্ছে, আমি চাটনির বাটিটা অদলবদল করে নিলুম। পাশাপাশি খেতে বসে এই ঝগড়ার মধ্যেই আমাদের সবচেয়ে বড় মজা। বড়রা রেগে গেলেও আমাদের কিছু করার উপায় ছিল না। মা বলে গেলেও আমি খেতে বসতে পারলুম না। একলা একলা খাওয়া যায় নাকি। দেখি না দাদা কখন আসে।

উঁকি মেরে দেখলুম, বাবার মুখের ওপর কাগজ, একটু বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছেন! ভালই হয়েছে। ইশ দাদাটা যদি এই সময় আসত!

বেলা তিনটের সময় মা ফিরে এলেন শুকনো মুখে হাওয়ায় চুল উড়ছে। এক-পা ধুলো, চটি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেম, ফিসফিসে গলায়, 'এসেছে নাকি রে?'

'না, আসেনি তো।'

কল খোলা ছিল। ছড়-ছড় করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। কলটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিয়ে এলুম। মা হতাশ হয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়েছেন। দাদা স্কুলে যায়নি! পার্থদের বাড়িতে, নেই, মাস্টার মশাইয়ের বাড়িতেও নেই, কোথাও নেই।

বিকেল গেল, সন্ধেয় শাঁখ বেজে উঠল, একটা দুটো করে তারার চোখ ফুটতে থাকল আকাশে। রাত ঘন হয়ে এল। দাদা কিন্তু এল না। বাইরের তারে দাদার জামাকাপড় শুকোচ্ছিল, সব তুলে এনে পাট-পাট করে রাখলুম। একটা খরগোশ পুষেছিল।

সেটা সারাদিন ছাড়া না পেয়ে ছটফট করছিল। কুচো কুচো ঘাস খেতে দিলুম। একটা গোলাপ গাছ পুঁতেছিল। আমাকে বলেছিল, 'শুভা, গোড়ায় একটু করে চায়ের পাতা দিয়ে দিস তো।' এতদিন গ্রাহ্য করিনি. আজ দিয়ে দিয়েছি। দাদার গাছে বড় বড় ফুল ফুটবে। পেনসিল কাটা কলটা নিয়ে রোজ লাঠালাঠি হত, আজ নিজে থেকেই দাদার বইয়ের বাক্সে রেখে দিলুম। দাদা তবু ফিরে এল না। কত রাত হয়ে গেল, তাও এল না।

পূজো চলে গেল। শীত এল। দাদার গাছে শীতের ফুল ফুটল। খরগোশটা একদিন সকালে মারা গেল। তবুও দাদা এল না। মায়ের চোখে চশমা উঠল। বাবার সব চুল পেকে গেল। দাদার বুটজুতো শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। তবু দাদা এল না। শঙ্কর কলেজে ভর্তি হয়েছে। পার্থ ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে গেছে। ন্যাপথালিন দিয়ে রাখা হয়েছে, তাও দাদার জামা পোকায় কেটেছে। তবু দাদা এল না। সেই বেল্টটা যেটা দিয়ে বাবা দাদাকে মারতে চেয়েছিলেন, সেটা আলনায় এখনও ঝুলছে, গায়ে সাদা সাদা ছাতা ফুটেছে। দাদা কিন্তু ফিরে এল না।

হঠাৎ একদিন এক সন্ন্যাসী এলেন। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি বীরপুত্রের জননী।' মা কেঁদে ফেললেন। সন্ন্যাসী বললেন, 'কাঁদছিস কেন বোকা? তোর ছেলে ঠিকই আছে। বিরাট দেশ, কত মানুষ, তাদের মধ্যে মিশে গেছে। দেখবি, সময় হলে ঠিক 'মা' বলে এসে দাঁড়াবে। সে যে তোদের বড় ভালোবাসে।'

সন্ন্যাসী যেদিন এলেন, তার তিন দিনের দিন বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। মা আর আমি রাস্তার দিকের ঘরে মেঝেতে শুয়ে আছি। গভীর রাত। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। সত্যের মতো স্বপ্ন দেখলুম, একটা বনপথ ধরে বাবা আর দাদা পাশাপাশি হাঁটছেন। বাবার ডান হাত দাদার কাঁধে। দাদা হাসতে হাসতে বলছে, 'এই ভ্যাখ শুভা আমি কত ভাল ছেলে হয়ে গেছি।'

আরও কিছু গল্প

রুকু আর সুকু

দু-ভাইয়ের খেলার মাঠের ঝগড়াটা শেষ পর্যন্ত বাড়ি অবধি এসে পৌঁছল। বড় রুকু গেট পেরিয়ে আগে-আগে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ঢুকছে। পেছনে ছোট সুকু, বুক ফুলিয়ে, তার মুখে কোনও ভয় বা অপরাধের চিহ্ন নেই। সে বরং ঢোকার মুখে গেটের পাশের খাড়া ইউক্যালিপটাস গাছের তলা থেকে ঝরা পাতা তুলে নিয়ে হাতে রগড়ে নিজের নাকের কাছে ধরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'আঃ, কী সুন্দর গন্ধ। যাদের বারো মাসই সর্দি তাদের এই পাতা রোজ শোঁকা উচিত।'

কথাটা সে তার দাদাকে উদ্দেশ্য করেই বলল, আর একটু খেপাবার জন্য। অন্যদিন হলে রুকু নিশ্চয় এর কোনও জবাব দিত। আজ কিছু বলল না। সে বেচারা ভাল করে হাঁটতেই পারছে না। সুন্দর একটা একতলা বাংলো বাড়ির দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। দুপাশে কেয়ারি-করা গোলাপের বাগান। বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে বসে মা মোজা বুনছেন একমনে। শীত এল বলে। ডাল্টানগঞ্জে শীতটা বেশ জমিয়ে পড়ে। এ বছর তিন জোড়া মোজাই তাঁকে বুনতে হবে। দু' ছেলের আর স্বামীর। রুকু ও সুকুর বাবা স্থানীয় মিশনারী হাসপাতালের নামকরা সার্জেন। স্থানীয় লোকেরা বলে, ডাক্তারবাবু মানুষ কেটে জোড়া লাগাতে পারেন। এমন হাত।

মার চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। সব সময় পরতে হয় না। এই বোনাটোনার সময়েই নাকে ওঠে। তখন যেন আরও সুন্দর দেখায়। সোনার মত গায়ের রঙের সঙ্গে চশমার রঙ মিলে যায়। শুধু কাঁচ দুটো খাড়া টিকলো নাকের পাশে জ্বলজ্বল করতে থাকে। মানুষটি যেমন ভালো তেমনি কড়া। যোধপুরের মেয়ে। চেহারাটা

অনেকটা রাজপুত মেয়েদের মতো।

রুকুকে ল্যাংচাতে দেখে রাজ্যেশ্বরী জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে রে তোর?'

রুকুটা ভীষণ ভাল মানুষ। কী হয়েছে ঠিক ঠিক বলতে গেলে —সুকুর নামে বলতে হয়। রুকু তাই কোনো কথা না বলে সিঁড়ি ভেঙে বারান্দায় উঠে এল। পেছনেই সুকু। উত্তরটা সেই দিল— আমি ওকে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছি মা। এই হল সুকুর স্বভাব। তার কাছে কোনো লুকোচুরি নেই। যা করে তা বলে। এই তো সেদিন হাতের আঙুলে গোলমতো মোটা একটা লাঠি খাড়া করে শোবার ঘরে ব্যালেনসিং অভ্যেস করছিল। লাঠিটা হঠাৎ বেকায়দা হয়ে সোজা গিয়ে পড়ল দেরাজ-আয়নাটার ওপর সপাটে। ভেঙে চুরমার! রুকুও সে-ঘরে ছিল। বহুবার ভাইকে বারণ করেছে— 'ওরে সুকু, ওরকম করিসনি! একটু আগে আর একটু হলেই আমার মাথাটা ফাটত।' সুকু শোনেনি, বলেছিল, 'বিছানায় শুয়ে শুয়ে সারাদিন বই পড়লেও ওরকম বিপদ একটু-আধটু হতেই পারে।' রুকু আর কিছু বলেনি। মাথায় আইসব্যাগের মতো একটা বালিশ চাপিয়ে সুকুর লাঠির হাত থেকে মাথা বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল।

কাঁচ ভাঙার ঝনঝন আওয়াজে মা যখন দৌড়ে এলেন, সুকু বললে, 'সরি মা! অন্যায় হয়ে গেছে। লাঠিটা যে ওর ওপর পড়বে আমি বুঝতে পারিনি। বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে থাকলে ওরকম একটু হবেই।' রাজ্যেশ্বরী এমন ছেলেকে কী আর বলবেন। বাবা শুনে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ বাপকা বেটা···আমিও ছেলেবেলায় ওর মতোই ছিলাম সাহসী, বেপরোয়া, সত্যবাদী? এই তো চাই।'

সেই দিনই ফারুক মিঞা বিকেলের দিকে এসে দেরাজের আয়নাটা নতুন করে লাগিয়ে দিয়ে গেল।

রাজ্যেশ্বরী বোনাটা কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বললেন, 'তুই দাদাকে ল্যাং মারলি কেন? এখন পা মচকে এই যে বিছানায় পড়ে

থাকবে, কে দেখবে ?

সুকু ভাল মানুষের মতো মুখ করে বললে, 'আমার অভ্যাস মা। কী করব বলো ?

'ল্যাং মারাটা তোর অভ্যাস ? বলিস কী রে ? তুই খেলতে গেছিস না ল্যাং মারতে গেছিস।'

তুমি জান না মা, আমাদের গেম ইনস্ট্রাকটর মিস্টার বেঞ্জামিন বলেছেন, ভাল ফুটবলার হতে হলে ভাল ল্যাং মারা শিখতে হবে। টক করে এমন কায়দায় পা-টা চালাবে যেন সার্জেনের ছুরি। রেফারি ধরতে পারবে না, এমন কী যাকে মারলে সেও বুঝতে পারবে না। বল-ফল ছেড়ে চিতপাত হয়ে পড়ল, তুমি মেরে-মেরে বেরিয়ে গেলে। সেই কায়দাটাই মা দাদাকে দেখিয়েছি।'

রুকু আর চুপ করে থাকতে পারল না। আর একটা খালি বেতের চেয়ারে বসে ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তুই একটা কাওয়ার্ড। ব্যাকে খেলার তোর যোগ্যতাই নেই, তুই যেই দেখলি আমি কাটিয়ে গোললাইনে ঢুকে পড়েছি, সিওর .গোল, পেছন থেকে সট করে ল্যাং মেরে দিলি। একে খেলা বলে না সুকু, একে বলে গুণ্ডামী।

'কী বললি ? কাওয়ার্ড ? সুকু কাওয়ার্ড! তুই খেলার খও জানিস না। থলথলে ভুঁড়ি নিয়ে হোঁতকা হোঁদলকুতকুতের মতো ওই স্পীডে দৌড়লে ল্যাং মারতেই ইচ্ছে করে। আমি কাওয়ার্ড নই ক্র্যাফটি।'

রাজ্যেশ্বরী উঠে দাঁড়ালেন। রুকুর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, 'বাঃ সুকু। তোমার ল্যাঙ্গোয়েজের খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি। দাদাকে হোঁতকা হোঁদলকুতকুত বলছ।'

রাজ্যেশ্বরী রুকুর পায়ের কাছে উবু হয়ে বসলেন।

সুকু বললে, 'এসব কথা তুমি সেদিন আমাকে যে বাঙলা বইটা উপহার দিলে, সেই বইটা থেকে শিখেছি। বইটার পাতায় পাতায়

যেসব ছবি আছে তার মধ্যে দাদার ছবিও আছে। সেখানে এই গল্পটাও আছে মা—হোঁদলকুতকুতের বাবার আলকাতরার ব্যবসা ছিল। হোঁদল ঘামত আর তার বাবা টিনে ধরে ধরে বিক্রি করত।'

'বইটা তোমাকে দিয়ে খুব ভুল করেছি বাবা। ভেবেছিলুম বাংলা শিখবে, এখন দেখছি কতকগুলো বাজে অ্যাডজেকটিভ শিখে বসে আছ।'

বাইরে গাড়ি দাঁড়াবার শব্দ হল। বাবা ফিরলেন হাসপাতাল থেকে। সামনে আসছে ডাক্তারি ব্যাগ হাতে সুখন। পেছন পেছন আসছেন ডাক্তার মুখার্জি। লম্বা চওড়া সুপুরুষ মানুষ। মুখে সব-সময় একটা হাসি লেগে আছে। বারান্দার কাছে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'বাড়ির খবর? আরে বড়টা দেখছি মানুষ হয়েছে। চেয়ারে বসতে শিখেছে?'

রুকু বললে, 'গুড ইভিনিং ফাদার!

'গুড ইভিনিং বয়। কী হয়েছে তোমার পায়ে?'

উত্তর দিলেন রাজ্যেশ্বরী, 'সুকুর গুণ্ডামির ভিকটিম। গোলের মুখে সুকু পেছন থেকে ল্যাং মেরে দিয়েছে।'

'ফাউল হয়নি?'

এবার উত্তর দিল রুকু, 'কী করে ফাউল হবে বাবা! ও তো বলেছেই, বাবা যেভাবে হাতে ছুরি চালায় ও সেইভাবে পায়ে ল্যাং চালায়।'

ডাক্তার মুখার্জি হো হো করে হেসে উঠলেন, বেড়ে বলেছে তো তা তুই কীভাবে পড়লি।'

'হাত পা দুমড়ে মুচড়ে ধপাস করে পড়ে গেলুম। আর ও বলটা ক্লিয়ার করে দিল।'

'দেখি সরো, ও তুমি বুঝতে পারবে না, আমার কাজ আমাকে করতে দাও।'

ডাক্তার মুখার্জি ছেলের মাকে সরিয়ে নিজেই উবু হয়ে বসলেন,

'বেশ ফুলে উঠেছে রে। না ভাঙেনি, মচকে গিয়েছে। কদিন একটু ভোগাবে। ও খেলতে গেলে একটু-আধটু হবেই, চীয়ার আপ মাই বয়। একটু গুলার্ড লোশন লাগাতে হবে!'

রাজ্যেশ্বরী দেবী বললেন, 'কাল থেকে তোমাদের দুজনের ফুটবল খেলা চিরদিনের জন্যে বন্ধ।'

'ও, নো নো,' ডাক্তার প্রতিবাদ করে উঠলেন, 'ও ব্যবস্থা ঠিক হল না, একসকিউজ মি, খেলবে, রোজ খেলবে, তবে আলাদা টিমে নয়, একই টিমে, তাহলে আর ল্যাং মারতে পারবে না।'

'সুকুকে তুমি চেনো না, তাহলেও ঠিক ল্যাং মেরে দেবে। ও কী বলছে জানো, কাউকে ছুটতে দেখলে ওর নাকি ভীষণ ল্যাং মারতে ইচ্ছে করে। উনি নাকি ল্যাং স্পেশালিস্ট। হ্যাঁ তোমাকে কী বলছে জানো, হোঁদলকুতকুতের বাবা।'

সুকু তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, 'না বাবা, আমি তোমাকে বলিনি, আমি দাদাকে কেবল হোঁদলকুতকুত বলেছি।'

'তা হলে দাদার বাবা কী হল?' রাজ্যেশ্বরী প্রশ্নটা রেখে ঘরে ঢুকে গেলেন।

সুকু আধহাত জিভ কেটে মাথায় দু হাত চেপে ধরে বলল, 'আমি ভেবে বলিনি বাবা।' তারপর দৌড়ে গিয়ে দু' হাতে বাবার কোমর জড়িয়ে ধরে বললে, 'বাবা, আমায় ক্ষমা করো।'

ডাক্তার মুখার্জি হাত দিয়ে ছেলের মাথার নরম চুল এলোমেলো করতে-করতে বললেন, 'পাগল ছেলে, একটা কথা জেনে রাখো, একজনের আনন্দ কখনও যেন আর একজনের দুঃখের কারণ না হয়। খেলা মানে মারামারি নয়। দ্যাখো তো, দাদা এখন ক'দিন ভাল করে আর হাঁটতে পারবে না।'

সুকুর মুখটা হঠাৎ করুণ হয়ে গেল। দাদার সামনে গিয়ে বললে, 'তুই ওভাবে পড়ে যাবি, আমি বুঝতে পারিনি রে, দাদা। নে, আমার কাঁধে ভর দিয়ে ভেতরে চল।'

রুকুর একটা হাত সুকুর কাঁধে, সুকুর একটা হাত রুকুর কোমরে দু ভাই ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকছে। ডাক্তার মনে মনে বললেন, ঈশ্বর, আমি কত ভাগ্যবান!

পড়াশোনার পর রাতের খাওয়া-দাওয়া। খাবার ঘরে লম্বা টেবিলে ধবধবে সাদা টেবিলক্লথ, ঝকঝকে সাদা চীনেমাটির প্লেট, কাঁটা চামচ।, বাবুর্চি নিজামত একে-একে গরম-গরম সব খাবার এনে সাজিয়ে রাখছে। ডাক্তার মুখার্জির মুখে তখনও পাইপ। অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছেন। অন্যদিকে রুকু আর সুকুর সারাক্ষণ বকবকানি চলে। আজ দুজনেই চুপ। চুপ রুকুই। সুকু সন্ধ্যে থেকে দাদার সঙ্গে অনেকবার কথা বলার চেষ্টা করেছে। রুকু তেমন সাড়াশব্দ করেনি। হুঁ হাঁ করে ছেড়ে দিচ্ছে। সুকু নিজের থেকেই গুলার্ড লোশন দিয়ে দাদার পায়ের পট্টি দুবার ভিজিয়ে দিয়েছে। তাও রুকু ভীষণ গম্ভীর।

সুকু তো বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। সে বাবার সঙ্গেই নানা রকম কথা শুরু করেছে। যতক্ষণ খাওয়া চলল ততক্ষণই সুকু কাঠবেড়ালি সম্পর্কে হাজার রকম প্রশ্নে বাবার প্রাণ বের করে দিল। কাঠবেড়ালিকে ওরকম দেখতে কেন? ডিম হয়, না বাচ্চা হয়। অত চটপটে কেন? পিড়িক পিড়িক করে ডাকবার সময় ল্যাজটা ওঠানামা করে কেন? কোথায় বাসা করে? বাসাটা দেখতে কেমন?

রাজ্যেশ্বরী চামচে দিয়ে পুডিং কাটতে কাটতে বললেন, 'আজ মাথায় কাঠবেড়ালি ঢুকেছে। কাল ঢুকেছিল টিয়া, সেটা উড়ে গেছে।'

খাবার টেবিল থেকে কাঠবেড়ালি বসার ঘর পর্যন্ত এলেও সেতার আর গানে চাপা পড়ে গেল। শুতে যাবার আগে এ বাড়ির এটাই নিয়ম। রেকর্ড প্লেয়ারে ঘণ্টাখানেক বাছা-বাছা রেকর্ড চলবে। কোনও দিন গান, কোনও দিন যন্ত্রসংগীত। ডাল্টনগঞ্জে আকাশ ছেয়ে রাত ঘন হচ্ছে। তারাদের জ্যোতি বাড়ছে। মিষ্টি হাওয়ায়

ইউক্যালিপটাসের গন্ধ ভাসছে। গানের সুরে, চার্চের ঘণ্টার আওয়াজে, রাতজাগা পাখির ডাকে পাহাড়ের গা বেয়ে বনস্থলী মধ্যে দিয়ে ঘুম আসছে স্বপ্ন নিয়ে।

দু ভাই একই ঘরে দু দিকে দুটো খাটে শোয়। অন্যদিন শুয়ে শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত দুজনে বকর-বকর করে। সুকুই শুরু করে। কখনও পড়ার কথা, কখনও খেলার কথা, কখনও বইয়ে পড়া কোনো অ্যাডভেঞ্চারের কথা। ইয়োরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার সব পথ-ঘাট-পাহাড়-পর্বত-বন-জঙ্গল সুকুর ভীষণ চেনা। মশারির মধ্যে ঢুকে বালিশে মাথা রেখে সুকু বললে 'জানিস, দাদা, আমাদের বাগানের পুবদিকে বাদাম গাছের তলায় কাঠবেড়ালির বাসা হয়েছে রে। কাল সকালে তোকে দেখাব।'

রুকু কোনও জবাব দিল না।

সুকু বললে, 'এখনও কোন বাচ্চা হয়নি রে। আমি গর্তর মধ্যে এতখানি হাত পুরে দিয়েও কিছু দেখতে পেলুম না। খালি একগাদা বাদাম পেলুম।'

অন্যদিন হলে রুকু ভাইকে সাবধান করে দিত, 'যেদিন সাপে কামড়াবে সেদিন তোর সাহস বেরিয়ে যাবে।' আজ কিন্তু কিছুই বলল না। চুপ করে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

সুকু মশারি তুলে বেরিয়ে এল। রুকুর মশারির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে একটা হাত দাদার কপালে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস না কেন রে দাদা? রাগ হয়েছে?'

রুকু আবার বেশিক্ষণ রেগে থাকতে পারে না। তার ফেরানো মুখ থেকেই উত্তর এল, 'হুঁ।'

'রেগে গেলি কেন?'

রুকু বললে, 'তুই সবসময় বন্ধুদের সামনে আমাকে ল্যাং মারবি, মোটা বলবি, অপদস্থ করবি। কেন আমি কি তোর ভাই নই!'

সুকু একটু চুপ করে ভাবল। তারপর বললে, 'আমি তো কাউকে

ছাড়ি না, আমি সবাইকেই তো ওরকম করি।'

'তারপর তুই সেদিন কোন ফাঁকে চুলে চুইংগাম আটকে দিয়েছিলি। আমি টের পাইনি। তিনদিন পরে মা চুল আঁচড়াতে গিয়ে দেখতে পেয়ে কাঁচি দিয়ে এক খাবলা চুল কেটে দিলেন। জানিস আমার কোঁকড়া চুল। কিছু ঢুকে থাকলে দেখা যায় না। সেই থেকে মাথার মাঝখানে একটা টাক হয়ে আছে।'

'চুইংগামের শেষটা যে চুলে আটকাতেই ইচ্ছে করে রে দাদা। আমি তো দাদার চুলেই আটকেছি রে, দাদা কি কারুর পর। তুইই বল।'

'হ্যাঁ, এরপর তুই আমার মুখে চুনকালি মাখিয়েও ওই একই কথা বলবি—আমার দাদার মুখেই তো মাখিয়েছি! এখন তুই কেমন স্কুলে যাবি, খেলার মাঠে যাবি, আর আমি বাড়িতে ঠ্যাং তুলে শুয়ে থাকব, কতদিন কে জানে!'

স্বকু মাথাটা বের করে নিয়ে মশারিটা গুঁজে দিল। দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

স্বকু বেরিয়ে যেতেই রুকু বিছানায় উঠে বসল। ওই পা নিয়ে তার আর হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, তা না হলে সে স্বকুর পিছু নিত।

কিছুক্ষণ পরেই স্বকুর গলা পাওয়া গেল 'মা, বাবাকে ডাকো।'

তারপর রুকুর কানে এল মা আর বাবার দুজনেরই গলা। মা বলেছেন, 'ইশ কী ভীষণ রক্ত বেরোচ্ছে রে।'

বাবা বলছেন, 'একদম উতলা হবে না, আমাকে দেখতে দাও। আজকের দিনটাই খারাপ। তুমি বরং ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ তৈরি করো। একটা এ টি এস দিতে হবে।'

রুকু খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এল। বাথরুমের সামনে স্বকু। ডানপায়ের বুড়ো আঙুলটা থেঁতলে গিয়ে রক্ত পড়ছে। স্বকু সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সারা মুখে দুষ্টু-দুষ্টু একটা হাসি।

বহুদিন চলে গেছে। রুকু আর স্বকু এখন কত বড়। শুধু বড়

নয়, দামী মানুষ, প্রতিষ্ঠিত মানুষ। রুকু থাকে মাদ্রাজে, মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ার। সুকু বিশাল বড় ডাক্তার, থাকে দিল্লীতে। যেখানেই থাকুক বছরে একবার শীতকালে ডিসেম্বর মাসে দু'ভাই মেলে ডাল্টনগঞ্জে তাদের জন্মস্থানে, ছেলেবেলার সেই বাংলো বাড়িতে। বাড়িটাকে তারা খুব যত্নে রেখেছে। রঙ, পালিশ, ফার্নিচার, বিছানা। সাজানো বাগান সব সেই আগের মত আছে। একজন কেয়ারটেকার আছেন। নেই কেবল বাবা আর মা। দুটো বিশাল ছবি ঝুলছে বসার ঘরের দেয়ালে।

সন্ধ্যের মুখে সবাই বসেছে বসার ঘরে। রুকুবাবু, সুকুবাবু, তাদের স্ত্রী, ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা। প্ল্যান হচ্ছে, আগামীকাল দুখানা ঝকঝকে নতুন গাড়ি নিয়ে তারা জঙ্গলে যাবে শিকারে। সুকুর ডান পা-টা বাঁ পায়ের ওপর তোলা। বুড়ো আঙুলের নখটা একটু গুটিয়ে পাকিয়ে আছে, রুকুর সেদিকে নজর পড়তে বলল, 'সুকু তুইতো বড় ডাক্তার, আমার হাতের পোড়া দাগটা ভাল করে দিলি, তোর পায়ের নখটাকে মেরামত করতে পারলি না?'

সুকুর চেয়ারের পেছনের দিকে দাঁড়িয়ে দু হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ছিল রুকুর বড় মেয়ে। সে জিজ্ঞেস করল, 'কাকামণি, আঙুলটায় কী হয়েছিল তোমার?'

'শোধবোধ করেছিলুম রে মা।'

'সে আবার কী?'

রুকু বলল, 'শোন্ তাহলে। তখন আমরা তোদের মতোই ছোট। ওই যে সেদিন আমাদের স্কুলটা তোদের দেখালুম সেই স্কুলের মাঠে হচ্ছে ফুটবল খেলা। গোলের মুখে বল নিয়ে কোন রকমে ঢুকেছি, তোদের কাকামণি পেছন দিক থেকে বলটা কেড়ে নিতে গেল। ছেলেবেলায় আমি একটু মোটাসোটা থলথলে ছিলুম। পড়ে গেলুম ধড়াস করে। ব্যাস, পা মচকে কুপোকাত। এইবার আমার পাগলা ভাইয়ের কেরামতি শোন। তিনি করলেন রাত দশটার সময় আমার

পা মচকে দেবার প্রায়শ্চিত্ত—সোজা বাথরুমে ঢুকে জলভর্তি একটা বালতি দু হাতে করে ওপরে তুলে পায়ের আঙুলটা তার নীচে রেখে দিল ছেড়ে। দুজনেই পায়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে পড়ে রইলুম বিছানায় দিন পনের। এ রকম ভাই হয় না রে!'

সুকু বললে, 'ওরকম দাদাও কি কারুর হয় ?'

রুকু বললে, 'তার আগে বলো, কত ভাগ্য করলে তবেই না ওরকম বাবা মা পাওয়া যায়! কত জন্মের তপস্যা।'

সুকু বললে, 'মনে আছে দাদা, বাবা ওই চেয়ারটায় ঠিক তুই যে ভাবে বসে আছিস সেই ভাবে বসে থাকতেন। তোকে অনেকটা বাবার মতো দেখতে হয়েছে।'

রুকু ধরাধরা গলায় বলল, 'আর ওই চেয়ারটায় বসতেন মা। কী সুন্দর দেখতে ছিলেন।'

কারুর মুখে আর কোনো কথা নেই। সেই একই ঠাণ্ডা হাওয়া পাহাড় ভেঙে, বনপথ পেরিয়ে, রাতজাগা পাখির ডাক নিয়ে ভেসে আসছে। সেই ঘর, সেই চেয়ার, সেই পড়ার টেবিল, সেই বাথরুম, সব, সব ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে।

কেবল রুকু আর সুকু বড় হয়ে গেছে।'

রুকু, সুকু ও পুসি

গির্জায় ঘণ্টা বাজছে। বাজছে তো বাজছেই। ভোরের হালকা বাতাস গম্ভীর শব্দে কাঁপছে। আকাশ থেকে ধীরে ধীরে অন্ধকার সরে যাচ্ছে! পাহাড়ের পাশ থেকে টুক্ করে লাফিয়ে উঠল সূর্য। ডিমের কুসুমের মতো রঙ।

সুকুর ঘুম ভেঙে গেল। ঘণ্টা তখনও বাজছে। জানলার সামনে ঝুলে থাকা কৃষ্ণচূড়ার ডালে সেই পাখিটা এসে বসেছে। সুকুর বন্ধু। রোজ সকালে পাখির কাজ গান গেয়ে সুকুর ঘুম ভাঙানো! কেউ বিশ্বাস করে না, পাখি আসে সুকুর ঘুম ভাঙাতে। সুকু বলেছিল, বেশ আমি যখন গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে বেড়াতে যাব, তখন দেখবে পাখি আর আসবে না। সত্যিই তাই। প্রমাণ পেয়ে অবিশ্বাসীদের এখন বিশ্বাস হয়েছে।

সুকু মশারির ভেতর থেকে তিনবার শিস দিয়ে জানাল, "পাখি, আমি উঠেছি?" পাখির ভাষা সুকু বোঝে, সুকুর ভাষা পাখি বোঝে।

সুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেছে। সাংঘাতিক একটা ব্যাপার। একজনের জীবনমরণ সমস্যা। সামনের খাটে শুয়ে আছে রুকু। এখনও শীত পড়েনি। ভোরের দিকে অল্প শীত-শীত। মায়ের হাতে তৈরি কাঁথা গায়ে রুকু ভোঁস-ভোঁস ঘুমোচ্ছে। সন্দেহের কিছু নেই। তবু ভীষণ সন্দেহের। এমন কিছু ঠাণ্ডা নয় যে, কাঁথা চাপা দিতে হবে। কাঁথার তলায় আশ্রয় পেয়েছে এক আসামি। নির্বাসনেই যার যাবার কথা। দু'ভাই কায়দা করে বাঁচিয়ে রেখেছে। মা ঘুম থেকে উঠে এ-ঘরে আসার আগেই আসামিকে সরাতে হবে নিরাপদ জায়গায়।

"দাদা, দাদা।" সুকু চাপা গলায় দাদাকে ডাকল। রুকুর ঘুম সহজে ভাঙে না। ঘুমোতেও যেমন দেরি হয়, জাগতেও সেই রকম

সময় নেয়। মা মাঝে-মাঝে বলেন, "কুম্ভকর্ণ রুকু হয়ে পুনরায় ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।"

"এই দাদা।" রুকুর মাথায় খোঁচা মারল সুকু।

"কী, কী।" রুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই বলতে লাগল, "কে, কে?"

"এই দাদা, ঠিকঠাক আছে তো?

রুকুর খেয়াল হল। তাড়াতাড়ি পায়ের কাছের চাপা ওঠাল। মৃদু একটা ঘড়ঘড় শব্দ কানে এল।

ঘুম-ঘুম চোখে রুকু ফিসফিস করে বললে, "আছে আছে।"

সুকু ফিসফিস করে বললে, "চাপা দে. চাপা দে।"

বারান্দার ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। মায়ের ওঠার সময় হল। রাজ্যেশ্বরী ঠিক পাঁচটার সময় ওঠেন। ছেলেদের ঘরে আসেন। খুব ভাল গান গাইতে পারেন। বহু বড়-বড় আসরে এক সময় গান গেয়েছেন। রাজ্যেশ্বরী ভোরের সুরে আলাপ করতে-করতে আসেন। সেইটেই ভরসা। তিনি আসছেন, জানা যাবে।

কাল দুপুরে রাজ্যেশ্বরী এই বাচ্চাটার ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। সাদা ধবধবে, এতটুকু বেড়াল-বাচ্চা। এই বয়েসেই ল্যাজটা কী মোটা হয়েছে। ভারী মিষ্টি মুখ। বাচ্চাটা না জেনে কিছু অপরাধ করে ফেলেছিল। বিচার করলে অপরাধটা অবশ্য তেমন সামান্য নয়। বেড়ালের হয়ে রুকু আর সুকু ওকালতি করতে গিয়েছিল, "বেড়ালের কি বুদ্ধি আছে মা?"

খুব আছে বাবা। দুষ্টু বুদ্ধিতে মাথাটি একেবারে ঠাসা।"

বাচ্চাটা না-জেনে, ভোগের পায়েসে মুখ দিয়ে ফেলেছিল। বেড়ালটার নড়া ধরে বাগানে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন রাজ্যেশ্বরী। ঘাসের মধ্যে, মনের দুঃখে থমকে বসে ছিল বেশ কিছুক্ষণ। বসে থাকলেই পারত। মানুষ হলে তাই থাকত। আসলে বেড়াল তো। চট করে ভুলে যায়। গুটিগুটি আবার চলে এসেছিল রান্নাঘরের

সামনে। বেশ বসে ছিল থেবড়ে। রাজ্যেশ্বরীও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন অপরাধ। বিশ্বাসও করেছিলেন বেড়ালটাকে। করেছিলেন বলেই লখিয়ার ডাকে উঠে চলে গিয়েছিলেন পেছনের বারান্দায়। ফিরে এসে দেখলেন, বাচ্চা একটা ভাজা মাছ নিয়ে খাবার ঘরে টেবিলের তলায় বসে মহানন্দে খাচ্ছে। এ-অপরাধও হয়তো ক্ষমা পেয়ে যেত, কিন্তু বাচ্চাটা রাজ্যেশ্বরীকে মেজাজ দেখিয়েছে। টেবিলের তলায় নিচু হয়ে যেই বলেছেন, 'কী রে, কী করছিস এখানে,' উত্তরে বাচ্চাটা ল্যাজ নাড়তে পারত। মিউ করে আদুরে একটা ডাক ছাড়তে পারত। তা না করে 'গোঁ' করছে। একবার 'ফ্যাসঁ'ও করছে।

"আপদটাকে বিদায় করে দিয়ে আয়।"

ছেলেদের ওপর ভার পড়েছিল দূরে বহু দূরে কোথাও ছেড়ে দিয়ে আসবে। কোথায় ছাড়তে হবে তাও বলেছিলেন। "রেল কলোনির ডিসুজারা খুব বেড়াল-ভক্ত। চুপিচুপি তাদের দোরগোড়ায় বসিয়ে দিয়ে আসবি। আর পাঁচটা বেড়ালের সঙ্গে মিলেমিশে ভালই থাকবে।"

মায়ের সব আদেশই দু'ভাই পালন করে। এই আদেশটি তাদের মনঃপুত হয়নি। অনেকে মাথা খাটিয়ে কাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত বাচ্চাটাকে লুকিয়ে লুকিয়ে রেখেছে। আর সম্ভব নয়। মা ওঠার আগে আরও মাথা খাটিয়ে একটা কিছু করতে হবে।

সুকু বললে, "নে নে, ওঠ্ দাদা। মা আসার আগেই সরাতে হবে।"

"কোথায় সরাবি ভাই? আর তো পারা যায় না।"

"আমার মাথায় ভীষণ একটা প্ল্যান এসেছে।"

"কি প্ল্যান?"

"চার্চে ফাদারের কাছে দিনের বেলায় থাকবে। রাতে থাকবে আমাদের কাছে।"

"ফাদার যদি দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন।"

"তা পারেনই না। ফাদার কত দয়ালু! তোর মনে নেই? সেই সেবার ভুলো কুকুরের পা ভেঙে গেল। ফাদার নিজে হাতে পা টেনে ধরে একটা কাঠ বেঁধে প্লাস্টার করে দিলেন। সবাই কত ভয় দেখাল, কামড়ে দেবে। ফাদার গ্রাহ্যই করলেন না। এক মাস ধরে সেই কুকুরের সেবা করলেন। চ দাদা, চ। আর ভাবার সময় নেই।"

রাজ্যেশ্বরীর গান শোনা গেল। সুকু ছোঁ মেরে বেড়ালটাকে তুলে নিয়ে জানলা টপকে বাগানে।

"দাদা, তুই কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাক্। মা ডাকলে তবে উঠিস।"

বেড়ালটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে সুকু দৌড়তে লাগল মাঠ পেরিয়ে চার্চের দিকে। সুন্দর সকাল। প্রথম শীতের ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সুকু দৌড়চ্ছে। উল্টো দিক থেকে দৌড়তে দৌড়তে আসছেন রেঞ্জারকাকু। রোজ সকালে দৌড়তে বেরোন। সুকুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, "চিয়ার আপ মাই বয়, চিয়ার আপ।"

বাচ্চাটা সুকুর বুকের গরমে ঘড়ঘড় করছে। বেড়ালদের এই এক মুশকিল, বিপদেও খুশি থাকে। বাড়ি থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছে, তাও ঘড়ঘড়ানি গেল না। সুকু মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখছে। নরম তুলেতুলে, ধবধবে সাদা। কাঠবেড়ালির মতো মোটা ন্যাজ, সুকুর পেটের কাছে ঝুলছে। সুকু মনে মনে বললে, বাচ্চা, তুই বাংলা জানলে মায়ের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারতিস। বলতে পারতিস, মা, বেড়াল তো চুরি করেই খাবে মা, তুমি কেন চাপা দিয়ে রাখোনি। বেড়ালের কাজ বেড়াল করেছে! মানুষের কাজ মানুষ করেনি। দোষ কার মা? তোমার না আমার?

সুকু চার্চে ঢুকে পড়ল। এইবার শান্তি। চূড়া উঠে গেছে নীল আকাশের দিকে। মাথায় ঘণ্টা ঘর। ওই ঘণ্টাটাই একটু আগে বাজছিল। সিমেন্ট-বাঁধানো পথ ফুলবাগানের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘাসে ঢাকা মাঠ পেরিয়ে সোজা চলে গেছে ফাদার যেখানে থাকেন সেই দিকে। গির্জার জানলার রঙ-বেরঙের কাঁচে সকালের রোদ হাসছে।

সুকু ডাকল, "ফাদার।",

ভেতর থেকে উত্তর এল, "ইয়েস, মাই সান।"

টেবিলে বসে ফাদার কী লিখছিলেন। চোখে আধখানা চশমা। সুকুকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন। ভোরের আকাশের মতো মুখ।

"সুকু! কী ব্যাপার তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?"

"ফাদার, সেভ মাই ক্যাট!"

"ফ্রম র‍্যাটস?"

"না ফাদার ফ্রম মাই মাদার।",

সুকু বেড়ালটাকে টেবিলে ছেড়ে দিল। মিউ করে বেড়ালটা একবার ডাকল। তারপর টেবিল থেকে লাফিয়ে ফাদারের কোলে।

ফাদার বললেন, "বাঃ, ভারী সুন্দর। কোথা থেকে পেলে মাই সান?"

"আমাদের বাড়িতে এসেছিল ফাদার। কেউ মনে হয় ছেড়ে দিয়ে গিয়েছিল।"

"তাই নাকি?"

"হ্যাঁ, ফাদার। ও একটু অপরাধ করে ফেলায় মা ওকে দূর করে দিয়েছেন। প্লিজ সেভ হার।"

"কী অন্যায় করেছে সুকু?"

"একটু চুরি করেছে ফাদার। মা বলছেন চুরি। ঠিক চুরি নয়। নিজের ভেবে খেয়ে ফেলেছে।"

"আই সি!"

"ফাদার, একে আপনি আশ্রয় দিন। সকালে আপনার কাছে থাকবে। রাতে আমরা নিয়ে যাব।"

"ভেরি গুড।"

"ফাদার ওর এখনও ব্রেকফাস্ট হয়নি।"

"আমারও হয়নি। আমরা দু'জনে শেয়ার করব।"

"ফাদার ও একটু বেশি ঘুমোয়।"

"আমার বিছানা আছে।"

"ফাদার ইউ আর গ্রেট।"

"সান, তুমি আমার চেয়েও গ্রেট।"

সুকু বাড়ি ফিরে এল। বেশ হালকা লাগছে এখন। রুকু মুখ ধুয়ে তোয়ালেতে মুখ মুছছে। ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক আছে?"

"হ্যাঁ, আছে।"

"নো প্রবলেম?"

"নো প্রবলেম। মা কোথায়?"

"চা করছেন।"

রান্নাঘর থেকে রাজ্যেশ্বরীর গলা ভেসে এল, "আয়, আয়, পুসি আয়, পুসি। চুকচুক।"

রুকু বললে, "পুসিকে কোথায় পাবে মা? তাকে তো কাল তুমি দূর করে দিয়েছ।"

তবু রাজ্যেশ্বরী ডাকতে লাগলেন, "আয়, আয়, পুসু আয়, দুধ খেয়ে যা।"

সুকু রান্নাঘরের সামনে গিয়ে হাত পা নেড়ে বললে, "বিদায় করেছ যারে নয়নজলে, এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?"

"কিসের ছলে, তাই না? রুকুর কাঁথার তলায় কে আছে? যা, তুলে আন। কাল থেকে কিছু খায়নি। দুধ খাবে।"

"তুমি কী করে জানলে মা?" সুকু আশ্চর্য হল।

"আমি যে ডিটেকটিভ বাবা। কাল রাতে তোরা যখন ঘুমিয়ে পড়েছিস, তখন তোদের ঘরে গিয়েছিলুম দেখতে।"

"কী দেখতে মা?"

"রোজই আমি যাই বাবা হনুমান দেখতে। এক ঘরে দুটো হনুমান কখন কী করে বসে! গিয়েই সন্দেহ হল। কী ব্যাপার! এই গরমে রুকু কাঁথামুড়ি দিয়েছে কেন? গরমে ঘেমে নেয়ে যাবে।

চাপা সরাতে গিয়ে কী দেখলুম বল তো। যা, তুলে আন। আহা, কাল থেকে কিছু খায়নি রে! ভাগ্যিস কাল তোরা ডিসুজাদের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসিসনি!"

"মা, তুমি গ্রেট। কিন্তু মা, এই মাত্র তোমার ভয়ে পুসিকে যে চার্চের ফাদারের কাছে রেখে এলুম।"

"সে কী রে! ফাদারের ওখানে একগাদা বিশাল-বিশাল কুকুর আছে যে রে!" রাজ্যেশ্বরীর হাত থেকে চামচ পড়ে গেল।

"কী হবে মা তাহলে?"

"যা যা, এক্ষুনি নিয়ে আয়। কুকুরে একবার ঘাড় কামড়ে ধরলে মারা যাবে।"

"তুমি আর ওকে তাড়িয়ে দেবে না তো?"

"শোন্, আমি মা তো! আমার দু' রকম কথা। এক মুখের কথা, আর এক মনের কথা। যা যা, নিয়ে আয়।"

রুকু আর সুকু দৌড়ল গির্জার দিকে। রোদ বেশ চড়ে গেছে। গেটের কাছে যখন পৌঁছল, দু'জনেই বেশ ঘেমে গেছে। হাঁপাচ্ছে। দূরে একগাদা বইপত্র বগলে ফাদার হেঁটে চলেছেন অফিসের দিকে।

"ফাদার, ফাদার।"

দু'ভাইকে ছুটে আসতে দেখে ফাদার দাঁড়িয়ে পড়লেন, "ইয়েস মাই সান্স। আবার একটা বেড়াল?"

"না ফাদার, পুসিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম হয়েছে।"

"আই সি। আই সি। বেকসুর খালাস?"

ফাদার হাসতে লাগলেন। ফর্সা মুখ! ঝকঝকে দাঁত। সাদা ধবধবে আলখাল্লা। বুকের কাছে দুলছে সোনালি ক্রস।

ফাদার ফিরে চললেন নিজের ঘরের দিকে। রুকু জিজ্ঞেস করলে, "কী করছে পুসি?"

"আমার বিছানায় চুপটি করে ঘুমোচ্ছে। দুধ খেয়েছে। বিস্কুট খেয়েছে।"

ঘর খুললেন ফাদার। বিছানায় বেড়াল নেই। ঘরের কোথাও নেই। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নেই। খোঁজ খোঁজ। ফাদার বেরোচ্ছিলেন। মোপেডে চেপে পাশের একটা গ্রামে যাবেন। যাওয়া মাথায় উঠে গেল। বাগানে, কিচেনে, সর্বত্র খোঁজা হল। নো ক্যাট। আকাশের দিকে চোখ তুলে ফাদার প্রার্থনা করলেন, "ও গড, গিভ মি মাই ক্যাট।"

ফাদার বললেন, "দাঁড়াও, মাই ফ্রেণ্ড, ভুলো আমাকে সাহায্য করতে পারে কি না দেখি," বলেই ফাদার ডাকলেন, "ভুলো, ভুলো, কাম হিয়ার!"

পা-ভাঙা কুকুর, আগের মতো আর দৌড়তে পারে না। ঝোপের পাস থেকে উঠে এল খোঁড়াতে খোঁড়াতে। সামনে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে।

"ভুলো, তুমি আমার পুসিকে দেখেছ?"

ভুলো ন্যাজ নাড়ল।

"কোথায় দেখেছ?"

ভুলো হাঁটতে লাগল। এপাশ-ওপাশ শোঁকে, আর গুটিগুটি হাঁটে। ভুলো গির্জার মাস-রুমে গিয়ে ঢুকল। সোজা পালপিটের সামনে। নানা রঙের কাঁচ চুঁইয়ে সূর্যের আলো নেমে এসেছে। আলোকের ঝরণাধারার মতো। রুকু, সুকু বিশাল প্রেয়ার রুমের আসনের তলায় পালপিটের ঘেরাটোপের আড়ালে নিচু হয়ে হয়ে দেখতে লাগল। তাদের সঙ্গে ফাদারও।

"হোয়্যার ইজ ইওর পুসি?"

ভুলো হঠাৎ ওপর দিকে মুখ তুলে ঘেউ করে উঠল।

"কী হল ভুলো?"

চার্চের দেয়ালে মেরিমাতার মূর্তি। বিশাল মূর্তি। হাসি-হাসি মুখ। কোল থেকে ঝুলে আছে সাদা একটি ন্যাজ।

স্তুকু আনন্দে লাফিয়ে উঠল, "ফাদার, পুসি মেরিমাতার কোলে উঠে বসে আছে। হাউ নাইস।"

"আয় পুসি, আয়, চুকচুক। আয় পুসি আয়।"

কোল থেকে মুখ তুলে পুসি একবার ডাকল মিউ। মায়ের কোল থেকে নামার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

স্তুকু দৌড়চ্ছে বাড়ির দিকে। "জোর খবর, জোর খবর!"

ছেলের চিৎকার শুনে মা বারান্দায় বেরিয়ে এলেন, "দেখবে চলো মা, দেখবে চলো। তোমার পুসি আর সে-পুসি নেই। মেরিমাতার কোলে উঠে, ন্যাজ ঝুলিয়ে বসে আছে মা। নামতে চাইছে না কিছুতেই।"

রুকু বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছে। সুকু বিছানার মাথার কাছে টেবিলের আলো রেখে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। বইটার নাম টমসায়েব, লেখক, মার্কটোয়েন। পড়ছে বটে কিন্তু তেমন মন বসছে না। মনটা সন্ধে থেকেই খুব খারাপ। ভাবলে ফেয়ারি টেলস পড়ি। যদি ভাল লাগে।

সুকু কোনোদিন অনুমতি না নিয়ে বাবার জিনিসে হাত দেয় না। কী যে দুর্মতি হল আজ। বাবার টেবিলের ড্রয়ার খুলেই দেখল ঝকঝকে সুন্দর নতুন একটা কলম। কলমটা হাতে নিয়ে বারকতক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল। ছোট্ট ছোট্ট খুদি খুদি অক্ষরে সোনালি কাপের গায়ে গোল করে লেখা—পার্কার। কলমটা খুলে বাবার ডাক্তারি প্যাডে খ্যাঁসর খ্যাঁসর করে গোটাকতক আঁচড় কেটে ভেবেছিল লোভটা সামলাতে পারবে। রেখে দিয়েছিল যথাস্থানে। ড্রয়ার বন্ধ করে চলেও যাচ্ছিল। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মন বললে—কলমটা নিয়ে আজ স্কুলে যা সুকু। টেরিফিক হবে। সবাই ট্যারা হয়ে যাবে। কী আছে। বাবা হসপিট্যাল থেকে ফিরে আসার অনেক আগেই তুমি ফিরে আসবে। যেখানকার কলম সেখানেই রেখে দেবে। কেউ জানতেও পারবে না, কেউ ধরতেও পারবে না।

সুকু চুপি-চুপি কলমটা নিয়ে স্কুলে গিয়েছিল। স্কুলে সুকুর খুব সুনাম। ফাদার হপকিনস নাম রেখেছেন, নটি গুড বয়। ক্লাস চলেছে। সুকুর দুরন্তপনাও চলেছে। শুধু কলম নয়, আর একটা জিনিসও সুকু পকেটে করে সযত্নে নিয়ে গিয়েছিল। কৌটোর ভেতরে একটা গুবরে পোকা। সুকুর ভয়ডর নেই। নিজের শোবার

ঘরে একটা কাচের জারে বেশ কিছুদিন একটা ইঞ্চি ছয়েক মাপের তেঁতুলে বিছে ধরে রেখেছিল। লাল টকটকে। দেখলেই ভয় করে। কী করে, কী কায়দায় ধরেছিল সুকুই জানে। কেন ধরেছিল সুকুই বলতে পারে। রুকু ভয়ে ঘরে ঢুকতে পারে না। মা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ও আপদটাকে জোটালি কোথা থেকে?'

সুকু বলেছিল, 'বাগান থেকে। তোমরা তো বাগানে কেবল ফুল আর গাছই দেখো। আরও কত কী আছে জানো? এটা তার একটা।'

'আমার জেনে কাজ নেই। টেবিলে রেখেছিস কী জন্যে? যদি বেরিয়ে আসে।'

'জুলজি হচ্ছে মা। এরপর দেখবে সাপ, ব্যাঙ, কাঁকড়া-বিছে, কেন্নো, ঘুরে ঘুরে সব ধরে আনব। কাচের জারে পাশাপাশি সাজানো থাকবে। তোমাদের ধারণা ওরা শুধু শুধু কামড়াবার জন্যেই জন্মায়। না, ভুল ধারণা। ওরাও পোষ মানে।'

রুকু মাকে বলেছিল, 'মা আমার শোবার ঘরটা আলাদা করে দাও। চিড়িয়াখানায় শোবার সাহস আমার নেই।'

ঘর আলাদা করতে হল না। বিছে কী খেয়ে বেঁচে থাকে জানা না থাকায় সুকু সেটাকে আবার বাগানে ছেড়ে দিয়ে এল। রুকু বলল 'ভগবান বাঁচিয়েছেন।'

সুকু বলেছিল, 'ভগবান বেশি দিন তোমাকে বাঁচাতে পারবেন না দাদা। না খেয়ে মরে যাবে, তাই ছেড়ে দিয়েছি। ফাদার ডাইসন বিছের খাদ্যতালিকা তৈয়ারি করছেন। সেটা হাতে এলেই এ ঘরে আমি বিছেদের প্যারাডাইস বানাব। অ্যাকোয়ারিয়ামের মতো বিছেরিয়াম। এই এতবড় একটা কাচের বাক্স। তলায় পুরু বালি বিছোনো। তার ওপর তেঁতুল বিছে, স্বরস্বতী বিছে, কাঁকড়া বিছে, থাউজ্যাণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান টাইপ অব বিছে। বিছেদের চেহারা দেখেছ, ভয়ঙ্কর সুন্দর! দেখলে যেমন ভয় করে ভালবাসতেও ইচ্ছে করে।'

রুকু জানে সুকুটা যা বলে তাই করে। ভয়ে দুবার ঢোঁক গিলে আর কথা বেশি বাড়তে দেয়নি। খেয়াল কাটলে ভাল, না কাটলে মাথার কাছে বিছেরিয়াম নিয়ে আতঙ্কে জেগে রাত কাটাতে হবে। বাবাকে বলতে, হাত ধরে বলবেন, 'বি ব্রেভ মাই বয়।' সুকুর পিঠে দুবার চাপড় মেরে বলবেন, 'বি কেয়ারফুল ইউ ডাকু। দে আর ডেঞ্জারাস।'

রুকু গুবরে পোকাটা বাগানের একটা বড় গাছের ফোকর থেকে সংগ্রহ করেছিল অতি কষ্টে। স্কুলে নিয়ে গিয়েছিল, ক্লাসে কারুর গায়ে ছেড়ে দিয়ে কোনোরকম অসভ্যতা করার জন্য নয়। বাড়িতে রেখে গেলে পাছে মা কোথাও পাচার করে দেন সেই ভয়ে। পোকাটা যাতে বেশ স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে এই রকমেরই একটা কৌটো সে সংগ্রহ করেছিল বাবার ওষুধের আলমারি থেকে। ভিটামিন বিস্কুটের চ্যাপ্টা রঙচঙে কৌটো। ক্লাসে কৌটোটা সে বইয়ের ব্যাগ থেকে বের করে বেন্চের উপর রেখেছিল। রেখে মন দিয়ে পড়া শুনছিল। মাঝে মাঝে অবশ্য একটু অন্যমনস্ক হচ্ছিল। না হয়ে উপায় ছিল না। অতবড় শক্তিশালী একটা গুবরে পোকা। শরীরের আকারের তুলনায় আধারটা তেমন বড় নয়। তার ওপর ছিল বাগানে এখন, বন্দী। বন্দী হয়ে থাকতে কার ভাল লাগে! সকলেই মুক্তি খোঁজে। কৌটোর ঢাকনাটা মাঝে মাঝে ওপর দিকে অল্প অল্প লাফিয়ে উঠছে। সুকু হাত দিয়ে চেপে চেপে দিচ্ছে।

পাশেই বসে ছিল মেরি আলভা। ব্যাপারটা সে লক্ষ্য করেছিল। কৌতূহল চাপতে না পেরে সে একসময় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'মাস্ট বি ভেরি স্ট্রং অ্যাণ্ড লিভিং ভিটামিন বিসকিটস।'

সুকু ফিসফিস করে বললে, 'ইয়েস, স্পেশ্যালি প্রিপেয়ার্ড ফর মি।'

ফাদার হপকিন ডায়াস থেকে মৃদু একটু ধমক দিলেন, 'বি অ্যাটেনটিভ মাই বয়েজ। আই রেসপেক্ট ইউ অল অ্যাণ্ড বি রেসপেক্টবল।' ফিসফিস বন্ধ হয়ে গেল।

সুকু খাতায় নোট নিচ্ছিল বাবার পার্কার কলম দিয়ে। হাতের লেখাটা যেন কলমের গুণে ভীষণ খুলছে! কলমটাকে মোটেই টানতে হচ্ছে না, কলমই হাত টেনে নিয়ে চলেছে।

আলভা আড়চোখে কলমটাও দেখে নিয়েছে। ফাদার ব্ল্যাক-বোর্ডের দিকে পিছন ফিরতেই আলভার মাথাটা সুকুর দিতে কাত হল, 'অ্যা নিউ পেন!'

'ইয়েস, পার্কার ফিফটি ওয়ান।'

'মাই গড। ভেরি ভেরি কস্টলি।'

ফাদার ক্লাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'ইয়েস, দিস ইজ ইওর আর্থ, এই হল তোমাদের পৃথিবী, অ্যাণ্ড দেয়ার ইজ ইওর মুন। এইবার তোমরা বলো পৃথিবী থেকে চাঁদে একটা রকেট পাঠাতে হলে তার স্পীড—'

ফাদার তাঁর প্রশ্ন শেষ করার সময় পেলেন না। সুকুর বেনচি থেকে রকেটের বেগে গুবরে পোকাটা সোজা উড়ে গেল ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। যাবার সময় ফাদার হপকিনসের কানের পাশ দিয়ে একটা পথ করে নিল। ফাদার ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না। ভয় পাননি, তবে চমকে উঠে কানের পাশে একটা চাপড় মারতেই গোল্ড ফ্রেমের শৌখিন চশমাটা নাক থেকে সামনের টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ল। গুবরে পোকাটাও বোর্ডে মোক্ষম একটা ঢুঁ মেরে তার যা স্বভাব, চিত হয়ে উল্টে রইল প্লাটফর্মে। ভোঁ-ভোঁ শব্দ।

ফাদার চশমাটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে নেড়েচেড়ে চোখে দিয়ে বললেন, 'ফরচুনেটলি সেভড। তোমাদের পাঠানো রকেট টার্গেট মিস করেছে। বাট হোয়াট ইজ দি মিসাইল লেট মি সী।'

ফাদার হেঁট হয়ে বস্তুটিকে দেখলেন। 'ও মাই গড। অ্যান

ইণ্টারেস্টিং ইনসেক্ট। আমার মনে হয়, ও ফাদার ডাইসনের ক্লাস ভেবে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল।' ফাদার পা দিয়ে পোকাটাকে সোজা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সুকু রেগে গেছে। আলভার কাজ। সুকু যখন চাঁদে যাবার রকেটের স্পীড ঠিক করছিল, ঠিক সেই সময় আলভা নিশ্চয়ই কৌটোর ঢাকনাটা খুলেছিল। মেয়েলি কৌতূহল। ফাদার ডায়াস থেকে রিলে করছেন, 'চিত হয়েই হাত-পা ছুঁড়ছে, তোমরা ফাদার ডাইসনকে বলবে, আই হ্যাভ অবজার্ভড ইটস নেচার, দিস কাইণ্ড অব ফিউরিয়াস ইনসেক্ট নিজের পায়ে দাঁড়াতে ভীষণ অপছন্দ করে। একটু আয়েসি আছে। এ লিটল বিট অব লেথার্জিক! শুয়ে শুয়ে চলাফেরা করতে ভালবাসে।'

হঠাৎ পোকাটা ভোঁ করে টেবিলের পাশ দিয়ে ক্লাসের দিকে উড়ে এল। মনে হয়, ফাদারের অনেকক্ষণের চেষ্টায় হঠাৎ সোজা হয়ে গিয়েছিল। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের ভয়ই বেশি। সবাই হাঁউ-মাঁউ করে এমন একটা কাণ্ড করল, বেনচ, ডেস্ক উলটে পালটে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড। ফাদার বলছেন, 'ইয়েস টেল ফাদার ডাইসন, ইট হ্যাজ অল দি কোয়ালিটিজ অব এ জেট প্লেন, জেট প্লেনের মতো উড়তে পারে।'

আলভা ভয়ে সুকুকে জড়িয়ে ধরেছিল। সুকু রেগে গেছে, 'ইট ইজ ইউ। তোমার জন্যে, তোমার জন্যে আমার ওই মহামূল্য সংগ্রহ জানলা গলে বেরিয়ে গেল। আই ডোণ্ট নো। তুমি আমার পোকা ফিরিয়ে এনে দাও। আই ডোণ্ট নো।'

শেষের 'আই ডোণ্ট নো'-টা সুকু এত জোরে বলেছে ফাদার শুনে ফেলেছেন। সুকু রাগের চোটে আলভার মাথার চুল ধরেও টেনেছে। আলভা দু-হাতে সুকুকে ধরে আছে জাপটে, অথচ অভিমানে চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে। কান্না জড়ানো গলায় বলছে, 'হাও ক্যান আই গিভ ইউ ব্যাক অ্যান আগলি ইনসেক্ট? তুমি তার বদলে আমার

ব্যাগ থেকে অন্য যা খুশি নিয়ে নাও।

ফাদার ডায়াস থেকে বললেন, 'হ্যালো বয়েজ অ্যাণ্ড গার্লস, অল ক্লিয়ার। আর এয়ার রেডের চানস নেই। স্বুকু, তুমি অত উত্তেজিত কেন? আলভা, তোমার অত দুঃখ কেন?'

স্বুকু উঠে দাঁড়িয়েছে, 'ফাদার, আমি বাইরে যেতে চাই। প্লিজ অ্যালাও মি। ওই পোকাটা আমার।'

'পোকা! ডোণ্ট সে পোকা। বলো বম্বার। ওটা তোমার পোকা! হাউ ফানি!'

'ইয়েস ফাদার, সকালে অনেক চেষ্টা করে বাগান থেকে ধরে কৌটোয় ভরেছিলুম, এই আলভা ওকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'আলভা, তুমি প্রিজনারকে মুক্তি দিয়েছ কেন?'

আলভা উঠে দাঁড়িয়েছে, চোখে জল। ফাদার জিজ্ঞেস করলেন, 'হোয়াই? ইউ আর ক্রাইং, মাই ল্যাস!'

'ফাদার, ওকে আমি কত ভালবাসি! তবু ও আমার চুল ধরে টেনেছে।'

'আগে টেনেছে না পরে টেনেছে?'

'পরে, এই মাত্র।'

'তুমি কি ভাবে এটা সম্ভব করলে?'

'ফাদার, ভিটামিন বিসকুটের টিনে পোকাটা ছিল। ঢাকনাটা মাঝে মাঝে লাফাচ্ছিল, সো আই আস্কড, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট স্বুকু? হি সেড, পাওয়ারফুল ভিটামিন বিসকিটস। হোয়েন হি ওয়াজ বিজি উইথ ইউ, আমি আস্তে আস্তে ঢাকনাটা খুলতেই, ইট জাম্পট আউট অ্যাণ্ড হিট দি ব্ল্যাক বোর্ড।'

'হিট দি ব্ল্যাক বোর্ড।' আলভার গলা নকল করে স্বুকু ভেঙচি কাটল।

ফাদার স্বুকুকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন, 'স্বুকু, স্বুকু, তুমি অত্যন্ত কঠোর ভাষা ব্যবহার করছ। তোমার সহপাঠিনী ভীষণ ভয় পেয়েছে।

তুমি ক্লাসের দিকে তাকিয়ে দেখো ; যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে। ওই দেখো, রঞ্জন এখনও ডেস্কের তলায় চাপা পড়ে আছে। লেট আস রেসকিউ হিম।'

ক্লাসটাকে সকলে মিলে মেরামত করতে করতেই পিরিয়ড শেষ হয়ে গেল।

সুকু যথাসময়ে বাড়ি ফিরে এল। ফিরে এল না দামী কলমটা। সারাদিনের উত্তেজনায় কলমের কথা সুকু ভুলেও গিয়েছিল। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর সুকুর বাবা লেখার টেবিলে বসে আবিষ্কার করলেন, কলমটা নেই। প্রথমে স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন। না, তিনি জানেন না। বই পড়ছিলেন। উঠে এসে, টেবিলের ড্রয়ার, টেবিলের ওপর, জামার পকেট, ডাক্তারি ব্যাগ সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন। কলম পাওয়া গেল না।

'রুকু, তুমি জান?'

রুকু জানে না। সত্যিই সে জানে না। না বলে বাবার কোনো জিনিসে সে হাত দেয় না। সুকুকে ডাকা হল। সন্ধ্যে থেকেই সে ভয়ে ভয়ে ছিল। সুকু বলল, জীবনে সে ওইরকম কলম দেখেইনি। হাত দেওয়া তো দূরের কথা।

ডক্টর মুখার্জি হাসিহাসি মুখে বললেন, 'কলমটা বড় কথা নয়, বড় কথা, দুঃখের কথা হল তোমাদের দুজনের মধ্যে যে-কেউ একজন মিথ্যে কথা বলছ।'

সুকু সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'তা হলে দাদা। ও সকালে মাকে বলছিল ওর কলমের নিবটা ভেঙে গেছে।'

রুকুর কলমের নিব সত্যিই ভেঙে গিয়েছিল।

রুকু প্রতিবাদ করল, 'আমার কলমের নিব ভেঙে যাওয়ার মানেই কি বাবার কলম নেওয়া, নিয়ে অস্বীকার করা! অপূর্ব তোর যুক্তি সুকু!'

'ঠিক আছে রুকু, তুমি যদি নিয়েই থাকো, প্লীজ সত্যি কথা বলো।

আমি কলম চাই না, আমি সত্য কথা চাই।'

'তুমি জানো বাবা, আমি মিথ্যে কথা বলি না। সেবার তোমার দামী অ্যাসট্রেটা ভেঙে ফেলেছিলুম, কই আমি তো অস্বীকার করিনি।'

'ছ্যাটস ট্রু।'

সুকু বললে, 'সেটা সকলের চোখের সামনে হয়েছিল, অস্বীকার করার উপায় ছিল না!'

রুকু বললে, 'তা হলে আর একটা ঘটনার কথা বলি, বাবার বিলিতি গ্যাসলাইটারটা আমি একবার খারাপ করে ফেলেছিলুম। কেউ দেখেনি। আমি চেপে যেতেও পারতুম। চাপিনি। বাবা আসতেই আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছিলুম।'

ডঃ মুখার্জি বললেন, 'ইয়েস ছ্যাটস ট্রু। তাহলে আজকের ঘটনায় কে মিথ্যে কথা বলছ? কে দুর্বল হয়ে পড়েছ? কার মর‍্যাল সিঙ্ক করেছে? সত্য নিয়ে বুক ফুলিয়ে আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছ?'

রুকু সহজেই বলতে পারত সুকু। কিন্তু বলল না। কারুর ঘাড়ে সে দোষ চাপাতে চায় না। যদিও সুকুর ব্যবহারে সে দুঃখ পেয়েছে।

শোবার ঘরে সুকু কয়েকবার দাদার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছে। রুকু একটাও জবাব দেয়নি। শুধু একটা কথাই বলেছে, 'আমার সঙ্গে তুই কোনোদিন কথা বলবি না। আমি তোকে ডিসলাইক করি।'

সেই থেকে সুকু বারবার একটা স্তবকই পড়ছে। কিছুতেই মন বসাতে পারছে না। লাইনের পর লাইন চোখের সামনে অর্থহীন কালো কালো শব্দ।

> Far over the misty mountains grim
> To dungeons deep and caverns dim
> We must away, ere break of day
> To win our harps and gold from him,

সুকুর মনে হল সে নিজেই গল্পের বামনদের মতো ক্রমশ ছোট

হয়ে আসছে!   মনে কোন সুখ নেই।

বাগানের দিকের খোলা জানালা দিয়ে ফুরফুর করে পশ্চিমের হাওয়া আসছে! পাতার শব্দ। দূরে পালামৌ হিলসের ঘাসবনে কারা আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। ঢেউ খেলানো আলোর রেখা আকাশের গায়ে। চার্চের চূড়ো তার মাথার উপর উজ্জ্বল একটা তারা।

জানালার বাইরে থেকে কে যেন মিষ্টি ভারী গলায় ডাকলেন, 'রুকু, সুকু মাই সান্‌স।'

সুকু চমকে উঠেছিল। জানালায় একটি মুখ। বুকের ওপর সাদা দাড়ি হাওয়ায় উড়ছে। ফাদার ডাইসন। সুকু ধড়মড় করে বসল, 'ফাদার আপনি?'

'ইয়েস মাই সান। তুমি কী পড়ছিলে?'

'অ্যান আনএক্‌সপেকটেড পার্টি।'

'ওঃ হো। রুকু ঘুম।'

সুকু ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে ফেলল।

'হোয়াট ইজ দিস! তুমি কাঁদছ কেন!'

'ফাদার। আমি মিথ্যেবাদী। আই অ্যাম এ লায়ার।'

'নো নো মাই সান। চিলড্রেন অব গড কাণ্ট বি লায়ারস।'

সুকু কান্না জড়ানো গলায় বললে, 'হ্যাঁ, ফাদার, আমি মিথ্যেবাদী! আমি মিথ্যে কথা বলেছি।'

ফাদার জানালার বাইরে থেকে সুকুর মাথায় একটা হাত রাখলেন, 'গডস ব্লেসিংস।'

সুকু ফাদারের হাত স্পর্শ করে বলল, 'ফাদার, আমি খারাপ হয়ে গেছি। আমার মর‍্যাল ভেঙে গেছে, দুর্বল হয়ে গেছে।'

'ইউ টেল মি দি হোল ফ্যাক্ট। আমি সবটা শুনতে চাই। আমি পোকামাকড় ধরতে বেরিয়েছিলুম, ভাবলুম, তোমাদের দুজনকে জানালা দিয়ে গুডনাইট করে যাই, বলে যাই হ্যাপি ড্রিমস। বাট ইউ আর সো আনহ্যাপি।'

স্কু কাঁদো-কাঁদো গলায় সারাদিনের ঘটনা ফাদারকে বলে গেল। বাবার পেন হারানো, অস্বীকার করা।

ফাদার বললেন, 'তোমার পেন নিশ্চয়ই ক্লাসরুমে পড়ে আছে, কোনো ডেস্কের তলায়।'

'ফাদার। আলভা নেয়নি তো!'

'ও, নো নো। তা হতেই পারে না। শি ইজ এ গুড গার্ল। তোমাকে একটা কথা বলি, অপরকে সন্দেহ করার আগে নিজেকে সন্দেহ করবে। লুক অ্যাট দোজ হিলস, ট্রিজ, ভাস্ট স্কাই, পৃথিবী যত বড় তার চেয়েও অনেক অনেক বড় করবে তোমার মনকে। ক্ষুদ্র মন আমাদের সব অসুখ, সব যন্ত্রণার জন্যে দায়ী আই উইল সী। কাল সকালেই তোমার বাবার কলম বেরোবে কোনোও ডেস্কের তলা থেকে।'

স্কু পাহাড়ের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এল ফাদারের মুখের ওপর। সোনালী ফ্রেমের চশমায় আলো পড়ে চকচক করছে সাদা ধবধবে মুখে। সাদা পোশাক।

ফাদার বললেন, 'রুকুকে ডাকো। ওর ঘুম এখনও তেমন গভীর হয়নি। রুকু রুকু '

রুকু ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। প্রথমে বুঝতে পারেনি। ভেবেছিল ভোর হয়েছে। ঘরে টেব্‌ল ল্যাম্পের মৃদু আলো, বাইরে কালো আকাশ, জানালায় সাদা মূর্তি।

'কাম হিয়ার রুকু। তোমার ভাইয়ের খুব দুঃখ হয়েছে। তুমি ভাব করে নাও।'

'বাট ফাদার, ও মিথ্যেবাদী।'

'নো, নো, রুকু ও সেই সময়টায় দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এখন ওর আমিটা সবল হয়েছে। নাও হি উইল কনফেস হিজ গিল্ট। স্কু, তুমি এখনই তোমার বাবার কাছে গিয়ে সত্য কথা বলে ক্ষমা চাইবে। আমি এখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তোমাদের সুখী দেখে তবেই ওই দূর জঙ্গলে যাব। আমার নকটারন্যাল ভিজিটে।'

রুকু বললে, 'হোয়াই ডোণ্ট ইউ কাম ইন ফাদার ফর এ হোয়াইল।'

'পাগল ছেলে, দি হাউস ইজ নট প্রিপেয়ারড ফর এ ভিজিটার অ্যাট দিস টাইম অব দি নাইট। গো মাই বয়েজ।'

বাবার ঘরে আলো জ্বলছে। বাতাসে জানালার পর্দা উড়ছে। খুব মৃদু সুরে বাবা বেহালা বাজাচ্ছেন। বড় করুণ সুর। সুকুর চোখে আবার জল এসে গেল। রুকু সুকুর পিঠে হাত রেখে বললে, 'কাঁদছিস কেন পাগল ছেলে!'

সুকু ধীরে ধীরে দরজায় কয়েকবার টোকা মারল। বেহালা থেমে গেল। দরজা ভেজানো ছিল, হাত দিয়ে ঠেলতেই খুলে গেল, 'বাবা, আমি সুকু।'

'বাবা, আমি রুকু।'

'আরে এসো এসো, ট্ গ্রেট ফাইটার্স। তোমরা এখনও ঘুমোওনি?'

সুকু সোজা বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'বাবা, আমি তোমার কলমটা নিয়েছিলুম।'

সুকু কথা শেষ করতে পারল না, বুক ঠেলে কান্না আসছে।

'আমি জানতুম, আমি জানতুম, মাই সানস আর গ্রেট। দে আর নট ক্রিপলড।'

সুকুর মাথাটা বিশাল বুকে চেপে ধরলেন।

'কলমটা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছি বাবা।'

ওরা লক্ষ করেনি। ফাদার ডাইসন পায়ে পায়ে এ ঘরের জানালার বাইরে চলে এসেছেন। ফাদার বললেন, 'কাণ্ট সে, হারিয়ে গেছে। আমার ধারণা ক্লাসরুমেই পড়ে আছে।'

'ফাদার।' ডক্টর মুখার্জি উঠে দাঁড়লেন।

'ডক্টর, আই কাণ্ট মিস সাচ এ পিস অব সুইট ড্রামা।'

রুকু, সুকু ও তাদের বাবার অনুরোধে ফাদার ডাইসনকে ভেতরে আসতে হল। শুধু আসা নয়, বসতে হল। কফি এসে গেল।

ফাদার বললেন, 'লেট আস সেলিব্রেট দিস ভিকট্রি ওভার মিউজিক। স্বকুকে, রুকুকে কে হারাবে! লেখাপড়ায়, চরিত্রে ওরা হবে গ্রেট, ভেরি ভেরি গ্রেট! ছোটখাট পরাজয় সব যুদ্ধেই হয়। কী বল মাই সানস।' ফাদার হাসতে থাকলেন। ফাদার হাতে তুলে নিলেন বেহালা। হঠাৎ গান গেয়ে উঠলেন, স্বরে স্বর মিলিয়ে,

The Sun was shining on the sea
Shining with all might.

দাদুর বাগান

'পৃথিবী ঈশ্বরের সৃষ্টি আর উদ্যান হল মানবের সৃষ্টি ।'

'কোন্ নেতা আবার এই জ্ঞানটি দিলেন ?'

'দাদুর মুখ খবরের কাগজের আড়ালে। পায়ের ওপর পা। এক পায়ে বিদ্যাসাগর চটি। মৃদু-মৃদু নাচছে। উলটো দিকের সোফায় বসে আছেন মেজদাদু। থাকেন দেরাদুনে। অনেক দিন পরে কাল এসেছেন। ইচ্ছে, রিটায়ার করার সময় হয়েছে, দেরাদুনের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে আসবেন। মেজদাদুর স্বভাবই হল মানুষকে উশকে দিয়ে মজা করা। মা দু'জনের সামনে দু'কাপ চা রেখে গেছেন। মেজদাদু দু'চার চুমুক চা চালিয়েছেন। বড়দাদু কাগজ থেকে মুখ তোলার অবসর পাচ্ছেন না। মাথা ডান থেকে বাঁ, বাঁ থেকে ডানে টানা পাখার মতো ঘুরেই চলেছে।

বড়দাদু কাগজের আড়াল থেকে বললেন, 'এ সব কথা নেতাদের বলার ক্ষমতা নেই। তাঁরা বলবেন, চলছে চলবে। এ হল আমার কথা।'

'হঠাৎ তোমার এই রকম একটা জ্ঞানোদয় হল কেন ?'

'পৃথিবী একটা পাঠশালা। চোখ-কান খোলা রাখলে প্রতি মুহূর্তে মানুষ কিছু-না কিছু শিখতে পারে। আর তোর মতো চোখ বুজে থাকলে পৃথিবী ঘুরেই যাবে, তুমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে থাকবে।'

'তুমি বোধহয় আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারলে না দাদা! কাগজ পড়তে-পড়তে, পৃথিবী, ঈশ্বর, উদ্যান তিনটে একসঙ্গে এসে গেল কী ভাবে ? দ্যাখো, কৌতূহল না থাকলে মানুষের জ্ঞানলাভ হয় না। শিশুদের কৌতূহল বেশি বলে তারা ঝটপট অনেক কিছু শিখে নিতে পারে।'

'তুমি যদি নিজেকে শিশু মনে করে থাকো, তা হলে আমার অবশ্য কিছুই বলার থাকে না।'

'আমি শিশু কিনা নিজেই দ্যাখো। এই দ্যাখো আমার একটাও দাঁত নেই।'

মেজদাদুর দু'পাটি বাঁধানো দাঁত শোবার ঘরে এক গেলাস জলে এখনও ভিজছে।

বড়দাদু বললেন, 'কাগজে আজ একটা বিজ্ঞাপন রয়েছে, কলকাতার উপকণ্ঠে বাগানসহ বাড়ি বিক্রয়। তুই তো বলছিস দেরাদুনের পাট তুলে দিবি। এই বাগানবাড়িটা কিনে নিলে কেমন হয়?'

'উঃ, ফাটাফাটি হয়ে যায়। ইউ আর গ্রেট দাদা। অ্যালফ্রেড দি গ্রেটের মতো, তুমি আমার দাদা দি গ্রেট। কাগজটা একবার দাও না।'

'উত্তেজিত হোসনি। সাফল্যের মূলে থাকে ধৈর্য।'

মেজদাদু সোফায় এলিয়ে পড়ে চায়ে চুমুক দিতে-দিতে বললেন, 'তোমার চা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।'

'যাক। চা আমি ঠাণ্ডা করেই খাই। গরম চা খেলে গায়ের রঙ কালো হয়ে যায়।'

'আরে, আমি তো চিরকাল গরমই খাই। তুমি তো আগে বলোনি। তাই আমার গায়ের রঙটা কেমন যেন মাজা-মাজা হয়ে গেছে।'

'হ্যাঁ, এই নে তোর কাগজ।'

বড়দাদু কাগজটা মেঝেতে ফেলে দিলেন। মেজদাদু কাগজটা তুলে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। কাগজও তো মা সরস্বতী। দেশবিদেশের কত খবর থাকে! আমাকে বললেন, 'চশমাটা শোবার ঘর থেকে নিয়ে এসো তো। আমার দু'টো চশমা যেটার মাথা কাটা, সেটাকে বলে রীডিং গ্লাস, তুমি সেইটে আনবে।'

বড়দাদু বললেন, 'হাফ চশমাটা।'

শোবার ঘরের আলনায় গোটা কুড়ি বিভিন্ন ধরনের ছড়ি ঝুলছে। মুসৌরির পাহাড় থেকে মেজদাদু কিনে এনেছেন। বৃদ্ধদের উপহার দেবেন। বড়দাদুকে একটা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'আমি এখনও বৃদ্ধ হইনি। এখনও আমি যুবক।'

চশমা চোখে দিয়ে মেজদাদু বিজ্ঞাপনটা জোরে জোরে পড়লেন।

'দাদা, একটা ফোন নম্বর রয়েছে একবার ফোন করে দেখলে হয় না? শুভস্য শীঘ্রং, অশুভস্য কালহরণম্।'

'উঁহুঁ, ধৈর্য। চা শেষ করে আমি আবার একবার বিজ্ঞাপনটা পড়ব। দু'বার পড়ব, তিনবার পড়ব।'

'কেন? এটা কি তোমার পরীক্ষার পড়া? অতবার পড়ার মানে?'

'সে তুই বুঝবি না রে মান্তু! দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে রে! ম্যাপ দেখে জায়গাটা চিনতে হবে।'

'কী যে বলো তুমি! সারা জীবন তিলকে তাল করে এলে। এ কি তোমার কুমেরু অভিযান না কি যে, ম্যাপ দেখে জায়গা চিনতে হবে। চব্বিশ পরগনার আবার ম্যাপ কিসের!'

'সে তুমি বুঝবে না ছোক্‌রা! থাকো বিদেশে। যুগ কী রকম পালটেছে সে খবর রাখো?'

'খুব রাখি।'

'অশ্বডিম্ব রাখো। সারা জীবন তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে কাটালে। বাঘ, ভাল্লুক, বন্দুক, পাইনগাছ, এই তো তোমার জগৎ।'

'কেন, কেন? সতীদাহ বন্ধ হয়ে গেছে, এ খবর আমি রাখি জাতিভেদ প্রথা উঠে গেছে, এ খবরও রাখি। ধুতি পাঞ্জাবি পরা উঠে গেছে সে-খবরও রাখি। দেশে দু'রকমের ইস্কুল আছে, ইংলিশ আর বেঙ্গলি মিডিয়াম।'

'ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে সে খবর রাখো?'

'তুমি কি আমাকে সত্যিই সদ্যোজাত শিশু ভাবলে? সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্ট, এ রেড লেটার ডে।'

'স্বাধীনতার মানে জানো ?'

'অফকোর্স, স্বাধীনতার মানে ফ্রীডম।'

'কিসের ফ্রীডম ?'

'কেন, শাসনের স্বাধীনতা, কথা বলার স্বাধীনতা, কাজ করার স্বাধীনতা।'

'অকাজ করার স্বাধীনতার কথা শুনেছ ?'

'না।'

'দুষ্কর্ম করার স্বাধীনতাব কথা শুনেছ ?'

'সে আবার কী ?'

'ওই তো মনুচন্দ্র, আকাশ থেকে পড়লে মানিক ! এ-দেশে যে-কেউ যা-খুশি করতে পারে ! চারটে লোক চেপে ধরে তোমার মাথাটা কামিয়ে দিয়ে যেতে পাবে।'

'যাঃ, তা কখনও হয় ?'

'হয় মানিক. ইট মেরে তোমার জানালার সব কাচ ভেঙে দিয়ে যেতে পারে। তোমার বাগানের সব গাছ উপড়ে নিয়ে যেতে পারে।'

'রাইফেল চালাব, ডালকুত্তা লেলিয়ে দোব।'

'খুনের দায়ে পড়বে। শেষ জীবনটা জেলে কাটবে। তোমার বাগানে বাস্তু-ঘুঘু চরবে।'

'সে কী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনকাল পালটে গেছে ভাই। সেই শান্তশিষ্ট বাঙালীর যুগ আর নেই। সব সময় কাড়ানাকাড়া, আর দামামা বাজছে মানুষের বক্তে। সাধে ভদ্রলোক বাড়ি আর বাগান বেচতে চাইছেন ?'

'তুমি যখন জানোই, তখন আমাকে শুধু-শুধু নাচিয়ে দিলে কেন ? আশার ছলনে ভুলি কী ফল লভিনু হায়।'

'হতাশ হয়ো না। আমাকে একটু তলিয়ে দেখতে দাও। ধ্যানে সব ধরা পড়বে।'

'সে আবার কী ?'

'সে তুমি বুঝবে না।'

'তার মানে তুমি ভূত নামাবে ?'

'ভূত ছাড়তেও পারি ।'

'তার মানে, তোমার কিছু পোষা ভূত আছে ?'

'ধরো, সেই রকমই।'

'তার মানে, তুমি মহাদেব ?'

'পাঁচজনে তো সেই রকমেই বলে।' বড়দাদু বললেন, 'ভুতো, টেলিফোন ডাইরেক্টারিটা নিয়ে আয়।'

আমার এক এক দিন, এক এক নাম। কাল ছিল গজা, আজ হয়েছে ভূতো। কৃষ্ণের শতনামের মতো, আমার সহস্র নাম।

দাদু বলেন, 'তুই আমার নামাবলী। মাঝে মাঝে আসল নামটাই ভুল হয়ে যায়।' দাদু জিজ্ঞেস করেন, 'তোর আসল নামটা কী ছিল রে গবা ?' আমাকে তখন মায়ের কাছে ছুটতে হয়। স্কুলে, মাঝেমধ্যে এই নাম ভুলে যাবার জন্যে পিটুনি খেতে হয়। সকাল থেকে যার নাম চলেছে অ্যাটলাস কি হটেনটট, সে বারোটার সময় অঙ্কের মাস্টার মশাইয়ের পিণ্টু ডাকে সাড়া দিতে দু চার মিনিট দেরি করলে কিছু বলার আছে? হয়তো আছে, তা না হলে ডাস্টার-পেটা খেতে হবে কেন ?

দাদু ফোনে অবনীকে ডাকলেন। 'শোনো হে অবনী।'

অবনীর ঘাড়ে একগাদা কাজ চাপল। গোয়েন্দাগিরি করতে হবে যেমন, জায়গাটা কোন্ দলের এলাকা ? আশেপাশে কী আছে! কলকারখানা আছে ? বস্তি আছে ? চায়ের দোকান আছে ? ক্লাব আছে ? নর্দমা কত দূর দিয়ে গেছে ? পাকা, না কাঁচা ? বড় রাস্তা কতদূরে ! এলাকায় ছোট ছেলের সংখ্যা বেশি, না যুবকের সংখ্যা, না বৃদ্ধের ? স্কুল কত দূরে !

দাদু এক-একটা ফিরিস্তি বের করছেন, আর মেজদাদু তারিফ করে উঠেছেন, 'বাহবা, বাহবা !'

পাক্কা আধঘণ্টা লাগল টেলিফোন শেষ করতে ।

মেজদাদু বললেন, 'কবে নাগাদ তোমার খবর আসবে ?'

'কালই এসে যাবে। অবনী কাজ ফেলে রাখার ছেলে নয়। তার নীতি হল, কাজ সেরে বসি, শত্তুর মেরে হাসি ।'

দাদু বললেন, 'যাও টমেটম, ডাইরেক্টারিটা যথাস্থানে রেখে এসো, তোমার ফাদার আবার এখুনি চেঁচাতে শুরু করবে। বড় মেথডিক্যাল মানুষ। আর হবে না কেন? মেথডিক্যাল না হলে জীবনে অত উন্নতি হয়? এই যেমন আমার কাজের ধারা ছ্যাখো! সব আটঘাট বেঁধে ধীরে-ধীরে এগোই। তোর মতো অমন হালুম করে লাফিয়ে পড়ি না। সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা বাঘ নই, মানুষ ।'

'তোমার কি মনে হয়, হালুম করে লাফিয়ে পড়ে বলে বাঘের কোনও ক্ষতি হয় ? বাঘ কত বড় প্রাণী জানো ? তুমি সামনাসামনি বাঘ দেখেছ ?'

'বাঘ দেখিনি? কী বলিস রে? ওই ব্যাটাকে নিয়ে প্রত্যেক বছর শীতকালে আমরা চিড়িয়াখানায় যাই ।'

'হ্যাঃ, চিড়িয়াখানার বাঘ আবার বাঘ! ও তো এক একটা শেয়াল। বাঘ দেখেছি আমি! কুমায়ুনের মানুষখেকো। যেমন তার রঙ, তেমন ব্যবহার। আহা!'

'খুব ভদ্র, অমায়িক ব্যবহার?'

'আরে না না, ভদ্র-অভদ্রের কথা আসছে কী করে? বাঘ কি ভদ্রলোক! বাঘের ব্যবহার বাঘের মতো। এক একটা লাফ কি! এই এ পাড়া থেকে ও পাড়া। হালুম করে মারলে লাফ, মাথার ওপর দিয়ে কোথায় যে চলে গেল!'

'মানে ওভারবাউণ্ডারি! ফীলডিং ভাল না হলে, সব বলই ওভার-বাউণ্ডারি হবে। ক্যাচ মিশ করা আমাদের ইণ্ডিয়ান টিমের একটা রোগ। এ সব প্লেয়ারদের দল থেকে বাদ দেওয়া উচিত।'

'নাঃ দাদা, সত্যি তোমার বয়স হয়েছে। হচ্ছে বাঘের কথা, টেনে আনলে ক্রিকেট। বাঘ কি ক্রিকেট বল যে লাফিয়ে উঠে ক্যাচ ধরব, আর আম্পায়ার আঙুল তুলে বলবেন, হাউজ দ্যাট! তুমি রোজ একটা করে ভিটামিন খাও।'

'ভিটামিন তুই খা। আমি রোজ পুঁইশাক খাই। শিকারীর হাতে রাইফেলটা কী জন্যে থাকে। সেইটা দিয়ে দুম্ করে মারা যায় না?'

'আজ্ঞে না, যায় না। তুমি শিকারের কিছুই বোঝো না।'

'একটা রাইফেল দে না, দেখিয়ে দিচ্ছি, শিকারের কী বুঝি আর না বুঝি।'

'এখন আর তেমন বাঘ নেই, থাকলেও মারা যাবে না।'

'কেন নেই?'

'নেই তাই নেই।'

'তোমাব মাথা। ওই গর্দভের মতো হালুম-লাফ মেরে-মেরেই জাতটা শেষ হয়ে গেল। বাঘের যদি আটঘাট বেঁধে কাজে নামার বুদ্ধি থাকত, তাহলে তোমাকে আর এখানে বসে বসে ন্যাজ নাড়তে হত না, বাঘের পেটে স্বর্গে যেতে।'

'তুমি যাই বলো, বাঘ মানুষের চেয়ে ঢের বড়।'

'বড় হলেই মানুষ হয় না। মানুষ বাঘের চেয়ে ঢের ঢের ঢের বড়। তিন ঢের বড়।'

'বাঘ তা'হলে ছ ঢের বড়।'

'মানুষ তা হলে বারো ঢের।'

'বাঘ তা হলে চব্বিশ।'

'মানুষ তা হলে আটচল্লিশ।'

'বাঘ ছিয়ানব্বই।'

'মানুষ তা হলে একশো বিরানব্বই।'

বাঃ এ যেন নিলাম হচ্ছে! কার রেট কোথায় ওঠে! নাঃ ব্যাপারটা

ফয়সালা হল না। মা এসে পড়ল! মা এলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। কোনোও গোলমাল দেখলেই মা ছুটে আসবে। সেই বলে না, শান্তির শ্বেত পারাবত, দু দেশের নেতা এক জায়গায় হলেই যা দু'হাতে আকাশে ওড়ান আর বলতে থাকেন, ভাই ভাই। মা'কে শান্তির জন্যে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত।

মা ঘরে ঢুকেই বলল, 'তোমাদের কোনও কাজ নেই?'

দু' দাদু এক সঙ্গে বললেন, 'না আমাদের কাজ কী! সংসারের সব কাজ আমরা শেষ করে বসে আছি। আমরা এখন রিটায়ার্ড।'

মা মেজদাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার দাঁত মাজা হয়েছে?'

মেজদাদু হে হে করে হেসে বললেন, 'দাঁত নিজেই নিজেকে মাজবে! সে হল স্বাধীন, আমার তোয়াক্কাই করে না।'

মা বড়দাদুর দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাবা. বেড়ানো হয়ে গেছে?'

'আজ আবার বেড়ানো কিসের? আজ তো রবিবার। আমরা এখন বাঘ মারব।'

'দাঁড়াও তোমাদের বাঘ মারা আমি বার করছি।' মা গলা ছেড়ে ডাকতে লাগলেন, 'পুষ্প, পুষ্প, এই ঘরটা আগে ঝাঁট দিয়ে মুছে নে।'

দাদু বললেন, 'উঠে পড়ো ভায়া, ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্ল্যান। ঝগড়া না করে তুই যে এক জায়গায় চুপ করে বসতে পারিস না! বয়েস হচ্ছে স্বভাবটা পাল্টা না।'

'বাঘের অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। বাঘ ইজ এ বাঘ।'

পুষ্পদি ফুলঝাড়ু বালতি আর ন্যাতা নিয়ে নেতার মতো ঘরে ঢুকল।

সন্ধের দিকেই অবনীবাবু এসে গেলেন। ন্যাড়া মাথায় ক্রিকেট টুপি। টাইট প্যান্ট, জামা ভেতরে গোঁজা। স্বাস্থ্য বেশ ভালই। দরজার সামনে আমাকে দেখে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে খোকা, ইহা কি গঙ্গাধরবাবুর বাড়ি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। গেটের বাইরেই তো নাম লেখা আছে।'

'ছোটখাটো জিনিস আমার চোখে পড়ে না।'

'আমার দাদু ছোটখাটো মানুষ?'

'আচ্ছা আড়বোঝা ছেলে তো! দাদু বাড়ি আছেন?'

'হ্যাঁ আছেন।'

'গিয়ে বলো অবনী এসেছে।'

'এসেছে নয়, এসেছেন।'

'সে তো তুমি বলবে, আমি বলব কেন? কুকুর আছে?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তিনি কোথায়?'

'তিনি নয়, সে।'

'ওই হল রে বাবা। সব কথায় অত ভুল ধরো কেন? সেই কুত্তাটা এখন কোথায়?'

'কুত্তা নয় কুকুর।'

'খাতির করলেও ভুল ধরবে, খাতির না-করলের ভুল ধরবে। এ ছেলে বড় হলে দেখছি নির্ঘাত স্কুলমাস্টার হবে।'

'কুকুর এখন ছাতে দাদুর সঙ্গে হাওয়া খাচ্ছে আর গান গাইছে।'

'গান গাইছে নয়, ল্যাজ নাড়ছে। এইবার তোমার ভুল ধরেছি।'

'আমাদের কুকুর গানও গায়।'

আমাকে আর যেতে হলো না, দাদুই এসে গেলেন। 'কার সঙ্গে বকবক করছিস রে লুলো? ও, অবনী এসে গেছ। এসো এসো ভেতরে এসো।'

সেই অদ্ভুত অবনীবাবু হাতজোড় করে দাদুর পেছন পেছন বসার ঘরে ঢুকে গেলেন। ভাল সোফায় না বসে একটা চেয়ারে বসলেন। দাদু বললেন, 'ওখানে বসলে কেন?'

'আজ্ঞে যার যেমন জায়গা। ও সব বড় মানুষের জন্যে। আমাদের জন্যে এই ভালো।'

'তুমি কি ছোট মানুষ ?'

'আরেব্বাপ, কী বলছেন আপনি ? আমার কোনোও এডুকেশন নেই। আপনি বাঁচিয়েছিলেন বলে জেলের বাইরে আছি, করে খাচ্ছি।'

'তুমি আমাকে ভালোবাসো ?'

'আরেব্বাপ, জিন্দেগিতে আমি একজনকেই ভালবাসি, সে হল আপনি।'

ভদ্রলোক কী ভাবে কথা বলছেন ! কী রকম ভয়ে ভয়ে বসে আছেন জড়সড় হয়ে।

মেজদাদুর শুকনো কাশি হয়েছে। খক্‌খক্ করতে করতে ঘরে এসে ঢুকলেন। বড়দাদু প্রশ্ন করার আগে মেজদাদুই শুরু করলেন, 'হ্যাঁ তা হলে কী বুঝলেন ?'

বড়দাদু বললেন, 'তুমি একদম নাক গলাবে না। চুপ করে বোসো। খক্‌খক্ করে কাশাও চলবে না।'

'যদি কাশি পায় ?'

'বাইরের বাগানে চলে যাবে। ঝাউগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেশে আসবে।'

অবনীবাবু বললেন, 'তা হলে আমি স্টার্ট করি।'

'না আমার একটা প্রশ্ন আছে। তোমার কি কেউ মারা গেছেন ?'

'কই, না তো।'

'তাহলে মাথা মুড়িয়েছ কেন ?

'আজ্ঞে, চুলের চিকিৎসা চলেছে। ভুশভুশ করে সব চুল উঠে যাচ্ছে। দুবার ন্যাড়া হয়েছি, আরও দুবার ন্যাড়া হব।'

'এবার তা-হলে একটা টিকিও রাখ। ইলেকট্রিকসিটি খেলবে, খাড়া-খাড়া চুল বেরোবে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ তাই করব। তা হলে বলি।'

মেজদাদু বাধা দিলেন। 'চুলের বিষয়ে আমার কিছু বলার আছে।

মাথা যখন মুড়িয়েছেন তখন আর-একটা কাজ কারুন। রোজ সকালে মাথায় গরম গোবর লেপে দিন। পনের দিনের মধ্যে কচি-কচি চুল বেরিয়ে যাবে।'

'গরম গোবর আমি পাব কোথায় ?'

'একটা গোরু কিনে ফেলুন। পেটে দুধ, মাথায় গোবর।'

'অবনী!' বড়দাদু কড়া গলায় ডাকলেন, 'বড় বাজে বকছ হে, নাও শুরু করো, জানো আমার সময়ের দাম আছে ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চারপাশ ফাঁকা।'

'কোথায় ফাঁকা।'

'ওই যে, বাগানবাড়িটা যেখানে। চারপাশে ধুধু মাঠ, অচেনা পথঘাট। কাছাকাছি একটা নদী আছে। নাম, ইছামতী।'

মেজদাদু বললেন 'ব্যাস, ব্যাস, আব আমার কিছু চাই না। নদী, বাগানবাড়ি। বহুদিনের ইচ্ছে, শেষ জীবনটা লিখে কাটাব। জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রথম বইটার নাম হবে 'ভদ্রলোক বাঘ, অভদ্র মানুষ।' দ্বিতীয় বইটার নাম, 'সাহসী চিতা।'

বড়দাদু বললেন, 'আমি আগেই বলে রাখছি, তোমার ওই রাবিশ আমি পড়তেও পারব না।'

'কে বলছে তোমাকে ভূমিকা লিখতে ? আমি বিলেত থেকে জেরালড জরেলডকে দিয়ে ভূমিকা লিখিয়ে আনব।'

'তাই এনো ? অবনী, তুমি বলে যাও।'

'আজ্ঞে, আশেপাশে যখন মানুষই নেই, তখন ছেলে বুড়ো,'যুবক যুবতীর প্রশ্নই আসে না। আসে কি ?'

'না, আসে না। রাস্তাঘাট ?'

'পিচের রাস্তা থেকে আর-একটা পিচের রাস্তা নেমেছে। সেই রাস্তা থেকে আর একটা সরু রাস্তা, সেটা থেকে আর একটা। ঘুর-পাক খেতে-খেতে সেই বাড়ি।'

'কতটা হাঁটতে হবে ?'

'মাইল দুয়েক।'

'চলবে না। ক্যানসেল?'

মেজদাদু বললেন, 'ক্যানসেল কেন।'

'অতটা কে হাঁটবে?'

'সাইকেল কিনব।'

অবনীবাবু বললেন, 'আপনারা অন্তত একবার দেখে আসবেন চলুন। আমার খুব পছন্দ হয়েছে। বাগানে খুব ভাল ভাল গাছ আছে। পাখির ডাক কী, কানের কাছে যেন সারেঙ্গি বাজছে সারা দিন।

'বেশ, তাই হোক। চলো, কাল ভোরেই বেরিয়ে পড়ি।'

মেজদাদু বললেন, 'খুবই ভাল কথা।'

বড়দাদু বললেন, 'তুমি চুপ করো। ভাল কথা কি খারাপ কথা, সে আমি বুঝব। অবনী, তুমি আজ রাতে এখানেই থাকবে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু ছাতে শোব।'

'তাই শুয়ো।'

'মাংসের ঝোল দিয়ে ভাত খাব।'

'কেন মাংস কেন?'

'বড় লোভ হয়েছে।'

'আচ্ছা তাই হবে।'

'একটু চাটনি।'

'তাও হবে।'

'শেষ পাতে একটু দই।'

'ব্যাস, ওইতেই শেষ।'

'হ্যাঁ, আর না, শুধু এক খিলি পান।'

'এক খিলিতে তোমার হবে না বাপু, দু'খিলি পাবে।'

'মেজদাদু বললেন, 'জর্দা চলে না কি?'

'আজ্ঞে সে ব্যবস্থা আমার পকেটে আছে।'

'আমার স্ত্রীর কাছে লাখনোর এক নম্বর জিনিস আছে। তোমাকে দেব।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে একটু বেড়িয়ে-চেড়িয়ে আসি।'

'হ্যাঁ, এসো, বুঝতেই পেরেছি, অনেকক্ষণ ধূমপান হয়নি।'

'আজ্ঞে, ধরেছেন ঠিক।'

সকাল না হতেই বাড়িতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বাথরুম থেকে বড়দাদু বোরোন তো মেজদাদু ঢোকেন। মেজদাদু বেরোন তো বড়দাদু ঢোকেন। ওঁদের এই ঘনঘন আনাগোনা দেখে মা রেগে রেগে উঠছে। বাবা বললেন, 'তুমি আর আগুনে কাঠ গুঁজো না। দু'জনেই নার্ভাস ডায়েরিয়ায় ভুগছেন, পারো তো ঘুমের ওষুধ খাওয়াও।'

'যাবেন বাগানবাড়ি দেখতে, অত ভয়ের কী আছে বাপু? সঙ্গে অমন ছেলে যাচ্ছে।'

অবনীবাবু এক রাতেই আমার দাদা হয়ে গেছেন। অবনীদা বুকটা একবার ফুলিয়ে নিলেন। বাবা বললেন, 'দুই বৃদ্ধকে নিয়ে আজ তোমার বরাতে খুব দুঃখ আছে।'

'আজ্ঞে, দুঃখই তো জীবন।'

'হ্যাঁ, বুঝবে ঠ্যালা। তখন এই কথাটা তোমার মনে থাকলে হয়।'

বড়দাদু বাথরুম থেকে বেরোচ্ছেন, মেজদাদু ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, 'তোমার কী হল বলো তো দাদা। কাল কি জোলাপ খেয়েছিলে? এতবার যাচ্ছ আর আসছ।'

'তুই আর কথা বলিসনি মেজ! তোর কবার হল গুনেছিস?'

'মাত্র তিন বার।'

'আজ্ঞে না, সাতবার। আমার এখনও এক কম আছে।'

মা বললেন, 'আর এক কম থাকে কেন? উনি বেরলেই তুমি সমান করে নাও।'

'করবই তো। বাথরুমে যাবার স্বাধীনতা সকলেরই আছে।'

অবনীদা বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে, আজ আর আপনারা যেতে

পারবেন না। আমি বরং কাল সকালে আসি।'

'আরে না না। এটা আমাদের বংশগত রোগ। ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে না দিলে এ চলতেই থাকবে।'

'আজ্ঞে, ধাক্কা দেবার কেউ নেই? এদিকে তো নটা প্রায় বাজল।'

'ধাক্কা কে দেবে বল্, আমরা যে বড় হয়ে বসে আছি।'

'তা হলে নিজেরাই এবার নিজেদের ধাক্কা দিন।'

'হ্যাঁ সেই ব্যবস্থাই করতে হবে। আমি মেজোকে দোব, মেজো আমাকে দেবে।'

যাক দশটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লুম। দাদুর ব্যাপারে আমাকে সঙ্গে থাকতেই হবে। মাও তাই চায়।

বাইরে একা একা বেরলে দাদু ভীষণ চানাচুর খান। সেবার দুশো গ্রাম চানাচুর খেয়ে ভীষণ কাণ্ড করেছিলেন।

আমরা চলেছি টানা ট্যাকসিতে। মেজদাদুর গা থেকে ভুরভুর চন্দনের গন্ধ বেরচ্ছে। অবনীদার মুখ থেকে জর্দার।

হুহু করে গাড়ি ছুটিয়ে প্রায় বারোটা নাগাদ আমরা সেই বাগান-বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলুম। মেজদাদু নেমেই বললেন, 'আহা স্বর্গ!'

বড়দাদু ধমক দিলেন, 'তুমি একটাও বাজে কথা বলবে না। স্বর্গ কি নরক সে আমরা বুঝব।'

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললেন, 'ঠিক বলেছেন দাদু, বেশি লাফালাফি করলেই চড়া দাম হাঁকবে।'

বড়দাদু ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমার ওই দাদু ডাকটা বদলানো যায় না? লেখাপড়া তো করেছ, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, বুড়োকে বুড়ো বলতে নেই, এ-শিক্ষাটা হয়নি?'

'আজ্ঞে তা হলে কী বলব?'

'কিছুই বলবে না। না বলেও তো বলা যায়।'

মেজদাদু যোগ করলেন, 'যেমন না-বলা বাণী।'

'আবার বাজে বকছ?'

'যাব্বাবা, একটা কথাও বলা যাবে না?'

'না, যাবে না। কোন্ কথায়, কী কথা বেরিয়ে আসে কে বলতে পারে!'

গাড়ি দাঁড়িয়ে রইল। আমরা আবার ফিরে যাব।

বাগানটা সত্যিই বিশাল। বহু ধরনের গাছ। আমগাছে বোল এসেছে। গন্ধে মাত। মৌমাছি ভ্যানভ্যান করছে।

বড়দাদু আপন মনে বললেন, 'অ্যাসেট। এমন জিনিস কি কেউ ছাড়বে! কে জানে!'

মেজদাদু বললেন, 'এবার কী হল দাদা! তুমি যে প্রশংসা করলে! দাম বেড়ে যাবে না?'

'তুমি ছাড়া কেউ শুনেছে?'

'আমি যখন স্বর্গ বলেছলুম, তুমি ছাড়া কেউ শুনেছিল?'

'তুই বড় তর্ক করিস।'

'হ্যাঁ সত্যি কথা বললেই তর্ক হয়ে যায়!'

'তোর বাড়ি তুইই তাহলে বোঝ, আমি তোর কোনোও ব্যাপারে থাকতে চাই না। ফিরে চললুম।'

বড়দাদু সত্যিসত্যিই গাড়ির দিকে ফিরে চললেন। অবনীদা এক হাত ধরেছেন, মেজদাদু আর এক হাত, আমি জাপটে ধরেছি কোমর।

মেজদাদু বললেন, 'তুমি চট করে বড় রেগে যাও।'

অবনীদা বললেন, 'নিজেদের মধ্যে অশান্তি ঠিক নয়।'

গাড়ির চালক বললেন, 'ওই করেই বাঙালি জাতটা শেষ হয়ে গেল।'

বড়দাদু বললেন, 'আমরা বাঙালি নই। দেখবে আমাদের একতা? চল মেজো, চল।'

হাওয়া সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে গেল। লোহার গেটে তালা ঝুলছে চেন বাঁধা।

বড়দাদু বললেন, 'যাঃ, হয়ে গেল। বাড়িতে বোধহয় কেউ নেই। তুমি আসল খবরটাই নাওনি অবনী!'

'কালও তো আমি লোক দেখে গেছি। দাঁড়ান, একবার দেখি!'

অবনীদা গেটের লোহার তালা বাজাতে লাগলেন। কী তার শব্দ!

অনেক দূর থেকে কে একজন হেঁকে বললেন, 'মেরে তক্তা করে দোব। আবার ফিরে এসেছিস!'

অবনীদা চীৎকার করে বললেন, 'আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি স্যার।'

বড়দাদু মৃদু ধমক দিলেন, 'স্যার বলছ কেন?' আমরা কি চাকরি চাইতে এসেছি? আমবা কিনতে এসেছি। সেই ভাবে ডাঁটে কথা বলো অবনী।'

অবনীদা আবার চীৎকার করলেন, 'আমরা বিজ্ঞাপন দেখে এসেছি মশাই।'

'মাথা কিনে নিয়েছেন!' উত্তব এল জবরদস্ত।

অবনীদা বড়দাদুর দিকে করুণ মুখে চেয়ে বললেন, 'এর উত্তরে কী বলব?'

'কিছু বলবে না। বড় মাছ তুলতে গেলে একটু খেলাতে হয়। এখন স্রেফ সুতো ছেড়ে যাও।'

ঢলঢলে সাদা প্যাণ্ট আর হাফহাতা জামা পরা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। সামনে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ঝুলছে। দেখলেই হাসি পায়। কোথাও কিছু নেই, এতখানি একটা দাড়ি। চোখে মোটা চশমা। গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় বললেন, 'সব কিছুর একটা সভ্যতা আছে।'

বড়দাদু বললেন, 'আমরা তো কোনো অসভ্যতা করিনি।'

'সভ্যতা, অসভ্যতার বোধটাই তো আপনাদের নেই। গেটে তালা বাজাচ্ছিলেন কেন? এটা কি আফ্রিকান বাদ্যযন্ত্র? আপনারা কি কনসার্ট পার্টি?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে ?'

'কী ভাবে তা হলে ডাকব ? কলিং বেল নেই যে !'

'ডাকবেন না। গেটে তালা মানেই দেখা করার সময় চলে গেছে। সকাল নটা থেকে এগারোটা, বিকেল তিনটে থেকে পাঁচটা।'

'কই, কাগজে লেখেননি তো !'

'সব কথা কি লেখা যায় ! বিজ্ঞাপনের খরচ জানেন ! সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু জিনিস বুঝে নিতে হয়।'

মেজদাদু বললেন, 'অলিখিত আইনের মতো !'

'দ্যাটস রাইট।'

বড়দাদু বললেন, 'আমরা তা হলে কী করব এখন ? ফিরে যাব ?'

'সে আপনাদের ইচ্ছে। ফিরেও যেতে পারেন, আশেপাশে ঘোরাঘুরিও করতে পারেন, তিনটে বাজলে আসবেন। হ্যাঁ যাবার আগে এক টিন রঙের দাম দিয়ে যেতে হবে।'

'সে আবার কী ?'

'এই যে তালা ঠুকে এই জায়গার রঙ চটিয়েছেন।'

বড়দাদু বললেন, প্রমাণ আছে ?'

'তার মানে ?'

'ওটা যে চটেই ছিল না তার কোন প্রমাণ আছে !'

'আমি বলছি, এই তো যথেষ্ট প্রমাণ।'

'তা হলে আদালতেই ফয়সালা হবে। এই নিন আমার কার্ড।'

বড়দাদু গেটের এপাশ থেকে ওপাশে ভদ্রলোককে একটা কার্ড এগিয়ে দিলেন। আমি জানি কী লেখা আছে, দাদুর নাম, এম, এ, এল, এল, বি, অ্যাডভোকেট, ক্যালকাটা হাইকোর্ট। নাও, এবার বোঝো ঠ্যালা। আমার দাদুকে না চিনেই বড় বড় কথা।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি আইন ব্যবসায়ী ?'

'কী মনে হচ্ছে ? একটা মানহানির মামলা তা হলে ঠুকে দি ?'

মেজদাদু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠুকে দাও দাদা। মেরে তক্তা করে

দোব বলেছেন, আমি স্বকর্ণে শুনেছি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি কে? অ্যাডিং ফিউয়েল টু দি ফায়ার?'

'আজ্ঞে, আগুনটা জ্বেলেছে কে? এইবার বুঝুন ঠেলা। আমি উত্তরপ্রদেশের কনজারভেটার অফ ফরেস্ট, বহু বাঘ মেরেছি জীবনে বড বড় বাঘ, বড় বড় বাঘ।'

'আমি কে জানেন?'

'আপনি? আপনি একজন অভদ্র লোক।'

'তা হলে এই নিন আমার কার্ড।'

উঃ, দারুণ জমেছে! কার্ডের খেলা চলেছে। তাস খেলা। টেক্কার ওপর টেক্কা পড়ছে।

বড়দাদু কার্ডটা উলটে পালটে দেখলেন। মেজদাদু পাশ থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছেন। আমি আর অবনীদা একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি।

বড়দাদু বললেন, 'আপনি ডক্টর ভবেশ মহাপাত্র? আমার বিশ্বাস হয় না।'

মেজদাদু বললেন, 'স্পেস সাইনটিস্ট ভবেশ মহাপাত্র, যিনি মহাশূন্যে রকেট ওড়ান? তাঁর তো এখন ফ্লোরিডায় থাকার কথা।'

'আঃ, তুমি চুপ করো। সব কথায় কথা বলো কেন? ফ্লোরিডা কি না জানি না, তবে ভারতে থাকার কথা নয়। বড বড় লোকেরা সব ভারতের বাইরে থাকেন।'

ভবেশবাবু বললেন, 'আমি ফিরে এসেছি। আমি ফিরে এসেছি। সবাই বলছে আমার মাথাটা নাকি একটু খারাপ হয়েছে।'

'প্রমাণ আছে?

'পাগলের প্রমাণ পাগলামি!'

'যেমন?'

'আমার বিশ্বাস ঢেঁকি স্বর্গে যেতে পারে। আমি সেই ঢেঁকির খোঁজে ভারতে এসেছি।'

আমিও বিশ্বাস করি। নারদ যে ঢেঁকি চড়ে আসা-যাওয়া করতেন, সেই বিশেষ ধরনের ঢেঁকিটি খুঁজে বের করতে হবে। ভারতবর্ষের কোথাও-না-কোথাও অবহেলায় পড়ে আছে।'

'আফগানিস্থানেও থাকতে পারে।'

'এ আপনি কী বলছেন, ঢেঁকি হল ভারতবর্ষের জিনিস, বিশেষত বাঙলার।'

'আরে মশাই, ঢেঁকি যে সময় বাহন ছিল, সেই সময় বিশাল আর একটা মহাদেশ ছিল, ভারত, আফ্রিকা টাফ্রিকা নিয়ে।'

'আপনি কিস্যু জানেন না।'

'আপনি কিস্যু জানেন না, এ আপনার হাইকোর্ট নয়।'

'আপনি ঘোড়ার ডিম জানেন।'

'ঘোড়ার যে ডিম হয়, তাই তো আপনি জানেন না।'

'তাই নাকি? কোন্ ঘোড়ার, আপনার ঘোড়ার?'

'আজ্ঞে না, পক্ষীরাজের। আমার কাছে আছে, দেখতে চান?

'বাড়িতে ঢুকতেই দিচ্ছেন না তো ডিম দেখা!'

'এইবার দোব, আপনি আমাব মনের মানুষ, তবে একটা শর্ত। ঢেঁকি শুধু বাঙলাদেশেই খুঁজলে হবে না, এলাকা বাড়াতে হবে। ওদিকে এশিয়া মাইনর, এদিকে আফ্রিকা।'

'বেশ, তাই হবে।'

ঝলঝলে জামার পকেট থেকে এক গোছা চাবি বের করে তিনি তালা খোলার চেষ্টা করতে লাগলেন। একবার এ চাবি ঢোকান, একবার ও চাবি ঢোকান। তালা কিন্তু খোলে না। কী করে খুলবে! তালা একটা, চাবি পঞ্চাশটা। আমার দাদুর দেবাজ খোলার অবস্থা। ভুল চাবিটাই বারেবারে ঘুরে ঘুরে আসে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর তিনি করুণ মুখে বললেন, 'কী হবে, চাবি যে মিলছে না! আপনারা গেট টপকে ঢুকতে পারেন না? আমার ছেলে ঢোকে।'

'আজ্ঞে না, সে বয়েস আর নেই। ছেলেবেলায় টিফিন আওয়ারের পর স্কুলে ঢুকেছি গেট টপকে, যৌবনে যাত্রা দেখে বাড়ি ঢুকেছি পাঁচিল টপকে।'

'আমার এই তালাটা মাঝে মাঝে বড় ভোগায়। একটা কাজ করলে হয়, যখন খুলবে তখন যদি ঢোকেন।'

'তার মানে?'

'মানে খুব সহজ, বাই চান্‌স এক সময় চাবি লাগবেই, তালা খুলবেই, সে ধরুন আজও হতে পারে, কালও হতে পারে, তখন টুক করে ঢুকে পড়বেন।'

'তার মানে, সেই দুর্গ অবরোধের মতো সৈন্যসামন্ত নিয়ে আমরা বাইরে বসে থাকব দিনের পর দিন, বছরের পর বছর! মামার বাড়ি আর কী?'

'তা হলে আপনারা চেষ্টা করুন।'

রাগ করে ভদ্রলোক চাবির থোলেটা আমাদের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন।

দাদু বললেন, 'অবনী, চেষ্টা করো।'

অবনীদা একের পর এক চাবি লাগাচ্ছেন আর খুলছেন। বিশাল দু'মানুষ উঁচু গেট। সহজে টপকানো যাবে না। মাথার দিকে খোঁচা-খোঁচা বর্শার ফলা। বেশ জাম্পেশ গেট। অবনীদা ঘেমে উঠেছেন। এতক্ষণ আমরা লক্ষ করিনি, পেছনে আর এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছেন।

ভদ্রলোক বললেন, 'ব্যর্থ চেষ্টা, ওই চাবির মধ্যে তালার চাবি নেই। চাবি আমার কাছে। এই দেখুন।'

সুন্দর চেহারার যুবক। এক মাথা এলোমেলো চুল। চোখে রঙিন চশমা। দু'আঙুলে চাবিটি তুলে দাঁড়িয়ে আছেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র, ও হল বিদেশী এজেন্ট, আমার গবেষণার শত্রু, তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে

দোব। তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করে দিয়েছি, আবার এসেছ, আবার এসেছ!'

ভদ্রলোক করুণ মুখে বললেন, 'আপনারা আমার বাবাকে ক্ষমা করুন। সম্প্রতি ওঁর মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে। দূর থেকে এসেছেন, আপনাদের বাড়ির ভেতরে সাদরে নিয়ে যেতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন।'

ভবেশবাবুর পেছনে এক বিদেশী মহিলা এসে দাঁড়িয়েছেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আমার স্ত্রী লরা। লরা, তুমি ওঁকে ভেতরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো।'

সেই বিদেশী মহিলা, অসীম স্নেহে দেশী বিজ্ঞানীকে মেয়ের মতো বুকে জড়িয়ে ধরে ছোট ছেলেকে যে ভাবে ভোলাতে থাকে, সেই ভাবে ভোলাতে লাগলেন।

ভবেশবাবু চিৎকার করে বললেন, 'উড়ন্ত ঢেঁকি ছিল, এখনও আছে, এ-কথা আপনারা বিশ্বাস করেন কি না!'

দাদু বললেন, 'না করি না, ও হল গল্প-কথা। রূপক। আসলে ঢেঁকি হল রকেট।'

'ইউ আর অল লায়ারস, ফরেন এজেন্ট।'

ভদ্রমহিলা ভবেশবাবুকে ভেতরে নিয়ে চলেছেন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'তোমরা দেশের শত্রু।'

বড়দাদু বললেন, 'ভেরি স্যাড, খুবই দুঃখের।'

ভবেশবাবুর ছেলে বললেন, 'ভেরি স্যাড।'

দাদু বললেন, 'উড়ন্ত ঢেঁকি কিন্তু থাকতে পারে। একবার খোঁজ-পাত করে দেখলে হয় না?'

'মরেছে, পাগলামি দেখছি ছোঁয়াচে! আপনারা এখুনি এঁকে নিয়ে চলে যান। তা না হলে আমার বাবার মতো অবস্থা হবে! ইতিমধ্যে পঞ্চাশ হাজার টাকার ঢেঁকি কিনে ফেলেছেন। এই বাগানবাড়ি বেচে সারা পৃথিবীর ঢেঁকি কিনতে চান!'

দাত্ব বললেন, 'পৃথিবীর সমস্ত আবিষ্কারকই প্রথম দিকে পাগল বলে পরিণত হতেন। হঠাৎ একটা কিছু হয়ে গেলে, তোমরাই তখন এঁকে মাথায় তুলে নাচবে। পরশপাথর কি সত্যিই ছিল না? পক্ষীরাজ কি নিছক কল্পনা? নাগপাশ কি গাঁজাখুরি? পুষ্পক রথ কি গল্প-কথা?'

অবনীদা ফিসফিস করে বললেন, 'যাঃ, হয়ে গেল! আর একটা উইকেট পড়ে গেল!'

আমি বললুম, 'পরশপাথর কিন্তু সত্যিই আছে।'

অবনীদা বললেন, 'যাঃ, আরো একটা উইকেট পড়ে গেল!'

মেজদাত্ব বললেন, 'আমার কেমন মনে হয় কামধেনু এখনও হয়তো আছে। কল্পতরুও থাকতে পারে।'

অবনীদা বললেন, 'যাঃ, হোল ফ্যামিলি আউট!'

বড়মামা, মোটর সাইকেল লাকি ও ভোলা

বড়মামা সকাল থেকেই পেয়ারের কুকুর লাকির ওপর ভীষণ রেগে গেছেন। পাশের ঘর থেকে শুনছি আমরা। চা-বিস্কুট খেতে খেতে হচ্ছে, 'বেরিয়ে যাও ইডিয়েট, বেরিয়ে যাও আমার ঘর থেকে। তোমার মুখ আমি দেখতে চাই না জানোয়ার, রাসকেল। একটা বিস্কুট দেওয়া আমার ডিউটি, এই নাও। গেট আউট, গেট আউট। না না, ডোণ্ট টাচ্ মাই বডি। উঁহুঁ উঁহুঁ, আদর নয়, আদর নয়। যাও, যাও। মোহন! মোহন! ইডিয়েট মোহন।'

মেজমামা আর আমি এ ঘরে বসে, চা খেতে খেতে গল্প করছিলুম। মেজমামা আমাকে আবিসিনিয়ার কাফ্রীদের গল্প বলছিলেন। এমনভাবে বলছিলেন যেন এইমাত্র ঘুরে এলেন। কথা বলতে বলতে মেজমামার খুব হাত পা নাড়ার অভ্যাস। দুবার কাপ উল্টে যাবার মতো হয়েছিল। গল্পের গভীরে ঢুকে গেলে তখন আর কাপ ডিশের খেয়াল থাকে না। বড়মামা যখন পাশের ঘর থেকে 'মোহন মোহন' করে চিৎকার করছেন, মেজমামা তখন বর্শার ফলায় মানুষের মুণ্ডু গেঁথে নাচাচ্ছেন। বড়মামার চিৎকারে ভীষণ বিরক্ত হয়েছেন। গল্প বলার মেজাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমাকে বললেন, 'বলে এসো তো, মোহন মারা গেছে আর বলে এসো, ডোণ্ট শাউট।'

মেজমামার হাত থেকে ছাড়া পাবার সবচেয়ে বড় সুযোগ। সকাল বেলাই সারা ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবেন। মাঝে মাঝে উটকো প্রশ্ন করে আমার জ্ঞান পরীক্ষা করবেন। না পারলেই মিনিটখানেক ছি ছি শব্দ করে বলবেন, যাও, এনসাইক্লোপিডিয়ার ছ' ভল্যুমটা নিয়ে এসো, নিয়ে এসো বারো, কি সাত। প্রত্যেকবার টুলে উঠে উঠে ভারি-ভারি বই পাড়ো, ধুলো ঝাড়ো। আর পাতার পর পাতা রিডিং পড়ো!

গরমের ছুটিতে মামার বাড়িতে কি জন্যে আসা! এসেছি বাগানের আম, জাম, জামরুল, ফলসা খেতে।

বড়মামার ঘরের দরজার সামনে অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হল। ভেতরের দৃশ্যটা দেখার মতো দরজার পর্দাটা একপাশে সরানো। জানলার কাছে ছোট টেবিলে দরজার দিকে পিছন ফিরে বড়মামা বসে আছেন। টকটকে লাল সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ধবধবে সাদা স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পৈতেটা দেখা যাচ্ছে। পৈতের সঙ্গে বাঁধা চাবি কোমরের কাছে দুলছে। ফর্সা চেহারা। চওড়া পিঠ। নধর মাংসল দুটো হাত।

চেয়ারের হাতলের ওপর সামনের দুটো পা তুলে দিয়ে লাকি লাল মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সারা গা-ভর্তি সাদা-সাদা বড় বড় লোম। মুখটা ভারী মিষ্টি। ঝুমকো-ঝুমকো লোমের ভেতর থেকে চকচকে দুটো চোখ উঁকি মারছে। লাকি চেষ্টা করছে বড়মামার সঙ্গে ভাব করতে। মুখটাকে ছুঁচালো করে ফোঁস ফোঁস করে শুঁকছে। মাঝে মাঝে জিভ বের করে বড়মামার হাতের ওপর দিকটা চুক চুক করে চেটে দিচ্ছে। লাকি যত কাছাকাছি সরে আসার চেষ্টা করছে, বড়মামা ততই শরীরটাকে ডানদিকে মুচড়ে মুখ ঘুরিয়ে বোঝাতে চাইছেন, লাকির সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। আর ডানদিকে ঘোরানো সেই মুখ অনবরত চিৎকার করে চলেছে, 'মোহন, মোহন।'

আমি ঘরে ঢুকতেই লাকি নেমে পড়ল। মুখ নিচু করে আমার কাছে এসে ফোঁস ফোঁস করে বার কতক আমাকে শুঁকে, বুকের ওপর দুটো পা তুলে জিভ বের করে হ্যা হ্যা করল কিছুক্ষণ। বড়মামা তখনও মুখ ঘুরিয়ে আছেন। কুকুরের মুখ দেখবেন না। বড়মামা ভেবেছেন, মোহন এসেছে। বেশ রেগেই বললেন, 'কোথায় থাকিস রাস্কেল! ইডিয়েটটাকে ঘর থেকে বের করে দে। বলে দে, আমার সঙ্গে ওর আর কোনো সম্পর্ক নেই। কোনো সম্পর্ক নেই।'

'কেন বড়মামা?'

আমার গলা পেয়ে বড়মামা খুব লজ্জা পেয়ে ঘুরে বসলেন। হাসতে

গিয়েও হাসলেন না। হাসলেই লাকি দেখে ফেলবে। মুখটাকে বেশ চেষ্টা করে গম্ভীর রেখেই বললেন, 'ও তুমি! আমি ভেবেছিলুম মোহনানন্দ। সকাল থেকে তিনি কোথায় আনন্দ করতে লাগলেন?'

লাকিটা এমন করছিল, মাথায় হাত রেখে একটু আদর না করে পারলুম না। বড়মামা হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'ওর সঙ্গে একদম মিশবে না। একেবারে বখে গেছে। উচ্ছন্নে গেছে।'

'কেন বড়মামা?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করো।'

সে আবার কী! ওকে জিজ্ঞেস করব কী! বড়মামার কুকুর কথা বলে নাকি!

'ও কী করে বলবে বড়মামা! ও কি কথা বলতে পারে!'

'সব পারে, সব পারে ওর মতো পাকা সব পারে! শুনবে ওর কীর্তি? অকৃতজ্ঞতায় ও মানুষের ওপর যায়, এমন কী, তোমার মেজমামাকেও ছাড়িয়ে যায়।'

আবার মেজমামাকে ধরে টানাটানি কেন? মেজতে বড়তে ভাবও যেমন, ঝগড়াও তেমন। গতকাল রাতে খেতে বসে আম নিয়ে ঝগড়ার জের চলেছে বুঝলাম। বড়মামা কবে নাকি গোলাপখাস বলে নার্সারী থেকে একটা আমগাছ খুব ঢাক ঢোল পিটিয়ে বাগানে বসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার বাগানেই খালি এই আম হত, এইবার হবে সুধাংশু মুকুজ্যের বাগানে। সেই গাছে এবছর প্রথম আম ধরেছে। আর সেই আম খাওয়া হচ্ছিল কাল রাতে। মেজমামা ঘন দুধে আম চটকে এক চুমুক খেয়েই ব্যালাব্যাম বলে মুখের একটা শব্দ করে বাটিটা নামিয়ে রেখেই বললেন, 'বড়দা, এই তোমার গোলাপখাস। এর নাম তেঁতুলখাস। দুধটাই নষ্ট হয়ে গেল। কী ক্ষতিই যে হল? দুধ না খেলে আমার আবার সকালে ভীষণ অসুবিধে হয়।'

বড়মামা ততক্ষণে আমটা চেখেছেন। বড়মামার মুখের চেহারাও ভীষণ করুণ। কিন্তু মেজর কাছে হেরে গেলে চলবে না। বললেন,

'জীবনে রিয়েল গোলাপখাস তো খাসনি। সে খেয়েছি আমরা। গোলাপখাস একটু টকমিষ্টিই হয়। তবেই না তার টেস্ট। তোর মতো নাবালকের বোম্বাই-টোম্বাই খাওয়া উচিত।'

রাত এগারোটা পর্যন্ত এঁটো হাতে দু'ভাইয়ে আম নিয়ে খুব দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেল। শেষ সিদ্ধান্ত হ'ল, বড়মামার গাছ বড়মামারই থাক, মেজমামা ল্যাংড়াই খাবেন। গোলাপ ফুল ভদ্রলোক হয়ত সহ্য করতে পারে, তবে গোলাপখাস ভদ্রলোকের আম নয়। শিশুরা খেতে পারে, কারণ শিশু আর ছাগল একই জাতের জিনিস।

বড়মামা লাকির অকৃতজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মেজমামার সঙ্গে তুলনা করলেন। করে বললেন, 'কুকুর কখনও মানুষ হয় না, বুঝেছ ? মানুষ কিন্তু কুকুর হতে পারে।'

কথাটা শুনে কিনা জানি না, লাকি বারকতক ভেউ ভেউ করে উঠল। বড়মামা বললেন, 'ওকে চুপ করতে বলো। এখানে কাজের কথা হচ্ছে।'

আমাকে বলতে হল না। বুদ্ধিমান কুকুর নিজেই বুঝতে পেরেছে। সামনের থাবায় মুখ রেখে ফোস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বড়মামা আড়চোখে একবার দেখে আবার শুরু করলেন, 'মাসে কুড়ি টাকার বিস্কুট। সত্তর টাকার মাংস। পঞ্চাশ টাকার দুধ। তিন কৌটো পাউডার। পঁচিশ টাকার ওষুধ। পনের টাকার সাবান। সব, সব ভস্মে ঘি ঢালা। সেই অকৃতজ্ঞ কুকুর আজ আমাকে অপমান করেছে। নিজের ভাই অপমান করলে সহ্য হয়, প্রতিবেশী লাথি মারলেও হজম করে নিতে হয়। নিজের কুকুর অপমান করলে সহ্য হয় না। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে।'

বড়মামা লাকির দিকে সামান্য ঝুঁকে বেশ জোরে জোরে বলে উঠলেন, 'বুঝেছিস ? আত্মহত্যা, আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে। না, নো ন্যাজনাড়া, ন্যাজ নাড়লে আমি আর ভুলছি না। তোমার ন্যাজের খেলা আমার জানা হয়ে গেছে। তোমার সঙ্গে

আমার আর কোন সম্পর্ক নেই। নো সম্পর্ক।'

লাকি সামনের থাবায় সেই ভাবে মুখ রেখে, চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে পটাক পটাক করে গা মাড়ছে।

এতক্ষণ অনেক কথা হল, বড়মামার রাগের কারণটা কিন্তু বোঝা গেল না। কাল রাতে শুতে যাবার আগে, আম নিয়ে মেজমামার সঙ্গে রাগারাগি হয়ে যাবার পর খোলা বারান্দার ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে কুকুরকে পেটের উপর ফেলে বড়মামা যেসব কথা বলছিলেন তার কিছু কিছু তো এখনও মনে আছে। বুরুশ বোলানো হচ্ছে কুকুরের লোমে আর কথা হচ্ছে 'হাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি, তুই এবার একদিন মানুষের মতো কথা বলবি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানুষের চেয়ে তুই ফার, ফার, ফার, ফার বেটার। অ্যাই কী হচ্ছে কী, নাল লেগে যাচ্ছে না মুখে! উঁহু উঁহু, আর না, আর না। দেখি পেটের দিকটা, চিত হও। কী হল, কাতুকুতু লাগছে?'

সেই কুকুর কী এমন করল! এই সাতসকালে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে! মেজমামা ওদিকে হাঁকাহাঁকি শুরু করেছেন, 'কী হল হে তোমার! এখানে জ্ঞানের কথা হচ্ছে, ভাল লাগবে কেন। গিয়ে পড়লে কুকুরের খপ্পরে।'

বড়মামার কপালটা একটু কুঁচকে গেল। আমাকে বললেন, 'জিজ্ঞেস করো তো কুকুর কি জ্ঞানের জগতের বাইরে। দর্শনশাস্ত্রটাই জ্ঞান, প্রাণী-তত্ত্বটা জ্ঞান নয়, ফেলনা জিনিস? জিজ্ঞেস করো তো পৃথিবীতে কত রকমের কুকুর আছে জানে কিনা। ওর জ্ঞানের দৌড় জানা আছে। পৃথিবীটাই জানা হল না, উনি ঈশ্বর, ভগবান, এই সব নিয়ে ভেবে মরে গেলেন'

দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললুম, 'এখুনি আসছি, মেজমামা।'

'ধ্যাত! তোর আঠার মাসে বছর। আসতে আসতেই আমার কলেজ যাবার সময় হয়ে যাবে। ভেবেছিলুম পৃথিবীর একটা পার্ট শেষ করে যাব।'

কথা শেষ করেই মেজমামা, 'মোহন, মোহন', করে চেঁচাতে আরম্ভ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বড়মামারও মনে পড়ল মোহনের কথা। দু'জনে তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলেন, 'মোহন, মোহন।'

লাকিটা বকুনি-টকুনি খেয়ে বেশ ঘুমিয়েই পড়েছিল। চিৎকারে ধড়মড় করে উঠে পড়ে, ছোট্ট একটা ডন মেরেই বড়মামার মুখের দিকে তাকিয়ে জোরে জোরে বার কতক ভেউ ভেউ করে, রাস্তার দিকের জানালায় পা দুটো তুলে দাঁড়াল।

আমি এক কদম এগিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিলুম কেন কুকুরটা ওরকম করছে। সামনের বাড়ির বারান্দায় ঠিক লাকির মতো আর একটা কুকুর এ জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর পুটুক-পুটুক ল্যাজ নাড়ছে। ও কুকুরটা কিন্তু এটার মতো কেঁউ কেঁউ করছে না বা পাগলের মতো দৌড়াদৌড়ি করছে না। দেখলেই মনে হয় কুকুরটা একটু দুষ্টু ধরণের। আমার বন্ধু অরুণের মতো। পড়ার ঘরে বেশ মন দিয়ে হয়ত পড়তে বসেছি, বাইরের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। মুখে একটা কথাও নেই। মুচকি মুচকি হাসি, স্থির দৃষ্টি। চোখের পাতা নাচিয়ে যা বলার বলে গেল—বইপত্তর মুড়ে উঠে আয়, পড়ার সময় অনেক পাবি, এমন সকাল পাবি কোথায়! অমনি, এই লাকির মতোই মনটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল। বাইরের চুপচাপ লাকি ভেতরের বন্দী লাকিকে ডাকছে।

'আজ সকাল থেকে তুমি এই করছ।' বড়মামার তর্জন-গর্জন থামেই না দেখি, 'সকালেই তোমাকে আমি ভাল কথায় বুঝিয়েছি বাইরে যাওয়া চলবে না, বাইরের কুকুরের সঙ্গে মেশা চলবে না। বাগান আছে, তুমি বাগানে ঘোরো, ছাদ আছে, ছাদে কাঠের বল নিয়ে খেল। আমি যতক্ষণ আছি আমার সঙ্গে ঘোরো, খেলা করো। কিন্তু মিত্তিরদের বাড়ির ওই নোংরা কুকুর দেখে তোমার মাথা খারাপ করা চলবে না। ওরা আমাদের তিনপুরুষের শত্রু।'

'এই যে মোহন,' বড়মামা লাফিয়ে উঠলেন। ফিরে দেখলুম

মোহন মেজমামার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছে। 'ফাস্ট' আমি ডেকেছি, তুই আগে আমার কাছে আসবি।'

মেজমামা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, 'ফাস্ট' সেকেণ্ডের কি আছে রে। তুই আগে আমার ওষুধ তৈরি করে দিয়ে তারপর যেখানে যেতে হয় যাবি।'

বড়মামা বলিলেন, 'বা হে বাঃ, খলে ঘষে ঘষে তোমার কবিরাজী ওষুধ তৈরি করে ও সকালটা কাটিয়ে দিক, এদিকে আমি বসে থাকি হাঁ করে। কুকুরের জন্যে কিমা না আনলে ও দুপুরে খাবে কী, উপোস করে থাকবে।'

'কিমা! কুকুরের কিমা!' মেজমামা এমনভাবে হাসলেন যেন বড়মামা অদ্ভুত উদ্ভট কোনো কথা বলেছেন। তারপর বড়মামার চোখের সামনে আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন, 'জানো না, রাস্তায় সব গাড়ির আগে যায় অ্যামবুলেনস আর ফায়ার ব্রিগেড। এমার্জেন্সি, বুঝেছ, এমার্জেন্সি। যা মোহন, প্রথমে ঘষবি দারু হরিদ্রা, তাতে দিবি গোলঞ্চর জল, বড়িটাকে ১৫ মিনিট খলে ঘষবি মধু দিয়ে, তারপর সব এনে হাজির করবি আমার টেবিলে। চলো ভাগনে!'

আমি কিছু প্রতিবাদ করার আগে মেজমামা আমাকে প্রায় হাতে হাতকড়া লাগাবার মতো করে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন, 'মূর্খ হয়ে থাকতে চাস! জানিস পৃথিবীতে কত কী শেখার আছে! এক জীবনে মানুষ সব পারে না।'

আমি বললুম, 'তাই তো হাঁসের মত দুধ আর জল থেকে শুধু জলটা তুলে নিতে চাই।'

'উল্টে গেল হে, উল্টে গেল,' কথা বলতে বলতে মেজমামা আলমারি খুলে একটা বুলওয়ার্কার বের করলেন—'বুঝেছ, যারা মাথার কাজ করে তাদের একটু করে ব্যায়াম করা উচিত।' মেজমামা জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে বুলওয়ার্কার টানতে লাগলেন। যতটা না টানছেন তার চেয়ে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছেন।

একটা মোটর সাইকেল সশব্দে বাড়ির সীমানা থেকে উল্কার মতো বেরিয়ে গেল। বড়মামা এমনিই জোরে চালান, আজ আবার রেগে আছেন। নিজেই বেরিয়ে পড়েছেন দেড় মাইল দূরের বাজার থেকে কিমা কেনার জন্যে। জাফরের দোকান ছাড়া মাংস কেনা চলবে না, তা না হলে কাছাকাছি আরও একটা দোকান ছিল।

দু'মামা আর এক মাসীর কাণ্ডকারখানা চলছে এ বাড়িতে। বড়মামা ডাক্তার। মেজমামা প্রফেসার। মাসী সকালের স্কুলের টীচার। বাড়িতে গরু আছে, পাখি আছে, কুকুর আছে, বাগান আছে, একগাদা কাজের লোক আছে। মাঝে-মাঝেই বড়মামা মেজমামার লড়াই আছে, গলায় গলায় ভাব আছে। নেই কেবল মামীমা। বুড়ি দিদিমা ছেলেদের উপর রাগ করে কাশীবাসী।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল বড়মামা ফিরছেন না। স্নানের পর গায়ে পাউডার মাখতে মাখতে মেজমামা বললেন, 'বাব্বা! বড়বাবু কি ব্যারাকপুর থেকে খিদিরপুর গেলেন কুকুরের কিমা কিনতে! কুকুর কুকুর করেই ডাক্তারবাবু কাবু হয়ে গেলেন। তুমিই বলো, ওষুধ আগে না কুকুর আগে?'

কী আর বলব, চুপ করে শুনছি। ছবির বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, মাসী এসে গেলে তবু আর একবার মুখরোচক খাবার-দাবার জুটত!

মেজমামার জামাকাপড় পরা হয়ে গেল। জানালা দিয়ে উত্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভাবালে দেখছি, উহুঁ ভাল ঠেকছে না হে। এতক্ষণ দেরী হবার তো কথা নয়। বাবু রেগেমেগে যেভাবে বেরিয়ে গেলেন! এসব রাস্তায় এত জোরে গাড়ি চালানো কি ঠিক! না ফিরলে বেরোতেও পারছি না। এদিকে প্রথম ক্লাসের সময় হয়ে এলো, লঞ্চে করে গঙ্গা পেরোতেই তো আধঘণ্টা লেগে যাবে।'

হঠাৎ দূরে মোটর বাইকের শব্দ হল। ভীষণ বেগে আসছে। আমরা জানালার কাছে সরে এলুম। মেজমামা বললেন, 'মনে হচ্ছে বড়বাবু!' হ্যাঁ বড়বাবু, লাল ঝকঝকে মোটর সাইকেল। পরনে

লাল লুঙ্গি। গায়ে গোলগলা গেরুয়া গেঞ্জি। উল্কার বেগে বড়মামা বাড়ির সামনে দিয়ে পশ্চিমে বেরিয়ে গেলেন। মাথার ঝাঁকড়া চুল হাওয়ায় উড়ছে নটরাজের জটার মতো! বড়মামার দশ হাত পেছনে ব্যারাকপুরের বিখ্যাত ভোলা। সেও খ্যাড়াখ্যাট্ খ্যাড়াখ্যাট্ করতে করতে বেরিয়ে গেল। ভোলা হল ইয়া এক তাগড়া ষাঁড়। বাজার অঞ্চলে, ভোলা-ভক্তের সংখ্যা কম নয়।

মেজমামা বললেন, 'সেরেছে! বড়বাবুকে দেখছি গঙ্গার জলে না ফেলে দেয়। একে ভোলা, তায় লাল মোটর বাইক, তার ওপর লাল লুঙ্গি, তার ওপর ওই পিলে-ফাটানো শব্দ। কে বাঁচাবে বড়বাবুকে!'

মেজমামা চিন্তিত মুখে ঘর থেকে রাস্তার দিকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমি পাশে এসে দাঁড়িয়েছি। বলতে কী, দারুণ মজাই লাগছিল। রেসটা বেশ জমেছে। বড়মামা হারেন, কি ভোলা হারে। রাস্তাটা সামনে গিয়ে গোল একটা প্যাঁচ মেরে আবার ফিরে এসেছে। বেশ জটিল ট্র্যাক। বড়মামা ঘুরে আসছেন, এবার বেগ আরও বেশি। ভোলার স্পীডও যেন বেড়ে গেছে। ভোলা ভীষণ রেগে গেছে. বড়মামাকে হারাতে পারছে না কিছুতেই।

বাড়ির সামনে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে যেতে বড়মামা চিৎকার করে বললেন 'শান্তি, ষাঁড়টাকে কোনরূপে গ্যারেজ করে দে।'

মেজমামা চিন্তিত মুখে বললেন, 'কী করে ষাঁড় গ্যারেজ করি বলো তো। ষাঁড় তো আর গাড়ি নয়।' দুজনে নেমে রাস্তার পাশে এলুম। কাজের লোকজন কাজ ফেলে এসেছে। মোহনের নানা প্ল্যান। সে একটা লাঠি এনেছে। ষাঁড়কে ল্যাঙ মেরে ফেলে দেবে। অতই সহজ। নিজেই ছিটকে পড়বে নর্দমায়! মজা দেখার জন্যে আশে পাশের বাড়ির জানালা দরজায় বড় ছোট মুখ। মিত্তিরদের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি কিশোর হুইসেল বাজাচ্ছে।

বড়মামা ওদিককার গোল রাস্তা দিয়ে আবার এদিকে তীরবেগে আসছেন। পেছনে ল্যাজ তুলে ভোলা। এদিকে রাস্তা দিয়ে

যাবার সময় বড়মামা বললেন, 'একটা কিছু কর, তেল ফুরিয়ে আসছে। আর পারছি না।' বড়মামা আসতেই মিত্তিরদের বাড়ির ছেলেটা ফুরুর ফুরুর করে বাঁশি বাজাল। সমস্ত জমায়েত পাশে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে উঠল।

পশ্চিমের দিক থেকে বড়মামা আবার আসছেন। বড়মামা বেশ ক্লান্ত, বিব্রত। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভেতর থেকে আমাদের পাশ দিয়ে তীরবেগে সাদামতো কী একটা রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ল—বড়মামার কুকুর লাকি। ভয়ে আমরা চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। দু'গজ দূরে বিশাল ভোলা লাফাতে লাফাতে আসছে। লাকি একলাফে ভোলার মুখের ওপর লাফিয়ে উঠল। ভোলার চোখ চাপা পড়ে গেছে, লাকি নাক কামড়ে ধরেছে! ভোলা এক ঝটকা মেরে লাকিকে ফেলতে ফেলতেই বড়মামা ঘুরে এসেছেন, মোহন লাঠি বাগিয়ে তেড়ে গেছে। এইবার উল্টো রেস—ভোলা ছুটছে আগে, বড়মামা তাড়া করে পেছনে।

আমরা দৌড়ে গেলুম লাকির কাছে। একটা বাড়ির রকের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। যে মেজমামা কুকুর দেখলে দশ হাত দূরে পালান, সেই মেজমামা কলেজে যাবার ধবধবে পোশাকে লাকিকে কোলে তুলে নিয়েছেন। চোখ দুটো ছলছলে। ভোলাকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে, বড়মামা ফিরে এসে বাইকটাকে কোন রকমে ফেলে রেখে, ধরা গলায় 'লাকি লাকি' করছেন। মাসীও এসে গেছেন।

দেখতে দেখতে বাড়ি হাসপাতাল। বড়মামার বন্ধু পশুচিকিৎসক ডাক্তার বরাট এসে গেছেন। দুই মামা'রই বারেবারে এক প্রশ্ন 'বাঁচবে তো, বাঁচবে তো!'

বরাট বলছেন, 'বেশ একটু শক লেগেছে। সারতে সময় লাগবে কয়েক দিন। আমি ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলুম।'

সন্ধ্যেবেলা লাকি বড়মামার নরম বিছানায় পাখার তলায়

ঘুমোচ্ছে। মাসী চিঁড়ে ভাজছেন। মেজমামা ইজিচেয়ারে বসে বিশাল একটা মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। মুখটা খুব বিষণ্ণ। মাঝে-মাঝে পিট পিট করে লাকির দিকে তাকাচ্ছেন। বড়মামা তুপুর থেকে লাকির পাশে সিস্টারের মতো বসে আছেন।

হঠাৎ বড়মামা বললেন, 'বুঝলি শান্তি! রাগ চণ্ডাল।'

মেজমামা বললেন, 'তুমি ঠিক বলেছ। আমরা তুজনেই ভীষণ রাগী।'

বড়মামা বললেন, 'বাবা ভীষণ রাগী ছিলেন।'

মেজমামা বললেন, 'মা-ও তাই। বরং বেশিই ছিলেন!'

বড়মামা বললেন, 'আসছে বার কুকুর হয়ে জন্মাব।'

মেজমামা বললেন, 'আমিও। লাকিকে দেখে আজ আমার জ্ঞান হল।'

বড়মামা মেজমামার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হাত মেলা।' তু'মামার করমর্দন, আর ঠিক সেই সময়ে সারাদিন পরে লাকি প্রথম তু'বার শব্দ করল—ভুক, ভুক। সঙ্গে সঙ্গে তু'মামার উল্লাসের চিৎকার, 'লাকি, লাকি।' লাকি বিছানার ওপর লাফিয়ে উঠে ডাক ছাড়ল, 'ভৌ, ঔ ঔ।'

পল্টুর সাইকেল

পল্টুকে পল্টুর মা বললেন—সাইকেলটা নিয়ে একবার দেখনা বাবা, পুজোর সময় বয়ে যায়, ভটচায্যি মশাই এখনও কেন আসছেন না। পুজো শেষ হলে তোর বাবা আবার অফিস বেরোবেন।

পল্টু সবে সাইকেল চালাতে শিখেছে। এসব কাজে তার মহা উৎসাহ। সে সাইকেলটা নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ির উত্তরদিকের রাস্তাটা এঁকে বেঁকে ফাঁকা মাঠ, কখনও বাগান, কখনও পুকুর, কখনও কাঁচা ড্রেনের পাশ দিয়ে ভটচায্যি মশাইয়ের বাড়ির দিকে চলে গেছে। বেশি দূরও নয়। মাইলখানেক পথ। বাঁদিকের ফাঁকা মাঠটাই ছিল পল্টুর সাইকেল শেখার জায়গা। মাসখানেকেই সে নিজেকে সাইকেল একসপার্ট ভাবে। তাকে যিনি সাইকেল শিখিয়েছিলেন সেই বিশুকাকা বলেছেন—প্রায় তৈরি হয়ে গেছে, এখন যত চালাবে তত সাহস বাড়বে, তত ব্যালেন্স আসবে। কখনও ভয় পাবে না। ডোণ্ট গেট নার্ভাস।

পল্টু এমনি ভালই চালায়। তার কেবল দুটো অসুবিধে। প্রথম অসুবিধে হল প্যাডেলে পা রেখে ওঠা, উঠে সিটে বসা। দ্বিতীয় অসুবিধে হল সেই একই ভাবে প্যাডেলে পা রেখে নামা। ওই দুটো সময়ে তার হাত লগবগ করতে থাকে। সাইকেলের গতি সাপের মত এঁকে বেঁকে যায়। সামনে কেউ এসে পড়লে আরও বিপদ। বিপদ পল্টুর যত না, তার চেয়ে বেশি সামনে যিনি পড়বেন তাঁর।

ইদানিং পল্টুকে অনেকেই ভয় পায়। নতুন সাইক্লিষ্ট আর ষাঁড় দুটোই সমান বিপজ্জনক। বিশুকাকা বলেছেন—জান পল্টু জল না খেলে যেমন সাঁতার শেখা যায় না, আছাড় না খেলে তেমনি সাইকেল শেখা যায় না। পাড়ার লোকে পল্টুকে আজকাল তালিমারা পল্টু বলে। জামাকাপড়ের বাইরে তার শরীরের যতটুকু অংশ দেখা যায় তার

প্রায় সর্বত্রই ঢ্যারা ঢ্যারা ষ্টিকিং প্লাস্টার। না পড়লে সাইকেল হয়ত শেখা যায় না সত্যি, তবু পল্টু যেন পতনের রেকর্ড করে ফেলেছে। পল্টুর বাবা বলেছেন—তোকে দেখলেই মনে হয় কেউ যেন তোর ওপর ঘর কাটাকাটি খেলেছে। শরীরে ক'ইঞ্চি চামড়া আর খালি আছে মেপে দেখেছিস! সবটাই তো ষ্টীকিং প্লাস্টার, যেন ছাদের ওপর জল ছাদ।

কোন রক না পেলে পল্টু সাইকেলে উঠতে পারে না, রক না পেলে নামতেও পারে না। সাইকেল নিয়ে বেরোতে দেখে, পল্টুর বাবা বললেন—দুর্গানাম জপতে জপতে যাও। দেখ কোন বিপদ বাধিও না। ও রাস্তাটার ডান পাশে বিশাল ড্রেন, সোজা তার মধ্যে ঢুকে বসে থেকো না। বাঁদিকটার জন্যে ভাবি না, বাগানের বেড়া। বড় বৌ, তুমি ওকে না পাঠালেই পারতে। ভট্‌চাজ মশাইকে তো বলাই আছে। হয়ত একটু দেরি হচ্ছে।

—তুমি অত পুতুপুতু কর না তো, ব্যাটাছেলেকে একটু ডাকাবুকো হতে হয়, যা দিনকাল পড়েছে। ভট্‌চাজ মশাই বুড়ো মানুষ, হয় তো ভুলেই বসে আছেন! মনে নেই ও মাসের সত্যনারায়ণের সময় কি করেছিলেন। তুমি না গেলে বুড়ির সঙ্গে ঝগড়াই চলত সারাদিন।

—আহা ঝগড়াতো হবেই। বুড়ির যেমন কাণ্ড। খড়ম দিয়ে কয়লা ভাঙ্গতে গেছেন। খড়ম দু আধখানা। মনে নেই, তুমি বললেনা, বাবা আপনার পায়ে দেড়খানা খড়ম কেন? আমি আবার সেই দিনই দশকর্মা ভাণ্ডার থেকে একজোড়া বেলিওলা খড়ম কিনে নিয়ে এলুম।

পল্টু বেরোতে বেরোতে দরজার গোড়া থেকে বললে—কিচ্ছু ভেবোনা বাবা আমি একটু বাঁ দিকেই যা টাল খাই, পড়লে বাগানের বেড়ার দিকেই পড়ব, নর্দমায় পড়ার চানস নেই।

—তুই হেঁটে যা না বাবা। সকালের রাস্তা, লোক চলাচল বেশি।

—তা হলে সাইকেলটা শুধু শুধু কিনে দিলে কেন?

—সে তোমার মার পাল্লায় পড়ে।

মা বললেন—চুপ কর তো। তোমার বড্ড বকবক করা স্বভাব।

পল্টু নিজেদের বাড়ির রকে সাইকেলে উঠতে উঠতে বললে—বাবারা ভীষণ ভীতু হয়! সব সময় এই কোরো না ওই কোরো না। এই করলে তাই হয়, তাই করলে এই হয়। ঘোড়ার ডিম হয়।

কিছু দূরেই যতীশবাবু বাজার করে ফিরছিলেন। পল্টুকে সাইকেলে উঠতে দেখে তাড়াতাড়ি মুদির দোকানের রকে উঠে পড়লেন। হরিসাধন ওজন করতে করতে বললে—কি হল কাকাবাবু?

—প্রাণটা বাঁচাই ভাই। সেই মারাত্মক ছেলেটা আসছে। সেদিন ধাক্কা মেরে আমার ছ'লিটার কেরোসিন তেল নর্দমায় ফেলে দিয়েছে।

—একপক্ষে ভালই করেছে, নর্দমায় তেল পড়ে না, তবু আপনার তেলে মশা একটু কমবে!

যতীশবাবু খেপে গেলেন—তোমার আর কি বল, মুদির ছেলে নারঙ্গি বসে বাজায় সারেঙ্গি।

পল্টু কিন্তু এসব কথার কিছুই শুনতে পেল না। সে সীটে বসেছে, বাঁ পা-টা তখনও রকে। ডান পা-টা প্যাডেলে। বাঁ পা দিয়ে ঠ্যালা মেরে সাইকেলটা ছাড়ার আগে মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করে নিচ্ছে। বাঁ পায়ের ঠেলাটা বোধ হয় একটু বেমক্কা হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার ধার ছেড়ে কোনাকুনি লগবগ করতে করতে সামনের চাকাটা তুলে দিল রাস্তার ওপাশে ঘুমন্ত একটা কুকুরের ন্যাজে। কুকুরটার এমনিই পাড়ায় তেমন সুনাম নেই। তার উপর সারারাত ঘেউ ঘেউ করার পর সবে একটু ঘুমিয়েছে। তাও রাস্তার একপাশে ছাই গাদায়। কুকুরটা বেঁকে খ্যাঁক করে উঠল। পল্টু আপ্রাণ চেষ্টা করেছে বাঁ দিকে হ্যাণ্ডেলটা বাঁকাবার। প্রায় সামলে এনেছিল। কুকুরের ধমকানিতে বেসামাল হয়ে হুড়মুড় করে বাঁদিকে শুয়ে পড়ল। কুকুরটা ন্যাজের যন্ত্রণায় কেঁউ কেঁউ করছে। সাইকেলটা পল্টুর পাশবালিশ হয়ে গেছে।

যতীশবাবু দেখলেন এই সুযোগ। ছোকরা ঠেলেঠুলে উঠতে উঠতেই তিনি পাশ কাটিয়ে পালাতে পারবেন। পল্টুর পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললেন, দুচাকায় তোমার চলবে না বাপু। বাবাকে একটা তিন চাকা কিনে দিতে বল।

ধুলোটুলো ঝেড়ে পল্টু সাইকেলটা নিয়ে কোনও রকমে উঠে দাঁড়িয়েছে। আগের মত আর লাগে না। পড়ে পড়ে শরীর শক্ত হয়ে গেছে। তবু বাঁ পায়ের ওপর দিকটা চেনের দাঁত লেগে বেশ জখম হয়েছে। সে আবার রকের কাছে ফিরে এল। আগের কায়দাতেই সাইকেলে উঠল। এবার আর ভগবানকে ডাকা নয়। ভগবান নেই। ভগবান থাকলে এতদিনে সমস্ত স্কুল বন্ধ হয়ে যেত। অঙ্কের স্যারের মারের হাতটা একটু কমত। প্যাডেলে পা রেখে বিশুকাকার মত সাইকেলে উঠানামাটা বপ্ত হয়ে যেত।

পল্টু এবার সাবধানে স্টার্ট দিল। যাক এবারে কোনও বিপদ হল না। রাস্তাটা সোজা গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে। মোড়ের মাথায় বেল বাজানোর নিয়ম। নিয়মে কোন ভুল হয় নি। সে আইন মতই কাজ করেছিল। বেআইনী ব্যাপার করল কিশোরী। তার দামড়া মোষটাকে সামনে রেখে সে পেছন পেছন আসছে বালতি হাতে। মোষে আর গাড়িতে কতটুকু তফাৎ। কিশোরীর হাতে একটা হর্ণ থাকা উচিত ছিল। কি হচ্ছে বোঝার আগেই, পল্টু দেখল তার মুখ যেদিকে সেদিকে সে যাচ্ছে না; সে ডুলকি চালে পেছন দিকে চলেছে। সাইকেলের সীট থেকে সোজা মোষের পিঠে। কিশোরার গ্রাহ্যই নেই। সে যেমন গান গাইছিল সেই রকমই গান গাইছে—আরে রামুয়া চলে আগেরে ভাই, লছমনুয়া চলে পিছে, হাঁড়ুমাড়জি থক গইলবা, সীতামায়ী রোয়ে। মোষের পিঠে বসে বসেই পল্টু দেখলে তার সাইকেলটা পাশের একটাবাড়ির দেওয়ালে ঘাড় মুখ গুঁজড়ে পড়ে আছে।

—এই কিশোরী, কিশোরী আমাকে নামিয়ে দাও।

—আরে রামুয়া চলে আগেরে ভাই, লছমনুয়া রে।

আরে এই কিশোরী...

—কাঁহা সে আগইলবা রে তু!

—কিশোরী নামিয়ে দাও, তোমার মোষের গায়ে বেজায় গন্ধ। আমার প্যাণ্টে গোবর

গোবর বলেই পল্টুর খেয়াল হল গোরুর গোবর হয়, মোষের তো গোবর হবে না, মোবর হবে। কিশোরী হাতের তালুর খইনিটা মুখে ফেলে সেই হাতেই পল্টুকে মোষের পিঠ থেকে নামিয়ে দিল।

পল্টু সাইকেলটাকে তুলল। হ্যাণ্ডেলটা একটু বেঁকে গেছে। সামনের চাকাটাকে দুপায়ের ফাঁকে রেখে হাতের চাপে ঠিকঠাক করে নিল। এখন আবার একটা রক চাই তবেই সে সীটে বসতে পারবে। দুটো বাড়ির পরেই একটা রকঅলা বাড়ি। পল্টু সেই পর্যন্ত সাইকেলটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল। বিশুকাকা ঠিকই বলেছিলেন— মাস খানেক সাইকেলটাকে শুধু হাঁটাবি। সাইকেলের সঙ্গে গল্প করবি। স্বভাবটা বোঝার চেষ্টা করবি। এইভাবেই ভাব-ভালবাসা হবে। আর সাইকেল চালাবার সময় ভুলেই যাবি যে সাইকেলে আছিস। তা না হলেই হাত লগবগ করবে। পড়ে যাবার ইচ্ছে হবে। সাইকেল আর সাহস দুটো শব্দেরই প্রথম অক্ষর স।

পল্টু গুরুজনদের উপদেশ ভীষণ মেনে চলে। তবু সব ব্যাপারেই কেন যে সে তাল রেখে চলতে পারে না মাঝে মাঝে ভাবলে কূল কিনারা করতে পারে না। সাহস তো তার কম নয়। ভয়টা কিসের! বিশুকাকা বলেছেন, সাইকেল যখন চালাবি, মনে করবি, তুই যেন হাড়গোড় ভাঙা দ। সেইভাবেই পল্টু চালাবার চেষ্টা করছে। করলে কি হবে, সাইকেলের হাতলে তার মুঠো দুটো এমন শক্ত হয়ে আছে, মনে হচ্ছে, হাতলটা যেন পালাতে চাইছে, আর সে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ধরে আছে। হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে সাদা, ন্যাজ মোটা একটা বেড়াল বেরিয়ে এল। বেড়ালটা রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়েছে। পল্টু ভেবেছিল বেড়ালটা পার হয়ে যাবে তাই সে বাঁ দিক দিয়ে পাশ কাটাতে গেল। পল্টু ভীতু

নয়, ভীতু বেড়ালটাই। বেড়ালটা হঠাৎ ব্যাক করল। যে ঝোপ থেকে বেরিয়েছিল সেই ঝোপেই ঢুকতে চাইল। কে বলে বেড়াল বুদ্ধিমান প্রাণী! তা না হলে কেউ রাস্তা পার হতে হতে ওই ভাবে বোকার মত পেছিয়ে আসে খাঁ করে। সোজা পল্টুর সামনের চাকায় এসে আটকে গিয়ে আধপাক ঘুরে ওপরে ঝুলতে লাগল। সেই পাকে একটা পা জড়িয়ে গেছে। পল্টু গেল গেল শব্দে বাঁ দিকে কেতরে গিয়ে বেড়ার ওপর পড়ে গেল। বেড়ালটা যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। কী চিৎকার! দু চারজন লোক জড় হয়ে গেল।

এক বৃদ্ধা বোকার মত প্রশ্ন করলেন—হ্যাঁ বাবা, মা ষষ্ঠির বাহনকে কেউ ওই ভাবে চাকায় বেঁধে নিয়ে যায়! ছি ছি আজকালকার ছেলে-পুলের মুয়ে আগুন! আমাদের কালে বেড়াল ছাড়তে যেতুম বস্তায় পুরে, মুখ বেঁধে। তাও ঠিক ফিরে আসত। হরিদাসীটাকে বস্তায় পুরে আমার কত্তা নদীর ওপারে ছেড়ে এসেছিল, ওমা, তিন দিন পরে দেখি ঠিক ফিরে এসে উঠোনে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। বিশ্বাস কর বাবা, বয়স হয়েছে মিথ্যে বলব না। কত্তা বললে, ওটা আর একটা বেড়াল। কী বলে, হরিদাসীকে আমি চিনিনা! সেই নাক, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই ন্যাজ, সেই মিঞাও ডাক, সেই ছোঁচকা স্বভাব! রান্নাঘরে কিছু রাখার উপায় নেই। ঠিক ঢাকা খুলে খেয়ে নেবে। বললে কিনা আর একটা বেড়াল! মানুষের যমজ হয়, বেড়ালের যমজ হয় নাকি!

—কি বলছ দিদিমা? বেড়ালের যমজ নয় চারমজ হয়। বিষ্ণু ঘরামী দিদিমাকে জ্ঞান দিল। জমায়েতে নন্দ-কিশোর ছিল। রাজ মিস্ত্রীর কাজ করে। কাজে যাচ্ছিল বোধ হয়, হাতে পাটা কর্নিক। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। সে প্রশ্ন করল—চারমজটা কি রে বিষ্ণু?

—বেড়ালের একসঙ্গে চারপাঁচটা বাচ্চা হয়!

দিদিমা রেগে গিয়ে বললেন—বয়স হল তিন কুড়ি দশ, তুই আর আমায় শেখাসনি। বেড়ালের এক সঙ্গে সাতটা বাচ্চা হতে দেখেছি আমি। সাতটা সাত রকম। বুঝেছিস ড্যাকরা!

পাশের একটা বাড়ির সদর দরজা খুলে গেল। পট্টবস্ত্র পরা পৈতেধারী ভীষণ চেহারার এক মানুষ বেরিয়ে এলেন। চোখ দুটো যেন লাল জবা।

—সাত সকালে এখানে কিসের তামাসা? কিসের তামাসা শুনি? জানিস না এটা আমার পুজোর সময়। ধ্যান ভঙ্গ হয়ে গেল আমার। বুড়ো দামড়া সব, জানিস আমার হার্টের ব্যামো আছে। জানিস আমি পাঁশকুড়ো থানার দারোগা ছিলুম একটানা সাত বছর। সব পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দেবো। আবার বেড়াল ডেকে ইয়ারকি হচ্ছে। কে বেড়াল ডাকছে রে?

—আজ্ঞে কত্তামশাই বেড়ালেই বেড়াল ডাকছে।

—বেড়াল নিয়ে তোরা কি কচ্ছিস?

—আজ্ঞে আমরা করিনি। বেড়ালটা সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে গেছে।

—অ্যাঁ, বেড়াল কি সুতো, সাইকেলের চাকা কি লাটাই যে জড়িয়ে যাবে, দেখি সব সরে দাঁড়া। আমাকে দেখতে দে।

পাঁশকুড়ো থানার এক্স-দারোগা এগিয়ে এলেন। বেড়ালটা স্পোকে জড়িয়ে একফালি সাদা ন্যাকড়ার মত ঝুলছে। পল্টু অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে বুঝতে পারছে না।

দারোগাবাবু উঁকি মেরেই বললেন—আরে এ তো দেখছি সেই ছেলেটা। সেদিন আমাকে বাজারের রাস্তায় গুঁতিয়ে দিয়েছিল। আরে এ তো দেখছি আমাদের বেড়ালটা! সাইকেলের চাকায় বেড়াল বেঁধে ইয়ারকি হচ্ছে। অ্যাঁ ইয়ারকি হচ্ছে। যাখুশী সাইকেলের চাকায় জড়িয়ে নিয়ে পালালেই হল, তাই না, মগের মুললুক পেয়েছ।

—আজ্ঞে পালাতে পারেনি বাবু। আপনার বেড়াল তো, চোর ধরা বেড়াল।

—ওহে ছোকরা, বেড়াল খুলে দাও! তা না হলে ভারতীয় দণ্ডবিধির পাঁচ ধারায় তোমাকে আমি ঘানি ঘুরিয়ে ছেড়ে দেবো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু ঘুইরে ছেড়ে দিন।

—ঘুইরে নয়, ঘুইরে নয়, বল ঘুরিয়ে।

—আমরা ঘুইরেই বলি, বাপ ঠাকুরদার কাল থেকে বলে আসছি।

—বেশ করেছিস। নাও হে ছোকরা বেড়াল খোল। আজ তোমাকে বাগে পেয়েছি। সেদিন খুউব ধাক্কা মেরেছিলে। একবার সরি পর্যন্ত বলার দরকার মনে করনি। অভদ্র কোথাকার। আজ তোমাকে কে বাঁচায় দেখি।

পল্টু আগেই একবার বেড়ালটার সামনের পা দুটো ধরে টেনে খোলার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। অতটুকু ছোট্ট প্রাণী হলে কি হয়। কি ফ্যাঁসফ্যাঁসানি। পল্টু অসহায়ের মত মুখ করে বলল—খুলতে যে দিচ্ছে না। কেবল কামড়াতে আসছে। ফ্যাঁস ফোঁস করে।

—কামড়ায় কামড়াক। বেড়াল কি আমি জড়িয়েছি মানিক? তুমি যে ভাবে জড়িয়েছ সেই ভাবে খুলে দেবে।

ভীড়ের মানুষ উপদেশ দিলেন—চাকাটাকে উল্টোদিকে ঘোরাও না খোকা, এখুনি খুলে যাবে।

পল্টু চাকাটাকে উল্টো দিকে অল্প একটু ঘোরাতেই বেড়ালটা মর্মভেদী একটা চিৎকার ছাড়ল। এতক্ষণ ল্যাজটা তবু ঝুলছিল, ঘোরাবার ফলে সেটাও জড়িয়ে গেল পাকে পাকে।

—বিষ্ণুর বুদ্ধিটা একবার দেখেন কত্তামশাই, ল্যাজটাও জইড়ে গেল।

পাঁশকুড়া থানার ভূতপূর্ব দারোগা হুঙ্কার ছাড়লেন—ওসব ইয়ারকি আমি বরদাস্ত করবনা। ওই সাইকেল আমি বাজেয়াপ্ত করে দেখে দোবো।

নতুন ঝকঝকে সাইকেল। সবে পল্টুকে পল্টুর বাবা কিনে দিয়েছেন। খুশি হয়েই কিনে দিয়েছেন। পরীক্ষার ফল ভাল করার পুরস্কার। সেই সাইকেল কিনা বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে! পল্টু মরিয়া। যা থাকে বরাতে। দুটো পা-ই চুলের বিনুনির মত পাকিয়ে গেছে। সেই পাকের মাঝখানে স্পোক। পল্টু একটা থাবা ধরে উল্টোপাকে খোলার চেষ্টা করতেই বেড়ালটা ফ্যাঁস ফোঁস করে হাতে কামড় বসিয়ে দিল। রক্তারক্তি ব্যাপার।

—দমকলে খবর দেন কত্তা।

—কি যে বল হরিপদ, দমকলে খবর দিতে হয় আগুন লাগলে। এ হল মেকানিকের কাজ।

পল্টুর মনে হল, মেকানিক নয়, এ জট খুলতে পারেন একমাত্র অঙ্কের মাষ্টারমশাই। মাষ্টারমশাই বলেন না, আগে অঙ্কটার দিকে ভাল করে তাকাবে, তাকালেই প্রসেসটা মাথায় এসে যাবে, তারপর ধাপে ধাপে এগিয়ে চল। সরল করার কায়দা।

যে বাড়িটা থেকে দারগাবাবু বেরিয়েছিলেন, সেই বাড়ির দোতালার বারান্দা থেকে এক মহিলা খ্যানখেনে গলায় চিৎকার করে উঠলেন—হল কি তোমার? কতক্ষণ আমি ফুল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব? আমার অন্য কাজকর্ম নেই না কি?

দারোগাবাবু ওপর দিকে চেয়ে ততোধিক উচু গলায় বললেন—যতক্ষণ দাঁড়াতে বলব ততক্ষণ দাঁড়াবে। এদিকে দেখেছ, তোমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। সুখী সাইকেলের চাকায় আটকে গেছে। সামনের পা দুটো বিনুনি হয়ে গেছে।

ভদ্রমহিলা গাঁক গাঁক করে চিৎকার করে উঠলেন—কোন মুখপোড়ার সাইকেল। কে করলে। ওমা আমার সুখীরে!

ভদ্রমহিলা এমন ডুকরে কেঁদে উঠলেন যেন তাঁর স্বামী মারা গেছেন। সকলেই বারান্দার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে —ওরে আমার সুখীরে। কী সব্বোনাশ হল রে!

স্ত্রীর কান্না দেখে দারগাবাবুর মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেল—আমার স্ত্রীর হার্টের ব্যামো আছে, যদি মারা যায় তোমার নামে আমি ক্রিমিন্যাল কেস করব। যাবজ্জীবন করে ছেড়ে দোবো। ওরে কে আছিস গোলাপীকে ডাক তো।

—তাকে এখন পাচ্ছেন কোথায় কত্তাবাবু। সে তো কাল রাত থেকে জ্বরে প্রলাপ বকছে।

—তার ছেলেকে ডাক।

—ছেলে তো একমাস হল বাপের ছেঁড়া গরম কোট নিয়ে বোম্বে পালিয়েছে হিরো হবার লেগে।

—তার কারখানার যে কোন কর্মচারীকে ডাক।

—একমাস হল তার কারখানা তো বসাকবাবুরা কিনে নেছে।

—ইয়ারকি হচ্ছে। সবেতেই তোদের ঝগড়া। ডাক্ যতীশকে, কামার শালের যতীশকে ডাক।

—তা ডাকতে পারি। এই তো নজদিকেই আছে। একটু আগেই তো দেখছিলুম বট্‌তলায় বসে বিড়ি ফোঁকা করছে।

—কিচ্ছু শুনতে চাই না, উসকো পাকাড়কে লে আও। বারান্দায় আর এক মহিলা এসেছেন। দ্বিতীয় মহিলা দারোগাবাবুর স্ত্রীকে ভোলাবার চেষ্টা করছেন—মা, তুমি কেঁদো না মা, কেঁদো না মা। তোমার আবার হাঁপানি আছে, এখুনি টান উঠবে। কেঁদো না মা, কেঁদো না।

পন্টু সেই থেকে বোকার মত দাঁড়িয়ে আছে। হাতের কবজি বেয়ে সামান্য রক্তের ধারা নেমে রোদে শুকিয়ে গেছে। সে কেবল মাঝে মাঝে মুখে চুকচুক শব্দ করে বেড়ালটাকে ভোলাবার চেষ্টা করছে। একি সেই বেড়াল, ভোলালেই ভুলবে! উঃ কী ভাবে জড়িয়েছে দেখো।

ভীষণ জোরে বিড়ি টানতে টানতে ময়লা চেহারার একটি লোক দারোগাবাবুর সামনে এসে খুব রুক্ষ গলায় বলল—কী বলছেন, বলছেন কী? পন্টু দেখলে লোকটিকে সে চেনে। চেনে এই কারণে, লোকটি তার বাবাকে খুব সম্মান করে। কেন করে পন্টু তা জানে না। দারোগাবাবু বললেন—যাও তোমার যন্ত্রর পাতি নিয়ে এস। ওই ছোঁড়ার সাইকেলের স্পোক কেটে বেড়ালটাকে উদ্ধার করতে হবে।

যতীশ এতক্ষণ পন্টুকে দেখেনি, পন্টুকে দেখেই যতীশ বললে—আরে খোকাবাবু। তোমার সাইকেল। দেখি কি হয়েছে। আরে বেড়াল জড়িয়ে গেছে। টেনে বের করে ফেলে দাও না।

পন্টু করুণ গলায় বললে—গায়ে হাত দিতে দিচ্ছে না যে যতীশ কাকা। এই দেখ আঁচড়ে দিয়েছে।

—সরো দেখি, ও এলেবেলে হাতে হবে না, লোহা পেটানো হাত চাই।

দারোগাবাবু যতীশকে দাবড়ে উঠলেন—যোতে, আমার বেড়ালের চোট হয়ে যাবে। তুই হ্যাক-স দিয়ে স্পোক কাট। বেশি পাকামো করে মরবি না। ছোঁড়াটা কে রে? তোকে যতীশ কাকা বলছে।

—ছোঁড়াটা কে, বলে দিলে আর ছোঁড়া বলবেন না, বলবেন ছেলেটি।

—হ্যাঁ তোর যেমন কথা। কে এমন তালেবর আছে রে এ পাড়ায়।

—আছে আছে, আপনিও জানেন কে আছে, এস, ডি, ও, সাহেবের ছেলে।

—অ্যাঁ! এতক্ষণ তাহলে বলিসনি কেন হতভাগা!

ভীড়ের দিকে তাকিয়ে যারা মজা দেখছিল তাদের ভীষণ দাবড়ে দিলেন—এটা দোল, না দুর্গোৎসব! সব দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে হতচ্ছাড়ার দল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীকে ধমকে উঠলেন—গলা দিয়ে আর একটু শব্দ বেরোলেই মুখে গামছা ভরে দে বিমলা।

যতীশ বললে—তাহলে যন্তর-টন্তর নিয়ে এসে সব স্পোকগুলো সব কেটে ফেলি। তারপর এস, ডি, ও, সাহেব যা পারেন করবেন।

যতীশ চলে যাচ্ছিল, দারোগা সাহেব তার ওপর হাতটা ধরে ফেলে বললেন—খোকার নতুন সাইকেল, শখের সাইকেল, স্পোকগুলো কেটে ফেললেই হল, না! খুব মজা! ইয়ারকি পেয়েছিস? বেড়ালটাকে ছাড়িয়ে দে। ঘেয়ো নেড়ি একটা বেড়াল! তাকে নিয়ে আদিখ্যেতা! কী নাম বাবা তোমার? একটু ছায়ায় সরে দাঁড়াও না। আমি তোমার কাকাবাবু হই বাবা।

পন্টুর মনে হল—ভদ্রলোকের বয়স তার বাবার বয়সের চেয়ে অনেক বেশি। পন্টুর তাই ইচ্ছে হল কাকাবাবু সম্বোধনটা মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। পন্টু বললে—আজ্ঞে আপনি আমার কাকাবাবু হতে যাবেন কেন? আপনি আমার জ্যাঠামশাই।

—না, না, না, না, তা কি করে হয়। তোমার বাবা বয়সে ছোট হলেও সম্মানে কত বড়। আমি তোমার কাকাবাবু। চলো, চলো, ভেতরে চলো, একটু মিষ্টিমুখ করবে চলো। আজকাল আমার মাথাটার কি যে হয়েছে। কখন কাকে কি কথা বলে ফেলছি। সবই হরির ইচ্ছা! প্রভু হে মধুসূদন। ওরে যোতে, বেড়ালটা খোল বাবা। না খুলতে পারিস পা দুটো কেটে বাদ দে।

—কত্তামশাই সাইকেলটাকে বরং ঠ্যালা গাড়িতে চাপিয়ে একবার মেডিকেল কলেজ নিয়ে গেলে হয়।

— মেডিকেল কলেজে এ কেস নেবে নারে বাবা, ভেটেনারি হসপিট্যালে নিয়ে গেলে যদি কিছু হয়।

—তবে আমার মাথায় আর একটা আইডিয়া এসেছে। দাঁড়ান।

যতীশ হেঁকে উঠল — ও দিদিমা, দিদিমা, গেলে কোথায় গো?

—কী বলছিস! চেল্লাচ্ছিস কেন, আমি কি কানের মাথা খেয়েছি!

—দিদিমা, তোমার ফুলটুসি বাড়িতে আছে? কত্তামশাই আপনার বেড়ালটা মেনি না হুলো।

—নাম শুনলি মুখ্যু আবার জিজ্ঞেস করছিস মেনি না হুলো?

—ফুলটুসিটাকে একবার আনতে পার?

—তাকে এখন পাবো কোথায়। এই সময় সে একটু বেড়াতে বেরোয়। তারও তো আত্মীয়স্বজন আছে। খবরটবর নিতে যায়।

—যাও না একবার, বাড়িতে গিয়ে দেখো-না, যদি পাও কোলে করে নিয়ে এস।

—তুই যা না, ওই তো আমার বাড়ি। আমাকে আবার হাঁটাবি কেন? আমি পুকুরে পানফল তুলতে যাচ্ছি। ওমা ওই তো আমার ফুলটুসি! দেখ দেখ কি রকম পাখি ধরতে বেরিয়েছে।

যতীশ পেছন থেকে আস্তে আস্তে ফুলটুসি পালাবার আগেই খপ করে ধরে ফেলল! দারোগাবাবু খুব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন—কী করতে চাইছিস যোতে!

— ত্থাখেন না, কি মজাটা একবার হয় !

যতীশ ফুলটুসিকে চাকায় আটকানো বেড়ালটার সামনে নামিয়ে দিল ! সঙ্গে সঙ্গে ফুলটুসির পিঠটা ধনুকের মত বেঁকে গেল ! ন্যাজটা ফুলে খাড়া হয়ে উঠল ! গলা দিয়ে গোঁড়র গোঁড়র শব্দ বেরোচ্ছে ! সুখীও ফুলছে ! যন্ত্রণার চিৎকারটা রাগের চিৎকার হয়ে গেল ! একটানে স্পোকে জড়ানো ন্যাজটা নিজে নিজেই খুলে ফেলে দুপাশে পটাক পটাক নাড়াতে শুরু করল ! ফুলটুসি ফ্যাঁস করে একটা থাবা চালিয়ে দিল ! সুখীর নাকের পাশে লেগেছে ! সুখী মিঞাও করে প্রচণ্ড একটা শব্দ করে, একটানে একটা পা খুলে ফেলল ! কিছু লোম ছিঁড়ে স্পোকে আটকে রইল ! ফুলটুসি সুখীকে বেকায়দায় পেয়ে মেরে দিল আর এক থাবা ! সুখী সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পা ছাড়িয়ে নিয়ে পিঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে ধপাস করে চাকা থেকে মাটিতে নেমে এল ! ফুলটুসি ভেবেছিল সুখী বুঝি নক আউট হয়ে গেছে ! সুখী হল দারোগা বাড়ির বেড়াল ! তার প্যাঁচ ফুলটুসি জানত না ! সুখী আর একটা পাশ ফিরেই মাটি থেকে সোজা লাফিয়ে উঠল ফুলটুসির গলার কাছে ! পরমুহূর্তেই হৈ হৈ ব্যাপার ! সুখী প্রতিপক্ষের গলা কামড়ে ধরে ঝুলছে ! ঝটাপটি, লাঠালাঠি। দুজনে রাস্তার এপাশ থেকে ওপাশ, ওপাশ থেকে এপাশ, তালগোল পাকাতে পাকাতে আসছে আর যাচ্ছে !

বুড়ী দিদিমা চিৎকার করে কাঁদছেন—ওরে আমার ফুলটুসি রে, ওরে যোতে মুখপোড়া রে !

দারোগাবাবু চীৎকার করছেন—চিয়ার আপ সুখী, চিয়ার আপ !

পল্টু যখন বাড়ি ফিরে এল তখন পুজো প্রায় শেষ ! পুরোহিত মশাই সত্যনারায়ণের কথা পড়ে শোনাচ্ছেন। পল্টুর রাস্তা দিয়েই কখন নারায়ণ হাতে নামাবলি গায়ে গুটি গুটি চলে এসেছেন, পল্টু দেখতেও পায়নি !

পল্টুর মা বললেন—এই যে ধেড়েকেষ্ট এদিকে এসে পায়ে চাপা দিয়ে বস ! এখুনি শান্তির জল দেবেন।

পল্টুর বাবা ফিসফিস করে বললেন—আশ্চর্য ছেলে তুমি !

পল্টুর ছোট বোন মার কানে কানে বললে—ওর প্যান্টের পেছনে একধাবড়া গোবর মা !

বাবা শুনে বললেন—মাথায় ছিল এইবার প্যান্টে এল !

ভট্টাচার্য মশাই উঠে দাঁড়িয়ে আম্রপল্লব দিয়ে শান্তির জল ছিটোচ্ছেন—ওঁ আপদ শান্তি ওঁ বিপদ শান্তি ওঁ শান্তিরেব শান্তি।

সুব্রতবাবুর কুকুর

সুব্রতবাবু সাহেব ছিলেন। এখনো তাই আছেন। এক সময় বনবিভাগে বড় চাকরি করতেন। এখন একটা বিশাল অ্যালসেসিয়ান কুকুর নিয়ে রিটায়ার করেছেন। আমাদের পাড়াতেই তাঁর ছোটমত হলদে রঙের সেই বাড়ি। বাড়ির বারান্দায় কুকুরটাকে নিয়ে প্রায় সারাদিনই একভাবে বসে থাকেন। কখনো তাঁকে ধুতি পরতে দেখিনি। বেশির ভাগই খাঁকি হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জির কাপড়ের বুকখোলা এক ধরনের জামা পরে থাকেন। বুকে চুল। তার ওপর সোনালী রঙের ছোট্ট ক্রশ ঝোলে। সুব্রতবাবু কিন্তু খ্রীস্টান নন। তাঁর বাবা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ছেলে ব্রাহ্মণ, সুব্রতবাবুর গলায় কিন্তু পৈতে নেই। সারা জীবন জঙ্গলে ঘুরে সব কুসংস্কার নাকি কেটে গেছে!

পায়ে হাওয়াই চটি, মুখে একটা পাইপ। সেটা কখনও ধোঁয়া ছাড়ে। কখনও নিভে থাকে। কোলে থাকে একটা ইংরাজী ম্যাগাজিন। বইটা পড়েন বলে মনে হয় না। কারণ তাঁর বিশাল ভুঁড়িটা সেই ম্যাগাজিন ঢেকে রাখে। লেখাটেখা কিছুই দেখা যায় না। কোলের ওপর ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিনের ওপর ভুঁড়ি। তার ওপর আফ্রিকার জঙ্গলে ঢাকা থলথলে একটা বুক। সেই বুকের ওপর যীশুখ্রীষ্ট। তার ওপর তিন থাক ঘাড়। ঘাড়ের ওপর বুল ডগের মত ভীষণ একটা মুখ। সেই মুখে মোটা একটা পাইপ। চোখে এই পুরু ফ্রেমের একটা চশমা।

সুব্রতবাবু পাড়ায় কারুর সঙ্গে মেশেন না। বলেন আমার স্ট্যাণ্ডার্ডের লোক কোথায়! প্রতিবেশীরা বলেন, তা ঠিক। এটা তো জঙ্গল নয়। জঙ্গলী মানুষ ছাড়া ও জিনিস মিশবে কার সঙ্গে। সুব্রতবাবুর আসল নাম চাপা পড়ে গেছে। সকলে তাঁকে জাঁদরেল বলে উল্লেখ করেন। জাঁদরেলের বাড়ি, জাঁদরেলের কুকুর, ছেলে, মেয়ে ও স্ত্রী।

সুব্রতবাবুর কুকুরের নাম অ্যালবার্ট। এই অ্যালবার্টের জ্বালায় সকালে আমরা কেউ ঘুমোতে পারি না। ভোরের ঘুমটা কত মিষ্টি। পাশ বালিস

বুকে জড়িয়ে ধরে ফিকে অন্ধকারে একবার চোখ মেলেই কি ভাল লাগে আর একবার ঘুমিয়ে পড়তে! দিনের প্রথম পাখিটি তখন হয়তো সবে ডাকতে শুরু করেছে। সেই সুখের ঘুমটা আমাদের গেছে। সুব্রতবাবু আর তাঁর কুকুর অ্যালবার্ট সেই কাকভোরে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় প্রাতর্ভ্রমণে বেরোন! সে কী এলাহি ব্যাপার!

জাঁদরেল সাহেবের হাতে কালো লিকলিকে ছড়ি। হাফপ্যান্ট, ফুল মোজা, হাণ্টার বুট পরে, মুখে পাইপ লাগিয়ে সুব্রতবাবু, সামনে অ্যালবার্ট। জিভটা ঝুলছে হ্যা-হ্যা করে। পেছন পেছন আসছে গোটা কতক নেড়ি-কুকুর। দূর থেকেই তাদের ঘেউ ঘেউ। কাছে যাবার সাহস নেই। অ্যালবার্ট থামে তো তারাও থামে। অ্যালবার্ট চলে তো তারাও চলে।

প্রথমে বাড়ি থেকে বেরিয়েই অ্যালবার্টের প্রাতঃকৃত্য। বিলিতী কুকুর আবার বাঙলা বোঝে না। প্রথম ল্যাম্পপোস্টে সে মূত্র ত্যাগ করবে। এই কাজটি সহজে করবে না। পাড়ার অর্ধেক মানুষের ঘুম ভাঙিয়ে তবে কাজটি সমাধা করবে। সুব্রতবাবু সমানে চিৎকার করবেন, পিস্ পিস্। কুকুরের গলা আর মালিকের গলা প্রায় সমান। কুকুরের গলার তবু একটা বিউটি আছে, মালিকের গলা যখন চড়ার দিকে ওঠে ভেঙে আটখণ্ড হয়ে যায়। বেশি চিৎকার আবার সহ্য হয় না। পিস্ পিস্, বারকতক পিস্, পিস্ করেই দমকা কাশতে থাকেন। সাংঘাতিক বুনো কাশি। চলেছে তো চলেছে, থামতে আর চায় না।

দাদা আর আমি এক বিছানায় ঘুমোই। দাদা একটু বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। দাদা বিছানায় উঠে বসে বললে—এ হল বন-বিভাগের কাশি, এ জিনিস কি শহরে, লোকালয়ে সহ্য হয়! লোকটাকে নিয়ে কি করা যায় বল তো!

—পিস্ মানে কি দাদা?

—পিস্ আর হিস্ এক মানে। কুকুরকে ইংরেজী কায়দায় হিসি করানো হচ্ছে।

কাশার সময় মালিকের মুখ দিয়ে পিস্ পিস্ বেরোয় না। অ্যালবার্ট

সেই সময়টায় ল্যাম্প পোস্টটাকে খুব ভাল করে শুঁকতে থাকে—ফোঁস, ফোঁস, ফিস। তারপর যদি দয়া হয় একটা পা তুলে একটু জল বিয়োগ করে মালিকের দিকে তাকিয়ে ল্যাজ নাড়তে থাকে। জাঁদরেল সাহেব তখন বলেন—ভেরি গুড। এরপরই শুরু হবে বল খেলা। প্যাণ্টের পকেট থেকে একটা কাঠের বল বেরোবে। সামনের বেওয়ারিশ মাঠে সেই বল, কুকুর আর কুকুরের মালিক মিলে একেবারে দক্ষযজ্ঞ কাণ্ড। বলটাকে দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলবেন—অ্যালবার্ট ক্যাচ ইট, ব্রিং ইট হিয়ার। কুকুর অমনি বলটা মুখে করে দৌড়ে আসবে। ঘণ্টখানেক পাড়া একেবারে ফেটে পড়বে – ক্যাচ ইট, হোল্ড, ব্রিং ইট, ব্র্যাভো ব্র্যাভো। ইংরেজির ফোয়ারা মাঝেমধ্যে দু চারটে নেড়ি কুকুর বিলেতী কুকুরের খেলা দেখতে এলে খেল আর জমে ওঠে। অ্যালবার্ট বল ভুলে একবার করে স্বজাতির দিকে বিজাতীয় আক্রোশে তেড়ে যাবে, তারাও দুকদম পিছিয়ে গিয়ে সমানে ঘেউ ঘেউ করতে থাকবে। জাঁদরেল সাহেব নেড়িদের পরিষ্কার বাংলায় বোঝাতে থাকেন—ওরে তোরা প্রাণটা নিয়ে পালা, জার্মানী কুকুরের সঙ্গে বাঙালী কুকুর পারবি না রে বাবা, এর জাতই আলাদা, মাংস ছাড়া ভাত খায় না, দুধ ছাড়া ব্রেকফাস্ট করে না। অ্যালবার্ট চলে এসো, লেট আস প্লে। প্লে হোয়াইল ইউ প্লে, ওয়ার্ক হোয়াইল ইউ ওয়ার্ক।

সত্যবাবু আমাদের পাড়ার আর এক প্রবীণ মানুষ। তিনিও বড় চাকরি করতেন। অনেক দিন হল অবসর গ্রহণ করেছেন। স্পষ্ট-বক্তা এবং সজ্জন ধার্মিক মানুষ। ওই খোলা মাঠকে তিন দিকে গোল করে ঘিরে যে কটা বাড়ি আছে তার একটায় তিনি থাকেন। সত্যবাবু একদিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণের সময় জাঁদরেল সাহেবকে স্পষ্টই বললেন —এই যে আপনি সাত সকালে মাঠে কুকুরের সার্কাস করেন এর ফলে পাড়ার শিশুদের কত ক্ষতি হচ্ছে জানেন? সকাল হল লেখাপড়ার সময়। একটু পরেই সব স্কুলে যাবে, ওই দেখুন জানলায় জানলায় সব কচি কচি মুখ, পড়া ছেড়ে আপনার কুকুরের কেরামতি দেখছে।

জাঁদরেল সাহেব পকেট থেকে, পাইপ বের করে ঠোঁটে লাগালেন।

পাইপ ছাড়া কথা বলতে পারেন না। সাহেবী অভ্যাস। তারপর সত্যবাবুর দিকে তাকিয়ে দুবার কাঁধ ঝাঁকালেন।

সত্যবাবু বললেন—আমার অভিযোগের কিন্তু কোনও জবাব পেলুম না।

সুব্রতবাবু হেসে বললেন—আমার কাঁধই জবাব দিয়ে দিয়েছে মিস্টার মিস্টার···

সত্যবাবু ধরিয়ে দিলেন—বোস।

সুব্রতবাবু বললেন—মিস্টার বোস। একে বলে রিপ্লাই ইংলিশ স্টাইল।

—তার মানে? আমি বাংলায় এত কথা বললুম, পশ্চিমবাংলায় দাঁড়িয়ে বললুম একজন বাঙালীকে, আপনি তার কোন জবাবই দিলেন না, উল্টে বলছেন—রিপ্লাই ইংলিশ স্টাইল। কে মশাই বুঝবে আপনার বিচিত্র কায়দা-কানুন? বড় মজার লোক তো আপনি!

সুব্রতবাবু পাইপ-চাপা ঠোঁটে বললেন—আপনি শ্রাগিং জানেন না। সায়েবরা যেই কাঁধ ঝাঁকায় তখনই বুঝতে হবে জবাবটা হল—হু কেয়ারস? ড্যাম ইট! শিশুদের যদি ট্রেনিং দিতে না পারেন, দোষটা আমার নয় মিঃ বোস, দোষ আপনাদের আপ-ব্রিগিংগসের। সুব্রতবাবু খুব ডাঁটে মুখ ঘুরিয়ে কুকুরকে বললেন—অ্যালবার্ট রান আফটার দি বল। পকেট থেকে বল বের করে একটা ঝোপের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

সত্যবাবু খুব অপমানিত হয়েছেন। মুখটা রাগে লাল। তবু বললেন—আপনি তো মশাই খুব অসামাজিক জীব।

দূর থেকে সুব্রতবাবু বললেন—হু কেয়ারস ফর ইওর হেলিশ সমাজ। উই নিউ এ লিটল এক্সারসাইজ। ওপেন এয়ারে ব্যায়াম আমার এবং আমার কুকুরের জন্যে প্রয়োজন। নাথিং ক্যান স্টপ ইট। অ্যালবার্ট···।

সত্যবাবু অপমানটাকে সহজে হজম করে নিতে পারলেন না। সপ্তাহের শেষে রাত ভোরে আমার আর দাদার ঘুম ভেঙে গেল। দাদা বিছানায় বসে বসেই বললে—মাঠে এ আবার কার গলা রে!

কান খাড়া করে শুনলুম—লালী ওঠ, লালী বোস। লালী ওঠ, লালী বোস।

দাদা মাঠের দিকের জানলাটা খুলেই বললে—দেখে যা, দেখে যা বিল্টু।

মাঠে সত্যবাবু। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি। সাদা ফুল হাতা পাঞ্জাবি। হাতে একটা স্টিক। আর এক হাতে চেনে বাঁধা মাঝারি মাপের বাদামী রঙের একটা কুকুর। কুকুরটা ফ্যাল ফ্যাল করে সত্যবাবুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ন্যাজ নাড়ছে, আর সত্যবাবু ক্রমান্বয়ে বলে চলেছেন—লালী ওঠ, লালী বোস। লালীর ওঠ বোস করার সামান্যতমও ইচ্ছে নেই।

দাদা চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল—জ্যাঠামশাই, ওটা কার কুকুর?

—মালিক যার কুকুব তার।

—কি কুকুর জ্যাঠামশাই?

—নির্ভেজাল নেড়ি। চিনতে পারছো না? তোমাদের বাড়ির সামনেই তো ঘুরতো। কয়েক দিন খাইয়ে দাইয়ে, চান করিয়ে, চেন পরিয়ে এর ভোল পাল্টে দিয়েছি। এখন চলছে ব্যায়াম আর ট্রেনিং। লালী, লালী, লালী ওঠ, লালী বোস।

সত্যবাবু লালীকে নিয়ে মহা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললে—কি হল বল তো, জ্যাঠামশাইয়ের মাথা খারাপ হল না কি? এই বয়েসে একটা নেড়ির গলায় বগলস পরিয়ে এ আবার কি?

খেলাটা জমে উঠল মিনিট পনের পরে। কুকুর ছাড়াই জাঁদরেল সাহেব তাঁর ইউনিফর্ম পরে মাঠে নেমে এলেন। বেশ উত্তেজিত। হাত দুটো পেছন দিকের কোমরে। একটা হাতে ছোটো স্টিক। মাঝে মাঝে প্যান্টের পেছন দিকে মেরে ফ্যাটফ্যাট শব্দ করছেন।

সত্যবাবু তখন লালীকে নতুন প্যাঁচ শেখাচ্ছেন—জাম্প আপ, জাম্প আপ।

সত্যবাবুর সব নির্দেশেই লালীর এক অ্যাকশান, পটাপট ন্যাজ নেড়ে চলেছে।

জাঁদরেল সায়েব এগিয়ে এসে বললেন—হোয়াট ইজ দিস্ ?

সত্যবাবু নির্বিকার গলায় বললেন--দেখতেই পাচ্ছেন ? লালী ওঠ, লালী বোস।

—এই মাঠে আমি আর আমার কুকুর রোজ সকালে প্র্যাকটিস করি।

– সো হোয়াট ? আজ থেকে আমি আর আমার কুকুর করব।

—নো, নো, দ্যাট কান্ট বি। ইউ আর এ ট্রেসপাসার।

সত্যবাবু হঠাৎ মাত্রাতিরিক্ত গলায় বললেন—মাঠটা আপনার ?

জাঁদরেল সায়েব একটু থতমত খেয়ে গেলেন। স্টিকটা বেশ কয়েকবার ফ্যাট ফ্যাট করে সায়েব বললেন—একে বলে জেলাসী, ইংরেজিতে বলে জেলাসী।

—বাংলাটা দয়া করে বলে দিন। আমি আবার বাঙালী।

—হিংসা, হিংসা। তা না হলে সাত-সকালে কেউ একটা নেড়ির গলায় চেন বেঁধে এসব করে ? আরে মশাই পেডিগ্রীড ডগ ছাড়া কুকুর কখনও কথা শোনে না। সে শুনবে আমার কুকুর।

-- পেডিগ্রীটা কি জিনিস ?

—ও তাও জানেন না, বংশ, বংশ। জাত কুকুর নাহলে ট্রেন-আপ করা যায় না।

—দেখাই যাক না। ও স্বাধীনতাটা আমারই থাক। বিলিতী কুকুরও তো বিলেতের নেড়ি। নেটিভরা যদি হাফপ্যান্ট পরে সায়েব হতে পারে, নেড়িও বগলস পরে বিলিতী হতে পারে।

—আমার কুকুর নিয়ে যদি মাঠে নামি বিপদে পড়ে যাবেন মশাই। কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে।

—নামুন না। কে বারণ করছে! সাধারণের মাঠ। আপনারও যেমন রাইট আছে আমারও তেমনি রাইট আছে।

—তখন কিন্তু আফশোষ করবেন না, মাইণ্ড ইট!

—চ্যালেঞ্জ তো আমি গ্রহণ করেইছি। অনর্থক কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করেছেন কেন? লালী ওঠ, লালী বোস।

দাদা বললে—বাঃ বেশ জমেছে। কিন্তু নেড়ি কি পারবে রে অ্যালসে-সিয়ানের সঙ্গে? অ্যাঃ লালীর আজ নির্ঘাত মৃত্যু!

জঁাদরেল সায়েব দ্বিতীয়বার মাঠে নামছেন, মুখে পাইপ, হাতে লাঠি, এক হাতে চেনে বাঁধা ইয়া তাগড়া বাঘের মত বিলিতি কুকুর। কুকুরটা জিভ বের করে হ্যা হ্যা করে এগিয়ে চলেছে।

সত্যবাবুর হাতে ধরা লালী ন্যাজ নাড়া ভুলে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

সত্যবাবু জিজ্ঞেস করলেন—চেন বঁাধা অবস্থায় হবে না খোলা অবস্থায় হবে?

জঁাদরেল সায়েব কি যে ভাবলেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন—আপনার নেড়িটাকে রোজ চান করান?

—না তো।

—পাউডার মাখে?

—পাউডার! না তো। নেড়ির আবার অত কি!

—গায়ে টিক্‌স আছে?

—থাকতে পারে।

—অ্যান্টি-র‍্যাবিস ভ্যাকসিন দেওয়া আছে!

—সে আবার কি?

—ধ্যারমশাই,তাহ'লেলড়াই হবে কির করে! আমার কুকুরকে আমি জেনেশুনে রাস্তার একটা ইতর কুকুরের সঙ্গে লড়তে দিই কোন আক্কেলে। বলা তো যায় না, এক আধটা কামড় বসালেই রোগে ধরে যাবে।

—তাহলে লড়তে দেবেন না, বাড়ি নিয়ে যান।

—আরে মশাই, আমি তাহলে কোথায় যাবো?

—জাহান্নামে।

—কেস করব।

—করুন।

—লড়াই করব।

—আমার সঙ্গে, না আমার কুকুরের সঙ্গে! হয় নিজে লড়ুন, না হয় আপনার কুকুরকে লড়তে দিন।

—দেখে নোবো।

—নেবেন।

জাঁদরেল সায়েব তাঁর কুকুরটাকে টানতে টানতে বাড়ির দিকে চললেন। সত্যবাবু নির্বিকার মুখে আবার শুরু করলেন, লালী ওঠ, লালী বোস।

অহিদার চোরধরা

আমার দাদা, অহিদা, ব্যারাকপুরে নতুন বাড়ি করেছেন। চারপাশে বাগান। একতলা হলদে বাড়ি। ছাদে অ্যালুমিনিয়াম রঙের জলের ট্যাঙ্ক। টেলিভিশনের অ্যাণ্টেনা। একপাশে খানিকটা অংশ চারদিক তারের জাল দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে নানা রকম গাছ। এক-একটা টবে ছোট-ছোট চৌকো টিকিট, কাঠি দিয়ে নোটিসের মতো মাটিতে পোঁতা। অদ্ভুত অদ্ভুত সব নাম—অ্যাকুইলেগিয়া, অ্যাসপিডিস্ট্রা, ক্যালানা ভালগারিস, গোদেতিয়া, গ্লোকসিনিয়া। ওই জালিঘরে ঢোকার গেটে একটা টিনের ফলকে লেখা—যারা ফুল ভালবাসে, তারা ঈশ্বরকে ভালবাসে। আর একটা ফলকে লেখা—ফুল মানে ফল নয়। অন্য আর একটা ফলকে লেখা—ফুলের আকাঙ্ক্ষা করো, ফলের নয়।

নিজে আর্টিস্ট, যা খুশি তাই লিখতে পারেন। আঁকতে পারেন। যেমন বাড়িতে ঢোকার গেটের বাইরে লিখে রেখেছেন—কুকুর নেই। কুকুর শব্দটা পড়েই লোকে ভাবেন, লেখা আছে—কুকুর হইতে সাবধান। ঢোকার আগে গেটের আঙটা বাজিয়ে চিৎকার করে বারবার জিজ্ঞেস করতে থাকেন, "কুকুর বাঁধা আছে তো?" বসার ঘরের জানালা খুলে অহিদা তখন ভারী গম্ভীর গলায় বলেন, "আর একবার পড়ে দ্যাখো।"

প্রভাতবাবু একদিন সকালে ওইভাবে বেকায়দায় পড়ে, পরে ঢুকতে ঢুকতে, একটু রাগ-রাগ গলায় জিজ্ঞেস করেছিলেন, "এটা তোমার কী কায়দা অহি? কুকুর নেই, সেটা লিখে জানাবার কী আছে হে!" মোটা চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে অহিদা বলছিলেন, "একটাই কারণ কাকা, পড়লে পুরোটাই পড়বেন, বুঝলে পুরোটাই বুঝবেন। শুধু মলাট দেখেই বিচার করবেন না। ক মানেই কৃষ্ণ নয়, কাকও হতে পারে, কঙ্কালও হতে পারে, কালিও হতে পারে!"

বাথরুমের বাইরে লিখে রেখেছেন—বাথরুম। শোবার ঘরে—

বেডরুম। রান্নাঘরে—কিচেন। "এসব কেন লিখেছেন অহিদা, বোঝাই তো যাচ্ছে বাথরুম, বেডরুম, কিচেন।" অহিদা বললেন, "কটা লোক বোঝে হে, স্নানঘর, শোবারঘর, রান্নাঘর, খাবার-ঘরের মর্ম। ঘরে ঘরে গিয়ে দ্যাখো, বাথরুমে পা দিতে পারবে না। শোবার ঘরটা খেলাঘর, বসার ঘর! খাটে পাতা বিছানা লণ্ড-ভণ্ড। ধুলো-বালি কিচকিচ করছে। বসার ঘরটাকে মনে হবে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। রান্নাঘরটাকে করে রাখবে গোয়ালঘর। চলতে ফিরতে মনে করিয়ে দাও সব সময় চোখের সামনে নোটিস লটকে দাও।"

আমার এই দাদা, অহিদা, যেমন ছবি আঁকতে ভালবাসেন, তেমনি খেতে ভালবাসেন। খেতে ভালবাসেন বলে রাঁধতেও ভালবাসেন। রাঁধতে ভালবাসেন বলে বাজার করতে ভালবাসেন। সুখে থাকলে, আনন্দে থাকলে মানুষের চেহারা ভাল হয়। প্রথমে মুখটা গোল হতে থাকে। বেলুন আস্তে আস্তে ফোলালে যেমন হয়। ভাঙা গাল, চোয়ালের হাড়, সব ভরাট হতে থাকে। গলার কণ্ঠা ক্রমশ চাপা পড়তে থাকে। ঘাড়টা ক্রমশ বেড়ে-ওঠা-কলাগাছের মতো গোল থেকে আরও গোল হতে থাকে। অহিদার চেহারা বরাবরই ভাল। তারপর ভালতর থেকে ভালতম হয়ে এখন ভাল-ভালতর, ভাল-ভালতর, ভালতম হয়ে ক্রমশই বেড়ে চলেছে। কী মজা, রোগা হলে লোকে বলবেন, আহা তোমার শরীরটা কী হয়ে গেছে! আবার মোটা হলেও বলবেন, কী হচ্ছে তোমার শরীরটা! প্রতিবেশী প্রভাতবাবু দেখা হলেই বলবেন, "কী হচ্ছে অহি। এরপর তো একটা আয়নায় তোমার কুলোবে না হে, জোড়া আয়না লাগিয়ে মুখ দেখতে হবে।"

অহিদার নজর লাগবে না। লাগলেও কিছু হবে না। কী আর কমবে! সাগর থেকে ঘটিখানেক জল তুলে নিলে সাগরের কী হবে! সে হবে আমাদের। কেউ যদি বলেন, তোর চেহারাটা বেশ চকচক করছে, তাহলেই আমার মা আড়ালে ডেকে কড়ে আঙুলটা কামড়ে গায়ে একটু নুন ছিটিয়ে দেবেন।

এখন নিজের চেহারাটা যখন এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজেকেই বয়ে বেড়াতে হয়, তখন বাজার বওয়া, কি কাঁধের পাশে সামান্য একটা ঝোলা ব্যাগ বওয়াও কষ্টকর ব্যাপার। নিজেরটা নিয়েই অস্থির, তার ওপর আবার আলু, পটল, ট্যাড়স, ড্রয়িং বোর্ড, তুলি, রং, জামা, কাপড়, চটি, চুল, দাড়ি! সেই জন্যেই নেপাল থেকে আনিয়েছেন বাহাদুরকে। বাহাদুর সব পারে।

ছাদের বাগান আর নীচের বাগানে চারাগাছে জল দিতে পারে। এমন ভাবে পারে, একটা চারাও উল্টে পড়বে না। একটা মাঝখান-থেকে-চেরা বাঁশ এমন কায়দায়, ফ্যাটফ্যাট করে বাজাতে পারে যে সেই শব্দ শুনলে মানুষের ঘুম এসে যাবে, আর যে-সব পাখি বীজ চারা নষ্ট করে, তারা ফররর ফররর করে উড়ে পালাবে। বাহাদুর মোটর গাড়ির টায়ার কাধে তুলতে পারে। দু কাঁধে, হাতের ফাঁক দিয়ে দুটো টায়ার ঝুলিয়ে শিস্ দিতে দিতে দু মাইল দূরের বাজার থেকে ঘুরে আসতে পারে। একটা বড় খাট একাই তুলতে পারে। পারে না কেবল অহিদাকে তুলতে।

কী করে বলছি পারে না? দেখেছি বলেই বলতে পারছি। অহিদা ব্যারাকপুর স্টেশনে একদিন পা মচকে পড়ে গেলেন। অহিদার দোষ নেই। একটা কুকুরকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনা। মহৎ কাজ! অসুবিধে হল, গাড়ির হর্ন থাকে, অহিদার তো হর্ন নেই। গাড়ির একেবারে চাকার তলায় কিছু পড়লে ড্রাইভার দেখতে পায় না, অহিদার একেবারে ভুঁড়ির তলায় প্ল্যাটফর্মে কুকুরটা শুয়ে ছিল। কী করে দেখবেন! বাহাদুর চেঁচাচ্ছে, "কুত্তা বাবু, বাবু কুত্তা!" কুকুর ঘুমুলেও তার অনুভূতিটা তো আর ঘুমিয়ে পড়েনা। সে ভেবেছে মালবোঝাই লরি আসছে। অহিদার শেষ পদক্ষেপটা কুকুরটার পেটের ওপরেই হত, যদি না কুকুরটার বিদ্যুৎ-গতিতে অহিদার পায়ের ফাঁক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করত। পালাবে কোথায়! সামনে কোঁচা, পেছনে ঝুলন্ত কাছা। কুকুরটা আকারেও তেমন বড় নয়। অহিদার কাছায়-কোঁচায় জড়ামড়ি হয়ে, জালে-পড়া শেয়ালের মত ঝটপট করছে, সঙ্গে কেঁউ কেঁউ আর্তনাদ। বাহাদুর বলছে

"উতার দিজিয়ে, উতার দিজিয়ে।" পেছন থেকে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলছেন, "ঝেড়ে ফ্যালো খোকা, ঝেড়ে ফ্যালো খোকা!"

অহিদা নীচের দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছেন, পায়ের ফাঁকে ব্যাপারটা কী হচ্ছে! দেখতে তো পাচ্ছেন না। ভুঁড়ির জন্যে দৃষ্টি আটকে যাচ্ছে। পুরো ঘটনাটাই খুব দ্রুত ঘটছে। কুকুরটা মুক্তির চেষ্টায় শেষ ঝটকাটা বোধহয় একটু জোরেই দিতে পেরেছিল। কাছাটা খুলে গেল। অহিদার কাছা এবার কুকুরটার পেছনের পায়ে জড়িয়ে কুকুরের কাছা হয়ে গেছে। কুকুর ভাবছে, অহিদা তার কাছা টেনে ধরেছেন। যে-দিকে কুকুরের মুখ অহিদার মুখ তার উল্টো দিকে। কুকুরটা প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে তিন পায়ে। একটা পা কাছায় আটকে উঁচু হয়ে আছে। অহিদা কখনও রাগেন না বা উত্তেজিতও হন না। ধীর গলায় শুধু বলছেন, "এই কী হচ্ছে, কী হচ্ছে!" কুকুরটা শেষ পর্যন্ত হয়তো পালাতে পারত কাছা ছাড়িয়ে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারল না। কোথা থেকে একটা মুশমুশে কালো কুকুর টিনের বেড়া গলে সামনে এসে দাঁড়াল। মনে হয় জাতভাইয়ের দুর্গতিতে কোনো সাহায্য করা যায় কিনা দেখতে এসেছিল। অহিদার কাছায় জড়ানো কুকুরটা কিন্তু অন্যরকম ভেবে বসল। ভয়ে আবার উল্টো দিকে দে দৌড়। নিমেষে অহিদার কাছাতে, কোঁচাতে, কুকুরের ল্যাজেতে কী হয়ে গেল। হিম-গিরির পতন। অহিদা পড়ে গেলেন। আমাদের পড়া এক রকম, অহিদার পড়া আর একরকম। আমাদের ওপর দিকটা তো তেমন ভারী নয়। অহিদার পড়া মানে, নিজের পায়েই নিজে পড়া। ওপরের অতটা গুরুভার সহসা নেমে এল নিজের পায়ে! সেইদিন দেখলুম, বাহাদুর সব তুলতে পারে, পারে না কেবল নিজের বাবুকে। অহিদা অবশ্য পরে গর্ব করে বলেছিলেন, "যে-বাবুকে চাকর তুলে ফেলে সে-বাবু বাবুই নয়।" তখন অবশ্য বাহাদুরকে খুব গালাগালি দিয়েছিলেন, "এর আগের বাহাদুর হাতি তুলে ফেলত, তুই ব্যাটা কোথাকার বাহাদুর!" অহিদার বাড়িতে যেই কাজ করতে আসে, তার নামই বাহাদুর।

সেই বাহাদুর রাগ করে কলকাতায় চলে গেছে। প্রথমদিন বাহাদুর-শূন্য অবস্থায় অহিদার খুব অসুবিধে হয়েছিল। অহিদার চেয়ে অসুবিধে হয়েছিল বৌদির। দুটো প্রেশার কুকার, দুটো ডব্‌ল গ্যাস-উনুন, একটা কেরোসিন স্টোভকে কাজে নামিয়েও তিনি অহিদাকে সামলাতে পারেন না। খেতে ভালবাসেন। অনবরতই খেতে চান। খাই-খাই। একটু এদিক-ওদিক হলেই রাগ। অতবড় একটা মানুষ রেগে গেলে কী রকম শব্দ হয়! বৌদি আবার শব্দ সহ্য করতে পারেন না। অহিদা রেগে গেলেই হিন্দি, ইংরেজি, বাংলা নয়, একেবারে ফরাসী ভাষায় চলে যান — 'স্তুপিদ স্তুপিদ'! ভুজ্যাত অ্যা মেসঁা, মেসঁা।" নল দিয়ে জল বেরোলে বেশ জমপেশ করে একটা কিছু গুঁজে দিলে জল বেরোনো বন্ধ হয়। গর্ত দিয়ে শেয়াল বেরোলে মাটি চাপা দিতে হয়। ফুটো দিয়ে ইঁদুর বেরোলে ইঁট পুরে দিতে হয়। অহিদার মুখ দিয়ে ফরাসী বেরোলেই বেশ নরম, গরম, তুলতুলে, মুচমুচে, ভরাট কিছু খাবার গুজে দিতে হয়। তা না হলেই, ভুজ্যাত ভুজ্যাত!

সারাদিন এইভাবে সংসার চালাতে গিয়ে রাতের দিকে বৌদির শরীরে আর শক্তি থাকে না। রাতের খাওয়া শেষ করেই বৌদি ধপাস করে যেই বিছানায় পড়েন, অমনি ঘুম। বৌদি ঘুমুলেই অহিদার যত খুটখাট শুরু হয়ে যায়। চাপা আলো জ্বেলে ইজিচেয়ারে বসে বিদেশী বই পড়ছেন। সাবেক আমলের পিয়ানোর ধুলো ঝেড়ে, বেঠোভেনকে স্মরণ করে, টুংটাং করছেন। যেমন কায়দাব বসা, তেমনি কায়দার বাজানো! মনে মনে ভাবছেন, সোনাটা বাজাচ্ছি! ভেতর থেকে তিড়িং করে যেই একটা ইঁদুর লাফিয়ে উঠল, তাড়াতাড়ি ঢাকনাটা বন্ধ করে, বাজানোর টুল থেকে উঠে পড়লেন। দরকার নেই বাবা, মাউস!

কোনো কোনো দিন চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে রান্না-ঘরে ঢুকে, দরজা বন্ধ করে, আলো জ্বেলে কী সব করেন! নোট জাল নয় তো? আধঘণ্টার মধ্যেই প্রেশার কুকার ফিইস্‌ করে ওঠে। চোখ বুজে, নিজের দু কানে আঙুল দিয়ে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ভাবেন নিজের কান চাপা দিলেই স্ত্রীর কানে এই বিচ্ছিরি শব্দটা ঢুকবে না, ঘুম ভাঙবে না, ইচ্ছে মত রান্না করে খাবার অপরাধটা ধরা পড়বে না। শব্দটা বন্ধ হলে কুকারটা ওভেন থেকে নামিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে চুপি-চুপি বেরিয়ে এসে পা টিপে টিপে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে যান। ভারী পর্দাটা অল্প একটু ফাঁক করে প্রায় অন্ধকার ঘরে দেখে নেন, স্ত্রী জেগে উঠেছে কি না!

নাঃ গভীর ঘুম। ঘুমোও, ঘুমোও! মোটা হয়ে যাচ্ছি বলে ডাক্তার কম খেতে বলেছেন! তাই না! মোটা হচ্ছি আমি হচ্ছি, কার তাতে কী!

পর্দাটা ফেলে দিয়ে বাইরের দালানে দাঁড়িয়ে অহিদা, দু হাতের বুড়ো আঙুল দুটো পুরুষ্ট কলার মত শূন্যে তুলে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে একপাক নেচে নেন। কলা দেখান ডাক্তারকে আর আমার সাবধানী ঘুমন্ত বৌদিকে।

সেদিন শনিবার। সন্ধ্যের দিকে বৃষ্টি হয়ে বেশ একটু শীত শীত ভাব! খেতে বসে অহিদা আর একটা ফিশ-ফ্রাই চেয়েছিলেন। বৌদি ধমকে বলেছিলেন, "আর আধখানাও না। নেহাত শনিবার বলে একটা দিয়েছি তোমাকে!" ভাল মানুষের মতো মুখ করে অহিদা খাবার টেবল থেকে উঠে পড়লেন। বুঝতেও দিলেন না, কী করবেন পরে, কী প্ল্যান আছে মাথায়।

তেমন গরম নেই বলে বৌদির ক্লান্তিটাও কম! অন্যদিন শুয়েই ঘুমিয়ে পড়েন। আজ মুখের কাছে একটা বই ধরে রেখেছেন। অহিদা উশখুশ করছেন, একবার চেয়ারে বসছেন, একবার ইজিচেয়ারে আধ-শোয়া হচ্ছেন। কখনও বাগানে বেরিয়ে হাততালি দিয়ে পেয়ারাগাছ থেকে বাদুড় ওড়াচ্ছেন। বৌদি একবার বললেন, "কী ছোট ছেলের মতো ছটফট করে বেড়াচ্ছ, শুয়ে পড়ো না।"

গম্ভীর গলায় অহিদা বললেন, "তোমার মতো আমার তাড়াতাড়ি

ঘুম পায় না। রাত বাড়লে তবেই আমার মাথায় ভাল ভাল প্ল্যান আসে, ছবির আইডিয়া আসে।”

“তবে তাই আসুক। আমার বাবা শুলুম আর ঘুমোলুম।”

“ভাল!”

মুখের সামনে বিলিতি ম্যাগাজিন খুলে, অহিদা কালো ঝকঝকে একটা রকিং চেয়ারে বসে ধীরে ধীরে দোল খাচ্ছেন। আর মনে মনে ভাবছেন, ঘুমোও না বাপু, ঘুমোও। না ঘুমালে কিছু করতে পাবছি না!

রাত এগারোটা নাগাদ বৌদি ঘুমিয়ে পড়লেন। অহিদা ভাল করে দেখে নিলেন। সারাদিনের সেই বিরক্ত মুখ নয়। ভাঁজটাজ মিলিয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে। ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে। ডানদিকে বাঁদিকে ঘাড় নেড়ে নেড়ে অহিদা খুশি খুশি মুখে বললেন, “ঘুমিয়েছে, ঘুমিয়েছে! খুকু ঘুমুলো পাড়া জুড়োল…”

ট্যাং ট্যাং করে বারোটা বাজল। রান্নাঘরে অহিদার প্রেশার কুকারও ফিইস করে উঠল। শব্দটা থামতেই দরজা খুলে পা টিপে টিপে অহিদা বেরিয়ে এলেন। খেতে বসার আগে দেখতে হবে তো ঘুমটা বেশ গভীর হল কিনা। অহিদা গুটিগুটি এগোচ্ছেন, পেছন-পেছন গুটিগুটি এগোচ্ছে ঘি আর গরম মশলার গন্ধ।

ওদিকে ছাদের সিঁড়ির দিক থেকে আর-একটা লোকও গুটিগুটি এগিয়ে আসছে। অহিদা প্রথমটা লক্ষ্য করেননি। চোখে চশমা নেই। ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। অহিদাকে এগিয়ে আসতে দেখে লোকটি থেমে পড়েছে। অহিদা নিজের কায়দায় দম বন্ধ করে এগিয়েই চলেছেন। কোনদিকে নজর নেই, নজর ঘরের দিকে, পর্দার দিকে।

অহিদার বিশাল পালোয়ানের মত চেহারা। তার ওপর ওইভাবে গুটিগুটি চিতাবাঘের মতো হেঁটে আসা, যেন এখুনি লাফিয়ে পড়বেন ঘাড়ের ওপর। লোকটি থেমে পড়ল। প্রথমে ভেবেছিল পালাবে। তবে চোর হলেও সে শুনেছে, সব লোকেরই চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। সে যেই পালাতে যাবে, অমনি চিৎকার উঠবে ‘চোর চোর’। অবশ্য দু-একটা

বাড়িতে সে এমনও দেখেছে, শুয়ে শুয়ে ড্যাবড্যাবে চোখ বের করে দেখছে, চোর সব নিয়ে পালাচ্ছে, খুব চেষ্টা করছে 'চোর চোর' বলে চেঁচাতে কিন্তু ভয়ে গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না, একেবারে সরু পিঁপড়ের মতো গলায়, 'চো চো' করছে।

কিন্তু এ লোকটাকে তেমন সুবিধার মনে হচ্ছে না। ভয়টয় পেয়েছে বলেও মনে হয় না। পালাতে গেলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করবে! এদিকেও মরেছি, ওদিকেও মরেছি। তারচে পায়ে পড়ে দেখি। মোটা-সোটা সাহসী বাবুদের দয়ামায়া সময় সময় থাকে। গলাটাকে কান্না-ভাঙা করে, 'বাভুউউ আহার কোঁওববনা' বলে লোকটা ঝপাং করে অহিদার দু-পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল।

এইরকম একটা ঘটনার জন্যে অহিদা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। সারা বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। নিজে আর নিজের স্ত্রী। হঠাৎ কোথা থেকে আর একটা লোক এসে হাজির হল! অহিদা থতমত খেয়ে গেলেন। মহা উৎপাত দেখছি। ভেউ-এ-উ করে চিল্লিয়ে ঘুমটা ভাঙাবে, খাওয়াটা পণ্ড হবে। শুধু পণ্ড হবে না, চিরকালের মত চুরি করে রান্না করে যা খুশি তাই খাওয়াও বন্ধ হয়ে যাবে। রান্নাঘরে চাবি পড়ে যাবে। অহিদা মাটিতে 'অহল্যা উদ্ধারের' মতো পড়ে থাকা লোকটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁটে একটা আঙুল রাখলেন। হিসহিসে গলায় বললেন, "স্ট্যুপ! আর একটা কথা বললেই গলায় ঠ্যাং তুলে দোব।"

পায়ের কাছেই লোকটা পড়ে আছে। মনে মনে ভাবলে, হ্যাঁ, একটা পায়ের মতো পা! এই পা গলায় ওঠা, আর গলার ওপর দিয়ে একটা গাড়ির চাকা চলে যাওয়া একই কথা! তবু মিন-মিনে গলায় বললে, "আমি চেঁচাব কেন বাবু। আমার কি চেঁচানো শোভা পায়!"

অহিদা জামার কলারের পেছন দিকটা ধরে, বেড়াল ছানাকে যেভাবে তোলে, সেইভাবে মেঝে থেকে লোকটাকে তুলে, সোজা রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন। রোগাপটকা লোক, তেমন ভারী নয়। ঝুলতে-ঝুলতেই লোকটা বলছে, "চেঁচাবেন তো আপনি। চোরের মার বড় গলা হলেও

চোরেদের গলা খাটোই হয়। তা বাবু, আর যাই করেন, নর্দমায় ফেলবেন না!”

অহিদা লোকটাকে রান্নাঘরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, ভেতর থেকে ছিটকিনিটা তুলে দিলেন, “নে, এবার প্রাণ খুলে বকবক কর। আমি ততক্ষণ খেয়ে নিই! এরপর আর কখন খাব! রাত তো প্রায় ভোর হয়ে এল! এই তিন দিনেই তুই এত রোগা হয়ে গেলি কী করে! নে, এখন রাগ করে চলে যাবার ঠ্যালা বোঝ্। সাতদিন তেড়ে খাওয়াদাওয়া করলে তবেই আবার ‘বাহাদুর’ হবি। হি হি, এখন একেবারে চামচিকি!”

প্রেশার কুকারের ঢাকনটা খুলছেন অহিদা! গন্ধে জিভে জল এসে যায়! লোকটা বুঝতেই পারছেন না এই মোটামতো লোকটা কি সব বলছে। ভীষণ লোভও হচ্ছে! চোর হয়ে সারাজীবন শুধু প্রহারই খেতে হল, ভাল খাবার আর জুটল কোথায়? মাঝে মধ্যে অবশ্য বড় বড় লোকের বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে হেঁসেলটা আগে হাঁটকেপাঁটকে দেখা। ধ্যুর! বড় লোকেরা ভীষণ হিসেবি। যা বাঁচল সব ঠাণ্ডা বাক্সে পুরে দিল। দরজা খুললেই আলো জ্বলে ওঠে, হিম ঠাণ্ডা, ধোঁয়া বেরোচ্ছে! কী আছে ভেতরে? বোতল-বোতল জল, তরকারিতে দেবার বাটা মশলা, এক বোতল হলদে সিরাপ, দু একটা ফল, ছোট্ট এক বাক্স মিষ্টি, ছোটো ছোটো বরফের টুকরো, সাদা ফ্যাকফ্যাকে মুরগীর ঠ্যাং একটা, এক চাকা মাছ, তরকারির ঘাঁটাঘাঁটা তলানি, গন্ধেই বমি আসে। গরিবদের হেঁসেলে তবু কিছু ভাল খাবার থাকে! মুশকিল, চুরি করতে হলে বড়-লোকের বাড়িই ঢুকতে হবে। এ লোকটা তাহলে কী! গরিব না বড়-লোক! মনে হচ্ছে খেয়েই ফতুর। ইশ্ কার মুখ দেখে যে উঠেছিলুম আজ!,

অহিদা ইতিমধ্যে কাঁচের প্লেটে করে ডিমের খিঁচুড়ি রেখেছেন লোক-টার সামনে। “নে, বাদলা-বাদলা আছে, ঝপাঝপ মেরে দে। মনে আছে তো আমাদের সব আগের কায়দা! সব ধুয়ে-মুছে তকতকে করে রেখে দিতে হবে। সকালে তোর মাইজি যদি টের পায়, ব্যস, তাহলেই হয়ে গেল,

চিরকালের মত খাওয়ার বাবোটা। কী, কীরকম হয়েছে? ফাস ক্লাস! কী, বল! আর একটু ঝাল হলে ভাল হত!"

বাইরে খুট করে একটু শব্দ হতেই, অহিদা ঝট করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, চাপা গলায় হিসহিস করে উঠলেন। সব চুপচাপ। নাঃ কিছু না, আলোটা জ্বেলে দিলেন। "ভাষা পেয়ে গিয়েছিলুম রে, ভেবেছিলুম তোর বৌদি বুঝি বাথরুমে যাচ্ছে। না আঃ, ইঁদুর-টি দুর হবে। ও ঘুম তো সহজে ভাঙার নয়!"

লোকটা ভয়ে ভয়ে খাচ্ছে, কৌতূহল আর চাপতে পারছে না, শেষে জিজ্ঞেস করল, "বাবু আপনিও কি চোর?"

আঙুল চুষতে চুষতে অহিদা লোকটার দিকে তাকিয়ে রইলেন একনজরে, তারপর ডান হাতের মোটা আঙুলটা চোরটার দিকে ইঙ্গিত করে দমকা হাসি চেপে বললেন, "ধরেছিস ঠিক! ধরেছিস ঠিক। হার্টের সঙ্গে চুরি", বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, দু কদম এগিয়ে গেলেন লোকটার দিকে, ঝুঁকে পড়ে মুখটা দেখলেন, "এ কী রে! তুই তো দেখছি নয়া লোক। তুই তো বাহাদুর নোস।" তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "ঠিক করে বল তুই কে! গুপ্তচর? স্পাই? কে তোকে এ বাড়িতে চাকরি দিয়েছে এবং কবে থেকে? আমার বৌ?"

"আজ্ঞে না! কেউ চাকরি দেয় নি! আমি গুপ্তচর নই, চোর! চুরি করতে এসেহেহেছিলুম বাবুহু।" লোকটা ধড়াস করে অহিদার পায়ে পড়ল, "আমি অপরাধী বাবু! আমাকে ক্ষমাই করুন।" ভেউ ভেউ করে লোকটা কেঁদে ফেলল।

লোকটার কান্না শুনে অহিদা ভীষণ বিরক্ত হলেন, "পা ছাড়, পা ছাড়। পায়ে ধরে সাধু হবে ভেবেছ! জানিস, আমি যদি এখুনি 'চোর চোর' করে চেঁচাই তোর কি অবস্থা হবে!"

"পিটিয়ে শেষ করে দেবে বাবু! তবে জেনে রাখুন, তা হলে আপনিও ধরা পড়ে যাবেন!"

অহিদা খুব চিন্তিত হলেন, "তা যা বলোছস। তাহলে তোর যা নেবার নিয়ে চলে যা। আমি ততক্ষণ এসব ধুয়ে মুছে রাখি। দে, তোর ডিশটা দে। যাক, চুরি তো তুই করবিই, তার আগে বলে যা, রান্নাটা কেমন হয়েছে!"

"ডিশটিশ আপনাকে ধুতে হবে না। আমি সব ধুয়ে দিচ্ছি।"

"দিচ্ছি কেন বলছিস, বল নিচ্ছি। তবে জেনে রাখ, তুই চুরির 'চ'ও শিখিসনি এই সময় কেউ কারুর বাড়িতে চুরি করতে যায় গবেট? বিলেতে লোকে এই সময় বেড়াতে বেরোয়। বুঝলি কিছু? চুরি করতে গেলে অত হাঁকপাঁক চলে না। ধৈর্য চাই। দে, ডিশটা দে, ধুয়ে দি।"

"না, আমি ধুচ্ছি।" লোকটা সিঙ্কের কাছে ধোয়াধুয়ি শুরু করেছে। অহিদা কৌটো-টৌটো ঠিকঠাক জায়গায় তুলে রাখতে-রাখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোর নাম কী রে? ও! নাম তো আবার বলবি না। ঠিক নাম তো তুই নিজেই জানিস না। কাগজে দেখেছি তো, কোর্টে যখন কেস ওঠে তখন তো শুধুই ওরফে, মণ্টু ওরফে পল্টু ওরফে জন ওরফে নিয়াজ আলি ওরফে বকু সর্দার ওরফে পরেশ ওরফে ছকুলাল..."

"না, বাবু না। আমার আসল নাম শুনলে হাসবেন, তাই বলব না।"

"বল না।"

"আমার নাম সাধু।"

"ভালই তো রে। খারাপ নাম কী! চোরে আর সাধুতে তফাত কতটুকু। কেউ সাধু চোর, কেউ চোর সাধু।"

ঠ্যাং ঠ্যাং করে দুটো বাজল দূরের ঘড়িতে। অহিদা বললেন, "একটু হাত চালা বাবা। এবার আমার নিজেরই ভয় ভয় করছে। আমার বৌ যদি উঠে পড়ে, তখন কিন্তু রক্ষে থাকবে না। 'চোর চোর' করে চেঁচাবে, লোকে তোকে ধরেই পেটাবে।"

সাধু নামক চোরটি তোয়ালে দিয়ে ডিশ মুছতে মুছতে বললে, "আপনার বাবু কোন বুদ্ধি নেই। বৌদি আমাকে চোর বলে বুঝতেই

পারবেন না। চোরের সঙ্গে মালিকের এই রকম সম্পর্ক হয় নাকি ? মনে করবেন চাকর।"

"চাকর ? রাত দশটা সাড়ে দশটা অবধি চাকর ছিল না, হঠাৎ রাত বারোটার সময় চাকর এসে গেল। এ কি কারখানা নাকি, সকালের শিফটে একরকম লোক, রাতের শিফ্‌টে আর একরকম। অত বোকা ভেবেছিস নাকি আমার বৌকে ?"

"বোকা আপনি। রাগ করবেন না।"

"প্রমাণ কর, তা না হলে রেগে যাব কিন্তু।"

"আপনি বলবেন, সকালে তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলুম, অমুকবাবু কি তমুকবাবু, যা হয় একটা চেনা নাম বলে দেবেন, একজন লোক দেবে বলেছিল, আসার কথা ছিল অনেক আগেই, ট্রেন লেট করায় তুমি শুয়ে পড়ার পর এল।"

"বিশ্বাস করবে ?"

"আলবত করবে, যদি মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস থাকে আর সেইভাবে বলতে পারেন, নিশ্চই করবে।"

"তারপর কাল সকালে তুই যখন চলে যাবি সব মালপত্তর নিয়ে তখন আমার অবস্থাটা কী হবে, ভেবে দেখেছিস ?"

"তা বটে ! তা হলে এক কাজ করুন বাবু, 'চোর চোর' করে চেঁচান। এখন তো সব ধোয়া মোছা হয়ে গেছে, আপনার তো কোনো ভয় নেই বাবু, লোকে এসে আমাকেই পেটাবে। অনেকদিন জেলেও যাইনি। এদিকে ব্যাঙ্কে সব লকার হয়ে গেছে, সোনাদানা তেমন পাওয়াও যায় না, বাজার বড় মন্দা। যাই, কিছুদিন থেকে আসি।"

হঠাৎ রান্নাঘরের দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। অহিদা দরজার দিকে পেছন ফিরে ছিলেন। দেখতে পাননি, চোর সাধু দেখেছিল। সে একগাল হেসে ছুট্টে গিয়ে, অহিদার স্ত্রীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে,"ট্রেন লেট ছিল মা, আসতে দেরি হয়ে গেল।"

বৌদি ঘুম-চোখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে

অবাক। আরব্যরজনী নাকি! ফটফট করে আলো জ্বলা সব কিছু ঝকঝকে তকতকে করে সাজানো। লোকটাই বা কে, দাদাই বা কী করছেন! সময়টাই বা কত! চোর সাধু বললে, "আপনি আমাকে সাধু বলেই ডাকবেন মা! বাবু আমাকে রান্নাঘর, কাজকর্ম সব দেখিয়ে দিয়েছেন। কাল থেকে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না। দেরিতে ঘুম থেকে উঠলেও চলবে। আমার হাতের রান্না যে একবার খেয়েছে, সে আর ভুলবে না।"

রান্না নিয়ে বড়াই করলে অহিদার সহ্য হয় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ, "দ্যাখ্ সাধু, বাড়ছিস বাড়, তা বলে সীমা ছাড়িয়ে যাসনি! রান্নায় তুই আমাকে হারাতে পারবি! কেন মিথ্যে বলছিস! হয়ে যাক চ্যালেঞ্জ।"

"চ্যালেঞ্জ!"

বৌদি থামিয়ে দিলেন, "আহাহা, চুপ করো। এ লোকটা কে!"

"আজ্ঞে আমি সাধু। নতুন কাজের লোক। বাবু বলেননি। আজ আমার জয়েন করার কথা!"

অহিদা গম্ভীর গলায় বললেন, "ও হ্যাঁ, তোমাকে বলা হয়নি, এ সাধু। থাকবে। কাজ করবে। কাজের লোক। তা দেখিয়ে-টেখিয়ে দিলুম। ভোর থেকেই লেগে যেতে পারবে!"

বৌদি হাই তুলে বললেন, "বাব্বা বাঁচা গেছে, ভগবান মেলে তো লোক মেলে না। কটা বাজল? তোমরা শোবে না? সারারাত পেঁচার মত জেগে থাকবে নাকি?"

বৌদি চলে গেলেন। অহিদা চাপা গলায় বললেন, "তুই শুধু চোর না, মিথ্যেবাদী। জানিস, চোরের চেয়ে মিথ্যেবাদী আরও খারাপ। কাল সকালে আমার কী অবস্থা হবে?"

"কী আবার হবে! সকলেই জানে, চাকররাই শেষে সব ফাঁক করে পালায়!"

"তা বলে, যেদিন এল সেইদিনই পালাল?"

"বলুন, যে-রাতে এল সেই রাতেই পালাল্।.. রাতেরাতেই কাজ শেষ।"

"যাঃ কী যে করলি না। একেই বলে যে, আমি কোনো কম্মের নই। এরপর কী বলবে তুই ভাবতে পারিস? তুই লুকিয়ে থাকতে পারতিস। তুই যখন অভিনয়ই করলি, অন্যভাবে করতে পারতিস। ওই ছুরিটা তুলে নিয়ে আমার পেটের কাছে ধরে বলতে পারতিস, 'একটু নড়েছ কি মরেছ, আমি চোর।' তাহলে আমার বৌ বুঝতে পারত, আমি তোকে বীরের মতো ধরতে এসে বিপদে পড়েছি।"

"বাঃ, আপনাকে চুরির দায় থেকে বাঁচালুম, দোষ হল আমার!"

"তুই তো আমি যেভাবে বললুম সেভাবেও বাঁচাতে পারতিস।"

"তাহলে তো আমি নিজেই চোর হয়ে যেতুম।"

"তুই তো চোরই, নামটাই যা সাধু। শোন, তুই চুরি কর ক্ষতি নেই, তবে সাত আটদিন পরে কর। দিন সাতেক থেকে যা, তোর কোনো কষ্ট হবে না।"

সাধু কিছুক্ষণ ভেবেচিন্তে বললে, "তবে তাই হোক। আমার ঘুম পাচ্ছে। কোনটা শোবার ঘর?"

অহিদা বাহাদুরের ঘরটা সাধুকে খুলে দিলেন। নিজেই আলো জ্বাললেন। ওই দ্যাখ চৌকি, বিছানাটা খুলে নে। ওই দ্যাখ্ নাইলনের মশারি, পেড়ে নে। জানালাগুলো খুলে দে, বেশ হাওয়া আসবে।

সাধু সব দেখে-টেখে বললে, "জীবনে এরকম ঘরে ঘুমিয়েছি? এ তো লাটসাহেবের ঘর। যান, শুয়ে পড়ুন।"

অহিদা চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "পালাবি না তো? দেখিস বাবা, অনুরোধ রাখিস। সাতটা দিন শুধু অপেক্ষা কর। তোর চুরির জন্যে এর মধ্যে আমি ভাল ভাল জিনিস এনে রাখব।"

"লোভ দেখাবেননি বাবু। দুগগা, দুগগা। শুয়ে পড়ুন।"

সাধু শুয়ে পড়ল। অহিদা নিজের ঘরে ঢুকতেই অহিদার স্ত্রী ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, "তুলে নিলুম।"

'সে আবার কী?'

'অপদার্থ বলেছিলুম, তুলে নিলুম। একটা কাজের মত কাজ করেছ। লোকটা যেমন ভদ্র, তেমনি চটপটে। কাল সকালে চায়ের জন্যে খোঁচাখুঁচি করে ঘুম ভাঙাবে না।'

অহিদা শুয়ে পড়লেন। কানটা সজাগ। ভয়! 'খুটখাট শব্দ হলেই লাফিয়ে গিয়ে ধরব। এবার তুমি চোর!' হাই উঠল। ঘুমোলে চলবে না। পাশের ঘরেই চোর। আবার হাই। মনে মনে বললেন, 'পালাসনি সাধু!'

রাত অনেক। নিস্তব্ধ বাড়ি। অহিদার নাক ডাকছে।

উপন্যাস

নরেন্দ্রর দলবল

নবেন্দু এতক্ষণ কোমরে হাত রেখে গম্ভীর চালে আমাদের কাজকর্ম সুপারভাইজ করছিল। হোল্‌ডলের বেল্টটা নিচু হয়ে দুবার টেনে দেখে বললে, 'আর একটু টান হবে, আরও দুঘর যাবে।' পরেশ বললে, 'নে নে, ওই যা হয়েছে যথেষ্ট। এটা তো একটা গন্ধমাদন হয়েছে রে! কী নেই এর ভেতর! পুরো একটা রাজত্ব।'

নবেন্দু পরেশের কথায় কানই দিল না। নিজের মনে গজগজ করতে লাগল, যত সব অপদার্থ, একটা বেডিং পর্যন্ত বাঁধতে পারে না, বাইরে বেড়াতে যাবার শখ। আয় তো অপূর্ব! এতক্ষণের পরিশ্রমে পরেশের কপাল ঘেমে গেছে! হাতের তালুর উল্টো পিঠে ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'তুই যদি আর একটা ঘর কমাতে পারিস, আমি এইখানে একহাত নাক-খত দেবো।'

অপূর্ব ঘরের কোণে ফার্স্ট-এড বক্‌স সাজাচ্ছিল, নবেন্দুর ডাকে উঠে এল। পরেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'তুই পালোয়ানের কেরামতিটা একবার দেখা যাক্‌।' নবেন্দু পরেশের দিকে একবার বাঁকা চোখে তাকাল, কোনো কথা বলল না। নবেন্দুর স্বভাবে কথা কম, কাজ বেশি। সোজা কথা, স্পষ্ট সোজা ভাবে বলে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ তার চরিত্রে লেখা নেই। রাগে কম। যখন রাগে তখন রক্ষে নেই, তখন হাতটাই বেশি চলে।

পরেশের চ্যালেঞ্জে তার টকটকে ফর্সা মুখটা একটু লাল হল, জ্বলজ্বলে বড়বড় দুটো চোখে একটু আগুন জ্বলল। নবেন্দু হোল্‌ডলটা খুলে ফেলল। আমাদের পাঁচ জনের বিছানা, পাঁচটা পাতলা তোষক, যতই পাতলা হোক একসঙ্গে বেশ পুরু হয়েছে, তার সঙ্গে হাওয়া দিয়ে ফোলানো যায় এমন পাঁচটা রবারের চোপসানো বালিশ, দুফেটি মোটা দড়ি, দুটো খেঁটে লাঠি, দুটো রেনকোট, পাঁচ জোড়া গ্লাভস, পাঁচটা চাদর, পাঁচখানা মশারি, একটা শিল-নোড়া, সব একসঙ্গে ছিটকে বেরিয়ে এল।

পরেশ এতগুলো জিনিস একসঙ্গে ঠিক ম্যানেজ করতে পারেনি,

কোনোরকমে জড়িয়ে-মড়িয়ে, যা হোক করে বেঁধেছিল। নবেন্দু সেই ছত্রাকার রণাঙ্গনে দু'মিনিট থমকে দাঁড়িয়ে রইল। ঠিক আর ঠিক সেই সময় আলুথালু অবস্থায় ঘরে এসে ঢুকলো অপর্ণা, নবেন্দুর ছোট বোন; হাতের ট্রেতে পাঁচটা বিশাল বাটিতে ফুলকো করে চিঁড়ে ভাজার সঙ্গে, চীনে বাদাম আর কুচো পাঁপড়ের মিশেল।

অপর্ণাও দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘরে অজস্র ছড়ানো জিনিসের মধ্যে পাঁচটি অসহায় প্রাণী হাবুডুবু খাচ্ছে। সাবধানে ঘরের মধ্যে পা বাড়িয়ে অপর্ণা বললে, 'যাচ্ছিস তো মধুপুর, দেখে মনে হচ্ছে এভারেস্ট জয় করতে যাচ্ছিস। এখন দয়া করে খেয়ে উদ্ধার কর।'

দুপুর থেকে কসরত চলছে। সন্ধে প্রায় গড়িয়ে এল। খিদেও পেয়েছিল। পাঁচটি প্রাণী লাফিয়ে উঠে হাত বাড়ালো। আমাদের মধ্যে প্রাণেশটা চিরকালই একটু উটমুখো। একদিকে পা ফেলতে আর এক দিকে ফেলে। প্রাণেশের পা লেগে হ্যারিকেনটা ফুটবলের মত ছিটকে অপর্ণার পায়ের কাছে পড়ে চিমনিটা কুটিফাটা হয়ে গেল।

প্রাণেশ একটু অপ্রস্তুত হয়ে করুণ গলায় বললে, 'দেখতে পাইনি রে।' পরেশ বললে, 'ছোটোখাটো জিনিস কোনো কালেই তো তোমার চোখে পড়ে না। হাতি ছাড়া তুমি কিছুই দেখতে পাও না। বিশেষ করে খাবার গন্ধ পেলে তোমার একটা ইন্দ্রিয়ই এত প্রবল হয়ে ওঠে যে, অন্যগুলোর ফাংশান স্টপ হয়ে যায়।'

প্রাণেশের অপ্রস্তুত ভাবটা অপর্ণাই কাটিয়ে দিল। 'ওর কি দোষ! সারা ঘরে পা ফেলার এক ইঞ্চিও জায়গা নেই, মানুষ যায় কোথা দিয়ে!' প্রাণেশ যেন একটু বল ফিরে পেল, 'দেখ না, বেলা একটা থেকে এই চলেছে।' নবেন্দু আবার হোল্ডলটা নতুন করে খুলে ফেলল। বাটিগুলো এতক্ষণে আমাদের হাতে এসে গেছে। তোফা মুচমুচে চিঁড়ে ভাজা, অল্প আদা পেঁয়াজের কুচি মেশানো।

একটু রাত গড়ালেই আরো একটা জিনিস আসবে। মাঝারি সাইজের

পোর্সিলেনের বাটিতে ঠাণ্ডা জমাট ক্ষীর মৃদু গোলাপের গন্ধযুক্ত। নবেন্দুদের বাড়িতে পাঁচ পাঁচটা জার্সি গরু, অঢেল দুধ, ঘি, ছানা, ননী, ক্ষীর। নবেন্দুর ঠাকুমা মাঝে মাঝে আমাদের রসিকতা করে বলেন, 'আমার গোয়ালে পাঁচটা চারপেয়ে আর ঘরে পাঁচটা দু'পেয়ে।'

নবেন্দুর বোধ হয় ঝাল লেগেছিল, খ'ড়া ধারালো নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। অপর্ণা বেরিয়ে যেতে যেতে বললে, 'সবই তো নিয়েছিস, কিছুই বাকি নেই, কেবল একটা তোলা উনুন হলেই হয়। বলিস তো ঠাকুমার উনুনটা এনে দি, হোল্‌ডলে ঢুকিয়ে নে।' নবেন্দুর মুখে তখন একমুখ চিঁড়ে। ভরা মুখে সে ধমকে উঠল, 'যা যা, তোকে আর বেশি পাকামো করতে হবে না।' অপর্ণা কথাটা শুনেও শুনল না, বরং আর একটা টিপ্পুনি দূর থেকে ছুঁড়ে দিল, 'তোরা তো আবার দুধের বাছা, একটা গরুও তাহলে সঙ্গে বেঁধে নিয়ে যা, সন্ধেবেলা সকলে মিলে দুধ খাবি।'

বেশ তারিয়ে তারিয়ে আমরা মুচমুচে চিঁড়ে ভাজা খেয়ে; জামার আস্তিনে মুখ মুছে আবার বাঁধা-ছাঁদায় লেগে গেলুম। নবেন্দু সত্যিই অসাধারণ। হোল্‌ডলটাকে অপূর্বর সাহায্যে সে ঠিক কায়দা করে ফেলল। স্ট্যাপটাকে সে শুধু এক ঘর সরালো না, চার চারটে ঘর সহজেই কমিয়ে দিয়ে বেশ টাইট করে ফেলে গম্ভীর গলায় পরেশকে বলল, 'সবকিছুই একটু যত্ন করে করতে হয় বুঝলি পরেশ, বেগার ঠেলায় কিছু হয় না।'

পরেশকে একটু যেন ম্লান দেখাল। আমাদের দলে পরেশটা চিরকাল একটু ফাঁকিবাজ। আমাদের ক্লাবের কি একটা ফাংশানে একবার একটা বাঁশের দরকার হয়েছিল। কোথায় পাওয়া যায়! গ্রামের শেষ সীমায় দত্তদের একটা বাঁশঝাড় ছিল। দলবল চলল বাঁশ কাটতে, পরেশও সেই দলে। নবেন্দুই বাঁশ পাতার খোঁচা উপেক্ষা করে কয়েকটা বাঁশ ঝাড় থেকে কেটে নামাল। এইবার বয়ে নিয়ে যাবার পালা। বাঁশের লিকলিকে ডগার দিকটায় পরেশ। মাঝে

আমি। গোড়ার দিকে কখন নবেন্দু, কখন অপূর্ব। মাইল তিনেক হাঁটা পথে পরেশ বাঁশের পুরো ভারটা আমার কাঁধে ছেড়ে দিয়ে ডগার দিকে কাঁধ ঠেকালো কি ঠেকালো না, গান গাইতে গাইতে সারাটা পথ এল। এই হল পরেশ—তবুও। পরেশ আমাদের প্রিয় বন্ধু।

নবেন্দু বললে, 'ফ্রেণ্ডস, আমাদের কাজ আপাতত শেষ। সবই প্রায় গোছানো হয়ে গেছে। নাউ ডিসপার্স। এখন স্নান,এখন বিশ্রাম। কাল সকালে স্টার্ট। আমরা ঠিক আটটার সময় বেরোবো। মনে থাকে যেন।'

অপূর্ব বললে, 'চল-না নবেন্দু আমরা সবাই মিলে এই সন্ধের অন্ধকারে দল বেঁধে স্নান করে আসি।' নবেন্দু ঠোঁটে আঙুল রেখে কিছুক্ষণ ভাবল; তারপর বলল, 'নট এ ব্যাড আইডিয়া। চলো তাহলে।' দলপতির নির্দেশ পেলে আমরা সব সময় রেডি। এ-যেন এক ক্ষুদে সামরিক দল।

কোমরে গামছা বেঁধে আমরা সারি সারি বেরোচ্ছি, ঠাকুমা তখন চওড়া লাল রকে বসে মালা ঘোরাচ্ছিলেন। তুলসীতলায় সবে প্রদীপ দেখানো হয়েছে। মালা ঘোরানোর ফাঁকেই আমাদের হেঁকে বললেন—'এই ছেলের দল, একটু পরেই সব আসবি, তোদের কিলোবো।' ঠাকুমার কিলোনো আমাদের জানা আছে, পেটে খেলে পিঠে সয়। অপর্ণাই বোধহয় তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়েছিল, গোয়ালের দিক থেকে ধোঁয়া ওঠা একটা ধুনোচি আনতে আনতে বলল, 'সন্ধেবেলা গঙ্গায় চান করতে যাচ্ছ যাও, আমি কিন্তু মাকে বলে দেবো, তারপর বুঝবে ঠেলা।' নবেন্দু বললে, 'তোকে আর বেশি পাকামো করতে হবে না, অয়েল ইওর ওন মেশিন।'—'ঠিক আছে তোমাদের মেশিনে মা-ই অয়েল দিয়ে দেবেন।' অপর্ণা ঘরে ঘরে ধুনো দিতে চলে গেল। আমাদের সকলের নাকেই একটা মিষ্টি চন্দনের গন্ধ এসে লাগল। সামনেই পশ্চিমের আকাশে তখন সন্ধ্যার

সেই অনেক দিনের বড় তাম্রাটা জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। উঠোনের এইপাশে জুঁই ফুলের গাছটা ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেছে, যেন অসংখ্য মায়ের মুখের ছোট ছোট নাকছাবি।

বাড়ির থেকে দু'কদম হাঁটলেই প্রাচীন কালের গঙ্গার ঘাট, রাধা-গোবিন্দের মন্দির, শিব মন্দির। রাধা গাবিন্দের মন্দিরে সন্ধ্যার আরতি শুরু হয়েছে। ঘণ্টা বাজছে। মৃদু মিষ্টি একটানা আওয়াজ। গঙ্গা একেবারে কূলে কূলে ভরা। ঘাটের কিনারায় জল ছলকে লাগার আওয়াজ উঠেছে। ওপারে জুট মিলের সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। ঘাটের কাছ দিয়ে ধীরে ধীরে একটা নৌকা পাল তুলে ভেসে চলেছে। উদাস মাঝি হালে বসে আছে। পশ্চিমের আকাশের গায়ে যেন কালো রঙের আঁকা একটা ছবি।

নরেন্দু আমাদের সতর্ক করে দিল, 'একদম নিঃশব্দে স্নান সেরে নাও। একদম ঝাপাই জুড়বে না।' নিস্তব্ধ এই সন্ধ্যায় প্রকৃতি যেন ধ্যানে বসতে চলেছে। কোনোরকম শব্দ করে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করা চলবে না। যেমন নির্দেশ, শীতল কালো জলে ডুব দিয়ে আমাদের শরীর জুড়িয়ে গেল। জলে ডুব দিয়েও আমরা যেন বহুদূর থেকে ঘণ্টার শব্দ শুনতে পেলুম। জল ছলকে ছলকে যেন রাতের প্রার্থনার মত কী এক সঙ্গীতে মত্ত।

নরেন্দুদের বাড়িতে অনেক দিন ধরে একটি প্রথা চলে আসছে— সন্ধ্যায় সমবেত প্রার্থনা। হলঘরে সাবেক আমলের একটা অর্গান আছে। নরেন্দুর মা খুব সুন্দর অর্গান বাজাতে পারেন। আমরা যখন গঙ্গা থেকে চান সেরে বাগানের পথে ফিরছি তখনই কানে এল অর্গানের মিষ্টি সুর। নরেন্দু বললে, 'পা চালিয়ে চল, প্রেয়ার শুরু হয়ে গেছে'।

বিশাল হল ঘর। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা। দেয়ালে বড় বড় অয়েল পেন্টিং, বাঘের মাথা, হরিণের ঝ্যাকড়া শিং। নরেন্দুর ঠাকুরদা হাইকোর্টের জজ ছিলেন। তাঁর আমলে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি এই

হলঘরে আসর জমাতে আসতেন শুনেছি। ঘরের একটা কোণে লাইব্রেরি, বড় বড় বই-ঠাসা আলমারি। নবেন্দুর ঠাকুরদা আবার একজন বড় শিকারী ছিলেন দেয়ালে তাঁর একটা বড় অয়েল-পেন্টিং ঝুলছে। ছবিটা এতই জীবন্ত, মনে হবে ছবি ছেড়ে সুদীর্ঘ পুরুষটি বুঝি এখনই কার্পেটের উপর নেমে এসে আমাদের মাঝে বসবেন।

প্রার্থনার সময় ঘরের সমস্ত চড়া আলো নিবিয়ে দিয়ে একধরনের ঘষা কাঁচের ডোমে ঢাকা আলো জ্বেলে দেওয়া হয়। সারা ঘরে একটা পাথুরে আলো ছড়িয়ে পড়ে। মনে হয়, মার্বেল পাথরের ঘরে একদল মার্বেল পাথরের মূর্তি স্থির হয়ে বসে আছে, আর উদাত্ত গানের সুর ধূপের ধোঁয়ার মত পাকিয়ে পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নবেন্দুর মা অর্গান বাজিয়ে তখন গাইছিলেন, 'আপনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে'; আমরাও সকলে গলা মিলিয়ে গাইতে শুরু করলাম। নবেন্দুর গলা যেমন মিষ্টি তেমনি চড়া। পরেশের গলা একটু ভাঙা ভাঙা। চড়ার দিকে সে আর সাহস করে গাইছিল না। অপূর্বর গলাও বেশ ভাল। পরের গান 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্র তপন'।

প্রার্থনা শেষ হবার পর আমরা সকলে একতলার ছাদে এসে মাদুর পেতে বসলাম। আকাশে তখন চাঁদ উঠেছে। ভিজে ভিজে হাওয়া বইছে। ছাদেও একটা সুন্দর বাগান। লতানে অপরাজিতা একটা মাচার উপর ডালপালা মেলে হাওয়ায় দুলছে। তলায় চাঁদের আলোর ছায়া কাঁপছে।

কারুর মুখেই কোনো কথা নেই। সকলকেই যেন প্রকৃতি স্তব্ধ করে দিয়েছে। এমনকি অপর্ণা যখন আমাদের জন্যে ঠাকুমার 'কিল' নিয়ে এল, তার কথায়ও কোনো চপলতা নেই। চকচকে ট্রেটা আমাদের মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে শান্ত পায়ে চলে গেল। আমরা সকলে ঝুঁকে পড়লাম। কুলফি মালাই। গায়ে পেস্তার ছিটে। ভুরভুরে গোলাপের গন্ধ। খাঁটি দুধের ক্ষীর দিয়ে তৈরি।

এক একটা টুকরো জিভের উত্তাপে গলে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। পরেশ শুধু বললে, 'এমন জিনিস আগে কখনও খাইনি'। অপূর্বর শুধু একটি কথা, 'কী অপূর্ব'।

সকালবেলা আকাশটা আবার একটু মেঘলা মেঘলা করেছে। বৃষ্টি হবে নাকি! হলেও কিছু করার নেই। ঠিক দশটার মধ্যে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছোতে হবে। সাড়ে দশটায় ট্রেন। দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে। অবশ্য ভাবনার কিছু নেই, নবেন্দুদের গাড়িতে যাওয়া হবে।

মাকে বলাই ছিল। ভোর ভোর উঠে সব কাজ সেরে নিতে হবে। খাওয়া নবেন্দুদের বাড়িতে। আমরা সকলে একসঙ্গে খেয়ে-দেয়ে টুক্ করে গাড়িতে উঠে বসব। কিঁ মজা! মেঘলা আকাশ হলেও যাবার আনন্দে মন নেচে উঠল। নবেন্দুর নির্দেশ, আমরা সকলেই স্কাউটের পোষাক পরে যাবো। স্নান করে, বাবার ছবিতে প্রণাম করে, মাকে প্রণাম করে দুগ্‌গা বলে বেরিয়ে পড়লুম। বেরোবার মুখে আমাদের কুকুব ভুলো বসেছিল। আমাকে দেখে ল্যাজ নেড়ে একটু রসিকতা করল। ভুলোটা ওই রকমই। ঠিক যেন মানুষের মতো। চোখের দিকে তাকালে মনে হয় হাসছে। সব জানে, সব বোঝে, কেবল কথাটাই যা বলতে পারে না। ভুলো আবার অঙ্কও জানে।

একদিন দুপুরে ঘরে বসে অঙ্ক করছি। ভুলো থাবার উপর মুখ রেখে বসে আছে সামনে, যেন কিছুই জানে না। সরল করাটা চির-কালই আমার একটু কেমন হয়ে যেত। হয় শূন্য কিংবা এক উত্তর হবে, আমি যত সাবধানেই করি না কেন, শেষকালে পূর্ণ-ফুর্ণ দিয়ে একটা বিদ্‌ঘুটে উত্তর হয়ে যেত। নিয়মটা জানাই ছিল—BODMAS, অর্থাৎ আগে ব্রাকেট, তারপর অফ, তারপর ডিভিশান, মাল্টিপ্লিকেশান, অ্যাডিসান, সাবট্রাকসান। সেদিনও সেই ভাবে করছিলাম, তবে অজস্র অঙ্কের ভীড়ের মধ্যে কিভাবে ভাগের আগেই গুণ করতে শুরু করেছিলাম, ভুলো অমনি ফ্যাক করে হাতটা কামড়ে ধরল। অঙ্কটা

ভুল হতে হতে বেঁচে গেল। উত্তর হল শূন্য।

ভুলোটা আবার শয়তানও ছিল। একদিন পড়ার বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম। ভুলো চুপি চুপি মাকে ডেকে এনে ধরিয়ে দিলে। বই গেল। প্রহারও হল। সাতদিন ভুলোর সঙ্গে রেগে কথা বললুম না। তারপর ভুলো একদিন নিজে এসেই ভাব করল। সামনে এসে চুপ করে বসল, তারপর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। কেউ কাঁদলে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। ভুলোর সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। নিজে হাতে গোটা দুই বিস্কুট খাইয়ে দিলুম।

নবেন্দুর বাড়িতে যখন পৌঁছোলুম তখন নটা বেজে পাঁচ। সকলেই এসে গেছে। খাবার টেবিলে প্লেট পড়েছে। নবেন্দু বললে, 'বসে পড়, বসে পড়, আর দেরি নয়'। অপর্ণা জল দিচ্ছিল, বললে, 'যতটা পারিস একসঙ্গে খেয়ে নে! কতদিন যে খাওয়া জুটবে না। এক মাসের খাওয়া একসঙ্গে খেয়ে নিতে পারবি দাদা!' পেটুক পরেশ যেন একটু ঘাবড়ে গেল। মুখটা করুণ-করুণ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি রে নবেন্দু, না খেয়ে মরতে হবে নাকি! মধুপুরে দোকান-পাট নেই। সবটাই কি গভীর জঙ্গল!' নবেন্দু কিছু বলার আগে অপর্ণাই বলল, 'তোমাদের খাবার জন্যে অনেকে আছে, তোমাদের খাবার কিছু মিলবে বলে মনে হয় না। এক ওয়াগন শুকনো চিঁড়ে আর ভেলি গুড় নিলে তবু প্রাণটা বাঁচত।' অপর্ণা মার ডাকে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পরেশের আবার প্রশ্ন, 'আমাদের কে খাবে রে নবেন্দু?' পরেশটা জীবনে গ্রামের বাইরে পা দেয়নি। তার ধারণা, খুব বড় বড় শহর ছাড়া ভারতবর্ষের অধিকাংশ জায়গাই গভীর অরণ্যের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে। সেখানে বাঘ ভাল্লুক কুমীর বড় বড় ময়াল সাপ তার জন্যে ওঁত পেতে বসে আছে। ভাঙা মন্দিরে মাঝ রাতে টিমটিমে আলোর সামনে কাপালিকরা রোজই নরবলি দিচ্ছে। অপূর্বই পরেশের প্রশ্নের উত্তর দিলে, 'কে আর খাবে! গোটা কতক বড় বড় কেঁদো বাঘ আছে তাদেরকেই একটু সামলে চলতে হবে।

তোর মতোই খাইয়ে সব। কোনো কিছু বাছবিচার করে খেতে শেখেনি। গরু ছাগলের অভাব হলে টপাটপ মানুষ খেয়ে জলযোগ করে, এই আর কি!' পরেশ দেখলুম বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে বললে, 'মার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই ভাই। আমি না হয় নাই গেলুম।' নবেন্দু এতক্ষণ ফুলদানিতে ফুল সাজাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়িয়ে এক ধমক লাগাল, 'ইডিয়েট, তোর লজ্জা করে না? তুই না পুরুষ মানুষ! মধুপুর কোথায় জানিস?' পরেশ ঘাড় নাড়ল, জানে না। নবেন্দু নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল,'তা জানবে কেন? ভূগোলে তো ওই জন্যই চিরকাল গোল্লা পাও'। আমি একটু উসকে দিলুম, 'মধুপুর হল উত্তমাশা অন্তরীপের কাছে একটা গভীর বন। সেখানে দিনের বেলা হ্যারিকেন জ্বেলে গাছের ডাল কেটে কেটে পথ করে এগিয়ে যেতে হয়। গাছের ডালে ডালে অসংখ্য রক্তচোষা বাদুর মাথা ঝুলিয়ে দোল খায়। মানুষ দেখলে ঝপ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে, পরেশ যে ভাবে আইসক্রীম খায় সেইভাবে ঘাড় থেকে রক্ত শুষে নেয়?' বাকিটা আমায় আর বলতে হল না। অপর্ণা মাছভাজা নিয়ে ঢুকছিল—সেই বললে, 'দু-একটা প্রাগৈতিহাসিক জীব যেমন ডায়নাসোর, বোডাকটিল এখনো সেখানে আছে, তারা পরেশদা যে ভাবে মুরগীর ঠ্যাং চিবোয় সেইভাবে আস্ত মানুষ মুখে পুরে চোখ বুজিয়ে মৌজ করে চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।' অপর্ণার হাতে ইয়া বড় বড় মাছের দাগা দেখে পরেশের ভয় তখন অনেকটা কেটে গেছে। একগাল হেসে বলল, 'বাঃ তোরা ইয়ারকি করছিস। মধুপুরে তোদের বাড়ি আছে। কাকাবাবু তো মাঝে-মধ্যেই যান, একজন মালী তো সারাবছর সেখানে থাকে।' অপর্ণা মাছভাজা পরিবেশন করতে করতে বলল, 'যাও-না গেলেই বুঝবে কত ধানে কত চাল!'

খাওয়াটা খুব জোর হয়ে গেল। শুয়ে পড়তে পারলেই ভাল হয়। পরেশ তো এইসা খেলো, ভয় হচ্ছিল ওর পেটটা না ফেটে যায়। নবেন্দু একবার ঘাবড়ে গিয়ে পরেশকে বাধা দিতে গিয়েছিল।

পরেশ খুব করুণ গলায় বললে, 'ভাই, বাধা দিসনি, এত সুন্দর রান্না হয়েছে নিজেকে সামলে রাখতে পারছি না।' অপূর্ব বললে, 'পেট খারাপ হলে কে দেখবে!' পরেশ ম্লান মুখে বললে, 'ওইটা যে আমার কিছুতেই হতে চায় না রে। আমার পেটে যে কি আছে, খালি খিদে পায়। মা বলেন আমি নাকি খেয়ে খেয়েই সংসারটাকে উচ্ছন্নে পাঠালুম।' পরেশ শেষ এক গেলাশ জল খেয়ে একটা পেল্লায় ঢেঁকুর তুলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেল, কারণ নবেন্দুর বাড়িতে জোরে হাঁচা, শব্দ করে ঢেঁকুর তোলাকে অসভ্যতা বলা হয়। পরেশ আমাদের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু মুখে বললে, 'চাপতে পারলুম না রে।' অর্পণা সেই সময় ঘরে ছিল, হেসে বললে, 'আমাদের বাছুরটা ঠিক ওইভাবে ডাকে।'

বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। মালপত্র সব উঠে গেছে। গুরুজনদের প্রণাম করে আমরা একে একে উঠলাম। ঠাকুমা দাড়ি ধরে আমাদের প্রত্যেককে চুমু খেয়ে বললেন, 'সাবধানে থাকিস, বেশি বীরত্ব দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়িসনি।' অপর্ণা দরজার পাশেই দাঁড়িয়েছিল, ভেবেছিলুম অনেক কিছুই বলবে, কিন্তু একটা কথাও বলল না। আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু, চোখ দুটো মনে হল জলে টল টল করছে।

গাড়িটা সাবেক আমলের, বেশ বড়। শুনেছি ইঞ্জিনটা নাকি অসাধারণ। কোনো শব্দ নেই, বিশ্বাসী কুকুরের মতোই দীর্ঘদিন এই পরিবারের সেবা করে আসছে। পেছনের সিটে আমরা চারজন, সামনে ড্রাইভারের সিটের পাশে বসেছেন প্রফুল্লদা। এই বাড়িতে অনেকদিন কাজ করছেন। বিশাল চেহারা। গায়ে অসুরের ক্ষমতা। শুনেছি এক সময় নাকি ডাকাত দলের সর্দার ছিলেন। এখন ভাল হয়ে গিয়ে আমাদের অভিভাবকের মত, আমাদের বিশ্বাসী বন্ধুর মতো প্রফুল্লদা সঙ্গে চলেছেন। আমাদের হাওড়ায় ট্রেনে তুলে দিয়ে আবার ফিরে আসবেন। গাড়িটা ছাড়ার মুখে পরেশ আর একটা

বিশাল ঢেঁকুর তুলল। এবারে আর বাছুরের ডাক নয়, অনেকটা ঝড়ের কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের গুড়ু গুড়ু। গাড়ির স্টার্ট পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। প্রফুল্লদা ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'পেটে কি পুরেছো? বিদ্রোহ শুরু করে দিয়েছে মনে হচ্ছে!' অপূর্ব বললে, 'বিশেষ কিছু নয়। ঘাটের কাছে যে বড় রুই মাছটা ঘুরতো, মাথা সমেত তার আধখানা, এক বিঘে জমির ধান থেকে তৈরি চাল, আর পাঁচ পোয়াটাক দই।' প্রফুল্লদা বললেন, 'নিজেকে এত কষ্ট দিলে কেন?' 'কষ্ট!' অপূর্ব হাসল, 'উপায় ছিল না, ও একেবারে একমাসের র‍্যাশান লোড করে নিয়ে চলেছে।'

গাড়ি আবার স্টার্ট নিল। পরেশ কোণের দিকে মুখ টিপে বসে আছে। আর কিছুতেই ঢেঁকুর উঠতে দেবে না। এবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেলে নবেন্দু গাড়ি থেকে নাবিয়ে দেবে। নবেন্দু সকাল থেকেই অসম্ভব গম্ভীর। কথা খুব কম বলছে। নবেন্দুকে সময় সময়, বিশেষ করে এই রকম সময়, বয়স্ক লোকেদের মত দেখায়। কোথা থেকে একটা অসম্ভব ব্যক্তিত্ব ওর উপর জাঁকিয়ে বসে। নবেন্দু চিরকালই একটু খেয়ালী। কখনও বিশাল সবুজ মাঠে সাদা সাদা কান লোটা লোটা ছাগল ছানার সঙ্গে আপন মনে দিক্ বিদিক্ দৌড়োদৌড়ি করে খেলা করে। কখনও পাতার পর পাতা অঙ্ক কষে বই শেষ করে ফেলে। কখনও বসে বসে আপন মনে ছবি আঁকে।

দেখতে দেখতে গাড়ি শ্যামবাজার মোড়ে এসে পড়ল। পরেশটা এতক্ষণ ঢুলছিল। সকালের শহরের ভীড়, গাড়ি, ট্রাম, সাজানো দোকান দেখে জানালার কাঁচে নাক ঠেকিয়ে খাড়া হয়ে বসল। আমাকে ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করল, 'কাঞ্চন, এইটা কলকাতা না কি রে?' 'তোর কি মনে হয়?' পরেশ কিছুক্ষণ গুম্, তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বাপ্‌স, কী ব্যাপার রে! এখানে লোকের পথ চলতে ভয় করে না?'

'ওরা তো গ্রামের লোক নয় যে ভয় করবে, ওরা সব শহরের

মানুষ। শহরের কায়দা কানুন সব জানে।'

'দিন কতক পরে আমরাও এখানে কলেজে পড়তে আসব, কি বলিস্। বিশ্ববিদ্যালয়টা কোন দিকে রে?'

'ওদিকে। সে দিকে আমরা যাবো না।' পরেশ হঠাৎ হৈ হৈ করে উঠলো, 'ওই দেখ কাঞ্চন, আকাশের গায়ে একটা বিশাল ক্রেন!' এইবার মাথায় গাঁট্টা! 'গবেট, ওটা ক্রেন নয়, ওটা হাওড়ার ব্রিজ।' পরেশ সামনের উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে হাঁ করে ব্রিজের দিকে তাকিয়ে রইল।

হাওড়ার পোলের উপর আমাদের গাড়ি নাকটা ঢুকিয়েই নিশ্চল হয়ে পড়ল। কি ব্যাপার কে জানে! সারা পোল জুড়ে এধারে ওধারে সারি সারি গাড়ি দাঁড়িয়ে। মাঝের একসার ট্রাম ঠ্যাঙ উঁচু করে স্থির। কারুরই কোনো যাবার গরজ নেই। প্রফুল্লদা সামনের জানালা দিয়ে মাথাটা বের করে একবার দেখলেন। কিছু বুঝতে পারলেন বলে মনে হল না। বরং বেশ নিশ্চিন্তে পকেট থেকে একটা গালমতো টিনের কৌটো বের করে বিড়ি ধরালেন! ড্রাইভার সাহেবের পকেট থেকে বেরোলো সরু চোঙা মতো একটা কৌটো সঙ্গে চ্যাপ্টা মতো ছোটো একটা বাচ্চা কৌটো। বড়টায় আছে দোক্তা পাতা, ছোটোটায় চুন। হাতের তালুর উপর দুটোকে ফেলে দলাই মলাই। চোখে একটা ভাবালু উদাস দৃষ্টি। একজন মৌজ করে বিড়ি ফুঁকছেন, অন্যজন খইনি দলছেন। জগৎ যেন চলতে চলতে হঠাৎ গতি হারিয়ে ফেলেছে।

এদিকে আমরা মনে মনে ছটফট করছি। ট্রেন ধরতে হবে। ট্রেন শেষে ছেড়ে না দেয়! নবেন্দু একটু উসখুস করে জিজ্ঞেস করল —'হল কি?'

ড্রাইভার সাহেব দু আঙুলে চিমটি করে দাঁত আর ঠোঁটের ফাঁকে খইনি গুঁজে নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল—'হুয়া কুছ্'। প্রফুল্লদা আর একবার মাথাটা বের করলেন। পাশ দিয়ে এক ভদ্রলোক

শরীরের চারদিকে মালপত্র ঝুলিয়ে একটি ছেলের হাত ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছিলেন। প্রফুল্লদার মুণ্ডু প্রশ্ন করল—'কি হয়েছে মশাই ?' ভদ্রলোক গতিবেগ কিছুমাত্র না কমিয়ে অনেকটা দূর থেকে বললেন —'গুষ্টির পিণ্ডি'।

'বাবা, কী মেজাজ !' প্রফুল্লদা মাথা ঢুকিয়ে নিলেন।

পরেশ হাঁ করে খানিক গঙ্গার হাওয়া খেয়ে বললে, 'যাই বলিস, বেশ লাগছে কিন্তু।' অপূর্ব বললে, 'তা তো লাগবেই। এদিকে মধুপুরের বারোটা। নির্ঘাত ট্রেন ফেল।'

আমার আবার পোল-টোলের উপর বেশিক্ষণ থাকতে অস্বস্তি লাগে। যদি ভেঙে পড়ে যায়! বলা তো যায় না। আমার ভয়টা পরেশের কানে কানে বলতেই পরেশের মুখ শুকিয়ে গেল। নবেন্দুর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, 'চল আমরা দৌড়ে ওপারে চলে যাই।'

'পরেশটা কি বলছে রে ?' অপূর্ব জানতে চাইল।

'বলছে, পোলটা যদি ভেঙে পড়ে যায়! চল আমরা দৌড়ে ওপারে চলে যাই'—আমি ভাল মানুষের মতো মুখ করে বললুম। পরেশকে একটু অপ্রস্তুত করার জন্যেই বললুম।

প্রফুল্লদা ঘাড় না ঘুরিয়ে আর একটা ভয় তৈরি করে ফেললেন, 'পোলের উপর দৌড়োবে! বল কি ? দৌড়োলেই পুলিশে ধরবে। পোলের উপর দৌড়োদৌড়ি চলে না, বুঝেছো! এটা তোমার গ্রামের সাঁকো নয়, এর নাম হাওড়ার পোল।'

নবেন্দু বাঁ দিকের দরজা খুলে রাস্তায় নেমে ফুটপাথের উপর উঠে দাঁড়ালো। বেশ চিন্তিত। সত্যিই চিন্তার কথা। আধঘণ্টা হয়ে গেল। উল্টো দিক থেকে এক ভদ্রলোক আসছিলেন বেশ ধীরে সুস্থে বেড়াতে বেড়াতে। গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি, মুখে বিশাল চুরুট। নবেন্দু বেশ বিনীত ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি ?' ভদ্রলোক মুখ দিয়ে চিমনির মত ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—'গরু'।

নবেন্দুর ফর্সা মুখ রাগে টকটকে লাল হয়ে উঠল। 'গরু মানে? ভদ্রভাবে একটা প্রশ্ন করলুম আর আপনি আমাকে গরু বললেন! হোয়াট ডু ইউ মিন!' দলবল আমরা তখন রাস্তায় নেমে পড়েছি। মাথায় থাক মধুপুর। আমাদের দলনায়কের প্রেস্টিজ নিয়ে টানা-টানি! থাক-না মুখে চুরুট হোক না ভারিক্কি চেহারা। তা বলে যাকে তাকে গরু বলে সরে পড়বেন বিনা কারণে, এ কেমন কথা! হয়ে যাক এক হাত। তারপর দেখা যাবে ট্রেন প্লাটফর্মে শেষ পর্যন্ত আমাদের জন্য রইল কি গেল।

ভদ্রলোক উল্টোদিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিলেন, নবেন্দুর চ্যালেঞ্জে ফিরে এলেন। মুখের চুরুটে অনর্গল ধোঁয়া বেরোচ্ছে। নবেন্দুর দিকে হাসি হাসি মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'নবেন্দু না! আমাদের পরেশবাবুর ছেলে। প্রথমে চিনতে পারিনি, তারপর মনে হল গলাটা চেনা চেনা লাগছে। তুমি কত বড় হয়ে গেছো হে!' আমরাও যেমন অবাক নবেন্দুও তার চেয়ে কম নয়। কে এই ভদ্রলোক! আমরা আস্তিন গুটিয়েছিলুম। আবার নামিয়ে নিলুম। ভদ্রলোক তখন হো হো করে হাসছেন, 'চিনতে পারলে না তো?' নবেন্দু চিনতে পেরেছে বলে মনে হল না। আমরা তো চিনিই না। ভদ্রলোক চুরুটটা মুখে পুরতে পুরতে বললেন, 'চিনলে না তো! আমি পার্থর বাবা।' নবেন্দুর মারমুখী ভাবটা সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য হল। টপ্ করে নিচু হয়ে ভদ্র-লোককে নমস্কার করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি নবেন্দুকে তাঁর ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতিতে জড়িয়ে ধরে গদ্‌গদ গলায় বললেন, 'ব্রেভ বয়'। আমরাও নবেন্দুর দেখাদেখি টপাটপ নমস্কার করে ফেললুম। 'তোমার দলবল? আরে ওই দেখ।' ভদ্রলোকের কথায় আমরা তাকিয়ে দেখলুম। হাওড়ার দিক থেকে পালে পালে গরু কলকাতার দিকে এগিয়ে আসছে। একটা আধটা নয়, প্রায় শ দুয়েক। 'গরু' বলার অর্থ এতক্ষণে আমাদের কাছে স্পষ্ট হল! এত গরু ছিল

কোথায়! এল কোথা থেকে! নবেন্দু অবাক হয়ে বলল, 'এত গরু ছিল কোথায়?'

'পাঞ্জাবে ছিল। এসেছে আজ সকালে। চলেছে কলকাতার খাটালে। এক একটা গরু মিনিমাম ২০ লিটার দুধ দেবে দিনে।'

'ও, এই জন্যেই সব রাস্তাঘাট বন্ধ!' নবেন্দু মনে হল এতক্ষণে বুঝেছে।

'যাকগে, তোমরা চলেছ কোথায় সদলে?'

নবেন্দু হেসে বলল, 'কয়েকদিনের জন্যে মধুপুরে যাচ্ছি মেসো মশাই।'

'আই সি।' মধুপুর। মধুপুর ভাল জায়গা হে। ওঃ, সেই কত কাল আগে গিয়েছিলুম! মেসোমশাইয়ের চোখ দুটো কী রকম স্বপ্নময় হয়ে এল মধুপুরের নামে।

'তোমার বাবা কেমন আছেন নবেন্দু?

'ভাল আছেন।' নবেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বলল। বোধহয় ট্রেনের কথা মনে পড়েছে। এ ট্রেনটা যে আমরা ধরতে পারবো না, ঘড়ি অন্তত তাই বলছে। পরে আর কি ট্রেন আছে জানি না।

'তোমাদের ট্রেন ক'টায়?' ভদ্রলোক নেভা চুরুটটা দেশলাই দিয়ে ধরাতে ধরাতে প্রশ্ন করলেন। নবেন্দু সময়টা বলতেই পাঞ্জাবির হাতা উল্টে ভদ্রলোক সময় দেখলেন। 'আর বেশি সময় নেই। তোমরা বরং গাড়ি ছেড়ে কুইক মার্চ করে চলে যাও। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই জ্যাম ক্লিয়ার হতে সময় নেবে।' পরেশটা একটু দূরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখছিল। কুইক মার্চ শব্দটা তার কানে যেতেই করুণ মুখে এগিয়ে এল, 'মালপত্তরের কি হবে মেসোমশাই?'

'মালপত্তর!' পরেশের দিকে তাকিয়ে মেসোমশাই সহজ গলায় হেসে হেসে বললেন, 'ইয়ং ম্যান, ট্রেন যদি ধরতে চাও, মাল মাথায় করে দৌড় লাগাও স্টেশনের দিকে, নো আদার অলটারনেটিভ।'

পরেশের মুখ দেখে মনে হল কেঁদে ফেলবে। বেশ আয়েশ করে ঘুমোতে ঘুমোতে আসছিল। এ কী মহাবিপদ! শ' খানেক গরু আমাদের সুখ গুঁতিয়ে ফেলে দিয়েছে। এখন জগদ্দল মাথায় দৌড়োতে হবে। আমাদের কারুরই এই পরিণতি ভাল লাগছিল না। একটু আধটু মাল নয়। মালের হিমালয় ঠাসা আছে গাড়ির বুকে, আমাদের পায়ের কাছে। এর চেয়ে গাড়িটা মাথায় করে দৌড়োন অনেক সহজ।

নবেন্দুকেও বেশ চিন্তিত দেখাল। সেও বোধহয় একই কথা ভাবছে। ভদ্রলোক তাড়া দিলেন, 'নাও নাও, গেট রেডি, আমি তোমাদের স্টার্ট করিয়ে দিয়ে যাব। জানো, আমি একজন ভালো স্টার্টার। হাওড়ায় যেখানে যত স্পোর্টস হয় সব জায়গায় আমি!' হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন, 'রেডি গেট সেট গোও-ও।' আমরা কেউই দৌড়োলুম না। নন স্টার্টার হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

টর্পেডোর মতো চুরুটটা মুখ থেকে বের করে, ছাইটাই ঝেড়ে পরিষ্কার করে মেসোমশাই একটা খালি দেশলাই বাক্সে ভরে ফেলে বললেন, 'তোমাদের দৌড় শুরু করে দিয়ে আমি এই গাড়িটা নিয়েই অফিসে চলে যাব। বেশি দূরে নয়—এই জি. পি. ও-তে। তোমাদের সঙ্গে কথায় কথায় ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।'

আমরা তখন মহা দ্বিধায় পড়েছি। কি যে করা উচিত ঠিক করতে পারছি না। নবেন্দুর কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ নেই। এমন সময় কানে এল সেই ঘণ্টার শব্দ। দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। দমকল। একটা নয় পর পর দুটো। কলকাতা থেকে হাওড়ার দিকে ছুটছে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে।

দূর থেকে দমকলের ঘণ্টা শুনেই প্রফুল্লদা ড্রাইভারের সিটের পাশে বসেই চিৎকার করে উঠলেন—'কুইক! ঝটপট সব ঢুকে পড়, এই সুযোগ, দমকলের পেছনে পেছনে আমরা বেরিয়ে পড়ব, তা না হলে তোমাদের ট্রেন ধরার বারোটা।' আমরা পড়ি কি মরি করে

গাড়িতে ঢুকে পড়লুম। পরেশটা চিরকালের ল্যাদাড়ুস। গাড়ির চালটা যে নিচু হয় একথা বোধহয় তেড়ে-ফুড়ে ঢোকার সময় ভুলেই গিয়েছিল। মনে পড়ল ধাঁই করে মাথাটা ঠুকে যাবার পর। কপালটা দেখতে দেখতে ছোটো নতুন আলুর মতো ফুলে উঠল। নবেন্দু বললে, 'ঠিক হয়েছে, লাগতে লাগতে যদি একটু আক্কেল হয়।' পরেশের চোখে তখন জল এসে গেছে।

আমাদের ড্রাইভার প্রফুল্লদার চেয়েও ওস্তাদ। দমকলটা গাড়ি আর গরুর জটিল জট ফুঁড়ে বেরোতেই স্টার্ট নিয়ে পিছু ধাওয়া করল। যে লোকটি দমকলের ঘণ্টা বাজাচ্ছিল সে যেতে যেতে আমাদের একটা দাবড়ানি দিল। আমরা তখন মরীয়া। দুপক্ষের তাড়া। দমকল চলেছে আগুন নেভাতে, আমরা চলেছি ট্রেন ধরতে। ইতিমধ্যে আর একটা দমকল তেড়ে এসেছে। প্রচণ্ড ঘটার আওয়াজে গরুগুলো তাদের পরিচালকের হাতছাড়া হয়ে এলোপাথাড়ি ছুটতে শুরু করেছে। একজন ট্রাফিক পুলিশ দৌড়ে আসছিল আমাদের গাড়িটাকে দুটো দমকলের মাঝখান থেকে টেনে বের করে দিতে, কিন্তু সুবিধে করতে পারল না। বিশাল একটা গরুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে, হেই রাম বলে ছিটকে পড়ে গেল। দুটো গাড়ির মাঝখানে স্যাণ্ডউইচ হয়ে আমরা এঁকে বেঁকে এগিয়ে চললুম। প্রফুল্লদার ঠোঁটের বিড়ি উত্তেজনায় টানতে ভুলে গিয়ে নিভে গেছে। আমাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'একে পুরনো গাড়ি, একবার স্টার্ট বন্ধ হলেই পিছনের গাড়িটা আমাদের ছাতু করে দিয়ে চলে যাবে। কোনো কেসই হবে না।' সকলের মুখ শুকিয়ে গেল। পরেশ দেখি আমার ডান হাতটা শক্ত করে চেপে ধরেছে। ভয়ে তার কপালের যন্ত্রণা ভুলে গেছে। ফোলাটাও যেন চুপসে গেছে। ভেবেছিলুম, বেশ বড় সাইজের একটা নৈনিতাল আলু হবে। তা আর হল না।

সবার আগে প্রফুল্লদা। ডান হাতে ঝুলছে সেই ম্যাগনাম সাইজের হোল্‌ডল, যার মধ্যে কি না আছে! খুঁজলে বিশল্যকরণীও পাওয়া যাবে হয়ত। শক্তি বটে একখানা! ওই অতবড় একটা ওজনদার জিনিস এমন অক্লেশে বয়ে নিয়ে চলেছেন যেন ছোটোদের একটা বই রাখা স্যুটকেস। প্রফুল্লদার পেছনে পেছনে আমরাও ছুটছি। ট্রেন ছাড়তে আর মিনিট তিনেক বাকি আছে। প্রথমে আমাদের বলেছিল আট নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে। এখন মাইকে ঝাঁঝাঁ করে বলছে ১২ নম্বর থেকে ছাড়বে। আমরা ছুটছিলুম আটের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে এখন মুখ ঘুরিয়ে আবার বারোর দিকে। সারাটা স্টেশনে যেন তোলপাড় কাণ্ড। প্রফুল্লদার পেছনে নবেন্দু, তার পেছনে আমরা। সবার শেষে পরেশ। একে সে বেচারা প্রচুর খেয়েছে তারপর গাড়িতে বসে বসে বোধ হয় একটু ঘুমিয়েছে। পরেশ যেন আর নড়তেই পারে না। তার উপর হাতে একটা বালতি। বালতির মধ্যে একটা কেরোসিন স্টোভ, তেলের বোতল, সুতুলি দিয়ে ঠেসে টাইট করে বসানো। দলবল তখন বারো নম্বরে ঢোকার বেড়ার কাছে এসে গেছে। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে—আমরা দেখতে পাচ্ছি। এমন সময় আমাদের ল্যাজের দিকে একটা হৈচৈ শুনতে পেলুম। সেই সঙ্গে পরেশের গলা। পরেশ করুণ সুরে বলছে, 'আমি কি করব বলুন! আমার কি দোষ বলুন!' সঙ্গে একটা হেঁড়ে গলা, 'তুমি কি করবে? তোমার কি দোষ? ইডিয়েট, তুমি দেখে চলতে পার না!' পিছন ফিরে ঘটনা দেখে আমাদের চক্ষুস্থির। পরেশের হাতের বালতি প্লাটফর্মে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কেরোসিনের বোতলটা গড়াচ্ছে। ভাগ্য ভাল ভাঙেনি। কিছু দূরে মাটিতে

কাৎ হয়ে পড়ে আছে একটা খাঁচা। দরজাটা খোলা। গোটা দশেক গিনিপিগ দৌড়োদৌড়ি করে বেড়াচ্ছে। অসহায়ের মত মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন খাঁচার মালিক। লম্বা চওড়া এক মানুষ। পরনে কালো স্যুট, টাই। ঘাড় অবধি লম্বা লম্বা চুল। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। গিনিপিগগুলো এদিক ওদিক দৌড়োতে দৌড়োতে ক্রমশই দূরে চলে যাচ্ছে। একটা ফুট-ফুটে বাচ্চা মেয়ে মার হাত ছাড়িয়ে একটি গিনিপিগের পেছনে হৈহৈ করে ছুটে চলেছে। মা ছুটছেন মেয়ের পেছনে—'ডলি ডলি, চলে আয় বলছি, চলে আয় দুষ্টু মেয়ে।' এক ভদ্রলোক হুইলারের স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ম্যাগাজিন দেখছিলেন। এক হাতে ধরা ছিল চেনে বাঁধা একটা বড় সাইজের কুকুর। ভদ্রলোক তন্ময় হয়ে বই দেখছিলেন। কুকুরটা দেখছিল ছুটন্ত গিনিপিগ। কাছাকাছি আসতেই ভৌ-ও বলে বিশাল এক লাফ মারল। আচমকা লাফের জন্যে কুকুরের মালিক প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চিৎপাত হয়ে উল্টে পড়লেন। কুকুর হাতছাড়া হয়ে চেন সমেত সারা প্লাটফর্মে দাপাদাপি শুরু করে দিল। এই হুড়োহুড়ির মধ্যে পড়ে এক বুড়ি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভদ্রমহিলা চিলের মত গলায় চিৎকার শুরু করলেন 'পুলিশ, পুলিশ'। একজন ফাদার আসছিলেন ঝুলো গাউন পরে লম্বা লম্বা পা ফেলে। এক হাতে ধরা সোনালী বাইবেল। কুকুরের তাড়া খেয়ে একটা গিনিপিগ তাঁর কোট কামড়ে ধরে ঝুলছে। ফাদার দাঁড়িয়ে পড়ে বুকে ক্রশ আঁকছেন আর আমেন আমেন বলছেন।

ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক রেগে খাঁচাটায় একটা লাথি মেরে আশপাশে ছড়ানো জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে অনেকটা বিবাদী পক্ষের উকিলের গলায় বললেন, 'এইসব উটমুখো জানোয়ারগুলো স্টেশনে ছাড়া পায় কি করে?' এ প্রশ্নের কে জবাব দেবে! টিকিট কাটলেই স্টেশনে ঢোকা যায়। যে কেউ ঢুকতে পারে। পরেশ এতক্ষণ মাথা নিচু করে অপমান হজম করছিল। জানোয়ার বলায় তার সুপ্ত পৌরুষ

এবার জেগে উঠল। জনতার আদালতের দিকে তাকিয়ে সেও এইবার তার প্রশ্ন রাখল, 'এই সব চিড়িয়াখানা নিয়ে স্টেশনে আসার কি দরকার ছিল! এতবড় একটা খাঁচা নিয়ে সকলকে খোঁচাতে খোঁচাতে উনিই বা কেন দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছিলেন!' ট্রেন ধরার আশা তখন আমরা ছেড়েই দিয়েছি। গার্ডসাহেবের হুইসিল বেজে লাল পতাকা নড়ে গেছে। পরেশের মুক্তির জন্যে আমরা এগিয়ে গেলুম। বেচারা মহা ফ্যাসাদে পড়েছে। নবেন্দু বললে, 'যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যা হোক একটা কিছু করা দরকার। ট্রেনটাও আমরা ফেল করেছি।' 'ট্রেন!' ভদ্রলোক তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলেন, 'সর্বনাশ, আমিও যে ওই ট্রেনে যাব। কার হুকুমে ট্রেন ছেড়ে গেল?' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলে উঠলেন, 'গার্ডসাহেবের হুকুমে।' ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, 'স্টপ ইট।' যিনি আগের উত্তরটা দিয়েছিলেন তিনি ততোধিক জোরে বললেন, 'ইয়েস স্যার।' জনতা হৈ হৈ করে হেসে উঠল।

ফাদার এইবার ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন। তাঁর সাদা গাউনের বুকে নিশ্চিন্ত আরামে লেপ্টে আছে একটা গিনিপিগ। জুলজুলে চোখে ভিড়ের দিকে তাকিয়ে আছে। 'বাবু, ইজ দিস ইওরস?' ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'থ্রো ইট। ফেলে দিন। দূর করে ফেলে দিন।' ফাদারের মুখে সেই মিষ্টি হাসি। যীশুর মুখের হাসির মত। 'বাবু, হোয়াই ইউ আর সো এ্যাংরি! ওতো রাগতে নেই। রাগ আমাদের এনিমি আছে। আমি একটাকে উদ্ধার করিয়েছি। বাট দেয়ার আর সো মেনি অফ দেম।' ভদ্রলোক কিছুই করতে চাইছেন না দেখে, আমি খাঁচাটা সোজা করে ফাদারের হাত থেকে গিনিপিগটা নিতে গেলুম। সে বেটা কি সহজে আসতে চায়! ফাদারের বুক আঁকড়ে মজাসে পড়ে আছে। জোর করে ছাড়িয়ে আনলুম। খচমচ্ করে হাতে একটু আঁচড়ে দিলে। কোনো রকমে খাঁচায় ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম।

খাঁচার দরজাটা ডিফেকটিভ। সহজে বন্ধ হতে চায় না। বন্ধ হলেও ছিটকিনিটা ঠিকমতো আটকানো যায় না। নবেন্দু খুব ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কটা ছিল?' ভদ্রলোক তখনও বেশ রেগে আছেন। বললেন, 'জানি না।'

'জানি না বললে তো চলবে না, জিনিসটা কার, মালটা কার ছিল?' ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলেন রেলওয়ে প্রোটেকসান ফোর্সের একজন অফিসার। 'সারা স্টেশনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। একজন ভদ্রমহিলা ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। কে একাজ করেছে! ভারতীয় দণ্ডবিধির ধারাটা মনে আসছে না, কত নম্বর ধারা—কত নম্বর ধারা, ধ্যত তেরি মনে আসছে না।' ভদ্রলোক বার কয়েক মাথার টুপিটা তুললেন আর বসালেন। 'ধারাটা আমার এখন ঠিক মনে আসছে না, মনে না এলেও ধারাটা নেই এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। রেলওয়ে ম্যাজিস্ট্রেট আছেন, তিনি বুঝবেন কত নম্বর ধারায় অপরাধীকে সাজা দেবেন। আমার কাজ অপরাধীকে অ্যারেস্ট করা।' প্রোটেকসান ফোর্সের অফিসার বুক ফুলিয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। পিনিপিগের মালিকও কিন্তু কম যান না। তিনি এতটুকু ভয় পেলেন না। ইংরেজিতে বললেন, 'হু আর ইউ? আমি যাকে তাকে আমার কাজের কৈফিয়ত দিই না, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব হু ইজ নট বিলো দি র‍্যাঙ্ক অফ এ ফার্স্ট ক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট।' অফিসার একটু ঘাবড়ে গেলেন। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট এখন বাড়িতে ভাত খেতে গেছেন। খাবার পর তিনি একটু ঘুমোবেন, তারপর তিনটে নাগাদ আসবেন। আপনি কি বলতে চান ততক্ষণ এই জন্তুগুলো সারা প্লাটফর্মে ঘুরে বেড়াবে! একটা তো সুপারিনটেনডেণ্টের ঘরে ঢুকে তাঁর চায়ের কাপ উল্টে দিয়েছে।' ভদ্রলোকের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি, কুকুরের চিৎকারে স্টেশন ফেটে যাবার উপক্রম, সেই সঙ্গে একটা অসহায় মানুষের চিৎকার—'টম, নো টম, যাঃ খেয়ে ফেলেছে'। সকলের নজর বইয়ের স্টলটার দিকে চলে গেল। কুকুরের মালিক

ধুলো ঝেড়ে উঠছেন কিন্তু কুকুরটাকে সামলাতে পারছেন না। কুকুরটা জিভ দিয়ে মুখ চাটছে। গোঁফের কাছে সাদা সাদা লোম। একটা গিনিপিগ সাবাড় করে আর একটাকে ধরার জন্যে চেন ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। ভদ্রলোক অসহায়ের মতো চিৎকার করছেন, 'টম, নো নো, হেল্প, হেল্প'। কে হেল্প করবে!

আমাদের আশেপাশে যে ভিড় জমেছিল, সেই ভিড়ে কিছু পুরোনো লোক চলে যাচ্ছেন এবং অনবরতই কিছু নতুন লোক এসে জমছেন। ফলে জটলার আকৃতি সেই একই থেকে যাচ্ছে। বরং যাঁরা নতুন এসে জমছেন তাঁদের একপ্রস্থ ব্যাপারটা গোড়া থেকে বুঝিয়ে দিতে হচ্ছে। সে দায়িত্বটা অবশ্য একজনই নিয়েছেন। সে হল স্টেশনের একজন উর্দিপরা পোর্টার। নবেন্দু এতক্ষণ ঘটনার দ্রুত পটপরিবর্তনের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরেই বোধহয় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। এইবার সে নাম ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। গিনিপিগের মালিকের সামনাসামনি এগিয়ে এসে বললে—'কি ছেলেমানুষী করছেন! একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে। সারাদিন নিশ্চয়ই এইভাবে আমরা সঙের মতো দাঁড়িয়ে থাকব না!' ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক মনে হল একটু নরম হয়েছেন, বললেন, 'কি করবে? এত বড় স্টেশনে কোথায় কোনটা কোন ঘুপচির মধ্যে ঢুকে গেছে, কে বার করবে শুনি?' 'কেন আমরা সকলে মিলে। ফাদার একটাকে ধরে এনেছেন। সেটা এখন খাঁচায়। একটাকে কুকুরে খেয়েছে। এখন বলুন, আর ক'টা আছে?' নবেন্দু হিসেব চাইল। ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন, 'যাঃ, কুকুরে খেয়ে গেল! কার কুকুর, কোথাকার কুকুর?'

নবেন্দু ভিড় থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরের মালিককে দেখিয়ে দিল। ভদ্রলোকের তখন পরিত্রাহি অবস্থা। তিনি কুকুরের মালিক না কুকুর তাঁর মালিক বোঝাই দায়। ফ্রেঞ্চকাট ভদ্রলোক লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেলেন। কুকুর থেকে সামান্য একটু দূরত্বে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কি আনট্রেনড, আনসিভিলাইজড কুকুর

মশাই আপনার?' কুকুরধারী চেনটাকে আঁকড়ে ধরে বললেন, 'তাতে আপনার কি মশাই? আপনার পাকা ধানে মই দিয়েছে কি?'

'নিশ্চয়ই দিয়েছে, তা না হলে বলব কেন? আমি যেচে কারুর সঙ্গে কথা বলি না, বুঝেছেন।'

'আমার কুকুর কি করেছে আপনার?'

'আমার রিসার্চ গিনিপিগ খেয়ে ফেলেছে।'

'কোনো প্রমাণ আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে। প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য আছে। তা ছাড়া ওই তো সারা মুখে সাদাসাদা লোম লেগে আছে। বত্রিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা আগে ছাড়ুন, একটা গিনিপিগের দাম, তারপর লম্বা চওড়া বাত ছাড়ুন। বুঝেছেন।'

'একটা গিনিপিগের দাম আটচল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা, বলেন কি মশাই! কোথাকার গিনিপিগ? অস্ট্রেলিয়ার?' কুকুরের আচমকা হেঁচকা টানে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে ব্যঙ্গের সুরে ভদ্রলোক বললেন।

'কানে কম শোনেন না কি মগজে গ্রে-ম্যাটার্সের অভাব হয়েছে? আটচল্লিশ টাকা বত্রিশ পয়সা নয়, বত্রিশ টাকা আটচল্লিশ পয়সা।'

'ওই হল মশাই, একটু গুলিয়ে ফেলেছিলুম। বড় বড় লোকদের ওই রকম একটু আধটু ভুল হয়েই থাকে, তাদের মাথায় সব সময় বড় বড় চিন্তা পাক খায়। আইনস্টাইনের কথা শোনেননি?'

'আইনস্টাইন আর আপনি! হাসালেন মশাই। আপনি আমার চেয়েও বড়! আমার নাম জানেন? আমার নাম ডকটর ল্যাং।' নিজের নাম ঘোষণা করে ভদ্রলোক বেশ গর্বের সঙ্গে ভিড়ের দিকে তাকালেন। ভিড়টা ইতিমধ্যে আগের জায়গা থেকে এদিকে সরে এসেছে। নামটা কুকুরের মালিককে এতটুকু সমীহ করে তুলেছে বলে মনে হল না। তিনি আগের মতোই বেপরোয়া ভাবে বললেন,

'ডকটর ল্যাং! জীবনে এরকম নাম শুনিনি। কিসের ডাক্তার! ঘোড়ার? হর্স ডকটর!' ল্যাং সাহেব একটু আহত হলেন। হাত দিয়ে টাইটা চেপে ধরে বললেন, 'কিসের ডাক্তার আর ঘণ্টাখানেক পরেই বুঝতে পারবেন।' একটা রহস্যের আভাস দিয়ে ডকটর ল্যাং নবেন্দুকে বললেন, 'চল মাস্টার, বাকিগুলোকে উদ্ধার করে আনি বিফোর ইট ইজ টু লেট।' ডকটর ল্যাঙের সঙ্গে আমরা একটু এগিয়ে যেতেই কুকুরের মালিক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এক ঘণ্টা পরে কি হবে?' 'এক ঘণ্টা পরেই বুঝতে পারবেন। তখন আপনার ওই ডাঁট চুপসে যাবে। তখনই বুঝতে পারবেন ডকটর ল্যাং কে!'

কুকুরের মালিক একটু এগিয়ে এসে বেশ সমীহ করে বললেন, 'বলুন না স্যার কি হবে? আমি আবার সাসপেন্সে থাকতে পারি না, পেট ফোলে। এটা আমার ছেলেবেলার রোগ। তখন কত আর বয়স আমার, এই এদের মতোই হবে, অবাধ্যতা করেছিলুম ব'লে আমার ফাদার রায়বাহাদুর হরিশঙ্কর রায় আমাকে সারারাত আমাদের নির্জন বাগানবাড়ির চিলেকোঠায় বন্ধ করে রেখেছিলেন। লোকে বলত বাড়িটা ভূতের বাড়ি। উঃ, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়, এই দেখুন এত বছর পরেও।' ভদ্রলোক বাঁ হাতটা এগিয়ে দিলেন।

ডকটর ল্যাং হাতটার দিকে তাকালেনও না, ভুরু দুটো ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বললেন, 'ও গল্প! স্টোরি! আপনার গল্প শোনার মতো সময় আমার নেই। আমার এক সেকেণ্ড সময়ের দাম কত অনুমান করতে পারেন?' 'অনেক দাম স্যার। আমি প্রতিবাদ করছি না স্যার। কেবল দয়া করে বলে যান একঘণ্টা পরে কি হবে?' ডকটর ল্যাঙের মুখে চিন্তার ছায়া পড়ল। নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কি?'

'নবেন্দু।'

'আই সি। নবেন্দু, বলেই দিই একঘণ্টা পরে কি হবে,

কি বল ?' নবেন্দু উত্তর দেবার আগেই আমরা সমস্বরে বললুম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, বলেই দিন। আমাদেরও ভেতরটা কেমন কেমন করছে।'

ডকটর ল্যাং প্যান্টের পকেটে হাত তুটো ঢুকিয়ে শরীরটা টান টান করে ভারিক্কি চালে বললেন, 'শুনুন, দিস ডগ, আপনার এই বাঁদর কুকুরটা একটা গিনিপিগ খেয়েছে। এরা সকলেই দেখেছে। আপনি অবশ্য দাম দেবার ভয়ে অস্বীকার করেছেন। আপনার স্বীকার অস্বীকারে আমার ঘণ্টাটি, বুঝেছেন! ফলেন পরিচীয়তে। ওই গিনিপিগটাকে হাই ডোজে হরমোন ইনজেকসান করা আছে, বুঝেছেন! যেটা আপনার গাধা কুকুরটা খেয়েছে। অবশ্য কুকুরের আর দোষ কি বলুন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে—কুকুরকে দেখে তার প্রভুকে চেনা যায় রায়বাহাদুরের বংশধরদেব কি অবস্থা তা আমার জানা আছে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।' ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখ করে ডক্টর ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডক্টর ল্যাং তাঁর বেদনার মুখটা উসকে দিতেই ভদ্রলোকেব এতক্ষণেব অহংকারেব আলখাল্লাটা যেন নিমেষে পায়ের তলায় খুলে পড়ল। অনেকটা আত্মগতভাবেই বললেন, 'কি অবস্থা দেখুন আমার, বাবা মাবা যাবাব পর সেই ভুতুড়ে বাগানবাড়িটা রেখে গেলেন, তাও আবার তিনবার মর্টগেজ করা। আর রেখে গেলেন তেরপলের চালওলা একটা পুরোনো গাড়ি। সেটার চালে এখন ছত্রিশটা ফুটো। আর এই কুকুরটা। বাবার আমলে এটা মাসে তিনশো টাকা খেত, এখন দশ টাকায় ম্যানেজ করতে হয়। কতদিন মাংসের মুখ দেখেনি। আলোচালের ভাত খেয়ে খেয়ে ওর স্বভাব নষ্ট হয়ে গেছে। কতদিন পরে আজ একটু মাংসের মুখ দেখল!'

সেই মাংসই ওর কাল হবে কড়া ডোজের হরমোনে ও ঘণ্টাখানেক পর থেকেই ফুলতে থাকবে, আকৃতিতে বাড়তে বাড়তে এখনকাব চেয়ে একশোগুণ হয়ে যাবে, চোখ তুটো আগুনের গোলার মত জ্বলবে।

শার্লক হোমসের হাউণ্ডস অফ বাস্কারভিল পড়েছেন?' ভদ্রলোক অসহায়ের মতো মুখ করে বললেন, ইংরাজি পড়তে জানি না। ছেলেবেলাটা বাড়িব বড় ছাদে ঘুড়ি উড়িয়ে কাটিয়োছ। আর একটু বড় হয়ে কেবল সিনেমা আর থিয়েটার দেখে কাটিয়েছি। আহা, সে কী সব অভিনেতা আর অভিনয়, দুর্গাদাস, শিশির ভাদুড়ি, অর্ধেন্দু শেখর, নরেশচন্দ্র, অপরেশ মুখোপাধ্যায়।'

'ছি ছি'—ডকটর ল্যাং ছি ছি করে উঠলেন। 'জীবনটা এইভাবে নষ্ট করেছেন! যাক, আর দুঃখের কিছু রইল না। এই কুকুরটাই আপনাকে উদ্ধার করে দেবে। হাড় মাংস সমেত প্রথমে আপনাকেই জলযোগ করবে। তারপর চেনফেন ছিঁড়ে পাড়ায় বেরিয়ে পড়ে, যাকে পাবে তাকে খাবে। তারপর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মিলিটারি ডেকে গুলি করে মারার চেষ্টা করবে। ভাবনার কিছু নেই। চল নবেন্দু।' ডকটর ল্যাং এগোতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর পিছনে। কুকুরের চেন ধরে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে রইলেন। ভয়ে মুখটা ছাইয়ের মত সাদা।

'চলো এবার।' ডঃ ল্যাং নবেন্দুর কাঁধে হাত রাখলেন। প্রত্যেকটা গিনিপিগ এক এক ধরনের মারাত্মক রোগবীজাণু নিয়ে ঘুরছে। কারুকে কামড়ে দিলে মহা মুস্কিল হবে। নবেন্দু আর ডঃ ল্যাং হাতখানেক এগোতেই আর পি এফের অফিসার বাধা দিলেন, 'যাচ্ছেন কোথায়? আপনাকে তো আমি অ্যারেস্ট করেছি।' 'অ্যারেস্ট!' ডাঃ ল্যাং থেমে পড়ে ভ্রূ দুটোকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেন। নবেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলে কি নবেন্দু, এই পেটি অফিসার অ্যারেস্ট করবে ডাঃ ল্যাংকে! এত বড় শক্তি এই ক্যারিকেচার অফ এ পুলিশ ম্যানের। দেখা যাক কার শক্তি বেশি।' চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে ডাঃ ল্যাং রুখে দাঁড়ালেন।

নবেন্দু আর আমরা দলবল চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রইলুম। কি হবে বোঝা যাচ্ছে না। কার শক্তি যে বেশি! ডাঃ ল্যাঙের পুরো পরিচয়ই তো জানি না। পুলিশের শক্তি আমরা জানি। পুলিশের

কেরামতি আমাদের পাড়ায় কয়েকবার দেখেছি। ঘাড়ে রদ্দা মেরে, পেটে রুলের গুঁতো মেরে বাঘা বাঘা আসামীকে নিমেষে ঘায়েল করা কোনো একটা ব্যাপারই নয়। তারপরই তো আসামীর বাড়ানো দুটো হাতে ক্ল্যাং করে দুটো লোহার বালা ঢুকে যাবে। কোমরে জড়িয়ে যাবে মোটা একটা কাছি। তারপর! তারপর ভাবতেও হাসি পায়, ডাঃ ল্যাং আগে আগে চলবেন, পেছনে হাতে দড়ি ধরে ওই পুলিশ অফিসার। প্রফুল্লদা একবার নবেন্দুদের একটা গরুকে এই ভাবে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন।

ডাঃ ল্যাঙের হাত তখনও নবেন্দুর কাঁধে। ঠোঁটে ঝুলছে মস্ত একটা টোব্যাকো পাইপ। ধোঁয়া বেরোচ্ছে না। নিভে গেছে বোধ হয়। ডাঃ ল্যাং বললেন, 'চলো। দেখ হতভাগাগুলো কোথায় আছে।' পুলিশ অফিসার এতক্ষণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডাক্তারের বোলচালে বোধ হয় একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এইবার ডাক্তার এগোতে চাইছেন দেখে একটু তৎপর হয়ে উঠলেন। ইংরেজিতে বললেন, 'ইউ আর আণ্ডার অ্যারেস্ট।' নবেন্দুর কাঁধ থেকে ডাক্তারের হাত নেমে এল। পাইপটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে ছাই ঝেড়ে কোটের পকেটে ফেলে দিলেন। বিড় বিড় করে বললেন, অ্যারেস্ট, অ্যা—অ্যারেস্ট, তাই না', তারপর ধাঁ করে অন্য পকেট থেকে বের করে ফেললেন অনেকটা রিভলবারের মতো দেখতে ছোট একটা অস্ত্র। আমরা আবার থমকে দাঁড়ালুম। এবার আর ডাঃ ল্যাঙের গা ঘেঁষে নয়, বেশ দূরে দূরে। বলা যায় না, গুলি-গোলা ছুটে কে কখন ঘায়েল হয়। পুলিশের রাইফেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কি ওই মাঝারী সাইজের রিভলবার! কাঁধে রাইফেল অথচ অফিসার ভদ্রলোক কি রকম ভয়ে ভয়ে দূরে সরে যাচ্ছেন। নবেন্দুটার কিন্তু আচ্ছা সাহস। দু'পক্ষের মাঝখানে খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা যেন কিছুই নয়, বিরাট একটা তামাশা। যাঁরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিছক মজা দেখছিলেন তাঁরাও সুড়সুড় করে পালাতে শুরু করলেন। প্রফুল্লদা

এতক্ষণ আরাম করে আমাদের পেল্লায় বেডিংটার উপর বসেছিলেন। উত্তেজনা বেশ বাড়ছে দেখে কৌটো খুলে নতুন করে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলেন। পরেশ কানে কানে বললে, 'আচ্ছা কাল হল দেখছি। এর হাত থেকে সহজে উদ্ধার পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।'

পুলিশকে পিঠ দেখাতে নেই বলেই বোধহয় অফিসার ভদ্রলোক যতটা সম্ভব পিছু হটে সরে যেতে যেতে বললেন, 'গুলি করবেন নাকি মশাই?' ডাঃ ল্যাং স্টেশন ফাটানো হাসি হেসে বললেন, 'গুলি! আমি কি সাধারণ ওয়াগনব্রেকার যে গুলি করব? এ জিনিস গুলির চেয়ে মারাত্মক।' অফিসার ভদ্রলোক আরো দু'কদম পিছিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন, 'তবে কি অ্যাটম বম?' 'অ্যাটম বম শব্দটা কানে যেতেই প্রফুল্লদা কুঁক কুঁক করে হেসে উঠলেন। হাসির শব্দটা অফিসারের কানে যেতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন, 'হাসে কে? হাসার কি আছে? এটা কি যাত্রা না থিয়েটার?' জীবনে অনেক পুলিশ চরিয়েছেন প্রফুল্লদা। ভয় ডর কিছুই নেই। বসে বসেই জবাব দিলেন, 'হাসব না কেন? হাসির কথা হলেই হাসি চাপা যায় না! অ্যাটম বোমা মশাই তিনটেই ছিল, যুদ্ধের সময় জাপানের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিল। ব্যস, স্টক শেষ, আর মাল নেই।'

'মাল নেই? আপনি সব জেনে বসে আছেন! আমি রোজ সকালে নিয়ম করে কাগজ পড়ি, বুঝেছেন। আমার একটা বইও আছে আণবিক বিজ্ঞান, আমি রোজ একটু করে পড়ি।' অফিসারের কথায় প্রফুল্লদার হাসি তো কমলই না, বরং বেড়ে গেল, 'পড়ে পড়ে তো ওই জ্ঞান হয়েছে। আণবিক বোমা হাতে করে ছোঁড়া যায়? আর আণবিক বোমা ডাক্তার সাহেব ছুঁড়বেন কেন? মশা মারতে কেউ কামান দাগে মশাই।'

'মশা? আমি হলুম গিয়ে মশা! দেখাবো মজা! দেখিয়ে দোবো একবার মশা বলার মজাটা।' প্রফুল্লদা একটা ঠ্যাং আর

একটা ঠ্যাংয়ের উপর তুলে দিয়ে বললেন, 'মশা মারতে লোকে মশামারা তেল ব্যবহার করে, ডাক্তার সাহেবের হাতের ওই যন্ত্রে সেই তেল ভরা আছে।'

পরেশ আমার কানে কানে বলল, 'এটা কী রে, ফ্লেম-থ্রোয়ার নাকি রে!' পরেশটা আবার জেমস বণ্ড গুলে খেয়েছে। প্রফুল্লদার কথায় অফিসার আরো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, সব রাগ গিয়ে পড়ল প্রফুল্লদার উপর। ডাঃ ল্যাঙের কথা ভুলে গিয়ে চিৎকার করে উঠেলেন, 'ইউ আর আণ্ডার মাই অ্যারেস্ট।' প্রফুল্লদা নির্মদাতন করা ঝকঝকে ত্র'সার দাঁত বের করে বলল, 'আমার অপরাধ স্যার!' অফিসার একটু ঘাবড়ে গেলেন, আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লজ্জা করে না সব কথায় হ্যা হ্যা করে হাসতে। যখন তখন যেখানে সেখানে হাসাটাও অপরাধ! দণ্ডবিধির, দণ্ডবিধির ধারাগুলো ছাই মনেও আসে না।'

'আসবে কি করে?' ডাঃ ল্যাং হাতের অস্ত্রটা নাচাতে নাচাতে বললেন, 'মাথায় তো কিছু নেই, পুরোটাই তো কাউ ডাং? তা না হলে আসল কাজ পড়ে রইল আর উনি গোঁফ বাগিয়ে অ্যারেস্ট, অ্যারেস্ট করে তখন থেকে—মোস্ট ডিস্টার্বিং। চল নবেন্দু।' ডাঃ ল্যাং খুব সহজ ভাবেই এগোতে চাইলেন। চাইলে কি হবে। সেই অশান্তি। এইবার অফিসার ভদ্রলোক একটু লম্ফঝম্ফ করে এগিয়ে এলেন। 'সাহস বেড়ে গেল, তাই না মিষ্টার অফিসার? তা হলে মজাটা এইবার দেখুন।' ডাক্তার তাঁর অস্ত্র উঁচিয়ে ধরলেন। অফিসার হঠাৎ বেগ সম্বরণ করতে গিয়ে টাল সামলাতে না পেরে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলেন, নবেন্দু ধরে সামলে দিল। নবেন্দুরও মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে। প্রকৃতই বিরক্তিকর ব্যাপার। নবেন্দু বললে, 'একে কোনো রকমে অ্যারেস্ট করা যায় না। তখন থেকে পায়ে পায়ে বেড়ালের মতো ঘুরছে।' ডাঃ ল্যাং বললেন, 'ঠিক বলেছ নবেন্দু, উৎপাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ভেবেছিলুম, খেটে খাওয়া মানুষ, বিপাকে ফেলব

না, তা বেশি তিড়বিড় করলে আমি কি করব? দিতেই হবে এক ডোজ ভরে। তারপর—তারপর, উঃ ভাবা যায় না!'

'কি হবে তারপর?' অফিসার তাঁর গর্তে ঢোকা চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, 'মরে যাবো?'

'মরে গেলে তো বেঁচেই গেলেন। তবে এ জিনিস মারে না, দগ্ধে দগ্ধে শেষ করে দেয়! যতদিন বাঁচবেন জ্বলে পুড়ে যাবেন।' ডাক্তার মুখটাকে ভয়াবহ করে শেষ পরিণতিটা জানালেন। 'জিনিসটা কি? বেশ দেখতে কিন্তু!' পুলিশ অফিসার ছেলেমানুষের মত কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। 'এর নাম জেট ইঞ্জেক্টার। চোখের পাতা পড়ার আগে এক ডোজ ঢুকে যাবে উপরের হাতে। একটা মোক্ষম প্রেপারেশান। দেখতে দেখতে চামড়াটা কালো হয়ে যাবে। ভেতর থেকে ধীরে ধীরে পুড়তে থাকবে। লক্ষ করলে দেখা যাবে সারা শরীর জড়িয়ে পাকিয়ে ফিকে গোলাপী ধোঁয়া বেরোচ্ছে। পাটের আগুনের মতো ধিকি ধিকি জ্বলবে।'

'তাই নাকি!' একটা লোক যে এত এত দৌড়োতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অফিসার পলকে প্লাটফর্মের কোণে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ডাঃ ল্যাং হো হো করে হেসে বললেন, 'বীর পুরুষ। পুরুষসিংহও বলা যেতে পারে। যাক, নাও কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। তটভূমি এখন অবরোধমুক্ত। চল দেখি, আমার সাঙ্গো-পাঙ্গোদের উদ্ধার করার চেষ্টা করি!'

প্রফুল্লদা কখন বেডিংয়ের সুখাসন ছেড়ে উঠে এসেছেন লক্ষ করিনি। ল্যাং সাহেবের কাছে এসে বললেন, 'জিনিসটা কি? জিনিসটা?' প্রশ্নটা ডাক্তার যেন নিজেকেই করলেন। 'জিনিসটা হল'—প্রফুল্লদা কিছু বোঝার আগেই তাঁর বাহুমূলে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। যন্ত্রটা ছিক করে একটা আওয়াজ করে খানিকটা তরল পদার্থ প্রফুল্লদার শরীরে ভরে দিল। পরেশ দাঁড়িয়ে ছিল পাশে, তারও ওই এক হাল হল। নবেন্দু এবার গর্জে উঠল, 'এটা কি হল ডকটর

ল্যাং? যে বিষ আপনি পুলিশের শরীরে ভরে দিতে ভয় পাচ্ছিলেন সেই বিষ ঢুকিয়ে দিলেন এদের শরীরে!' নবেন্দু ভাবতেও পারেনি যে, ডাঃ ল্যাং নবেন্দুকেও বাদ দেবেন না। নিমেষে নবেন্দুর হাতেও ডকটর ফুঁড়ে দিলেন। প্রফুল্লদা বোধহয় ঘটনার আকস্মিকতায় একটু কাবু হয়ে পড়েছিলেন, এইবার হাতা গুটিয়ে এগিয়ে এলেন, 'মরার আগে মেরে যাবো। দেখি কতবড় ডাক্তার তুমি।' ডাক্তার মিটি মিটি হেসে বললেন, 'তোমাকে মারলুম কে বললে? তোমাকে, তোমার এইসব চেলাদের বাঁচালুম বলতে পার।'

প্রফুল্লদা একে রাগী মানুষ তায় আবার শরীরে অসীম ক্ষমতা। ডাঃ ল্যাঙের মতো কৃশকায় একজন মানুষকে দু হাতে মাথার ওপর তুলে দশ হাত দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া কিছুই নয়। আমরাও তাই চাইছিলুম। ভদ্রলোকের জন্যে আমরা ট্রেন ফেল করেছি। সারা স্টেশনের মানুষ উদ্ব্যাস্ত; হোক, হয়ে যাক একটা হেস্তনেস্ত। তা ছাড়া ভদ্রলোক আমাদের বিনা কারণে আক্রমণ করেছেন। শরীরে মারাত্মক একটা কি জানি কি বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছেন! প্রফুল্লদা বাঘের মতো এগিয়ে আসছেন। এইবার ডাঃ ল্যাঙের দফা রফা। এইবার থানা পুলিশ না হয়ে যায় না। যাচ্ছিলুম মধুপুরে। এইবার ডাঃ ল্যাঙকে মেরে দলবল সমেত যাব হাজতে। তবে পুলিশও বহুত রেগে আছে। প্রফুল্লদার প্যাঁচ আমাদের জানা আছে। ঝাঁ করে লাফিয়ে পড়লেন বিদ্যুৎগতিতে। ডাঃ ল্যাং কিন্তু এতটুকু ভীত নন। মুখে অদ্ভুত একটা মৃদু হাসি। হাসি যেন বলতে চাইছে, আসছ এস, দেখি তোমার কেরামতি।

প্রফুল্লদা বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন। ডাঃ ল্যাং আত্মরক্ষার কোনো চেষ্টাই করলেন না। শুধু ডান হাতের তর্জনিটা একটু প্রফুল্লদার গায়ে আলতো ঠেকিয়ে দিলেন। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। গরম লোহা জলে ডোবালে যেমন শব্দ হয়। একটু ধোঁয়া মত বেরোলো। বাপ বলে একটা শব্দ করে প্রফুল্লদা চিৎপাত হয়ে

প্লাটফরমে শুয়ে পড়লেন। কোনো সাড়াও নেই শব্দ নেই। কি যে হল, ব্যাপারটা বোঝা গেল না। ডাঃ ল্যাং মুখে একটু চুক চুক শব্দ করে বললেন—'আহা বেচারা।'

আমরা সকলে প্রফুল্লদার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লুম। বেঁচে আছেন না মারা গেছেন বোঝা যাচ্ছে না। পরেশ ফিস ফিস করে বলল, 'ডেড'। নবেন্দু উঠে দাঁড়াল। 'এ আপনি কি করলেন—মার্ডার?' ডাঃ ল্যাং পাইপ ধরাতে ধরাতে খুব শান্ত গলায় বললেন, 'যাঃ, ছুঁচো মেরে কেউ হাত গন্ধ করে! নাড়ীটা দেখ না।' নবেন্দু আবার নিচু হয়ে প্রফুল্লদার কবজিটা দু আঙুলে তুলে নিল। ডাঃ ল্যাং চিমনির মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি বুঝছো?' নবেন্দু আবার উঠে দাঁড়াল, 'বেঁচে আছেন। কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?' পাইপ চিবোতে চিবোতে ডাঃ বললেন, 'কিছু না। বড্ড লম্ফঝম্ফ করছিল। ঠিক পছন্দ হল না। বেশি ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই আমার ভীষণ খারাপ লাগে! তাই একটু লো ভোলটেজ চালিয়ে দিলুম।'

'লো ভোলটেজ মানে?'

'ইলেকট্রিসিটি।' ঘড়ি দেখতে দেখতে ডাঃ ল্যাং উত্তর দিলেন।

'ইলেকট্রিসিটি কোথা থেকে পেলেন?'—আমরা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলুম।

'কেন, আমার আঙুল। ইচ্ছে করলে আমার সব ক'টা আঙুল কন্‌ডাকটার করে ফেলতে পারি। একবার দেখবে নাকি?'

'না না', নবেন্দু প্রফুল্লদার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় চিৎকার করেই বলল। 'কিন্তু বিদ্যুতের উৎসটা কি? আপনি কি শরীরের মধ্যে ব্যাটারি লুকিয়ে রেখেছেন নাকি?'

'ব্যাটারি পাব কোথায়, প্রয়োজনই বা কি?'

'তবে?' পরেশ খুব অবাক হয়ে প্রশ্ন করল।

ডাঃ ল্যাং লোহার একটা সরু শিক দিয়ে পাইপের মুখে খোঁচা মারতে মারতে বললেন, 'তোমাদের অজ্ঞতা অপরিসীম। একটু লেখাপড়া

কর-না কেন ?'

নবেন্দু একটু প্রতিবাদের গলায় বলল—'লেখাপড়ায় আমরা খুব একটা খারাপ নই, বুঝেছেন ? শরীরে বিদ্যুৎ-প্রবাহ সম্পর্কে কিছু জ্ঞানও রাখি, কিন্তু আঙুলের ডগা থেকে বিদ্যুৎ বের করে মানুষ ঘায়েল করার কৌশল এই প্রথম দেখলুম ; কিন্তু কায়দাটা বুঝলুম না ।'

'জল-বিদ্যুতের কথা শুনেছো ? Hydro-electricity ?'

'শুনেছি ।' সমস্বরে আমরা জানালুম ।

'গতিশীল জল বাধা পেলে, কোনো কিছুতে ধাক্কা খেলে, জল-তরঙ্গের গতি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে । করে কিনা ?'

'হ্যাঁ, করে ।'

'বেশ, এইবার শোনো আমার আশ্চর্য আবিষ্কার । তোমার আমার সকলের শরীরে রক্ত বয়ে চলেছে । যেমন করে নদীতে জল প্রবাহিত হয় । রক্তের একটা গতিবেগ আছে । এই রক্তপ্রবাহের মধ্যে আমি সূক্ষ্ম কায়দায় একটা ছোট্ট টারবাইন বসিয়ে রেখেছি । সেটা ঘুরছে, অনবরত ঘুরছে । পাশেই আছে একটা জেনারেটার, এইবার আমার আঙুলটা দেখ ।' ডাঃ ল্যাং তর্জনিটা তুলে দেখালেন । নবেন্দু হাত দিতে ইতস্ততঃ করছিল, শক খাবার ভয়ে । ডাঃ ল্যাং আশ্বাস দিলেন, 'ভয় নেই । পাওয়ার হাউস বন্ধ আছে ।'

নবেন্দু আঙুলটা হাত দিয়ে দেখল । ডাঃ ল্যাং বললেন, 'বুঝলে কিছু ?'

'কি যেন একটা লাগানো রয়েছে ।'

'দ্যাটস রাইট । পাতলা একটা তামার চাদর । কনডাকটার । এই কনডাকটারের মধ্যে দিয়েই বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হয় ।'

'এখন কিভাবে আপনি প্রবাহ বন্ধ করলেন ?'

'তোমাদের বাড়িতে নিশ্চয়ই হিটার বা ইস্ত্রি আছে । মাঝে মাঝে হয়তো দেখেছো, যেই সুইচ অন করলে ফট্ করে একটা শব্দ হয়ে একটু আগুন ছিটকে লাইনটা ফিউজ হয়ে গেল ।'

পরেশ খুব উৎসাহ নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আজই সকালে আমার সেই ঘটনা ঘটেছে। জামাটা আর ইস্ত্রিই করা হল না। কলারটা কি রকম কুঁচকে আছে।' পরেশ খুঁত খুঁত করতে লাগল।

ডাঃ ল্যাং বললেন, 'তোমাদের বডিগার্ডের গায়ে হাত ঠেকানো মাত্রই সেই ঘটনা ঘটল। তোমরা একটা আওয়াজ শুনেছো, একটু ধোঁয়াও হয়তো দেখেছো। পজেটিভ নেগেটিভ এক হয়ে আমার ফিউজ উড়ে গেছে।'

'ফিউজ উড়ে গেছে মানে?' আমরা সবাই ঝুঁকে পড়লুম।

ডাঃ ল্যাং বাঁ হাতের কবজির ঘড়িটা দেখালেন। মোটা, মানে সাধারণ ঘড়ির ব্যাণ্ডের চেয়ে চওড়া একটা অদ্ভুত ধরনের কালো ব্যাণ্ড খাপ হয়ে বসে আছে। ঘড়িটাও অদ্ভুত দেখতে। কালো ডায়াল। বারোটা বেজে পনেরো মিনিট হয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। সেন্টার সেকেণ্ডের কাঁটাটা একটু বেশি চকচকে। কাঁটাটা ঘুরছে না। ছত্রিশ সেকেণ্ডে স্থির হয়ে আছে।

'বুঝলে কিছু?' ডাঃ ল্যাং মুচকি হেসে প্রশ্ন করলেন। আমরা বোকার মতো ঘাড় নেড়ে জানালুম, 'কিছুই বুঝিনি।'

'এই ঘড়িটার সঙ্গে ফিউজ লাগানো আছে। ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। সেটা দেখেছো তো?'

আমরা সমস্বরে বললাম, 'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'বারোটা বেজে পনের মিনিট ছত্রিশ সেকেণ্ডে তোমাদের ওই কমরেড কাত হয়েছে। এখন ফিউজটা লাগালেই ঘড়িটা আবার চলতে শুরু করবে।'

'ফিউজ লাগাবেন না?'

'লাগাবো একটু পরে।'

রক্তপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ, ব্যাপারটা যেন অবিশ্বাস্য। নবেন্দু একটু খুঁত খুঁত করে বলল, 'আমি আপনার থিওরিটা আর একটু ভাল করে বুঝতে চাই।'

'ভেরি গুড।' ডাঃ ল্যাং এতোগুলো উৎসাহী ছাত্র পেয়ে বেশ খুশী হলেন। 'বোঝাবো বোঝাবো, তার আগে তোমাদের এই ফ্রেণ্ডকে একটু চাঙ্গা করে তুলি।' ডাঃ ল্যাং প্রফুল্লদার উপর ঝুঁকে পড়লেন। ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে লম্বা চকচকে একটা লোহার মতো যন্ত্র বের করে প্রফুল্লদার হার্টের উপর কিছুক্ষণ ধরে রাখতেই, প্রফুল্লদা চোখ খুললেন। ডাঃ ল্যাং সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ফাইন। নাও উঠে বস। আর কখনো এই রকম হঠকারিতা কোরো না। জেনে রাখো, বৈজ্ঞানিকরা অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী।'

প্রফুল্লদা উঠে বসে চোখ পিট পিট করে বললেন, 'একটা বিড়ি খাবো।'

'নো, নো নাও। একটু পরে। আগে এক কাপ গরম কফি খাবে, তারপর ধূমপান।'

ডাক্তারের একটা হাত আমার কাঁধে আর একটা হাত নবেন্দুর। দলবল এগিয়ে চলল কফি কর্ণারের দিকে। প্রফুল্লদার পা দুটো যেন একটু টলছে। মুখটা বিমর্ষ। বড্ড হেরে গেছেন। 'গিনিপিগ উদ্ধারের কি হবে?' ডাক্তার ল্যাং নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, 'হবে, হবে ফার্স্ট কফি, তারপর পিগই বল আর গিনিপিগই বল, যা হয় একটা কিছু হবে।'

কফিখানায় ডাঃ ল্যাং

পরেশটা আবার কফি ভালবাসে না। পোড়া পোড়া গন্ধ লাগে। এক চুমুক খেয়েই পেয়ালা নামিয়ে রেখেছে। মুখটা করুণ। যেন তাকে ভীষণ সাজা দেওয়া হয়েছে। প্রফুল্লদা ডবল স্পিডে খেয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে পরেশের না খাওয়া কাপের দিকে তাকাচ্ছেন। মনের খুব ইচ্ছে নিজেরটা শেষ করে ওটাও শেষ করে ফেলেন। কেউ একবার বললেই নিজের মনের ইচ্ছেটা তিনি কাজে করে ফেলবেন, এই আর কি।

ডাঃ ল্যাং আবার তার পাইপ নিয়ে পড়েছেন। কী ভীষণ জিনিস। সারাদিনের বারোটা ঘণ্টাই এই পাইপ নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া যায়। খোঁচাখুঁচি করে। তামাক ভরে। কিংবা বারে বারে দেশলাই দিয়ে ধরাবার চেষ্টা করে। পাইপে তামাক ভরতে ভরতে ডাক্তার একবার আড়চোখে আমাদের দেখে নিলেন। বেশ দেখতে ডাঃ ল্যাংকে। সরু উঁচু পাতলা নাক। অসম্ভব ঘন কালো চুলে কপালের প্রায় আধখানা ঢাকা। টকটকে ফর্সা রং। বলে না দিলে সাহেব বলেই ভুল হতে পারে। বিজ্ঞানীদের এত সুন্দর চেহারা খুব কম দেখা যায়। আমাদের ক্লাসের বিজ্ঞানের স্যারের মতো নয়। মাথা জোড়া বিশাল টাক। কুচকুচে কালো রঙ। ইয়া মোটা মোটা হাত। হাত নয়তো, থাবা। ডাঃ ল্যাঙের আঙুলগুলো কী সুন্দর! লম্বা লম্বা সরু সরু।

ডাক্তার কফিতে চুমুক দিলেন। আমরা সবাই চুপ করে উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছি। কী অদ্ভুত মানুষ! অপরেশ কানে কানে বললে, 'মানুষ নয়তো, চলমান জেনারেটার। সঙ্গে বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরেন।' অপরেশ ফিস ফিস করে বলেছিল। ডাঃ ল্যাং কিন্তু শুনে ফেলেছেন। আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন—'ফ্রেণ্ডস, আমরা সবাই জেনারেটার। কেউ জানে, কেউ জানে না। মানুষ যদি নিজের কলকব্জার খবর রাখত, তাহলে প্রতিটি মানুষই অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারত। আমরা সকলেই এক একটি অদ্ভুত শক্তিশালী যন্ত্র। আমরা রেডিও, আমরা টিভি, আমরা জেট প্লেন, আমরা কমপিউ-টার, আণবিক বোমা। পৃথিবীর জানা অজানা সমস্ত মেশিনের সমন্বয়।'

প্রফুল্লদা আর থাকতে পারলেন না, বলেই ফেললেন, 'পরেশের কফিটা আমি···'

'ও।সওর'—ডাঃ ল্যাং দাঁতে পাইপ চেপে অনুমতি দিলেন। প্রফুল্লদা সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ালেন। হাতটা এখনো অল্প অল্প কাঁপছে। 'আর

একটু পরে তুমি আর এক কাপ কফি খাবে।' পাইপটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে ডাঃ ল্যাং আর এক কাপ কফি মঞ্জুর করলেন।

'ওই বিদ্যুতের ব্যাপারটা'—নবেন্দু আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলেই ফেলল। ডাঃ ল্যাং ধোঁয়া ছাড়লেন। মুখটা ধোঁয়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। হাত দিয়ে ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বললেন, 'হার্টের ফাংশান আই মিন হৃদ্‌যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জ্ঞান তোমাদের আছে নিশ্চয়।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আছে।'

'অল রাইট, তাহলে বুঝতে পারবে। এই আমার হাতের মুঠোর মতো ছোট্ট এতটুকু একটা হৃদয়ের ক্ষমতা কিন্তু বিশাল। এই খুলছে এই বন্ধ হচ্ছে। এই সঙ্কুচিত হচ্ছে আবার বেড়ে যাচ্ছে বা প্রসারিত হচ্ছে। সংকোচন আর প্রসারণ। লাব্ ডুব লাব্ ডুব। সারাদিন ধরে তোমাদের শরীরে এই পাম্প চলছে। ওয়েটার।' —ডাঃ ল্যাং ওয়েটারকে ডেকে আবার কফির অর্ডার দিলেন।

পরেশ বললে—'আমি না।'

'নাবালক'- -ডাঃ ল্যাং সস্নেহে হাসলেন। হাসার সময় চোখ দুটো একটু ছোট হল।—'এই পাম্প প্রতিদিন ন থেকে দশ টন রক্ত পাম্প করে। প্রতিবারে শরীরের সমস্ত রক্তের একশো ভাগের এক ভাগ ঠেলে 'অ্যাওর্টার মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে। সেখান থেকে বাঁধভাঙা নদীর গতিতে এই রক্ত আমাদের শরীরের মাইলের পর মাইল দীর্ঘ শিরা উপশিরার মধ্যে কুল কুল করে প্রবাহিত হচ্ছে। কোনো ধারণা আছে? আমাদের শিরা উপশিরা একসঙ্গে যোগ করলে দৈর্ঘে কত মাইল হবে?'

পাইপ মুখে দিয়ে ডাক্তার আমাদের দিকে তাকালেন। আমরা সকলেই চুপ। পরেশ হঠাৎ বলে ফেলল—'কুড়ি গজ।'

'ইজ ইট? তুমি নবেন্দু?' —ডাঃ ল্যাং নবেন্দুকে জিজ্ঞেস করলেন। নবেন্দু একটু ইতস্তত করে বলল···'এক মাইল।'

'ওঃ হো, নো নো। ধারে কাছেও গেল না। ইট ইজ সিকস্‌টি

থাওজেণ্ড মাইলস। ৬০ হাজার মাইল! আমাদের শরীরে শাখা-প্রশাখা মিলিয়ে ৬০ হাজার মাইলের রক্তনদীর ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমাদের ভারতবর্ষের যে কোনো দুটো রিভার সিসটেমের চেয়ে বড়।'

আমরা সকলে হাঁ করে তাকিয়ে রইলুম। নবেন্দু নিজের হাতটা চোখের সামনে তুলে বার কয়েক দেখল। এ যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার! আমাদের এই ক্ষুদ্র শরীরে প্রবাহিত গঙ্গা, প্রবাহিত সিন্ধু। বুকের বাঁ পাশের হাতের মুঠোর আকারে একটি পাম্প রোজ ন থেকে দশ টন রক্ত পাম্প করে ৬০ হাজার মাইলের সুদীর্ঘ প্রবাহপথে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কী বিস্ময়! কফি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চুমুক দেবার কথা সকলেই যেন ভুলে গেছি।

'হার্টের ভাল্‌ভটা কেমন জানো? ইট হ্যাজ থ্রী ভালভস্ ট্র্যাঙ্গুলার ইন শেপ। ভাল্‌ভটার তিনটে কপাট, ত্রিভুজের মত দেখতে। কলম আছে? দাও এঁকে দেখিয়ে দি।'

নবেন্দু ডট পেন আর পরেশ বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে এগিয়ে দিল। কাগজটার এক পিঠে একটা ঠিকানা লেখা। অন্য পিঠ সাদা। দাঁতে পাইপ চেপে ডাঃ ল্যাং বললেন, 'কার ঠিকানা?' পরেশ আমতা আমতা করে বলল, 'আজ্ঞে আমাদের বাড়ির। মা লিখে দিয়েছেন।' 'হাউ ফানি। তোমার নিজের বাড়ির ঠিকানা মেমারিতে রাখতে পার না?' পরেশ একটু লজ্জা পেলেও তার ব্যাখ্যাটা শোনার মত।—'ঠিকানাটার ওপর চোখ বোলান।' ডাঃ ল্যাং জোরে জোরে পড়লেন—'২৩৩/১৪/সি/১০/এইচ ৭৬/পি ৭, হোয়াট ইজ দিস? এ তো দেখছি কমপিউটারে ফিট করার মতো একটা কোড নম্বর। কোথা-কার ঠিকানা হে? চিঠিপত্তর আসে তো!' পরেশ দিগ্‌বিজয়ীর মতো মুখ করে বলল, 'নতুন পিওন এলে প্রথম প্রথম চিঠি-পত্তর আসে না। চিঠি না এলেও ক্ষতি নেই। মুশকিল ইলেকট্রিক বিল নিয়ে। বাবা

তখন পোস্ট অফিসে গিয়ে পিওনকে একদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তারপর থেকে আবার চিঠি আসতে থাকে। পুরোনো পিওন বদলির আগে বলে যায়—নতুন কে আসছেন, তাঁর নাম কি!'

হো হো করে ডাঃ ল্যাং হেসে উঠলেন, 'মাই গড! পৃথিবীটা কী ফানি প্লেস! মানুষ যতদিন বাঁচবে ততদিনই তার নতুন নতুন শিক্ষা হবে। পৃথিবীর পাঠশালাতে উই আর ইন্টারন্যাল স্টুডেন্টস!' ডাঃ ল্যাং কাগজের সাদা দিকটায় সুনিপুণ হাতে, হার্ট আর ভালভের ছবি এঁকে ফেললেন। 'কাম হিয়ার!' সব ক'টা মাথা এগিয়ে এল। আমার মাথাটা নবেন্দুর সঙ্গে ঢাঁই করে ঠুকে গেল। ঠুকে গেলেও আমাদের তখন অন্য কোনো লক্ষ্য নেই। নিজেদের শরীরের রহস্য জানার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

'হিয়ার ইজ ইওর হার্ট', ছবিটা টেবিলের উপর ফেলে বাঁ হাতে কফির কাপটা ঠোঁটের কাছে তুলে নিলেন। 'হার্টের মেকানিজমটা আরো একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমাদের হৃদয়ে চারটি প্রকোষ্ঠ। দুটো ঘরের দেওয়াল খুব পাতলা, এদের নাম অরিকল। আর দুটো ঘরের পেশী খুব শক্তিশালী, নাম ভেনট্রিকল। তার মানে হৃদয় হল দুটি সহযোগী পাম্প। নাও সি'—ডাঃ ল্যাং ডট পেনটা আবার হাতে তুলে নিলেন। এই দেখ দক্ষিণ হৃদয়—একটা অরিকল, একটা ভেনট্রিকল। আমাদের দেহের মোটা মোটা শিরা রক্তস্রোত বহন করে আনছে এই দক্ষিণ হৃদয়ে। দুটি বিশাল প্রবাহিত রক্তনদী, একটির নাম ইনফিরিয়ার ভেনাকোভা অন্যটির নাম সুপিরিয়ার ভেনাকোভা, অবিশ্রান্ত ধারায় নিজেদের উজাড় করে দিচ্ছে এই হৃদয়ের দক্ষিণের দুটি প্রকোষ্ঠে। কান পেতে শোনো, অনবরত কুল কুল শব্দ শুনতে পাবে।' ডাঃ ল্যাঙের চোখ দুটো হঠাৎ তীক্ষ্ণ থেকে কেমন যেন ভাবালু হয়ে উঠল, 'তোমরা জলপ্রপাত দেখছো নিশ্চয়ই। হুড্রু, জুনা।

হু হু করে জল ঝরে পড়ছে হাজার হাজার ফুট নীচে। গুম গুম শব্দ, পাথরের দেয়ালে দেয়ালে প্রতিহত হয়ে মহাসংগীতের মতো ঊর্ধ্বে ছড়িয়ে পড়ছে। চারিদিকে সূক্ষ্ম জলকণা ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়ছে। হৃদয়ের এই দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে যদি তোমাদের বেড়াতে যাবার সৌভাগ্য হতো, তোমরাও অবিকল ওই দৃশ্য দেখতে—চারিদিকে লাল রক্তের স্রোত প্লাবনের নদীর মত ফুলে ফেঁপে এগিয়ে আসছে।' ডাঃ ল্যাং এক চুমুক কফি খেলেন। আমাদের কারুর মুখে কোনো কথা নেই। 'এইবার কি হচ্ছে?' হাতে ডট পেনটা তুলে নিলেন। 'দক্ষিণ হৃদয় পাম্প করে এর রক্তকে পাঠিয়ে দিচ্ছে লাংসে। এই দেখ, ফ্রম হিয়ার টু দেয়ার।'

ডাঃ ল্যাং হঠাৎ ডট পেনটা ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ আমাদের মুখের দিকে অদ্ভুত এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমরা একটু ভয় পেলুম। কি হল কে জানে। আমাদের কারুর পা গায়ে লাগে নি তো! টেবিলের তলায় জোড়া জোড়া পা। ডক্টর হঠাৎ একটু হাসলেন। আমরাও হাসলুম। 'একটু খিদে খিদে পাচ্ছে, তাই না!' সমর্থনের আশায় আমাদের উদ্বিগ্ন মুখের উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে নিলেন। 'বেশীক্ষণ মাথার কাজ করলে আমার ভীষণ খিদে পায়।'

'আমারও'—পরেশ সোৎসাহে সমর্থন করল।

'দ্যাটস রাইট। হি ইজ মাই টাইপ। এই ছেলেটা বড় হলে আমার চেয়ে বড় সাইন্টিস্ট হবে। হোয়াট ইজ ইওর অ্যাড্রেস?' পরেশ তার বাড়ির নম্বরটা মনে করার চেষ্টা করে '২৩৩/১৪ বাই, বাই,' পরেশ বাই বাই করল দশ বারো বার। ডাঃ ল্যাং হাত তুলে বললেন, বাস্ বাস্ ফাটা রেকর্ডের মত বেজো না। ইউ নীড প্লেন্টি অফ প্রোটিন টু রিমেম্বার দ্যাট অ'ফুল নাম্বার।' বয়। তীক্ষ্ণ ডাকে বয় দৌড়ে এল—'কাটলেট ফর অল অফ আস। রাইট। হারি আপ।' পাইপটা নিভে গেছে। তবু ঠোঁটে লাগালেন। 'নাও সি বয়েজ। লাংসে গিয়ে রক্ত কি করছে? গেটিং প্লেন্টি অফ অক্সিজেন। তোমার প্রতিটি শ্বাসে

ফুসফুস তাজা অক্সিজেন বায়ু থেকে নিচ্ছে। রক্তপ্রবাহ বুদ্‌বুদ্‌ করে উঠছে! রক্ত অক্সিজেন শুষে নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছেড়ে দিচ্ছে। যেটা ফোঁস করে বেরিয়ে যাচ্ছে তোমার প্রশ্বাসের সঙ্গে। বাঁ দিকের হৃদয় ফুসফুস থেকে অক্সিজেনসমৃদ্ধ রক্তের ধারা গ্রহণ করে পাম্প করে পাঠিয়ে দিচ্ছে ধমনীতে। তার মানে রক্তনদীর ধারা চলেছে এই ভাবে।' ডাঃ ল্যাং ডট পেন দিয়ে কাগজে লিখলেন—

'ফ্লো অফ ব্লাডঃ দি গ্রেট ভেনস—রাইট আট্রিয়াম—রাইট ভেন্ট্রিকল—লাংস (ভায়া পালমোনারি আরটারি)—লেফ্‌ট আট্রিয়াম (ভায়া দি পালমোনারি ভেন) লেফ্‌ট ভেনটিকল—অ্যাওর্টা (শরীরের সবচেয়ে বড় শিরা, মহানদী)। একে বলে রক্তপ্রবাহের ক্লোজড সার্কিট। শরীরের মধ্যে অনবরত প্রবাহিত এই স্রোতধারা সরু, মোটা, নানা মাপের রক্তবাহিকা নালির মধ্যে অবিশ্রান্ত ছুটছে। প্রবাহের পথে বসে আছে হাতের মুঠোর আকারের এই শক্তিশালী পাম্প, যার নাম হৃদয়। অ্যাণ্ড হিয়ার কামস আওয়ার কাটলেট।'

বয় টপাটপ ডিসগুলো আমাদের প্রত্যেকের সামনে নামিয়ে দিয়ে গেল। অপূর্ব গন্ধে জিভে যেন জল এসে যায়। ডাঃ ল্যাং মরিচের পাত্রটা হাতে তুলে নিলেন। পরেশ আমার কানে কানে জিজ্ঞেস করলে—'এই হলদে মতো জিনিসটা কি রে?' আমারও ঠিক জানা ছিল না। নবেন্দুকে প্রশ্নটা চালান করে দিলুম। উত্তর ঘুরে এল—'মাস্টার্ড। একটু করে কাটো, মাস্টার্ডে ছোঁয়াও, আলতো গালে ফেলে দিয়ে একটু স্যালাড চালান করে দাও।'

'ডেলিসাস'। ডাঃ ল্যাং জ্বলজ্বলে চোখে মন্তব্য করলেন, 'দেয়ার ইজ নাথিং লাইক কাটলেট। কাটলেট না খেলে মানুষ সিভিলাইজড হয় না। আমার আবার এক ডজনের কমে মন ভরে না। দ্যাটস দি প্রবলেম। বয় বয়।' ডাঃ ল্যাং তারস্বরে চিৎকার শুরু করলেন, কাট-লেটের কামড়ে আমার ধমনীর রক্তপ্রবাহের গতিবেগ বেড়ে গেল। আমার বিল্ট ইন জেনারেটারে এখন হাই ভোল্টেজ বিদ্যুৎ খেলছে।

প্রফুল্ল আর একবার হবে নাকি?' ডাঃ ল্যাং হাসতে লাগলেন। প্রফুল্লদার তখনো ঘোর কাটেনি। করুণ মুখে বললেন, 'আজকে কার মুখ দেখে উঠেছি জানি না। ঘণ্টা দুয়েক হয়ে গেল, হাওড়া স্টেশানেই আটকে আছি, এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারবো কিনা জানি না।' ডাঃ ল্যাং বেশ তারিয়ে তারিয়ে কাটলেট খেতে খেতে বললেন, 'কার মুখ দেখেছো নবেন্দু, ঈশ্বরের নয়তো?'

নবেন্দু একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল। চমকে উঠে বলল, 'ও হ্যাঁ, সে এক সাংঘাতিক লোক। নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।'

'ইজ ইট?' ডাঃ ল্যাং হাড়ের টুকরোটা ডিশে ফেলে দিলেন—'হু ইজ হি? যার এত পাওয়ার! মাস্ট বি এ সায়েনটিস্ট লাইক মি?'

'সে এক সুদখোর, বন্ধকী কারবার করে।' নবেন্দু নামটা আর করল না। আমার ঠোঁটের ডগায় নামটা এসে গিয়েছিল, কোনোক্রমে সামলে নিলাম।

'আমি আর এক কাপ কফি খাই, কেমন? ডোণ্ট মাইণ্ড। তোমাদের দুবার হয়েছে। নো মোর।'

'আমি আর এক কাপ খেতে পারি না ডাক্তারবাবু?' প্রফুল্লদার করুণ প্রার্থনা। 'ডাক্তারবাবু! দ্যাটস ফাইন। আমি তোমার ফিজিসিয়ান! নট ব্যাড। আচ্ছা স্যাংকসানড। বয়।' দু'কাপ কফির অর্ডার গেল। 'নাও বয়েজ, কাম হিয়ার। আর একটু বাকি আছে।' আমাদের সব ক'টা মাথা আবার ঝুঁকে পড়ল কাগজের ওপর।

'এইবার ভরা পেটে তোমাদের দুটো সাংঘাতিক ইংরেজি শব্দ শেখাবো।' ডান হাতের সরু সরু লম্বা দুটো আঙুল 'ভির' মতো করে ডাঃ ল্যাং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। আমাদের উৎসুক অনেক জোড়া চোখ। 'শব্দ দুটোর একটা হল ডায়াস্টোল, আর একটা সিসটোল। বল, তুমি বল, রিপিট কর শব্দ দুটো, পরেশের অগ্নি-পরীক্ষা। বোধ হয় একটু অন্যমনস্ক ছিল পরেশ। আমতা আমতা করে বলল, 'কাশীর টোল আর শেরশাহের টোল।'

ডাঃ ল্যাং কিছুক্ষণ অবাক হয়ে পরেশের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ওরে আমার সোনার চাঁদ ছেলে রে! কি সেবিব্রাল পাওয়ার নরেন্দু, তোমার দলে এরকম পাঁঠা আর ক'জন আছে? একে এখুনি কাটলেট করে খেয়ে ফেলা উচিত। গর্দভ। টোল শুনলেই বেদের টোল, পণ্ডিতমশায়ের টোল, টুল বলোনি এই আমাদের ভাগ্য।' প্রফুল্লদা বললেন, 'ডায়াস্টোল সিস্টোল।' ডাঃ হাস-হাসি মুখে প্রফুল্লদাকে বললেন—'আ, হিয়ার ইজ মাই ব্রাইট ফেণ্ড। আরে, তোমার মগজে দেখছি ওই ইডিয়েটটার চেয়ে বেশি গ্রে-মেটার আছে।' পরেশের মুখটা লজ্জায় লাল। ছালভাঙা নারিকেল মতো বললে, 'আমার মাথা সহজে কিছু ঢুকতে চায় না।'

'ঢুকবে কি রে বাবা। তোমার মধ্যে ঢোকার যে একটি রাস্তা। মু দিয়ে উদরে। জ্ঞান জিনিসটাতো আর কাটলেট নয় যে, পরেশবা ফকে গেঁথে বিট বাই বিট মাস্টার্ড মাখিয়ে খেয়ে ফেলবে! তোমার দাওয়াই আমার পকেটে আছে।' পরেশ হুমড়ি খেয়ে ডাঃ ল্যাংয়ের পা জড়িয়ে ধরে আর কি, 'আমাকে বাঁচান, অঙ্কে তিরিশ, ইংরেজি বত্রিশ, লাইফ সায়েন্স বাইশ।'

'সপ্লেনডিড। চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও। ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়। একদিন তোমারও হবে। ইহজন্মে কিম্বা পরজন্মে।' পরেশ কিন্তু একেবারে ভেঙে পড়ল, 'পরের বার এইরকম রেজাল্ট হলে বাবা বলেছেন, গম ভাঙার কলে লাগিয়ে দেবেন।'

'আ, এ ব্রাইট ফিউচার। কিন্তু সেখানেও যে হিসেব আছে বাবা। আচ্ছা নরেন্দু কি বলে? নরেন্দু, তোমার ফেণ্ডকে একটু ইনটেলিজেন্ট করে দেবো?' নরেন্দু এতক্ষণ চুপ করে ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'করা যায় নাকি?' ডাঃ ল্যাং বললেন, 'যায় না বলে পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই! দেখবে যায় কি না?' ডাঃ ল্যাংয়ের কাছে ব্যাপারটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল। আর দেখাই গেছে, যে কোনো চ্যালেঞ্জে তাঁর চেহারা।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা রুপোলী কৌটো বের করলেন।

কৌটোটার একটা দিক চাপ দিতেই খুট করে ডালাটা খুলে গেল, ভেতরটা গাঢ় নীল। সারি সারি সাজানো সোনালী ট্যাবলেট। দু আঙুলে একটা ট্যাবলেট তুলে নিয়ে বললেন, 'ওয়ান ট্যাবলেট উইল ট্রান্সফর্ম ইউ। তোমার পার্সোন্যালিটি ভেঙে চুরমার করে, তোমার ভেতর থেকে আর একটা সেলফ বের করে আনবে। বাট মাইণ্ড ইট, তোমার স্বভাব কিন্তু একেবারে পাল্টে যাবে। তোমার খাই খাই ভাব কমে যাবে, ঘুম কমে যাবে, কথা বলার ইচ্ছে কমে যাবে।' পরেশ সোনালী ট্যাবলেটটা খাবার জন্যে পাখির ছানার মতো বারে বারে হাঁ করছিল। ডাক্তার তাকে নিরাশ করে ট্যাবলেটটা আবার কৌটোয় ভরে রাখতে রাখতে বললেন, 'তোমার অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়া এটা আমি তোমাকে দিতে পারব না। এ খেলে মানুষের ক্যারেকটার চেঞ্জ হয়ে যায়।' পরেশ দুঃখ পেলে কি হবে? আমাদের খুব আনন্দ হল। একা পরেশ বুদ্ধিমান হয়ে যাবে, আর আমরা সব ক'টা যেমন ছিলুম তেমনি থাকবো। তা কি করে হয়।

'তোমাদের আর প্রশ্ন করব না, কি বলতে কি উত্তর দেবে; আমার কাটলেট খাওয়া মেজাজটাই নষ্ট হয়ে যাবে। ডায়াস্টোল আর সিসটোল হল হৃদস্পন্দনের দুটো পর্যায়। ডায়াস্টোল হল হার্টের বিশ্রামের সময়, যে সময় রক্ত আট্রিয়া থেকে ভেনট্রিকলে যায়। সিসটোলের সময়, ভেনট্রিকল ভীষণভাবে সঙ্কুচিত হয়। রক্ত তখন ফুসফুসের দিকে ছুটতে থাকে শিরা উপশিরার দিকে। এই পর্যায়ে হৃদয়ের দুটো ভাগে স্পন্দন অদ্ভুতভাবে মিলে মিশে কাজ করে। ডায়াস্টোলের সময় হার্টের বাঁ এবং ডান প্রকোষ্ঠ হাত পা ছড়িয়ে এই আমার মতো বসে থাকে। রিল্যাকসড। আমার এখন ডায়াস্টোল। সিসটোলের সময় দুটোই সঙ্কুচিত হয়। ওই প্রফুল্লর গানের মতো।' প্রফুল্লদা ঠিক সেই সময় বিড়ির ধোঁয়া টানছিলেন।

'পরেশ কিছু বুঝছে বলে মনে হয় না, তবু আমায় বলতে হবে, বলা যখন শুরু করেছি, কি বল নবেন্দু? না বন্ধ করবো? রহস্যটা রহস্যই

থেকে যাক, কি বল? আমার সিক্রেট।' ডাঃ ল্যাং উদাস উদাস মুখে তাকিয়ে রইলেন। আমরা হৈ হৈ করে উঠলুম, 'তা কি করে হয়? আমরা যে হাঁ করে আছি শোনার জন্যে।' 'তা হলে শোনো। ডাঃ ল্যাং ডট পেন তুলে নিলেন হাতে, 'সারা জীবন, তোমরা যতদিন বাঁচবে, তোমাদের এই ছোট্ট হৃদয় নিয়মিত আপনি আপনি স্বয়ংচালিত ঘড়ির মতো ধুকধুক করবে। যেদিন ইনি থামবেন সেদিন তোমার গণেশ উল্টে যাবে। শরীরের প্রয়োজন অনুসারে ঠিক যতটা রক্ত যখন যে সময়ে পাম্প করা উচিত তাই করবে। কি করে তা সম্ভব! কে সেই যন্ত্রী যে আমাদের হৃদয়ের কারখানায় সারা জীবন বসে বসে এর চলা নিয়ন্ত্রণ করছে! গোছা গোছা বিশেষ একধরনের টিস্যু বা তন্তু হার্টের মধ্যে এমন কায়দায় জড়ানো আছে যারা এই ঘড়ির কায়দায় হৃদয়ের স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করছে। দক্ষিণ আস্ট্রিয়ামের উপর বসে আছে হার্টের 'পেসমেকার'। 'পেসমেকার মানে কি পরেশ?' পরেশের বুদ্ধি খুলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 'আজ্ঞে পেসকার। কোর্টে পাওয়া যায়। আমার মামা পেসকার ছিলেন স্যার।'

ডাঃ ল্যাং, 'উরে বাবারে' বলে দুটো হাত দিয়ে নিজের মাথা চেপে ধরলেন। পরেশ যেন গুলি করেছে। 'না, সোনালী ট্যাবলেট এই গবেটটাকে খাওয়াতেই হবে।' ডাঃ ল্যাং পাইপ খুঁচতে খুঁচতে বললেন, 'পেসমেকার মানে—যে চলার ছন্দ নিয়ন্ত্রণ করে। হার্টের পেসমেকারের নাম সাইনো-অরিকিউলার নোট। এই পেসমেকার প্রতি মিনিটে হার্টের স্পন্দন ৬০ থেকে ৯০ বারে ধরে রেখেছে। পরেশ নামটা একবার রিপিট করবে নাকি? নবাবা দরকার নেই, এখুনি হয়তো বলে বসবে সাইনো সোভিয়েট প্যাক্ট। এই যে মিনিটে ৬০ থেকে ৯০ বারের স্পন্দন, এই স্পন্দন বাম এবং ডান আট্রিয়ার দেওয়াল বেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ফলে কি হচ্ছে, হার্টের সংকোচন। এইবার আর একটা দাঁতভাঙ্গা নাম বলি—ইণ্টার আট্রিয়াল সেপমাম। বাম এবং ডান আট্রিয়ার সীমানায় ইনি প্রহরী। প্রহরী কেন, আর এক যন্ত্রবিৎ,

যিনি আর একটি স্পন্দনের ঢেউ তুলে রেখেছেন, যার নাম রাখা হয়েছে এ ভি। বড় করে বললে এট্রিয়ো ভেনট্রিকিউলার নোড। এই এ ভি আবার স্পন্দনটাকে রিলে করে দিচ্ছে দুটো ভেনট্রিকলের গা বেয়ে, যার ফলে ভেনট্রিকল দুটোয় একই ভাবে সঙ্কুচিত হচ্ছে। হৃদয় তাই ময়ূরের মতো নাচছে কিনা জানি না, তবে গান গাইছে লাবডুব লাবডুব। হার্টকে আমাদের যে সিসটেম নাচাতে পারে, হৃদয়হীন কিম্বা হৃদয়বান করে তুলতে পারে, তিনি বসে আছেন এই ব্রেন সেণ্টারে। পরেশেরও আছে। আমরা বলি না—ভবে বুক কেঁপে গেল, আনন্দে তিড়িক তিড়িক করে নেচে উঠল, গর্বে দশহাত হল! এ সব অনুভূতি-রাজ্যের জিনিস। ব্রেনের এই সব অনুভূতি দুটি আলাদা রাস্তায় ব্রেন থেকে হৃদয়ে নেমে আসে। একটি পথ—ধর ন্যাশনালহাইওয়ে ১—যার নাম সিমপ্যাথেটিক পাথওয়েস, ব্রেন থেকে হার্টে এসেছে। এই রাস্তায় যে অনুভূতি আসে তা আমাদের হৃদয়ের স্পন্দন বাড়িয়ে দেয়। আর এন এইচ দুই, যার নাম প্যারা সিমপেথেটিক পাথওয়েস, সেই রাস্তা এসেছে মেরুদণ্ড থেকে হৃদয়ে। দুঃখ, ভয়, আনন্দ এইসব অনুভূতি ব্রেন থেকে সোজা এই দু'রাস্তায় হৃদয়ে নেমে এসে তার স্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করে। বুঝলে কিছু? ঘোড়ার ডিম বুজেছো।'

ডাঃ ল্যাং আর একবার পাইপ ধরালেন। 'এই বার তোমাদের আর্টারির কথা বলবো, কিন্তু তার আগে, ডোণ্ট মাইণ্ড, এক কাপ কফির অর্ডার দি। বক বক করে গলা শুকিয়ে গেছে। বয় বয়।' ডাক্তার কফির অর্ডার দিলেন। 'রক্ত, বুঝলে নবেন্দু, এয়োর্টা দিয়ে হার্ট থেকে বেরিয়ে আসে কলকলিয়ে, আমাদের শরীরের সব চেয়ে বড় ধমনী। কৃষ্ণা, কাবেরী কিম্বা গঙ্গা। আমার দেহের ওপরের খোলসটা যদি ছাড়িয়ে ফেল, তাহলে তোমাদের কি মনে হবে জানো? —আমি যেন একটা গাছ। অসংখ্য শিরা-উপশিরার শাখা-প্রশাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সবচেয়ে বড় ধমনীর প্রবাহপথে হৃদয় ত্যাগ করে রক্তের নদী হার্ট থেকে যত দূরে যাচ্ছে, ততই ছোট ছোট শাখা

নদীতে ঢুকে পড়ছে। যে সংকোচনকে আমরা সিসটোলিক বলছি, সেই চাপে রক্ত ছুটছে ধমনীতে, শিরা-উপশিরায়, সমস্ত দেহকাণ্ডে। কবজির কাছে নাড়ীতে আঙুল ছোঁয়ালে যে স্পন্দন আমরা অনুভব করি সেইটাই হল হার্টের সিসটোলিক কনট্রাকশন বা আমরা সাধারণ ভাবে যাকে বলি পাল্স। দাঁড়াও, এইবার একটু কফি খাই। আয়্যাম ড্যাম থার্স্টি।'

কফি খেতে খেতে ডাঃ ল্যাংগুয়ের পেটটা যেন কফির ট্যাঙ্ক হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিকদের ব্যাপারই আলাদা। 'এইবার শোনো, এই যে আমাদের সারা শরীরে ছড়িয়ে থাকা আর্টারি, এ তোমার জলের পাইপের মতো শুধু রক্ত বহন করে না, এদের আবার কিছু নিজস্ব ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন আমাদের সৃষ্টিকর্তা। এই আর্টারি রক্তের প্রবাহ সারা শরীরে বিতরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যেসব আর্টারি বা ধমনী বেশ মোটা তাদের ভেতরের দেওয়ালে আছে ইল্যাসটিক টিস্যু। হার্টের সিসটোলিক সংকোচনে যেই রক্তের প্রবাহ বাড়ে অমনি এই ইল্যাসটিক টিস্যুর আবরণে আবৃত আর্টারি প্রসারিত হয়ে সেই বড়তি রক্তধারা প্রবাহের পথ করে দেয়। আবার ডায়াস্টোলের সময় স্বাভাবিক হয়ে যায়। একবার ফুলছে আবার পরক্ষণেই কুঁচকে যাচ্ছে।

'সরু ধমনীর ভেতরের দেয়ালের মসৃন পেশীরও কিছু কাজ আছে। তুমি অলস বসে থাকতে পার হাত পা ছড়িয়ে কিন্তু তোমার শরীরের ভেতরের সিসটেম বসে নেই। সবসময় তারা নিজেদের কাজ করে চলেছে। আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীর স্বয়ংক্রিয় শাখার অতি সূক্ষ্ম লেজগুলো এই মসৃন পেশী-দেয়ালে লেপ্টে আছে। এদের বলে আর্টারিয়োল, বেশ সোরগোলের জিনিস। এরা আমাদের সতর্ক প্রহরী। আমাদের শরীরের ভেতরের কাজকর্মের সঙ্গে আপনা আপনি সঙ্গতি বজায় রেখে চলেছে। আমাদের স্নায়ুর চাহিদা অনুসারে এইসব আর্টারিয়োল বেড়ে গিয়ে কিম্বা কমে গিয়ে শরীরের যে অংশে যেমন রক্তের প্রয়োজন তা পাঠাবার ব্যবস্থা করে। এরা সব গ্রেট ম্যানেজার।'

ডাঃ ল্যাং কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে কাপটা খালি করলেন। ডান হাত দিয়ে মাথার চুল ঠিক করলেন। হাতের ঝকঝকে রিস্ট ব্যাণ্ড আলোয় ঝলসে উঠল, যেখানে আছে তাঁর বিদ্যুৎশক্তির উৎস।'

'ঈল' বলে একরকম মাছ আছে জানো? সিল নয় কিন্তু, ঈল'।

আমাদের মধ্যে নবেন্দুর পড়াশোনাই বেশি। জানেও অনেক। সহজে ঠকে না। নবেন্দু বললে, 'ঈল মাছ হল সামুদ্রিক বান মাছ। গত শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এদের সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের যথেষ্ট কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এদের চাল-চলন জন্ম-বৃত্তান্ত সবকিছু রহস্যাবৃত ছিল। এখন অবশ্য এদের সম্পর্কে মানুষ অনেক কিছুই জেনেছে। আরো জানার চেষ্টা চলছে।'

'সে প্লনডিড।' ডাঃ ল্যাং হাসি-হাসি মুখে নবেন্দুর পিঠ চাপড়ে দিলেন। 'ঠিক বলেছ। ঈল হল জীব-জগতের বিস্ময়। ভূমধ্যসাগরের নাবিকরা একসময় যখনই ঈল ধরতো দেখতো সব মাছই বড়। ছোট মাছ কিম্বা মাছের ডিম কখনই তাদের জালে পড়ত না। তারা অবাক হয়ে ভাবত, ঈলের তাহলে কি বাচ্চা হয় না? এরা কি ডিম পাড়ে না? কিন্তু আমি তোমাদের হঠাৎ ঈল মাছের কথা বলছি কেন? কেন বলছি পরেশ?'

পরেশ বোকার মতো একটু হাসল। ডাঃ ল্যাং বড় বড় চোখ করে প্রশ্নটা আবার করলেন। তিনি উত্তর চান। চুপ করে থাকলে চলবে না। অথচ পরেশ ঠেকে শিখেছে, যা জানে না তার উত্তর দেবার চেষ্টা করা মানেই, ডাঃ ল্যাঙের উপহাসে চুপসে যাওয়া। পরেশ বুদ্ধিমানের মতো বললে, 'ঠিক জানি না।'

'গুড'। ডাক্তার বললেন, 'ভেরি গুড। যা-তা বলার চেষ্টা করনি এর জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। এই ঈল মাছেদের মধ্যে এক ধরনের ঈল আছে, যাদের বলে ইলেকট্রিক ঈল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা গল্প শোনো।' ডাক্তার পাইপ ধরাবার জন্যে একটু চুপ করলেন।

পরেশ হাঁউ করে বিশাল একটা হাই তুলল। ডাক্তার আড়চোখে তাকিয়ে বললেন, 'হোয়াট ইজ দ্যাট? ঈলের কথা শুনে তুমি দেখছি শীলের মতো হাই তুলছো। তোমার বুঝি শুনতে ভাল লাগছে না। দেন আই স্টপ হিয়ার।'

আমরা সকলে হৈ হৈ করে উঠলুম, 'না-না, আপনি বলুন, আপনি বলুন।' পরেশটার মাথায় খটাস করে একটা গাঁট্টা মারতে ইচ্ছে করছিল। ডাঃ ল্যাং একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দেন আই বিগিন।' আমরা সবাই সোজা হয়ে বসলুম।

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় একদল যুদ্ধ-ঘোড়া ইওরোপের একটা অগভীর নদী সাঁতরে পার হচ্ছিল। যুদ্ধসম্ভার নিয়ে যাচ্ছিল আর কি। দেখা গেল এক একটা ঘোড়া জলে নেমেই যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে। চিঁ হিঁ হিঁ হিঁ করে চিৎকার করে উঠছে। মহা বিপদ, ব্যাপারটা কি? মেজর জেনারেল এগিয়ে এলেন, "লেট মি সি, লেট মি সি।" স্বচ্ছ কাঁচের মত জল। অজস্র ঈল মাছ সাপের মতো কিলবিল করছে। কি আর এমন বড় মাছ। লম্বায় একটা তিরিশ বত্রিশ ইঞ্চির বড় হবে না। যে সমস্ত ঘোড়া যন্ত্রণায় ছটফট করে উঠছে তাদের পায়ের কাছে এক একটা ঈল এসেই ছিটকে সরে সরে যাচ্ছে। ওইটুকু মাছের কি এমন দাঁতের ধার, কী এমন কামড় যে, শক্তিশালী অত বড় বড় ঘোড়া কাবু হয়ে পড়ছে! গবেষণার বিষয় অবশ্যই। দেখা গেল কামড় নয়, সামান্য স্পর্শেই ঘোড়া কাবু। ন্যাজ আর মুড়ো একসঙ্গে ঠেকলেই ঘোড়া যন্ত্রণায় লাফিয়ে উঠছে। ভঙ্গিটা অনেকটা সাপের ছোবলের মতো। স্বচ্ছ ঈল মাছ চলে এল বৈজ্ঞানিকদের গবেষণার টেবিলে। একদল বিশেষজ্ঞ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। দেখা গেল সেই কাঁচের মতো স্বচ্ছ ঈলের মেরুদণ্ডের দুপাশে সারি সারি সাজানো রয়েছে অণুর মতো ছোট ছোট কোষ। মাইক্রস-কোপিক। দেখতে গোলাকার। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত সারি সারি চলে গেছে। এই অণুকোষগুলিই হল তড়িৎ কোষ। মেরুদণ্ডের এক

পাশটি হল পজিটিভ পোল অন্য পাশটি হল নেগেটিভ। ধনাত্মক আর ঋণাত্মক। এরাই হল ইলেকট্রিক ঈল।

'কোনো কোনো ইলেকট্রিক ঈল ইচ্ছে করলে ৫০০ ভোল্টের মতো ডিরেকট কারেন্ট উৎপাদন করতে পারে নিমেষে, অক্লেশে। এখন একটা তুলনামূলক তথ্য দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে এই বৈদ্যুতিক মাছের বিদ্যুৎ শক্তি কতখানি। সাধারণ রাসায়নিক তড়িৎ কোষ ১·১ থেকে ২·১ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ-তরঙ্গ তৈরি করতে পারে। ড্যানিয়েল সেল ১·১ ভোল্ট, লীক্লানসে সেল ১·৫ ভোল্ট, সঞ্চয়ক কোষ বা স্টোরেজ সেল, যা মোটর গাড়িতে থাকে ২·১ ভোল্ট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উপাদন করতে পারে। আর ইলেকট্রিক ঈল ৫০০ ভোল্ট! ফ্যানটাসটিক, কি বল? ফ্যানটাসটিক।' ডাঃ ল্যাং আপন মনে হাসতে লাগলেন পাইপটাকে উল্টো করে টেবিলে ঠুকতে ঠুকতে তিনি যেন অন্য জগতে চলে গেলেন। আমরা যেন তাঁর সামনে নেই। শুধু নির্জন দুপুরে কাঠঠোকরা পাখির ঠোঁটের শব্দের মতো শব্দ হচ্ছে ঠক ঠকা ঠক ঠক।

এক সময় তাঁর তন্ময়তা কেটে গেল। আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যেন এইমাত্র দেখা হল। কোনো প্রশ্ন করার সাহস হল না। নিজে থেকে যখন শুরু করবেন তখন করবেন। ধৈর্যই আমাদের মূলধন। ডাক্তার পাইপটা ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পাইপের মুখে আগুন দপ করে জ্বলে উঠে নিভে গেল। একরাশ ধোঁয়ায় তাঁর মুখ চাপা পড়ে গেল অল্প সময়ের জন্যে। ধোঁয়া সরে গিয়ে তাঁর মুখ স্পষ্ট হতেই তিনি আবার শুরু করলেন।

'বুঝলে নবেন্দু, আমিও একটি বৈদ্যুতিক মানুষ, ইলেকট্রিক ম্যান। ঈল মাছের কায়দাতেই আমি ডিরেকট কারেন্ট তৈরি করছি। ঈল মাছের মেরুদণ্ডের দুপাশে সাজানো তড়িৎকোষ খুলে বৈজ্ঞানিকরা আঠার মতো চটচটে একধরনের পদার্থ পেয়েছেন। এই জেলিই মাছের প্রাণ-তরঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে বলে অনুমান। আমার শরীরেও আমি অস্ত্রোপচার করে অণু-তড়িৎ-কোষ প্রধান রক্তবাহী নালীর

দুপাশে সাজিয়ে রেখেছি। আমার এই দুটো আঙুলের একটা ধনাত্মক, পজিটিভ পোল; অন্যটি ঋণাত্মক, নেগেটিভ পোল। ধাবমান রক্তের প্রচণ্ড বেগ ও উত্তাপে ওই সব কোষে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে এই দুটো আঙুলের মাথায় এসে জমছে। দুটো আঙুল এক করে যাকে আমি স্পর্শ করব তার অবস্থা হবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ওই ঘোড়ার মতো। যন্ত্রণায় ছিটকে পড়ে যাবে। মরবে না, সারা শরীর তার অবশ হয়ে পড়বে।'

ডাক্তার আবার অন্য জগতে চলে গেলেন। চোখ বুজিয়ে চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিয়েছেন। ঠোঁটের ডগায় পাইপ ঝুলছে। সরু ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমরা সকলে উন্মুখ শ্রোতা। ডাক্তার তাঁর সেই অন্য জগৎ থেকে ভারি গলায় বললেন, 'এই আমার বুকের বাঁদিকে সেই শক্তির উৎস, আমার হৃৎপিণ্ড, আমাদের হার্ট। পানের মতো ছোট্ট এতটুকু একটা পেশীময় আকৃতি। ধমনার এক প্রান্ত দিয়ে হু হু করে লাল রক্তের স্রোত বয়ে আনছে। এক প্রকোষ্ঠ থেকে আর এক প্রকোষ্ঠে, সেখানে রয়েছে বহু অশ্বশক্তিসম্পন্ন একটা পাম্প। সেই পাম্প প্রচণ্ড চাপে সমস্ত রক্ত ঠেলে দিচ্ছে শরীরের গোদাবরীতে, কৃষ্ণা, কাবেরীতে। শরীরের সমস্ত সেচ ক্ষেত্রের পাশ দিয়ে প্রবাহিত নদী ছোটো ছোটো শাখায় সেই ধারাকে প্রবাহিত করে দিচ্ছে। তাই আমরা সফলা, সুফলা, সবুজ, তরুণ, যৌবনের জোয়ার। এই তো, কান পেতে শোনো, অনবরত শব্দ করে পাম্প চলেছে। সেই রক্তনদীর স্রোতের মাঝখানে বসিয়ে রেখেছি আমার নিজের হাতের তৈরি ছোট্ট একটা টারবাইন! ঘুরছে, ঘুরছে সেই টারবাইন। তৈরি হচ্ছে বিদ্যুৎ। সেই বিদ্যুৎ চলে আসছে আমার কৃত্রিম কোষে, আমার একাধিক পাওয়ার হাউসে। হাঃ হাঃ, আমি এক সচল বিদ্যুৎ কেন্দ্র।' ডাক্তার হঠাৎ ঝাঁকানি দিয়ে উঠে বসলেন।

আমরা একটু চমকে উঠলুম; সত্যি ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলুম। সাংঘাতিক মানুষকে বিশ্বাস নেই। গায়ে এতটুকু আঙুল ছুঁইয়ে

দিলেই আমরা কাত। ডাক্তারের চোখে উদার হাসির ঝিলিক, মনে হচ্ছে যেন মিশনারী ফাদার। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'নাও বয়েজ, লেট আস বিগিন আওয়ার একসপিডিসান নাম্বার টু। অপারেশান গিনিপিগ।' নবেন্দুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আমার সেই গিনিপিগ। যারা এতক্ষণ সারা স্টেশনে ছড়িয়ে পড়েছে। মাই পুওর অ্যানিমেলস।'

কফিখানা ছেড়ে আবার আমরা স্টেশনে। লোক ছুটছে। মানুষের মাথায় মাল ছুটছে। বিশাল ঘড়ির কাঁটা আটকে আছে বারোটার ঘরে। মাইকে গলার প্রতিধ্বনি। 'আওয়ার নেকসট ট্রেন ফর পাঞ্জাব।' এতক্ষণ যেন আমরা অন্য জগতে ছিলাম। রিপ ভ্যান উইঙ্কলের মতো একটা ঘুম দিয়ে ২২শে মের সকাল বারটায় কলকাতা অথবা হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মে জেগে উঠেছি।

পরেশ হঠাৎ নিচু হয়ে একটা ফলের ঝুড়ি উল্টে দিল। প্রায় হামা-গুড়ি দিয়ে কি যেন খুঁজছে। কোমরে দুহাত রেখে ডাক্তার বললেন, 'কি হল পরেশবাবু। মোহর নাকি।' হাতের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হেসে বললে, 'নেই!'

—'কি নেই?'

—'গিনিপিগ।'

—'মাই গড! তুমি কি ভেবেছিলে ওরা তোমার জন্যে ওপর তলায় অপেক্ষা করে বসে আছে! হাও ফানি মাই বয়।'

পরেশ হন্তদন্ত হয়ে আর একদিকে ছুটছিল। ডাক্তার খপ করে তার হাত চেপে ধরে বললেন, 'নো নো, মাই বয়। ওভাবে নয়। সবকিছুরই একটা মেথড আছে। অ্যাণ্ড হোয়াট ইজ দ্যাট?'

আমরা ডাক্তারকে ঘিরে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লুম। সত্যিই তো। কোথায় তারা আছে। কিভাবে আছে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম বিশাল এই স্টেশনে তারা ছড়িয়ে গেছে। হোয়াট ইজ দি মেথড?

মেথড! আমরা সকলে মেথডের অপেক্ষায় গিনিপিগ ধরা ভুলে ডাঃ ল্যাঙের চার পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। প্রকাণ্ড স্টেশনের কোথায় কে ঘাপটি মেরে বসে আছে কে জানে! একমাত্র ভগবান ছাড়া কারুর ক্ষমতা নেই সহজে তাদের উদ্ধার করে।

নবেন্দু বললেঃ 'মেথডটা বলুন।' ডাঃ ল্যাং হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসলেন, তারপর বললেন, 'আর দু মিনিট অপেক্ষা কর। ডোণ্ট মুভ। যে যেখানে আছ সেইভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। লেট আস প্রে ফর দেম।' ডাক্তার নিচু হয়ে খাঁচার দরজাটা খুলে উত্তরমুখো পায়ের কাছে বসিয়ে রাখলেন। খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। ব্যস্ত স্টেশনে মালপত্র, লোকজন চারপাশ দিয়ে স্রোতের মত হু হু করে ছুটে চলেছে আর আমরা একটা দল স্থির হয়ে পেঙ্গুইন পাখির মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে আমরা ক'জন কোনো প্রিয়জনের মৃত্যুতে দু মিনিট নীরবতা পালন করছি যেন।

হঠাৎ সাদা মতো একটা কি ঝড়ের বেগে খাঁচায় ঢুকে গেল। প্রথমে মনে হয়েছিল বন্দুকের নলের মুখ থেকে বুঝি ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছিটকে এল। দেখতে দেখতে আর একটা, তারপর আবার একটা। পটা-পট একের পর এক খাঁচায় এসে ঢুকছে ঝড়ের বেগে। ঢুকেই লুটিয়ে পড়ছে অবশ হয়ে। নবেন্দু চুপ করে থাকতে না পেরে বলেই ফেলল, কি রে বাবা, ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি!' ডাক্তার নবেন্দুর পিঠে আদরের হাত রেখে বললেন, 'অনেকটা তাই। প্রকৃতির শক্তি আর সাধারণ নিয়ম কানুনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারলেই তুমি ভৌতিক শক্তির অধিকারী হবে। যেমন ধর, এই মুহূর্তে আমি যদি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি জয় করে গ্যাস বেলুনের মতো আকাশে ভাসতে থাকি, তুমি ভাববে আমি ভূত হয়ে গেছি। আমি যদি হঠাৎ ঝাপসা হতে হতে অদৃশ্য হয়ে যাই, তোমরা ভয় পেয়ে যাবে। ভেবো না এসব একেবারে অসম্ভব ব্যাপার। ভূতে যা পারে মানুষও তা পারে। তবে হ্যাঁ,

সাধনা চাই শিক্ষা চাই।' কথা বলতে বলতে ডাক্তর নিচু হয়ে খাঁচাটা দেখতে লাগলেন। গুনে-গেঁথে বললেন, 'ওয়ান শর্ট। আর এক ব্যাটা গেল কোথায়?'

প্রফুল্লদা বললেন, 'একটা যে কুকুরের পেটে গেছে।'

'দ্যাটস রাইট, থ্যাঙ্ক ইউ মাই ফ্রেণ্ড।' ডাক্তার খাঁচার দরজাটা বন্ধ করে সোজা হলেন আর ঠিক সেই মুহূর্তে সারা স্টেশন কাঁপিয়ে একটা কুকুর ঘাঁউ ঘাঁউ করে ডেকে উঠল। বিশাল একটা অ্যালসেশিয়ান আমাদের দিকে তেড়ে আসছে, পেছনে চেন ধরে ঘষটাতে ঘষটাতে আসছেন কুকুরের মালিক। সামাল সামাল রব উঠেছে চারিদিকে! কুলিরা মাল ফেলে পালাচ্ছে। যাত্রীরা ভয়ে এ ওর ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। খাঁচার সামনে এসে কুকুর শান্ত হল।

ডাক্তার বললেন, 'এসেছিস। দে, আমার মাল বের করে দে। খাবার সময় মনে ছিল না, কান ধরে টেনে আনবো!' ক্ষতবিক্ষত মনিবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি, কতদূর থেকে টেনে নিয়ে এল? খুব তো বোলচাল মেরেছিলেন তখন, এখন সামলান ঠ্যালা!'

ভদ্রলোক হাঁপাতে হাঁপাতে জামা-কাপড়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'মশাই সবে স্টেশন থেকে বেরিয়ে শিবপুরের দিকে পা বাড়িয়েছি, কুকুরটা বেশ যাচ্ছিল সামনে সামনে, হঠাৎ কি হল—চনমন চনমন করে উঠল কয়েক বার,কান দুটো খাড়া হয়ে উঠল, এদিক ওদিক তাকাল, ফোঁস ফোঁস করে মাটি শুঁকলো কয়েকবার। তারপর উল্টো দিকে মারল এক হ্যাঁচকা টান। তৈরি ছিলুম না তো, উল্টে পড়ে গেলুম। ভাগ্যিস চেনটা ছেড়ে যায় নি হাত থেকে। কোনোরকমে উঠলুম। সামলানো যায় এত বড় কুকুর! সেই থেকে হিড় হিড় করে টেনে আনছে। রাসকেল কুকুর, অদ্যই তোর শেষ রজনী।' ভদ্রলোক রেগে গিয়ে কুকুরকে জুতোপেটা করতে যাচ্ছিলেন। ডাক্তার থামিয়ে দিলেন, 'করছেন কি! কুকুর কিংবা মানুষ

কারুকেই মারধোর করা উচিত নয়। দ্যাট্স ভেরি ব্যাড। শিক্ষা দেবার ওটা ঠিক রাস্তা নয়। তাছাড়া কুকুরের তো দোষ নেই। দোষ ওর আহারের। পুওর ক্রীচার! লোভে পড়ে সেই গিনিপিগ খেয়ে মহা বিপদে পড়েছে। গিনিপিগ হজম হয়ে যাবে, হজম হবে না হাই ফ্রিকোয়েনসি রিসিভিং সেটটা। যতদিন ওটা পেটে থাকবে ততদিন ওকে ছটফট করতে হবে।'

ভদ্রলোক প্রায় আঁতকে উঠলেন, 'অ্যাঁ, বলেন কী! রেডিও খেয়ে ফেলেছে! রেডিও কি খাবার জিনিস? শুনেছি ছাগলে কি না খায়? কুকুরেও কি তাই!'

ডাক্তার বললেন, 'রেডিও খাবো বলে খেয়েছে বললে ওই মূক জন্তুটির প্রতি অবিচার করা হবে। আসলে আপনার কুকুর গিনিপিগের ক্যাপসুলে একটি ছোট সেট গিলে ফেলেছে। চিবিয়ে ফেললে অসুবিধে ছিল না। গিলে ফেলাই সেটটির কর্মশক্তি অটুট আছে। এবং দীর্ঘকাল তাই থাকবে। এবং—ডাক্তার এই এবং দিয়ে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরী করলেন যার অর্থ—বোঝো বাছা কত ধানে কত চাল!

ভদ্রলোক করুণ মুখে ডাক্তারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, 'একটা কিন্তু ভাল হবে। সারাদিন ঘেউ ঘেউ না করে হাঁ করলেই বিবিধ ভারতী বেরোবে। কি মজা, কি মজা।' কুকুরের মালিকের শিশুর মতো আনন্দ দেখে পরেশ আহ্লাদে আটখানা। থাকতে না পেরে বলেই ফেললে, 'কুকুরটা আপনার বহুব্রীহি সমাস হয়ে গেল, কুকুরও যে রেডিওও সে—ইজ ইকোয়াল টু রেডিও কুকুর বা কুকুর রেডিও।' নরেন্দু পরেশের পাণ্ডিত্য থামিয়ে দিল।

আমার মতো নরেন্দুর মাথাতেও নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। কিভাবে গিনিপিগগুলো ফিরে এল আপনা আপনি, কুকুরটাই বা দৌড়ে এল কেন? বুদ্ধি দিয়ে তো এর ব্যাখ্যা করা চলে না। পায়েড পাইপার অফ হ্যামলিনে অবশ্য পড়েছি, বাঁশী বাজিয়ে সমস্ত ইঁদুর

বের করে আনার কথা। সেখানে সুর ছিল, সুরের আকর্ষণ ছিল, কিন্তু এখানে? শব্দ নেই, সুর নেই, চুপচাপ আমরা শোক প্রস্তাব নেবার ভঙ্গিতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলুম আর চোখের সামনে ঘটে গেল অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! নবেন্দু প্রশ্নটা চেপে রাখতে পারল না। 'কি করে কি করলেন আমাদের একটু বুঝিয়ে দিন!'

ডাক্তার ডান হাতের একটা আঙুল উঁচু করে বললেন, 'বলব, বলব, সময় মতো সব বলব; তার আগে এই কুকুরটা বিদায় করি। তা না হলে এই কুকুরও আমাদের নিয়ে যেতে হবে নবেন্দু।'

'নিয়ে যাবেন,' কুকুরের মালিক যেন হাতে চাঁদ পেলেন। 'বেশ তো, বেশ তো, যান না নিয়ে, এই চেন আর বগলস সুদ্ধই নিয়ে যান, আমার কোনো আপত্তি নেই। এই প্যাকেটটাও আমি ফ্রী দিয়ে দিচ্ছি।' ভদ্রলোক পকেট থেকে ডগবিস্কুটের একটা প্যাকেট বের করলেন। কুকুরকে পোষ করার জন্যে এইমাত্র হয়তো কিনেছিলেন। ডাক্তার ল্যাংকে ছেলে ভোলাবার মতো করে ভুলিয়ে ভালিয়ে দামড়া একটা অ্যালসেশিয়ান গছাতে চান আর কি।

ডাক্তার বললেন, 'কোন প্রয়োজন নেই, আপনার কুকুর আপনারই থাকবে। আমার সংগ্রহে পঁচাত্তর রকমের দুশো একটা কুকুর আছে। কয়েক বছরের মধ্যেই চারশো চারটে হবে। আমার কুকুর নিবাসে আপনার এই আনট্রেণ্ড কুকুর চলবে না।'

'মাই গড!' ভদ্রলোক বড় বড় চোখ করে বারো নম্বর প্লাটফর্মের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিজের মনেই বললেন, 'টু হাণ্ড্রেড ওয়ান এণ্ড ফোর হাণ্ড্রেড ফোর!' তারপর হালভাঙা নাবিকের মতো করুণ অসহায় গলায় বললেন, 'একে নিয়ে যাবো কি করে, থেবড়ে বসে আছে খাঁচার সামনে। একে সামলাবো কী ভাবে!'

'সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। ডোণ্ট ওয়ারি। সুড়সুড় করে মূষিকের মতো এই বিটকেল কুকুর আপনার পেছন পেছন বাড়ি চলে

যাবে।' ডাক্তার এই কথা বলতে বলতে কোটের ডান পকেট থেকে ছোট্ট একটা স্প্রেয়ার শিশি বের করলেন। শিশিটা দেখে ভদ্রলোক একটু ভয় পেলেন মনে হল। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই ডাক্তার সিঁ সিঁ করে খানিকটা আরেক ভদ্রলোকের গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন। অদ্ভুত একটা গন্ধ! সেন্টের সুবাস নয়। কেমন যেন একটা গন্ধ, একটা কুকুর-কুকুর গন্ধ।

'একি করলেন?' ভদ্রলোকের অভিযোগের গলা।

'কিছুই করিনি, কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে কুকুর করে দিলুম।' ডাক্তার অমায়িক হেসে পিঠ চাপড়ে দিলেন, 'নাও ইউ আর এ ডগ, স্বভাবে নয়, গন্ধে! শত চেষ্টা করলেও স্বভাবে কুকুর হতে পারবেন না। কুকুরের মতো অত গন্ধ মানুষের পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যান, এবার আস্তে আস্তে বাড়ি চলে যান। বাট বি কেয়ারফুল।'

'কেন, কেয়ারফুল হতে বলছেন কেন?'

'কেয়ারফুল হতে হবে এই কারণে, রাস্তায় নিশ্চয়ই আরো অনেক কুকুর আছে!'

'তা নেই! শিবপুরের রাস্তায় নেড়ী কুকুরের ছড়াছড়ি। অনবরতই লটাপটি ঝগড়া!'

'তবেই বুঝছেন কেন সাবধান হতে বলছি। মানুষ যেমন চোখ দিয়ে মানুষ চেনে কুকুর চেনে ঘ্রাণ দিয়ে। নবেন্দু, সেই ছড়াটা কি?' নবেন্দু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, 'রতনে রতন চেনে ভাল্লুকে চেনে শাকালু।' ডাক্তার বললেন, 'তোমার আই কিউ তো খুব ভাল, ভেরি গুড। তোমার এই ছড়াটাকে একটু অন্যরকম করে দিই কেমন? কুকুর কুকুর চেনে, ভৃত্য চেনে মনিব। পরেশ, ইংরেজি কর দেখি!'

পরেশ এতক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে একঝুড়ি কলার দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প ঢোক গিলছিল, চমকে ফিরে তাকাল হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেছে! আসলে মনে মনে পরেশ কলা খাচ্ছিল। প্রশ্নটা পরেশের

কানেই ঢোকেনি। ডাক্তার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এতক্ষণ ছিলে কোথায়, কোন্ জগতে শুনি?'

'ও ছিল কলার জগতে'—না বলে পারলুম না।

'কলা? মানে আর্ট?' ডাক্তার বেশ অবাক হলেন।

'মানে প্ল্যানটেন, ওই যে ঝুড়িতে, বড় বড় সবুজ।'

'আই সি, আই সি, ব্যানানা, বেবুন লাইফ ইনস্টিংকট।' ডাক্তার হৈ হৈ করে হেসে উঠলেন। 'যাক, ইংরেজিতে আর দরকার নেই, খুব হয়েছে নাও, লেট আস মুভ।' ডাক্তার গিনিপিগের খাঁচাটা হাতে তুলে নিলেন। সামনে জিভ বের করে বসে থাকা অতবড় একটা কুকুরকে একটুও ভয় করলেন না।

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে আমি!'

'আপনিও এবার বাড়িমুখো। একটু সাবধান, আপনার সামনে সামনে চলবে আপনার কুকুর, পেছন পেছন আরো গোটাকতক অনুসরণ করতে পারে, প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কামড়াকামড়ি করতে পারে। ভয়ের কি আছে? হাসপাতাল আছে, তলপেটে ইনজেকসানের ব্যবস্থা আছে। নিয়ে নেবেন চোদ্দটা কি চব্বিশটা।' দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে ডাক্তার হন হন করে এগিয়ে চললেন ইয়ার্ডের দিকে। ডাক্তার যখন বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেছেন নরেন্দ্র চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'আমরা, আমরা তা হলে যাই।'

'তোমরা, তোমরা আমার অতিথি হতে পার।' ডাক্তার পা দুটো অল্প ফাঁক করে আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন, 'চলে এস, চলে এস, কাম অন মাই বয়েজ। ইয়ার্ডে অপেক্ষা করছে আমার সেলুন কোচ, প্রচুর জায়গা, প্রচুর খাবার, অনেক বিস্ময়, অনেক প্রশ্ন, অনেক উত্তর।'

প্রফুল্লদা ফিসফিস করে বললেন, 'অচেনা লোকের সঙ্গে যাবে খোকাবাবু! লোকটা বড় সাংঘাতিক। কি বলতে কি করে দেবে।' প্রফুল্লদা এত আস্তে বললেন—অতদূর থেকে এই ব্যস্ত

কলরবময় প্লাটফর্মে ডাক্তারের শুনতে পাবার কথা নয়। ডাক্তার কিন্তু হাত নেড়ে বললেন, 'আর অচেনা নেই। অনেকক্ষণ আমাদের পরিচয় হয়ে গেছে। লোক আমি সাংঘাতিক, তবে ছেলে-ধরা নই; আমি এক বিজ্ঞানী। নবেন্দু, আসতে চাও তো চলে এস তোমার দলবল নিয়ে। তোমরা না অ্যাডভেনচারের সন্ধানে বেরিয়েছো!' ডাক্তার মিলিটারী কায়দায় ঘুরে দাঁড়িয়ে সোজা সোজা পা ফেলে এগিয়ে চললেন।

নবেন্দু বললে, 'আমি যাবই। তোমার ভয় থাকলে বাড়ি ফিরে যেতে পার।' অত দূরে ডাক্তার অথচ কানের পাশে গুনগুনে মাছির মতো গলা শুনলুম: 'এই তো চাই, সাবাস নবেন্দু। উপনিষদে পড়েছো না, "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" দুর্বল হলে, ভীরু হলে জীবনের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যায় না।'

খাতার পাতায় যেমন পাশাপাশি অজস্র লাইন থাকে, হাওড়ার রেল ইয়ার্ডে ঠিক সেই ভাবে পাশাপাশি পাতা আছে ইস্পাতের সবল রেখা, বাঁকা রেখা। পরেশের খাতার জ্যামিতির হিজিবিজির মতো। মাঝে মাঝে রোদ ঝলসে উঠছে। সময় সময় আপনা-আপনিই লাইনে লাইনে খটখটাস করে জোড়া লেগে যাচ্ছে, ছেড়ে যাচ্ছে। কী যে সব কাণ্ড হচ্ছে বোঝার উপায় নেই। দূর থেকে দেখতে ভালই লাগে। মাঝে মাঝে এক একটা লাইন ধরে এক একটা বগি আপন মনে নিরুদ্দেশে চলেছে।

ডাঃ ল্যাং উঁচু প্লাটফর্ম থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে লাইনে নামলেন। জোড়া রেল লাইন পেরোতেই বুক কেঁপে যায় আর এ তো জোড়া জোড়া লাইন। আমাদের দিকে না তাকিয়েই পেছন দিকে হাত নেড়ে বললেন, 'কাম অন বয়েজ।' নবেন্দুর দেখাদেখি আমরাও পটাপট লাফ মারলুম। পরেশটা ভয়ে দোনামনা করছে।

'কী রে আয়? যাবি না?'

'যদি কাটা পড়ি!'

'পড়লে আমরা সবাই একসঙ্গে পড়বো। ভাবিসনি, ঝাঁপিয়ে পড়। ভাবলেই মরবি। টকা-টক লাইন পেরিয়ে চলে আয়। ওই দেখ ওরা কত দূর চলে গেছে।'

শুকনো মুখে পরেশ একবার তাকিয়ে দেখল। লাল একটা বগি দূরে আপন মনে গড়িয়ে চলেছে। সাঁতার না জানা ছেলের মতো পরেশ ইয়ার্ডে লাফিয়ে পড়ল। এপাশে ওপাশে ছোটো ছোটো কেবিন। দোতলাটা কাঁচের। জাহাজের ক্যাপ্টেনের ঘরের মতো। বুক পর্যন্ত একটি করে লোক কি কলকাঠি নেড়ে চলেছে! সারাদিন লাইনে লাইনে জোড়া লাগানোর খেলা। দূরে একটা ট্রেন ঢুকছে। কেন্নোর মতো গুটিগুটি এঁকে বেঁকে। কোন লাইনে আসবে কে জানে! ডাঃ ল্যাংই আমাদের ভরসা, আমাদের গাইড। জোড়া জোড়া লাইনের মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা জমি। নাটির ফুটখানেক ওপর দিয়ে সারি সারি তার চলে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই ল্যাং খেয়ে আছড়ে মরতে হবে। পরেশ আর একটু হলেই পড়ে মরছিল। আমার কাঁধে ভর রেখে সামলে গেল।

একটু দূরেই একটা সাদা ধবধবে বগি দাঁড়িয়ে। চারপাশে নীল সুন্দর বর্ডার। সমস্ত জানলার শাটার বন্ধ। কাঁচের গায়ে ঝাপসা হয়ে আছে যেন ভোরের কুয়াশা। মনে হল, ডাঃ ল্যাং ওই দিকেই চলেছেন। উনি যে কত দ্রুত হাঁটতে পারেন! এক ফুট দেড় ফুট উঁচু তারের বেড়া শিশুর মতো লাফিয়ে লাফিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছেন। কিছুই না যেন, খেলা। নীল বর্ডার দেওয়া সাদা বগিটা যেন রহস্যের মতো ইস্পাতের ঝকঝকে জোড়া লাইনে অক্ষরের মতো দাঁড়িয়ে। ভেতরে হিম কুয়াশা। প্রফুল্লদা আবো একবার ফিসফিস করে বললেন, 'ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না হে। বগিটার রং দেখেছো! এই রকম রঙের বাক্সে বরফের চাঙড়ার ওপর মৃতদেহ শুইয়ে রাখে। আমি বহুদিন স্বপ্নে এই রকম গাড়ি দেখেছি। ভেতরে বরফের গুহা,

বিশাল একটা সাদা ভাল্লুক নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে একটা শরীরের খানিকটা পা বের করে ফেলেছে। পা-টা মোমের মতো সাদা।'

প্রফুল্লদার কথা শুনে পরেশ লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ছুটে পালাতে যাচ্ছিল ভয়ে। প্রফুল্লদা খপ করে হাত চেপে ধরলেন। আর ঠিক সেই সময় পাশের লাইন দিয়ে একটা দূর পাল্লার ট্রেন দিক্‌বিদিক্ কাঁপিয়ে স্টেশনের দিকে চলে গেল। হাওয়ার ঝাপটায় চুল পোশাক এলোমেলো হয়ে গেল। ডাঃ ল্যাং তিরস্কারের গলায় বললেন, 'মানুষ ভয়েই মরে, বুঝলে পরেশ চন্দ্র। ভয়টা কিসের শুনি?' পরেশ নিজেকে বাঁচাবার জন্য বেমালুম বলে দিল, 'প্রফুল্লদা বললেন, ওই সাদা বগিটার মধ্যে বরফের চাওড়ায় ডেড বডি শোয়ানো আছে।'

ডাঃ ল্যাং হো হো করে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতেই পকেট থেকে সিগারেট বাকসের মতো ছোট্ট একটা বাকস বের করলেন। বাক্‌সটার গায়ে টেলিফোন ডায়ালের মতো ছোট একটা, গোল চাকা লাগানো। চাকাটা বার কতক ঘোরালেন। সঙ্গে সঙ্গে বগিটায় ঢোকার দরজা চিচিং ফাঁকের মতো দু পাশে শব্দ করে সরে গেল। সেই ভীষণ গরমেও একটা হিম ঠাণ্ডা বেরিয়ে এসে আমাদের কাঁপিয়ে দিল।

সাইবেরিয়ার ভাল্লুক

কেটে রাখা রেলের কামরার ভেতরটা নীল, ভোরের কুয়াশা ঢাকা আকাশের মতো ঝাপসা। দরজা খুলে যেতেই কে একজন দু পাশে হেলে দুলে এগিয়ে এল। বিশাল দরজা জোড়া চেহারা। কে রে বাবা! কোনো পালোয়ান নাকি! ডাঃ ল্যাং বললেন, 'আলি, মিট মাই ফ্রেণ্ডস।' আলির মুখে এই মোটা একটা চুরুট। গল গল

ধোঁয়া বেরোচ্ছে। গায়ে যেন একটা সাদা ফারের কোট পা পর্যন্ত নেমে এসেছে। আলি হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। সামনেই নবেন্দু। তাকেই আগে শেকহ্যাণ্ড করতে হবে। ওই হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে ভয় হবারই কথা। কালো ভাল্লুক রাস্তায় দেখেছি ভাল্লুক নাচওলা যখন নাচাতো। এ একেবারে সাদা। নবেন্দু হাতে হাত মেলালো। আলি চুরুট মুখেই হুম হুম করে দু বার শব্দ করল। চিড়িয়াখানায় শিম্প্যাঞ্জিকে চুরুট খেতে দেখেছি। ভাল্লুকও চুরুট খায় গ্যালোস দিয়ে প্যান্ট পরে! দু পায়ে দাঁড়ায়। এমন ঘটনা সার্কাসেও দেখিনি। ভাল্লুকের সঙ্গে হাত মেলাতে হবে ভেবে পরেশ আমাকে জড়িয়ে ধরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল। 'তোরা আমাকে বাড়ি রোখ আসবি চল। ওর সঙ্গে এক কামরায় যাওয়ার মানে জানিস তুই! এক এক খাবলা করে আমাদের সব ক'টাকে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। ওরে, আমি বাঁচতে চাই। বিশ্বাস কর, এবার থেকে খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করব।'

আমাকে কিছু বলতে হল না। ডাক্তার পরেশের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আবার ভয়! জানো, সাইবেরিয়ার এই আলির স্বভাব মানুষের চে অনেক ভাল। অনেকটা দেবতার মতো। মাছ, মাংস, ডিম ছোঁয় না। মধু, দুধ, ফল, ভেজিটেবল খায়। ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে চুরুট খায়, গান শোনে। মাঝে মাঝে আইস-ক্রিম খায়। সময় সময় একটু নাচে। গেট ইন বয়েজ! আর মাত্র আধ ঘণ্টা সময় আছে। তারপর মেন লাইনের ট্রেনের সঙ্গে এই বগি জুড়ে যাবে। তারপর। তারপর বলতে পার কি হবে নবেন্দু?'

নবেন্দু বললে, 'যাত্রা হবে শুরু।'

আমরা একে একে সেই শীতল সুন্দর ঘরে ঢুকে পড়লুম। ইতিমধ্যে ডাক্তার আমাদের গরম জামা পরিয়ে দিয়েছেন। কোথা থেকে একটা

সিঁ সিঁ শব্দ বেরোচ্ছে। আলি আরাম-কেদারায় বসে আছে। মনে হচ্ছে পরেশের দিদিমা শীতের দুপুরে গায়ে সাদা কম্বল জড়িয়ে দেশের দাওয়ায় বসে ফোকলা মুখে পরেশের মার থেঁতো করে দেওয়া পান চিবোচ্ছেন আয়েস করে।

আলি

আমরা সবাই বেশ গুটিসুটি বসেছি। ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। ডোরাকাটা একটা ক্যাম্প চেয়ারে আলি বসেছে। শিম্প্যাঞ্জি মানুষের মতো অনেক কিছু করে শুনেছি, ভাল্লুক যে তার ওপরে যায়, না দেখলে বিশ্বাস হতো না। সারা কামরায় গোল চৌকো হরেক রকমের কাঁচের পাত্র। প্রত্যেকটা পাত্রেই নানা ধরনের প্রাণী। কয়েক রকম সাপ, বিষাক্ত বিছে, যেমনি লাল তেমনি চওড়া, গিরগিটি, টিকটিকি। এক গাদা খাঁচা। খাঁচায় পাখি আছে, কাঠবেড়ালির মতো অদ্ভুত সুন্দর এক ধরনের প্রাণী, গায়ে সিল্কের জামা! সত্যি কথা বলতে কি, বেশ ভয় ভয় করছে। সাপ আর বিছেরা যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে কাঁচের জার ভেঙে তাহলে আর রক্ষে থাকবে না।

পরেশ ফিস ফিস করে বললে, 'ভীষণ শীত করছে রে।'

—'শীত করছে?' ডাক্তার অপরাধীর মতো মুখ করে বললেন।

—তোমাদের কষ্ট হচ্ছে, তাই না! আমার কিন্তু শীত করছে না।'

আলি ভরাট গলায় হেসে উঠলো। ভাবখানা এই—রে বালক, এই তোর মুরোদ! এই শীতেই শীত।'

ডাক্তার বললেন—'আচ্ছা দাঁড়াও, আমি তোমাদের গরম করে দিচ্ছি। ওয়ান, টু, থ্রি। তোমাদের ঘাম বের করে ছেড়ে দিচ্ছি। সব চোখ বুজোও।

আমরা ভয়ে ভয়ে চোখ বোজালুম। ঘাড়ের কাছে মনে হল ছোট্ট

একটা লাল পিঁপড়ে কামড়ালো যেন। সমস্ত শরীরটা মনে হল চাবুকের ঘায়ে জ্বলে উঠলো। ভয়ে চোখ খুলে ফেললুম—'একি করলেন? একি করলেন আপনি!'

ডাক্তার অদ্ভুত শব্দ করে হেসে উঠলেন। যেন ইস্পাতের ঠোঁটের ঠোকাঠুকিতে হাসিটা বেরিয়ে এল! লোকটি কী নিষ্ঠুর! আমাদের কি মানুষ গিনিপিগের মতো ব্যবহার করতে চান! আমরা কী ধরা দিয়ে ভুল করেছি! প্রফুল্লদার কথাই কি তাহলে ঠিক! পরেশ গরমে উফ্ উফ্ করতে করতে সোয়েটার খুলে ফেলেছে।

নবেন্দু সন্দেহের চোখে ডাক্তারের দিকে তাকাচ্ছে। মনে হয়, আমি যা ভাবছি নবেন্দুও তাই ভাবছে।

ডাক্তার গৌতম বুদ্ধের ভঙ্গিতে ডান হাতের চেটোটা তুলে বললেন —'মাভৈঃ। আমি কিছু করিনি, শুধু—'ডাক্তার শুধু বলে রহস্য-জনকভাবে চুপ করে গেলেন। নবেন্দু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'শুধু কি!'

ডাক্তারের চোখ দুটোয় দুষ্টুমি—'শুধ্ কি! বলবেন তো!' নবেন্দুর তাগাদা!

শুধু এইটা তোমাদের ঘাড়ের কাছে একটা শিরায় পুট করে একটু ফুটিয়ে দিয়েছি। অল্প একটু।

ডাক্তারের হাতে বাবলা কাঁটার চেয়ে সরু কালো একটা হুলের মতো জিনিস।—জিনিসটা কি! জিনিসটা কি বললেন তো!—অবশ্যই বলবো। তার আগে বলো তোমাদের এখনো কি আগের মতো শীত করছে!

শীত! আমরা সমস্বরে বললুম, কোথায় শীত! এখন রীতিমতো ঘাম বেরোচ্ছে! ডাক্তার শব্দ করে একটু হাসলেন। দেখছো তাহলে শীত আর গ্রীষ্ম জিনিসটা কত আপেক্ষিক! শরীরের বিশেষ একটা অবস্থা মাত্র। আমি হিমালয়ের বরফে কত সাধু সন্ন্যাসী দেখেছি যাঁরা সম্পূর্ণ খোলাগায়ে তুষার-ঝঞ্ঝার মধ্যে নির্বিকার ধ্যানে বসে

আছেন। সূর্য তখনো ভাল করে উঁকি দেয়নি গোমুখীর বরফ গলা জলে মহানন্দে স্নান করছেন। কেমন করে সম্ভব হয় এ সব!

কেমন করে! আবার আমাদের সমস্বরে প্রশ্ন।

মন। মন। বুঝেছো নবেন্দু, বুঝেছো পরেশ। মনের খেলা। আমাদের মস্তিষ্কের যে অংশে শীত, গ্রীষ্ম, ব্যথা বেদনার বোধ, সেটার ওপর প্রভুত্ব করতে জানলে মানুষ আর মানুষ নয়, সে রাজা, সে তখন দেবতা, অতিমানব। এই প্রভুত্ব দুভাবে করা যায়, এক কৃত্রিম উপায়ে, দুই, যোগের সাহায্যে। সেই গল্পটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো?

কোনটা! কোনটা!

প্রচণ্ড শীতের রাত। মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন লর্ড ক্লাইভ। গরম কোট প্যান্ট হোস, মাফলার টুপি পরেও গঙ্গার হু হু হাওয়ায় ক্লাইভ সাহেব কাঁপছেন। নবাব সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি পরে পান চিবোতে চিবোতে। ঠোঁটের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। একজন শীতে কাঁপছেন আর একজন ঘামছেন। রহস্যটা কি! রহস্য হল পান!

পান! আমরা চেঁচিয়ে উঠলুম। আলি খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে উঠলো।

ইয়েস মাই বয়েজ, পান। একখিলি পানের দাম এখনকার দিনের একশো টাকার সমান। মুক্তোভস্ম দিয়ে সাজা। তোমাদের কলকাতার ছাতুবাবু লাটুবাবুর গল্প জানো?

না।

অনেকটা একই রকম। তখন কলকাতায় হাড়-কাঁপানো শীত পড়তো। সেই শীতের রাতে দু ভাই ছাতু আর লাটু খোলা গায়ে ছাদে পায়চারি করতেন আর বলতেন, উফ্ বেজায় গরম, বেজায় গরম! না, মুক্তোভস্ম নয়। মুরগির মাংস। প্রথমে একটা মুরগিকে গোখরো সাপের ছোবল মারানো হত। সেই মুরগির রক্ত ইঞ্জেকসান করা হত

আর একটাকে। সেটার রক্ত আর একটাকে। এইভাবে শেষ যে মুরগিটা বেঁচে যেত সেটাকে কেটে কাবাব করে দু ভাই খেতেন। আর গরমে তাঁদের রক্ত টগবগ করে ফুটতো।

আমাদের কি হয়েছে!

তোমাদের কেসটা অন্য। তার আগে দেখি পিঁপড়ে সম্পর্কে তোমাদের কার কি জ্ঞান। বল তো পৃথিবীতে ক'জাতের পিঁপড়ে আছে?

সুড়সুড়ি, লাল, গোঁদো, ডেঁও, কাঠ।

উত্তরটা বড় ভাসা ভাসা হল হে। তবে শোনো, সারা পৃথিবীতে ছ হাজারেরও বেশি জাতের পিঁপড়ে আছে। সবই হয়তো মোটামুটি একরকমের দেখতে, কোনো জাতের পিঁপড়ে আকৃতিতে বড়, কোনো জাতের পিঁপড়ে ছোট অথবা মাঝারি। সামাজিক জীব। এরা হল হাইমেনোপেটেরা জাতির কীট। পৃথিবীর সর্বত্র এদের পাবে। মরুভূমিতে, সুমেরু কিম্বা কুমেরুতে, বর্ষার বনভূমিতে, শহরে নগরে। এরা নিজেদের কলোনিতে দল বেঁধে থাকে। আমাদের সমাজের মতো এদের সমাজেও জাতি ভেদ আছে, শাসনব্যবস্থা আছে। এক একটা কলোনিতে পাবে—রানী, পুরুষ আর শ্রমিক পিঁপড়ে। রানী হলেন আকৃতিতে সবচেয়ে বড়। এনার আবার ডানা আছে। পুরুষ পিঁপড়েরা রানীর চেয়ে আকৃতিতে ছোটো। এদের ডানা আছে। যে কোনো কলোনিতে শ্রমিক পিঁপড়ের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি আর এদের ডানা নেই?

নবেন্দুর মনে হয়, কিছু প্রশ্ন ছিল। উসখুস করছিল। ফাঁক পেয়েই প্রশ্ন করল, শীত গ্রীষ্মের কথা থেকে পিঁপড়ের কথা আসে কি করে!

আসে আসে। কেন আসে আর একটু ধৈর্য ধরলেই। বুঝতে পারবে। এখন শোনো, আর একরকম পিঁপড়ে আছে এদের বলা হয় অ্যান্টলায়ন বা সিংহ-পিঁপড়ে। এরা হলো নিউরোপটেরা প্রজাতির

কীট। সিংহ-পিঁপড়ে থাকে শুকনো বালি বালি জায়গায়। অতি সাংঘাতিক প্রাণী হে। তেমনি বুদ্ধিমান। এরা কি করে জানো, চমৎকার ফাঁদ পেতে অন্যান্য পোকামাকড় ধরে! বালিতে ফানেলের মতো গর্ত করে তলায় ঘাপটি মেরে বসে থাকে। গর্তের গা বেয়ে হড়কে এই সব পোকা সোজা তলায় চলে আসে। তারপর যেই গা বেয়ে বাইরে পালাবার চেষ্টা করে সিংহমশাই তখন প্রবল বিক্রমে বালির বন্দুক ছুঁড়তে থাকে নিজের মাথা দিয়ে। সেই বালির মেশিনগানে ঘায়েল হয়ে বেচারা চিৎপাত হয়ে পড়ে, তখন সিংহমশাই মহানন্দে তার বক্ত-শুঁড় দিয়ে পোকাটির প্রাণ-রস শুষে নিয়ে খোলসটি গর্তের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়! সাধারণ পিঁপড়ের যম এই সিংহ-পিঁপড়ে।

এইবার শোনো আগুনে পিঁপড়ের কথা যার ইংরাজি নাম ফায়ার অ্যাণ্ট। ফায়ার অ্যাণ্ট বলার সঙ্গে সঙ্গে আলি পটপট করে হাততালি দিয়ে উঠলো। এরা আসলে দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসী। এদের দংশনে শুধু জ্বালা নয়, মারাত্মক বিষক্রিয়ায় মৃত্যু পর্যন্ত অস্বাভাবিক নয়। তোমরা পিঁপড়ের ঢিবি হয়তো দেখেছো। আগুনে পিঁপড়ের ঢিবি দেখোনি। তিন থেকে চার ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। শক্ত পাথরের মতো। যে জমিতে এই ধরনের ঢিবি দেখা যায় তার ধারে-কাছে ভয়ে কেউ যেতে চায় না। চাষ করার চেষ্টা তো দূরের কথা। গোটা কতক পিঁপড়ে যদি তোমাদের এখন কামড়ায়, মিনিট পনেরো লাগবে তোমাদের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে। দক্ষিণ আমেরিকায় প্রতি বছর বহু পশু, পাখি, এমন কি মানুষের বাচ্চা এই আগুনে পিঁপড়ের কামড়ে মারা পড়ে। আমি কিছুই করিনি, কেবল তোমাদের ঘাড়ের কাছে বিশেষ একটি নার্ভে টুক করে একটু ফুটিয়ে দিয়েছি।—কি ফুটিয়ে দিয়েছেন? আমরা সকলে একসঙ্গে ভয়ে চিৎকার করে উঠলুম। পরেশটা একেই ভীতু, আরো যেন কেমন হয়ে গেল। মনে হলো এক্ষুনি যেন মারা যাবে।

ডাঃ ল্যাং পকেট থেকে চ্যাপ্টা মতো একটা কৌটো বের করলেন

অনেকটা জর্দার কৌটোর মতো। ঢাকনায় ছোটো ছোটো গোল গোল অজস্র ফুটো। ঢাকনাটা খুলে ফেলে কৌটোটা সামনের টেবিলে যেমনি রাখতে গেলেন, ট্রেনটা হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে উঠলো আর কৌটোটা ছিটকে কামরার মেঝেতে পড়ে গেল। এক ঝলকে যেন দেখলাম ঠিক লালও নয় কালোও নয় একটা পোকার মতো কি খড় খড় করে একটা আসনের তলায় গিয়ে ঢুকলো। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললেন—কেসাবফুল মাই বয়েজ, ডেঞ্জার ডেঞ্জার। সবাই আসনের ওপর উঠে দাঁড়াও, প্যান্টের ফোল্ড আর শরীরের পেছন দিক সামলাও। সুড় সুড় করলেই জোরে ঝাড়া দাও। ও ভেরি ডেঞ্জারাস। ওটাকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত এই কামরা বড়ই বিপজ্জনক। সঙ্গে সঙ্গে পরেশ 'ওরে বাবারে' বলে একটা লাফ মেরে আলির কোলে গিয়ে ছিটকে পড়ল।

লখিয়ারা সন্ধের দিকটা বাংলোর হাতায় বড় পিপুল গাছটার নিচের কোয়ার্টারে থাকে। এলোমেলো খাটিয়া ছড়ান। একটা ওর বাবার একটা ওর মায়ের। লখিয়ার বাবার বাতের অসুখ। সারা-দিনের খাটুনির পর এই সময়টা তার একটু আরামের। লখিয়া তখন মস্‌মস্ করে গা হাত পা টিপতে থাকে আর বকবক করে বকে। মাঝে মাঝে আবার বাবাকে বকে দেয়। লখিয়ার বাবার যেন কত অপরাধ! মেয়ের কাছে বকুনি খেতে খেতে বুড়োর জীবন যায়। সে কেবল ঘুমজড়ানো চোখে বলতে থাকে—হাঁরে বিটিয়া, হাঁরে বিটিয়া!

মায়ের কাঁপা কাঁপা গলার ডাক শুনে লখিয়া যেই উত্তর দেয়—আতা হ্যায় মায়ী, বাবা অমনি হুপ করে রান্নাঘরে লাফিয়ে পড়েন। মা অমনি আমাকে জাপটে ধরে উ করে উঠতেন। বাবা হাসতে হাসতে বলতেন— ম্যাডাম এই তোমার সাহস! আমাকে বলতেন —তোর ব্যাটা কোনও সাহস নেই, শিকারী হবি কি নিয়ে। বাপকো

বেটা সিপাহীকো ঘোড়া, কুছ নেহি হ্যায় তো থোড়া থোড়া।

কোথায় গেল আমার সে সব দিন! জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রেলের নতুন লাইন পাতা হচ্ছে। ওই সময়টা বাবাকে ক্যাম্পে থাকতে হত। একদিন রাতে আদিবাসীরা কি কারণ জানা নেই ক্যাম্পের ওপর চড়াও হয়ে, তীর চালাতে শুরু করল। বাবা আহত হলেন। স্পেশাল ট্রেনে শহরে আনার আগেই বাবা মারা গেলেন। সন্ধে হয়ে এলেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে। হাফ প্যান্ট, হাঁটু অবধি মোজা, হাফ সার্ট, মাথায় শোলার হ্যাট, মুখে পাইপ, এতখানি চওড়া বুক, মোটা হাতের কবজি। হাসলে মনে হত সমস্ত বাড়িটা যেন সুখে কেঁপে উঠছে। মেরে না ফেললে এখনও বাবা বেঁচে আছেন।

ট্রেনটা আবার একটা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছে, গুমগুম করে শব্দ হচ্ছে। পৃথিবীটা আসলে বড় নির্জন জায়গা। বেশির ভাগই যেন জঙ্গল, পাহাড়, নদী। এই ব্রিজটাও হয়ত কবে কোনোদিন বাবাই তৈরি করে গিয়েছিলেন রেলের লোকলস্কর এনে। আসতে আসতে কতগুলো যে ব্রিজ পড়ল! ডাক্তার কি একটা বই পড়ছিলেন আলির চেয়ারে পা তুলে দিয়ে। বইটা হঠাৎ কোলের উপর ফেলে দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। চোখ দেখে মনে হল বহু দূর অতীতে চলে গেছেন। ঠোঁটের কোণে অল্প একটু হাসি—কিসের দুঃখ! পৃথিবীতে কত কি ঘটে জান। তোমার বাবার মতো আমার বাবাও খুন হয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে গেলুম। আশ্চর্য ব্যাপার! ডাক্তার কি করে আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। অদ্ভুত ক্ষমতা তো! শুনেছি সাধু-সন্ন্যাসীদের এইরকম ক্ষমতা থাকে। জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন—আমার বাবা ছিলেন ইংরেজ, আমার মা ছিলেন বাঙালী। যুদ্ধের আগে আমার বাবা খড়্গপুরের রেলের কারখানায় জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন, মা ছিলেন রেল হাসপাতালের ডাক্তার। আমার জন্ম এইখানে। যুদ্ধের পর আমার বাবা আর ইংলণ্ডে ফিরলেন না।

বললেন ভারতে থেকে রোদ ভাল বেসে ফেলেছি, চল সিসিলিতে গিয়ে বাকি জীবনটা কাটাই। অলিভগাছ, ভূমধ্যসাগরের সবুজ জজ, প্রাচীন ইতিহাস। মা-ও রাজী হয়ে গেলেন। উঃ সিসিলি কি জায়গা! ভারত আমার মাতৃভূমি। ইংলণ্ড আমি দেখেছি। নিজের জন্মভূমির উপর সকলেরই মায়া থাকে। বাবারও হয়ত ছিল। বাবা যেহেতু ইংরেজদের ওপর ভীষণ চটে গিয়েছিলেন, বলতেন বেনের জাত, সেই হেতু সিসিলিকে যেন জোর করে ভালবেসে ফেলেছিলেন। আমার আর কি বল? আমি তো আর ইংল্যাণ্ডে জন্মাইনি। সিসিলি তো আমার ভাল লাগবেই। চোখ বুজলেই আমি আমার কৈশোরের দিন দেখতে পাই। ভূমধ্যসাগরের তীরে ইতিহাস দিয়ে সাজান আমার স্বপ্নের সিসিলি।

নবেন্দু বললে—জানেন, পৃথিবীর নানা দেশে আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। আমি যখন বড় হব তখন আমি আপনার মত ভূপর্যটক হয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াবো!

—ভেরি গুড। এবচে ভাল হবি আর কিছু নেই নবেন্দু। দেশ, মানুষ, প্রকৃতি, পৃথিবী যে কতবড় নবেন্দু, এক জীবনে মানুষ দেখে শেষ করতে পারবে না। সিসিলিতে আমার বাবার কেনা বাংলোটা এখনও আছে। সিমেতো নদীর ধারে। আমার মা সেখানে আছেন। বয়স হয়েছে। ডাক্তারি করেন তবে জোর করে কেউ ধরে না নিয়ে গেলে রুগী দেখেন না। ছোটো একটা বাগান আছে। সেখানে আঙুর হয়, কমলালেবু পাকে শীতে, পীচ, বাদাম, পেস্তা, পাতিলেবু, ডুমুর, অলিভ। বাংলোর বারান্দায় বসে মা তাকিয়ে থাকেন পেলো-রিতান, নেব্রোদিয়ান মাদোনিয়ান পর্বতশৃঙ্গের দিকে। মাউন্ট এটনার নাম শুনছো তোমরা?

ডাক্তার প্রশ্নটা করে, মোটা একটা চুরুট ধরাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ট্রেনটা ভীষণ দুলছে। সেই দোলায় আমরাও দুলছি। দুলছে সাপের বেতের ঝুড়ি দুটো। ছোট্টো একটা খাঁচাও দুলছে, যার

মধ্যে লাল একটা পাখি ডানায় মুখ গুঁজে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কখন কখন মুখ তুলে ঠোঁট দিয়ে ডানা চুলকে নিচ্ছে। চুরুট দেখে আলির মাথা খারাপ হয়ে গেছে। নাকের পাটা ফুলিয়ে ফোঁস ফোঁস করে ধোঁয়া নিচ্ছে নাকে। ডাক্তার একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন—পারে পারে। ডোণ্ট বি ইমপেশেণ্ট। ইউ উইল গেট ইওর শেয়ার।

মাউণ্ট এটনা, কত বড় আগ্নেয়গিরি! আমাদের বাংলোর পশ্চিম বারান্দায় বসলে দেখা যেত আকাশের গায় উদ্ধত 'মাউণ্ট এটনা'। বিশাল আগ্নেয়গিরি। দশ হাজার সাতশো চল্লিশ ফুট উঁচু। কি তার শোভা! লোহার মতো কালো। জ্বালামুখটা যেন খুবলে নেওয়া পুডিং এর মতো। চাঁদনি রাতে পাহাড়টা দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতুম—হে আগ্নেয়গিরি! আর একবার তুমি জেগে ওঠ। অন্ধকার আকাশে মেলে দাও আগুনের লকলকে শিখা। ছিটিয়ে দাও স্ফুলিঙ্গ, ছুঁড়ে দাও আগুনের গোলা। সিসিলি যে কি জায়গা, তোমাদের বোঝাতে পারব না। সিসিলি মাই লাভ! সিসিলি মাই লাইফ।

ভূমধ্যসাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ সিসিলি। কত বড় জান—ন' হাজার নশো পঁয়ত্রিশ বর্গ কিলোমিটার। মাঝখানটা সমতল। চারপাশে পাহাড়। সিমেতো নদী বয়ে চলেছে কুলুকুলু করে। এই সমভূমির নাম কাতানিয়া। পলি ফেলে ফেলে সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সেখানে আঙুরের বাগানে সিসিলির মেয়েরা বেতের ঝুড়িতে সাবধানে থোকা থোকা আঙুর সাজিয়ে রাখছে। গাছে গাছে হলদে হয়ে আছে পাকা পীচ ফল।

বাবার সঙ্গে প্রথম যেদিন পালেরমোতে গেলুম, সেদিনটা আজও আমার মনে আছে। সিসিলির রাজধানী। ইতালির ষষ্ঠতম শহর এবং বন্দর। সমুদ্র যদি দেখতে চাও নরেন্দু ভূমধ্যসাগরের ধারে দিন কতক থেকে এস। মেসিনার নাম শুনেছ নরেন্দু! আর একটি বড় বন্দর। ১৯০৮ সালের বিশাল ভূমিকম্পে মেসিনা একেবারে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর সামান্য একটা গা-ঝাড়া—৭৭ হাজার মানুষের মৃত্যু। সেই

শহর, সেই বন্দর গড়ে উঠেছে। হাওয়ায় বিশাল অলিভের পাতা কাঁপছে, জীবন চলছে স্বপ্নের মতো, বলা যায় না হঠাৎ কখন এটনা ফুঁসে উঠবে, ভূপৃষ্ঠ একটু কেঁপে উঠবে, সব—সব আবার ভূমিসাৎ! সন্ধেবেলার সিসিলি তুমি ভুলতে পারবে না। সমুদ্রের দিক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে, ওদিক থেকে আসছে সাহারার শুকনো গরম বাতাস। সে বড় মজার অভিজ্ঞতা! তোমার সব সময় মনে হবে গরম আর ঠাণ্ডা জলের স্রোত ভেঙে তুমি হেঁটে চলেছো। গরম হালকা হয়ে ওপর দিকে উঠছে তলার দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে শীতল বাতাস। সাহারার এই গরম বাতাসকে ওদেশে কি বলে জান—'সিরোক্কা'।

ওদেশটা তো আমার মাতৃভূমি নয়, পিতৃভূমিও নয়, তবু এত ভালবেসে ফেলেছিলুম। পালেরমোর বিশ্ববিদ্যালয় কত প্রাচীন জান? ১৭৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি পড়েছি। সেই গ্যারিবলডির দেশে আমার যৌবন কেটেছে। খ্রীস্টের জন্মেরও আটশ বছর আগে গ্রীকরা এখানে এসছিল রাজত্ব করতে। গ্রীকদের তৈরি মন্দির, প্রাসাদ, থিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। তাওরমিনায় গ্রীক থিয়েটারের সেই ভগ্নাবশেষে কতদিন চাঁদের আলোয় এক পাগল প্রফেসারকে দেখেছি—সারারাত ঘুরছেন অতীত ইতিহাসের পাতায়। একমাথা সাদা চুল, মুখে নিভে যাওয়া একটা চুরুট। অত্যাচারী দ্বিতীয় হিয়েরোর তৈরি বেদীতে রাতের বেলার সেই বেহালাবাদককে মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। কোনও দিনও ভুলতে পারব কি! সমুদ্রের হু হু হাওয়ায় ওঠাপড়াও বেহালার সুর অলিভ অরণ্যের মধ্যে কেঁদে বেড়াচ্ছে।

এই সিসিলিতেই আমার বাবা খুন হলেন 'মাফিয়াদের' হাতে। মাফিয়াদের সম্পর্কে কিছু জান তোমরা! বিখ্যাত গুপ্তসমিতি। যারা ফ্যাসিস্টদের অত্যাচার আটকাবার জন্যে জীবনপণ করে লড়ছে! হিটলার ও মুসোলিনি চক্রান্তের কিছু কিছু তোমরা নিশ্চয় জান। বাবার ভীষণ মাছধরার নেশা ছিল। মাঝে মধ্যে রাতের বেলাও খাঁড়িতে ছিপ ফেলে

বসে থাকতেন।

ইতালির মূল ভূখণ্ড থেকে সিসিলিকে আলাদা করে রেখেছে মেসিনা খাঁড়ি। সামুদ্রিক জীবের সবচেয়ে প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। ওই মেসিনা স্ট্রেটেই বাবা যেতেন মাছ ধরতে। সঙ্গে থাকত তাঁর প্রিয় কুকুর—অ্যাপেলো। সেদিনটা ছিল শনিবার। ইতালির মানুষ শনিবার সারা রাত জেগে থাকে। সপ্তাহের শেষ! শুধু স্ফূর্তি আর উল্লাস। পরের দিনটা তো রবিবার ভয় কি! সন্ধের মুখে বাবা বেরোলেন। রাতের দিকে সমুদ্রে জোয়ার আসবে। সেই সময় খাঁড়িতে কত রকম মাছ ঢুকবে—সার্ডীন, টুনা, ম্যাকারেল।

বাবা সাধারণত ভোরের দিকে ফিরে আসতেন। দূর থেকেই আমরা অ্যাপোলোর ঘেউ ঘেউ ডাক শুনতে পেতুম। মাঝে মাঝে বাবার গলা—হেল্‌প মি অ্যাপোলো, হেল্‌প মি, ডোণ্ট বি এ নাটি বয়! মা অমনি আমাদের বসার ঘরের জানলার সাদা পর্দাটা সরিয়ে—সুপ্রভাত জানাতে চাইকেন। পর্দাটা সরালেই বর্ষার ফলার মতো রোদ এসে পড়ত ঘরের কার্পেটে।

সেদিন সাতটা বাজল. আটটা বাজল, তবু বাবা ফিরলেন না। মা ঘর-বার করছেন। জানালার পর্দা সরিয়ে বারে বার দেখে আমাকে এসে বলছেন—কি করা যায়, কি করা যায়! হঠাৎ বহুদূরে যেন অ্যাপোলোর ডাক শোনা গেল। আমরা দুজনেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। ঢালু বেয়ে অ্যাপেলো উঠে আসছে—মুখে যেন একটা .ক। আরো কাছে এল। মুখে বাবার একপাটি জুতো।

অ্যাপোলোই আমাদের নিয়ে গেল সেই জায়গাটায়। ছিপ, হুইল, খাবারের বাক্স, ফ্লাস্ক চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে। নাইলন নেট বাবার জীবনে ধরা সবচেয়ে বড় মাছ। পা দুটো জলে, শরীরটা বালির ওপর, বাবা মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। পিঠে এতখানি একটা ছোরা ঢুকে আছে। ছোরার সঙ্গে একটা কার্ড—দিস ইউ ডিজার্ভড—মাফিয়া ইউনিট নম্বর সেভেনাবাই ওয়ান বাই থ্রি।

সেই দিনটা আমি কোনও দিন ভুলতে পারবো না অপূর্ব। জীবনের সমস্ত স্বপ্ন সিসিলির সেই ভোরে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, বাবা মাফিয়াদের হাতে খুন হয়েছেন এই খবরটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আমাদের ছি ছি করতে লাগল। আমাদের জানা নেই বাবার হয়তো এমন কোনও গুপ্ত জীবন ছিল। গুপ্ত যোগাযোগ ছিল। এই ভুল ধারণাটা তো সহজে পাল্টানো শক্ত। কে বিশ্বাস করবে আমাদের কথা। একে আমরা সবে গিয়ে বসবাস শুরু করেছি। আমাদের অতীতটা কেউ দেখেনি। বর্তমানটাই দেখেছে।

সব দেশের পুলিশই তো সমান। ইতালির পুলিশ বোধহয় অপদার্থতায় সব দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। কিছুই করল না। আসলে করতে পারল না। পুলিশের উৎপাতে অপরাধী অতিষ্ঠ না হয়ে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলুম। মনে হল আমরাই অপরাধী। শেষে সিসিলি থেকে আমাদের পালাতে হল। সেণ্ট সিবাস্তিয়ান চার্চের ক্রিমেটোরিয়ামে, প্রাচীন এক অলিভগাছের তলায় আমার বাবাকে শুইয়ে রেখে আমরা চলে এলুম। সমস্ত জিনিসপত্র যেখানে যা ছিল সব বিলিয়ে দেওয়া হল। বাড়িটা খুব কম দামে এক জেলেকে প্রায় দান করেই দেওয়া হল।

হঠাৎ ট্রেনের স্পিডটা কমে এল। ডাঃ ল্যাং বললেন, অতীত বুঝলে নবেন্দু, সকলের অতীতই দুঃখ-সুখের টানাপোড়েনে বোনা। মন দিয়ে সব কিছু জয় করতে শিখবে। বুঝলে, মন। মনটাই সব। মন হবে সৈনিকের মতো। ফরওয়ার্ড মার্চ। কামাণ্ডার বলেছেন—এগিয়ে যেতে হবে—নো লুক ব্যাক। পেছনে তাকাবে না। পরাজিত হয়ে ফিরে আসবে না। পালিয়ে আসবে না। পলাতকের পুরস্কার—কোর্ট মার্শাল।

ডাক্তার হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। ঠিক আটটা বেজেছে। আমাকে অবাক করে দিয়ে আমার ভাবনাটাকেই ডাক্তার বললেন—হ্যাঁ, আটটা

বেজেছে। নাও ইট ইজ টাইম ফর ডিনার। তোমরা কেউ চান-টান করবে! নবেন্দু বললে, আমি করব। আমার একটু উপাসনার কাজও আছে।

—ভেরি নাইস। তোমার আছে আমারও আছে। দেন লেট আস অ্যাডজাস্ট। তুমি আগে যাও, চানটা সেরে এসো। ওই নীল কাঁচের দরজাটার ওপাশে চলে যাও। তারপর আমি যাবো। তোমরা কেউ যাবে না?

—হ্যাঁ, আপনারা সেরে নিন। তারপর আমরা একে একে যাবো।

—কিন্তু মনে রেখো নটার মধ্যে আমাদের শেষ করতে হবে। দশটার কিছু পরে আমরা পৌঁছে যাবো।

নীল কাঁচের স্নানঘর

বেশ মজা লাগছিল চলন্ত ট্রেনে 'শাওয়ারের' তলে দাঁড়িয়ে স্নান করতে। আরও ভাল লাগছিল এই কারণে, পুরো স্নানঘরটা গাঢ় নীলরঙের। নীলরঙের মেঝে, দেয়াল, কাঁচ। তার মাঝে সাদা 'বেসীন', ঝকঝকে নিকেলের কলের মাথা। সারাদিনের পর শরীরটা যেন জুড়িয়ে গেল। শাওয়ারটার এত জোর, মনে হচ্ছে মাথা ছ্যাঁদা হয়ে যাবে। পা বেয়ে জল নেমে যাচ্ছে ফ্যানা ফ্যানা হয়ে। সারা বাথরুমে ছড়িয়ে আছে মিষ্টি একটা ফুলের গন্ধ!

স্নান সেরে অস্বচ্ছ নীল কাঁচের দরজা খুলে বাইরে আসতেই মনটা যেন ভরে গেল। অনেক ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে চার্চে গিয়ে এই রকম সংগীত শুনেছিলুম। কখন মনে হচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে, কখন মনে হচ্ছে বিশাল অরণ্যে ঝড় বইছে। ডাঃ ল্যাং সাদা একটা গাউন পরে হাঁটু মুড়ে 'নিল ডাউন' হয়ে বসে প্রার্থনা করছেন।

বুকের কাছে দুহাতে ধরে আছেন সোনার তৈরি একটা ক্রশ। নবেন্দু অবশ্য পদ্মাসনে বসে আছে। আমাদের পরেশচন্দ্র, যার জীবনে আহার আর নিদ্রা ছাড়া দ্বিতীয় কোনও সূক্ষ্ম ব্যাপার নেই সেও এই পরিবেশে অন্যরকম হয়ে গেছে। অবাক হয়ে একপাশে বসে আছে চুপ করে। আলি ইজিচেয়ারে চোখ বুজে চুপ করে বসে আছে। আমিও পাশে একটু জায়গা করে নিয়েছি। আমার সেই—ভবসাগর তারণ স্তোত্র এখানে সুরে মিলবে না। তবে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রার্থনা—খণ্ডন ভব বন্ধন জগ—মিলবে মনে হচ্ছে।

কতক্ষণ ওই ভাবে চোখ বুজিয়ে বসেছিলুম বলতে পারব না। সময়ের কোনও হিসেব ছিল না। গাউনের খসখস আওয়াজে চোখ মেলতেই দেখলুম, ডাক্তার উঠে দাঁড়াচ্ছেন। দাঁড়িয়ে উঠে গম্ভীর গলায় বললেন—ও খ্রাইস্ট। সংগীতটা তখনও বন্ধ হয়নি। ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে টেপ-রেকর্ডারটা বন্ধ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কানে এল, ট্রেনের সেই একঘেয়ে শব্দ। লাইনের চাকায় ঐকতান।

ডাক্তার সাদা গাউনটা খুলে ফেলে, গুছিয়ে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন লাগছে তোমাদের ?

নবেন্দু বললে—ভীষণ ভাল লাগছে। এত সুন্দর সংগীত কখনও শুনিনি।

ডাঃ ল্যাঙের মুখে প্রশান্ত হাসি। হাসতে হাসতেই চৌকো একটা বাক্সর সামনের পাল্লাটা খুলে ফেললেন। সমস্ত কামরাটা খাদ্যের সুগন্ধে ভরে গেল। বাক্সটার ভেতরে মৃদু একটা লাল আলো জ্বলছে। সেই ঠাণ্ডা ঘরেও একটা গরম তাপ অনুভব করতে পারছি। ওই চৌকো বাক্সটার ভেতর থেকে খাদ্যের গন্ধের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তার বললেন—নবেন্দু, তুমি আমাকে একটু সাহায্য কর। ওই ফোল্ডিং খাবার টেবিলটা তুমি পেতে ফেল। অপূর্ব, তুমি নবেন্দুকে সাহায্য কর ডিশ, প্লেট, বোলগুলো ঠিকঠাক করে সাজিয়ে। ভাঙবে না, অযথা শব্দ করবে না। খেয়াল রাখবে আমরা চলন্ত ট্রেনে বসে আছি।

মাঝারি আকারের টেবিল। পরিষ্কার ঝকঝকে। বিশেষ বিশেষ কয়েকটা জায়গায় ছোট ছোট গোল খাঁজকাটা। প্রথমটা বুঝতে পারিনি কেন এমন করা। একটু পরেই বোঝা গেল। ডাঃ প্রথমেই স্যুপের বড় জায়গাটা একটা খাঁজে বসিয়ে দিলেন। তলাটা খাপে খাপে বসে গেল। ট্রেন যতই দুলুক পাত্রটা সরতে সরতে পড়বে না। এই ভাবে সবকটা পাত্রই জায়গায় জায়গায় বসে গেল। সব কিছুই মাপে মাপে তৈরি। আলির গলায় বুকের সামনের দিকে ছোটো একটা তোয়ালে বেঁধে দিয়েছেন। তার কোলে স্টেনলেস স্টিলের বাটিতে দুধ পাঁউরুটি। বেশ বড় একটা চামচে। পাশেই এক জোড়া বেশ বড় সাইজের কলা। একটা লাল টকটকে আপেল।

—এত সব খাবার আপনি কখন তৈরি করলেন কাকা?

. কাকা! আ মাই ডিয়ার সন। এতক্ষণে তোমাদের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হল। আ মাই ডিয়ার সনস। তোমাদের মতো ছেলেরা যে দেশে আছে সে দেশের এত দুঃখ কেন হবে! হবে না। যদিও ভারতটা ঠিক আমার দেশ নয়, তবু এই ভারতের চেহারা আমি পাল্টে দোবো, দোবোই দোবো।

এক হাতে ছুরি আর এক হাতে কাঁটা, ডাক্তার দুহাত আকাশে তুলে তাঁর প্রতিজ্ঞাটাকে অনেক উঁচুতে তুলে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখ বেয়ে জলের ধারা নামল।

—আঙ্কল, আপনার চোখে জল কেন?

—জল, ইজ ইট? আমি কাঁদছি! সত্যি আমি কেঁদে ফেলেছি। বাট মাই সনস, এ দুর্বলের কান্না নয়। এটা আমার আবেগ, জীবনের অনেক কিছু করতে চাওয়া আর করতে না পারার আবেগ চোখের কোণে জল হয়ে জমেছে। আমি যদি বেঠোভেন, বাক, হ্যাণ্ডেল হতে পারতুম, আমি যদি গ্যালিলিও কোপার্নিকাস হতে পারতুম, আমি যদি ফ্লেমিং, রাসেল, আইনস্টাইন হতে পারতুম! পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সেরা সেরা মানুষ এসেছেন, সব মিশিয়ে যদি নিজেকে তৈরি করতে পারতুম!

—কিন্তু আঙ্কল আপনি যে কত বড় বৈজ্ঞানিক !

—বৈজ্ঞানিক ? আমি ? আমি সামান্য একটা জোনাকি। আমার বিজ্ঞান কার কি কাজে লেগেছে! তবে, ইয়েস লাগাতে হবে। আমি পৃথিবীর মুখের চেহারা পাল্টে দিতে চাই। এমন সব মন তৈরি করতে চাই, যে মনে সব সময় বেঠোভেনের নাইন্থ সিমফনি বাজছে। যে মন নদী নয়, নালা নয়, নর্দমা নয়। বিশাল সমুদ্র, বিশাল উচ্ছ্বাস, বিশাল ঝড়। আই উইল বি এ মেকানিক অফ মাইণ্ড। নাও নাও, ফুডস আর গেটিং কোল্ড।

ডাক্তার চিকেনের একটা ঠ্যাং ধরে টানাটানি করতে লাগলেন—কী রকম রেঁধেছি বল ? হাউ আই কুক ? তোমরা একবারও কেউ কিছু বললে না !

আমরা সমস্বরে চিৎকার করে উঠলুম—চমৎকার ! চমৎকার !

আলি মহানন্দে একটা কলা ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়েই লুফে নিল। ক্রিকেটার হলে একটা ক্যাচও মিস করত না।

শেষরাত

ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল। কেন ভাঙল ! ট্রেনের দুলুনিটা থেমে গেছে। চলছে না, কোথাও একটা দাঁড়িয়ে পড়েছে স্থির হয়ে। চোখের সামনে সেই অদ্ভুত ঘড়িটা। স্বপ্নের মায়াবী ঘড়ি যেন। ডায়ালটা মস্ত একটা গোল কাঁচ। গাঢ় নীল। হালকা মেঘ ভাসছে। আলোর অক্ষরে সময় ভেসে উঠছে। তিনটে পনের, তিনটে ষোল, সতের। তাকাতে না তাকাতেই সময় সরে যাচ্ছে, নদীর জলের মতো। পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছে, পূর্বে সূর্য উঠছে। সূর্য এখন কোথায়, ঘড়ি দেখলেই বোঝা যায়। পৃথিবীর কোথায় কোন দেশে সন্ধ্যা নামছে, কোথায় ভোর হচ্ছে, আজ কোন আকাশে চাঁদ, তারারা কে কোথায় আছে,

আকাশের মতো ওই গোল ডায়ালে সব ভেসে উঠছে।

'আঙ্কল, আমরা কোথায়?'

'আমরা বিহারে। এইবার একটা ছোট ইঞ্জিন আমাদের অন্য লাইনে টেনে নিয়ে যাবে।' ডাক্তার পাশের বাঙ্ক থেকে শুয়ে শুয়েই জবাব দিলেন।

'কার নাক ডাকছে আঙ্কল?'

'আলির। ওর ভীষণ নাক ডাকে।'

'আমরা কখন পৌঁছোব?'

'ভোরের একটু পরেই।'

ঘটাংঘট করে ভীষণ একটা শব্দ হল। কামরাটা দুলে উঠল।

'অপূর্ব, ইঞ্জিন জুড়ল। এইবার আবার আমরা চলতে শুরু করব।'

আমাদের কামরার আর একপাশে আর একটা বড় কাঁচের পর্দা ছিল। কেন ছিল, কি তার কাজ বুঝিনি আগে। এখন চোখ পড়তেই অবাক হয়ে গেলুম। ছোট ছোট আলোর টিপ একটা কোণে ঝাঁক বেঁধেছে। আগে ছিল না। হলফ করে বলতে পারি ছিল না। বিন্দুগুলো হঠাৎ পরস্পব পৃথক হয়ে কাঁচের গায়ে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখছি। আমার ঘাড়টা বালিশ থেকে উঠে পড়েছে। হঠাৎ কোথা থেকে ছোট ছোট সাদা সাদা পরীদের মতো কি এক কোণ থেকে আর এক কোণে উড়ে চলেছে। ঠিক দেখছি তো! হ্যাঁ পরীই তো!

'আঙ্কল, ও কি, কাঁচের পর্দায়, কি যেন উড়ে যাচ্ছে! একের পর এক পাখির মতো ভেসে চলেছে।'

'যা দেখছ তাই। দে আর সোলস।'

'সোলস, আত্মা, তার মানে! ফ্যানটাসি! আপনার তৈরি!'

'না অপূর্ব, আমার তৈরি নয়, যন্ত্রটা আমার তৈরি ঠিকই। বাট দে আর সোলস। রাতের পরিক্রমা শেষ করে ওরা এক গোলার্ধ থেকে আর এক গোলার্ধে চলেছে। দিন ওদের সহ্য হয় না তাই রাতের দিকে ছুটে চলেছে।'

নবেন্দু উঠে পড়েছে। পরেশ গ্যাঁট হয়ে উঠে বসেছে। নবেন্দু বললে, 'কেমন যেন বিশ্বাস হয় না।'

নবেন্দুর কথা শুনে ডাক্তার উত্তেজিত হয়ে উঠে বসলেন, 'কেন বিশ্বাস হয় না মাই ডিয়ার নবেন্দু! তুমি টেলিভিসান বিশ্বাস কর নিশ্চয়ই?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, করি।'

'আচ্ছা, তুমি রাডারের নাম শুনেছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, একস রে, গামা রে, চোখে দেখা যায়?'

'আজ্ঞে না।'

'আলট্রা ভায়লেট রে দেখা যায়?'

'আজ্ঞে না।'

'তুমি নিশ্চয়ই জান, এমন শব্দ-তরঙ্গ আছে যা কানে শোনা যায় না।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'অথচ এরা আছে। কেমন তো!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এইবার আমি যদি বলি, ওই যন্ত্রটা আমার এমন কায়দায় তৈরি যে কায়দায় আমাদের অদৃশ্য জগতের আলোক-কম্পন সহজেই ধরা পড়ছে। যা আমাদের চোখের বাইরে দিয়ে চলে যায় তাই যেন হঠাৎ সত্য হয়ে উঠছে। অলৌকিক, ভৌতিক বস্তু সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। পরেশ, তুমি বল তো ভূত শব্দটার মানে কি?'

পরেশ সবে ঘুম থেকে উঠে চোখ ছানাবড়া করে বসেছিল। প্রশ্ন শুনে, প্রথমে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে খানিক মাথা চুলকাল, তারপর ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ভূত মানে ভয়।'

'ব্র্যাভো, ব্র্যাভো মাই ফ্রেণ্ড।' ডাক্তার দু আঙুলে টুসকি বাজালেন। কাঁচের পর্দাটা ইতিমধ্যে কালো হয়ে গেছে।

'আঙ্কল, পর্দায় আর কিছু নেই কেন?'

'যে দৈর্ঘ্যের আলোকতরঙ্গ ওই যন্ত্রের পক্ষে ধরা সম্ভব, ওরা হয় তার চে বড় দৈর্ঘ্যে সরে গেছে কিংবা ছোটো হয়ে গেছে। শোন পরেশ, ভূত মানে ভয় নয়, ভূত দেখলে ভয় হতে পারে, তবে ভূত কখনও ভয় দেখাতে চায় না, আমরাই ভয়ে মরি। ভূত হল আমরা যা দেখি, শুনি, অনুভব করি তার মূল উপাদান অর্থাৎ ক্ষিতি অপ তেজঃ মরুৎ ব্যোম। পঞ্চভূত। আকাশ, বাতাস, পৃথিবী, আগুন, জল কোন জীবই মরে না। মৃত্যু হল এক ধরনের রূপান্তর। এক অবস্থা থেকে আর এক অবস্থায় চলে যাওয়া।'

পরেশ বিশাল একটা হাই তুলল। ডাক্তার বললেন, 'নাও, আর একটু শুয়ে নাও তোমরা।' সেই অদ্ভুত ঘড়িটার দিকে চোখ চলে গেল। মনে হল সূর্য যেন দিগন্তের আরও কাছে চলে এসেছে। ডায়ালে সমুদ্রের ঢেউ। ডাক্তার বললেন, 'ওই দেখ, সমুদ্রে জোয়ার আসছে।'

টিংলিং, টিংলিং করে অদ্ভুত একটা মিষ্টি শব্দ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। কিসের শব্দ!

'আঙ্কল, কিসের শব্দ?'

'যদি বলি পৃথিবীর অক্ষপথে ঘোরার শব্দ, বিশ্বাস করবে?'

'হ্যাঁ করব। আপনি যা বলবেন, তাই বিশ্বাস করব।'

'তবে মনে রাখবে—প্রণিপাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া।'

ট্রেনের ঝাঁকুনিতে আবার যেন ঘুম জড়িয়ে আসছে চোখে। খাঁচার পাখিরা বোধহয় টের পেয়েছে ভোর হয়ে আসছে। কিচির কিচির করে ডাকছে। ডাক্তার বললেন, 'পাখিদের ভাষা বোঝ নবেন্দু?'

'আজ্ঞে না।'

'আচ্ছা তোমাকে শিখিয়ে দোবো। আমি একটা অভিধান তৈরি করেছি।'

পাহাড়তলি

একসঙ্গে গোটাচারেক সাদা স্টেশান ওয়াগন পর পর ছুটছে। রাস্তা কখনও খাড়া ওপর দিকে উঠেছে। কখনও গোঁত করে নীচে নামছে। চারপাশে শাল সেগুনের বন ঝিম ঝিম করছে পাহাড়ী রোদে। যাঁরা গাড়ি চালাচ্ছেন তাঁদের নীল পোশাক। যাঁরা নিতে এসেছেন তাঁদের সাদা। সাদা আর নীল পাশাপাশি এত সুন্দর দেখাচ্ছে!

আমাদের গাড়িতে ডাক্তার ল্যাং নেই। তাঁর বদলে আমরা পেয়েছি ডক্টর শিলারকে। জার্মান ভদ্রলোক। পরিষ্কার বাংলা বলেন। আমাদের সঙ্গে চলেছে সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস। বিষাক্ত বিষাক্ত অসংখ্য সাপ গোল ছোট ছোট বেতের ঝাঁপিতে। ডক্টর শিলার হলেন সাপের বিষ বিশেষজ্ঞ। শিলার বললেন, 'আমার প্রথম কাজই হবে সমস্ত সাপের বিষদাঁতের কোটর থেকে বিষ ঢেলে নেওয়া। বড় শক্ত কাজ। এই বিষে যেমন মানুষ মরে তেমনি ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে বহু মারাত্মক অসুখ সেরে যায়।'

ডক্‌টর শিলারের কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি গাড়িটা হঠাৎ হুড়মুড় করে বাঁদিকে কাত হয়ে পড়ে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে ছিটকে পড়ল একটা বেতের ঝাঁপি। ডালাটা খুলে গেছে। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে একটা কালো সাপ।

শিলার বললেন, 'একদম ভয় পাবে না। মনে রাখবে যিনি বেরোচ্ছেন তিনি কেউটে। গোলমাল একেবারে পছন্দ করেন না।'

আমরা ভয়ে আসনের ওপর পা তুলে নিয়েছি। সাপটা প্রায় পুরো শরীরটাই বের করে ফেলেছে। দেখেই কেমন গা শির শির করছে। শিলার একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন, সাপটার গতিবিধি

দেখছেন। গাড়িটা কাত হয়ে থেমেই আছে। চলবে বলে মনে হয় না। কি হল কে জানে! গাড়ি ওল্টান থেকে বাঁচলেও সাপের কামড় থেকে বাঁচব কিনা ঈশ্বরই জানেন।

শিলার পকেট থেকে একটা রবারের রড বের করলেন। কালো কুচকুচে রঙ। সেই রবারের ডাণ্ডাটা সাপের মুখের কাছে ধরতেই, সাপটা ছোবল মারার জন্যে ফণা তুলল। মাথাটা হেলছে তুলছে। লিকলিক করে জিভ বেরোচ্ছে ঢুকছে। আতঙ্কে আমাদের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে। ডক্টর শিলার হঠাৎ ডান হাত দিয়ে সাপটার গলার কাছটা ঝপ করে চেপে ধরলেন। বজ্র মুঠি। সাপটাকে মেঝে থেকে সোজা হাতখানেক ওপরে তুলে ধরেছেন। শূন্যে লিকলিক করে শরীরটা ঝুলছে, প্রথমে আমরা চোখ বুজিয়ে ফেলেছিলুম। শিলারের গলা পেলুম, 'ওপন ইওর আইস বয়েজ, দি ক্রাইসিস ইজ ওভার।'

সাপটাকে ফের ঝাঁপিতে ভরে ফেললেন, সেও এক অদ্ভুত কায়দা। মাথাটা ছেড়ে দিলেই তো ছোবল মারবে। মাথাটাকে প্রথমে ঢোকালেন, ন্যাজটাকে বাঁহাতে গোল করে গুটিয়ে গুটিয়ে বেশ সুন্দর করে দড়ি গুছোবার মতো করে রাখলেন। মাথাটা ছাড়লেন সবশেষে। বিদ্যুৎ গতিতে ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলেন। ভেতর থেকে হিস হিস শব্দ বেরোতে লাগল।

শিলারের সারা মুখে ঘাম ফুটেছে। নিজের হাতের আঙুলগুলো ভাল করে দেখতে দেখতে বললেন, 'জান তো, সাপ নিয়ে যাদের কারবার তারা সাপের হাতেই মরে।'

'ডক্টর, আজ কোন বিপদ হতে পারত!'

'ইয়েস, একে এই ছোট জায়গা, আমার হিসাবে একটু ভুল হলেই আমাকে মেরে দিতে পারত। কিন্তু সাপ ধরায় ভীষণ মজা আছে।'

ড্রাইভার বললেন, 'এইবার আপনাদের একটু নামতে হবে।'

গাড়ির বাঁ পাশের সামনের চাকাটা একটা গর্তে পড়েছে। নাকটা

ঠেকে গেছে একটা পাথরে। পাথরটা না থাকলে আমরা চলে যেতুম শ'খানেক ফুট নিচে। একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যেতুম। উদ্ধারের কি উপায় কে জানে! ড্রাইভার, 'বললেন গাড়িটাকে আর একটা গাড়ির সঙ্গে মোটা তার দিয়ে বেঁধে পেছন দিক থেকে টানতে হবে।' আগের গাড়িগুলো আমাদের ফেলে সামনে এগিয়ে গেছে।

ডক্‌টর শিলার বললেন, 'ওয়্যারলেসে যোগাযোগ কর।'

ড্রাইভারের সামনের আসনে একটা চৌকো বাক্‌স ছিল। তার গায়ে ঝুলছে টেলিফোন। সামনের গাড়ি গুলো বহু দূরে। তবু যোগাযোগ হয়ে গেল নিমেষে। 'ইয়েস ইউ আর কামিং। এখুনি আসছি, ভেব না কিছু।'

শিলার হাসিহাসি মুখে বললেন, 'পাহাড়ী পথে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে। ভয় পাবার কিছু নেই।'

আমরা কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়েছি। পাথরে ঠেকে না গেলে আমাদের খুঁজে পাওয়া যেত কয়েক শ'ফুট নিচে তালগোল পাকানো অবস্থায়। নবেন্দু খাদটা উঁকি মেরে দেখছে। জঙলা গাছ, কাঁটা ঝোপ ধাপে ধাপে নেমে গেছে। অনেক নিচে একটা গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। ভাঙা-চোরা জং ধরা। নবেন্দু আর আমি দুজনেই দেখছি। এই ভাবেই গাড়িটা একদিন ছিটকে পড়েছিল।

শিলাব বোধহয় আমাদের মনের কথা বুঝেছেন, 'একবছর আগের একটা দুর্ঘটনার সাক্ষী। এই জায়গাটাকে আমরা ডেঞ্জারাস পয়েন্ট বলে থাকি। কোনও কারণ নেই, তবে কেন যে এই জায়গাটায় মাঝে মাঝে দুর্ঘটনা ঘটে যায়! ওটা আমাদের একটা গাড়ি। ওই গাড়িটাতেও অনেক সাপ ছিল। ডক্টর চন্দ্র মারা গিয়েছিলেন ওই দুর্ঘটনায়। বহু মারাত্মক সাপও ছাড়া পেয়েছিল। এখন তারা সংখ্যায় আরও বেড়েছে নিশ্চয়!'

দূরে একটা গাড়ি আসছে। আমাদের গাড়ি। আমাদের উদ্ধার করতে আসছে। ডক্টর ল্যাং লাফিয়ে নামলেন। তাঁর মুখে লেগে

আছে মিষ্টি একটা হাসি।

'ডক্‌টর শিলার, দি সেম পয়েণ্ট '

'ইয়েস ডক্টর। এই জায়গাটার একটা কিছু ব্যাপার আাছে।'

'ব্যাপারটা আমাকে ইনভেসটিগেট করতে হবে। আমি একদিন সারারাত এখানে বসে থাকব। নিশ্চয় এখানে কোন স্পিরিট আছে।'

'আমি যে ওসব বিশ্বাস করি না।'

'কিন্তু আমি যে করি।'

শিলার হো হো করে হাসলেন।

মোটা তার নয়, বিশাল একটা ম্যাগনেট দিয়ে গাড়িটাকে সরিয়ে আনা হল। বাধ্য ছেলের মতো সুড়সুড় করে পেছনে সরে এল।

ডকটর ল্যাং বললেন, 'নেকসট টাইম এখানে আমি একটা ক্রশ পুঁতে দোবো। এখানে একটা ইভল স্পিরিট কাজ করছে।'

যে যার গাড়িতে উঠে পড়লুম। আমাদের যাত্রা আবার শুরু হল ? দুলতে দুলতে, লাফাতে লাফাতে গড়ি চলেছে। রাস্তাটা তেমন ভাল নয়। বেতের ঝাঁপিগুলো এদিকে ওদিকে দুলছে, আবার না ছিটকে পড়ে।

দূর থেকে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা চার্চের চূড়া। নীল আকাশের গায়ে যেন খোঁচা মারছে! কানে এল ঘণ্টার শব্দ। শিলার বললেন, 'আমরা এসে গেলুম। আজ শুক্রবার, তাই চার্চের ঘণ্টা বাজছে। আজ প্রেয়ারের দিন।'

পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে বাড়ি উঠে গিয়েছে। কোথা থেকে যেন একটা আলো ঝলসে উঠছে মাঝে মাঝে। বিশাল একটা আয়না থেকে আলো ঠিকরে পড়লে যেমন হয়। বিশাল দুটো বেলুন উড়ছে আকাশের গায়ে। একটার রঙ হলদে আর একটা লাল।

সামনেই একটা সাইনবোর্ড—হিলসাইড রিসার্চ স্টেশন। ট্রেসপাসারস উইল বি ইন ডেঞ্জার। ডেঞ্জার মানে তো বিপদ। কেউ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে ঢুকে পড়লে বিপদে পড়বে কেন? কি বিপদ।

রাস্তাটা হঠাৎ অসাধারণ ভাল হয়ে গেল। মসৃণ, চকচকে, কালো

পিচ মোড়া। দু পাশে সাদা সাদা পাথরের খাড়াই। আমরা এখন ঢালু পথে নিচের দিকে নেমে চলেছি। মাঝে মাঝে পথের পাশে ছোট ছোট গুমটি ঘর। পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। হাতে বন্দুক নয়, একধরনের কালো নলের মতো জিনিস। মুখের কাছে চকচকে রিং লাগান। দু' পাশ দিয়ে দু' সার করে তার চলে গেছে। একটা ছোট নালা বয়ে চলেছে পাশ দিয়ে তরতর করে। স্বচ্ছ জল। মাঝে মাঝে কালভার্ট। কালভার্টের তলায় টিয়ার ঝাঁক। জায়গাটাকে সরগরম করে রেখেছে। দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়ের ঢেউ ঝাপসা হয়ে আছে। দেখলেই কেমন যেন মন কেমন করে ওঠে। কত দূর! কত অজানা! গভীর বন। হরিণ, চিতা, হায়না!

পথের একটা জায়গায় এসে গাড়িটা থেমে গেল। ডক্‌টর শিলার বললেন, 'বয়েজ, এবার তোমাদের নামতে হবে। আমি গাড়িটাকে নিয়ে পাতালে চলে যাব। বাসুকিদের রাজত্বে। তোমাদের গাইড করে নিয়ে যাবে 'আমাদের গার্ড।'

আমরা আমাদের জিনিসপত্র নিয়ে নেমে পড়লুম। সামনেই একজন সুন্দর মানুষ দাঁড়িয়ে। অলিভ রঙের পোষাক পরে। রাস্তার পাশেই একটা লোহার হাতল। লিভারের মতো দেখতে। সেটাতে চাপ দিতেই ওপরের রাস্তাটা সরে গেল। নীচে বেরিয়ে পড়ল আর একটা রাস্তা। সোজা নেমে গেছে ঢালু হয়ে। মোটেই অন্ধকার নয়, সেখানেও দিনের আলোর মতো ঝলমল করছে আলো। গাড়িটা সেই পথে নেমে যেতেই ওপরের দুভাগ রাস্তাটা আবার জুড়ে গেল।

আর তো দ্বিতীয় কোন গাড়ি নেই। আমরা কি ভাবে যাব! সঙ্গে এত মালপত্তর! বাড়িগুলোও অনেক দূরে। আমাদের গাইড সাহেব মুখ দেখেই মনের কথা পড়ে ফেলেছেন। হেসে বললেন, 'হাঁটতে হবে না। তোমরা দাঁড়িয়ে থাকবে। কাম হিয়ার। কাম টু দিস সাইড অফ দি রোড।'

আমরা, মালপত্তর নিয়ে বাঁ পাশে সরে গেলুম। পায়ের কাছে

স্যুটকেশ। গাইড সাহেব বললেন, 'আমি সঙ্গে যাচ্ছি না, ওপাশে তোমাদের যিনি রিসিভ করবেন, তাঁকে আমি ফোনে জানিয়ে দিচ্ছি। তোমরা শুধু ডানপাশের এই সাদা রেখাটায় পা লাগবে না। রেডি ওয়ান, টু, থ্রি।'

সাঁ করে মৃদু একটা শব্দ হল। আমরা এগোতে লাগলুম সামনের দিকে। পরেশ বললে, 'অপূর্ব, আমার মাথাটা ঘুরছে রে, তোর কাঁধ দুটো ধরছি।'

নবেন্দু বললে, 'আমি পড়েছি, বিদেশে এইরকম চলমান রাস্তা আছে। কি মজা লাগছে! তাই না?' পরেশ কাঁদকাঁদ গলায় বললে হ্যাঁ কী ভীষন মজা!'

চোখ-ধাঁধান আলোর রহস্যটাও যেন হঠাৎ পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখে পড়ল বিশাল একটা গোল গম্বুজ। গম্বুজের বাইরের রঙটা আয়ানার পেছনের মত। মাথাটা খোলা। ভেতরটা নিশ্চই খুব গভীর। খোলা মুখে সূর্যের আলো পড়ে ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসছে। মনে হয় ভেতর দিকটা আয়নার মত কোন বস্তু দিয়ে তৈরি। আমরা গম্বুজটার অনেক দূর দিয়েই চলেছি, তবু মনে হল ভেতরে যেন কেমন একটা বগবগ শব্দ উঠছে।

'নবেন্দু, ওটা কি বল তো?'

'মনে হচ্ছে মোলার রি-অ্যাকটার। এরা সূর্যের আলোকে সূর্যের তেজকে কাজে লাগাচ্ছে! কি কাজে লাগাচ্ছে তা জানি না।'

আমাদের গতি ধীরে ধীরে কমে আসছে। সামনেই একটা সাদা গুমটি ঘর, গায়ে হলুদের ডোরা। সাদা রঙের একটা মানুষ সমান উঁচু লোহার বেড়া আমাদের পথ আগলে আছে। ঢং করে একটা ঘণ্টার শব্দ হতেই চলমান রাস্তা স্থির হয়ে গেল। ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আর একজন গার্ড। সেই অলিভ রঙের পোশাক। হাত বাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। এঁর হাতেও সেই ফাঁপা নলের মতো একটা কি! মুখটা চকচকে ধাতুর রিং দিয়ে মোড়া।

বেড়ার ওপাশে বিশাল একটা প্রাঙ্গণ। পাথরের ইট বসানো। ঝাউ, ইউক্যালিপটাস, বোগেনভ্যালিয়া, গন্ধরাজ গোল করে ঘিরে রেখেছে। সামনেই দূর থেকে দেখা সেই চার্চ। কয়েকটা নতুন চকচকে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চার্চের জানলায় নানা রঙের কাঁচ বসান। কাঁচের গায়ে আঁকা যীশুর জীবনের নানা ঘটনা।

গার্ড বললেন, 'তোমাদের জিনিস এখানে থাক। আমি তোমাদের গেস্ট হাউসে পাঠিয়ে দোবো। তোমরা সোজা চার্চে চলে যাও। ওখানেই সকলকে পাবে।'

চার্চে অদ্ভুত সব মানুষ

নবেন্দু বললে, 'ওই যে উঁচু বেদী বা প্ল্যাটফর্মের মত জায়গাটা, ওটাকে বলে পালপিট। আর সাদা পোষাকপরা ওই মানুষটি হলেন বিশপ।'

অর্গানের সুরে ভেতরটা গমগম করছে। সঙ্গে সমবেত কণ্ঠের গান:

Holy, holy, holy, is the Lord God
Almighty.
Who was, who is, and who is to come.

আমরা সবার পেছনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের প্রত্যেকের সামনে উঁচু একটা ডেস্ক। তার ওপর একটা করে বাইবেল। মলাটে সোনার জলে লেখা—বাইবেল। আমাদের সামনে আর যাঁরা সব দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের দেখে আমরা সকলেই খুব ভয় পেয়ে গেলুম। কেউই স্বাভাবিক মানুষ নয়। ডানপাশের শেষের সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, তাঁরা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া, ঠিক দৈত্যের মত। একেবারে সামনের সারিতে যারা, তাঁরা সব ক্ষুদে মানুষ।

উচ্চতায় দু ফুট-আড়াই ফুটের বেশি হবেন না। আমাদের সামনে যারা তাঁদের প্রত্যেকের পিঠেই একটা করে বিশাল আকারের কুঁজ। তাদের পাশেই যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের কেমন যেন গেঁটে গেঁটে চেহারা। ঠিক যেন কাঠের তৈরি পুতুল।

প্রেয়ারের সময় কথা বলতে নেই। আমরা পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাচ্ছি। মনে মনে কথা হচ্ছে, এঁরা কারা! এমন অদ্ভুত সমাবেশ এখানে হল কি করে! অর্গানের সুর কখনও উঠছে, কখনও পড়ছে। রঙীন কাঁচের বাইরে পাহাড়ী রোদ ক্রমশ প্রখর হচ্ছে।

সুর থেমে গেল। বিশপ প্রার্থনা করলেন,

I will pour out my spirit upon all men .
Your sons and your daughters will prophesy,
Your young men will see visions,
And your old men will dream dreams.

আমরা একে একে চার্চ থেকে বেরিয়ে এলুম। ডাক্তার ল্যাং বোধ হয় সামনের দিকে ছিলেন। তিনি বেরিয়ে এলেন সবশেষে। আমাদের অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝেছেন, তাই হাসতে হাসতে বললেন, 'অদ্ভুত সব মানুষ, তাই না নবেন্দু !,

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তাকিয়ে দেখার মতো।'

'এই রহস্য তোমাদের কাছে আমি পরিষ্কার করে দোবো আজ রাতে। এখন তোমরা আমার সঙ্গে চল। বেশ বেলা হয়েছে। একটার সময় লাঞ্চ। তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে।'

গেস্টহাউস

এত সুন্দর গেস্ট হাউস খুব কম দেখা যায়। তবে ক'টা গেস্ট হাউসই বা আমরা দেখেছি! চারপাশে গোলাপ ফুলের বাগান। নানা রঙের বড় বড় গোলাপ ফুটে আছে। মাঝখানে একটা ফোয়ারা। হাল্কা ধারায় জল উঠে চারপাশে যখন ছড়িয়ে পড়ছে, মাঝে মাঝে রামধনু তৈরি হচ্ছে। এত বড় বড় ভোমরা ফুলের কিছুটা দূরে শূন্যে দাঁড়িয়ে কখনও স্থির, কখনও খোঁচা মারছে ফুলের গর্ভকেশরে। কেমন একটা একটানা ঝিমধরান ভোঁ ভোঁ শব্দ।

আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটা করে আলাদা ঘর। পরেশের সবেতেই ভয়।

'কি করে একলা একটা ঘরে শোব রে অপূর্ব! চার্চে যাদের দেখলুম, তারা যদি রাতে জানালা ধরে উঁকি মারে, ভয়ে মরে যাব রে নবেন্দু।'

'তোর মরে যাওয়াই ভাল রে পরেশ। তোর সবেতেই ভয়। মানুষেও ভয়।'

'আচ্ছা বল, ওরা কি মানুষ!'

'মানুষ না তো কি? এক জায়গায় অতগুলো কদাকার মানুষ দেখা যায় না এই যা!'

নবেন্দু চান করতে চলে গেল। আমরাও চানে যাব। প্রত্যেকের ঘরের সঙ্গেই একটা করে বাথরুম।

ওঃ! চানের জন্যেও যে এত আয়োজন থাকতে পারে জানা ছিল না। একেবারে সাদা বাথরুম। বিশাল বাথটাব। শাওয়ার। মেঝেতে এটা আবার কি! পায়ের চাপ দিয়ে দেখিন আরে, চাপ দিতেই তলা থেকে ফিনকি দিয়ে জল উঠছে ফোয়ারার মতো। বেশ মজা তো! ওপরে শাওয়ার থেকে জল পড়ছে, নিচে ফোয়ারা থেকে

জল উঠছে। আঃ কি আরাম রে। একটা কৌটোর গায়ে লেখা, বাথসল্ট। বাথ মানে স্নান, সল্ট মানে নুন। পুরো মানেটা তাহলে হল চানের নুন। সেটা আবার কি জিনিস। যেখানকার জিনিস সেখানেই থাক বাবা। হাত দিয়ে কাজ নেই।

গেস্ট হাউসের বারান্দায় খসখসের পর্দা নেমেছে। একজন লোক পিচকিরি দিয়ে জল দিচ্ছে। ছোট্ট এতটুকু মানুষ। দেখলেই কেমন মজা লাগে। পরেশ দেখলে ভয় পাবে। খসখসের মিষ্টি গন্ধে মনটা যেন জুড়িয়ে গেল। বিহারী গরম ফুটছে। ঘাম নেই, গা জ্বালা। লোকটি আমাকে দেখে বললে, 'গুড মর্নিং, মাস্টার, মাস্টার...'

'অপূর্ব।'

'ইয়েস মাস্টার অপূর্ব। আমার নাম টমাস।'

'মর্ণিং মাস্টার টমাস।'

মাস্টার বলেই খেয়াল হল, দেখতে ছোট হলেও বয়েসে অনেক বড়। ভুল শুধরে নিলুম, 'মর্ণিং মিস্টার টমাস।'

লোকটি চলে যেতে যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে হাসল, 'রাইট ইউ আর, আমার বয়েস এখন ফর্টি সিক্স।'

নবেন্দু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে।

'কি মেখেছিস রে নবেন্দু!'

'কেন, বাথ সল্ট!'

'বাথ সল্টটা কি রে?'

'বাথটাবে জল ভরবি, তারপর বাথ সল্ট মিশিয়ে বেশ করে ফেনা করে তার মধ্যে শুয়ে পড়বি।'

'তাই নাকি, তাহলে আর একবার চান করে আসি।'

'সে কি রে!'

'হ্যাঁ, তুই করলি আমি করব না! কি সুন্দর জায়গা নবেন্দু। আমি আর এখান থেকে যাব না।'

'তোকে রাখবে কেন?'

'আমি আঙ্কলকে রিকোয়েস্ট করব।'

'আচ্ছা, পরেশটার কি হল বল তো?'

'ঠিক বলেছিস। অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া শব্দ পাচ্ছি না। চল তো ওর ঘরে।'

পূর্বদিকের শেষ ঘরটা পরেশের। ঘরের দরজা হাট খোলা। জামাটামা সব খোলা। চরিদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। বাবু বাথরুমে ঢুকেছেন। নবেন্দু ডাকলে, 'পরেশ, পরেশ।'

বাথরুম থেকে একটা চাপা কান্নার শব্দ এল।

'কি হল রে নবেন্দু, পরেশ কাঁদছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ তো রে, কান্নারই তো শব্দ। পরেশ, কি হল, এই পরেশ।

বাথরুম থেকে পরেশের কান্না জড়ান চাপা গলা ভেসে এল, 'বাথরুমের দরজাটা যে খুলতে পারছি না রে নবেন্দু। সেই থেকে আটকে বসে আছি।

'সে আবার কি রে?'

'হ্যাঁরে, কিছুতেই খুলছে না ভাই।'

''উঃ তোকে নিয়ে তো মহা বিপদ হল। তুই ছিটকিনিটা বাঁদিকে ঘুরিয়ে দরজাটা তোর দিকে জোরে টান। দরজার ল্যাচ এইভাবেই খুলতে হয়। ট্রেনের ল্যাভেটারির কায়দা তো তুই দেখেছিস, ডানদিকে ঘোরালে বন্ধ হয়, বাঁদিকে ঘোরালে খোলে।'

'আরে তখন থেকে তাই তো করছি। কমসে কম হাজার বার করেছি '

'তাও খুলছে না?'

'না।'

নবেন্দু আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'কি ব্যাপার বল তো অপূর্ব!'

নবেন্দু দরজাটা ভাল করে দেখে হো হো হেসে উঠল। পরেশ ভেতর থেকে বললে, 'আমার এই বিপদে তুই হাসছিল নবেন্দু।'

'হ্যাঁ, হাসছি ইডিয়েট। তুই একটা ইডিয়েট।'

নবেন্দু হাতল ধরে দরজাটা নিজের দিকে টানতেই খুলে গেল দরজাটা। পরেশ গামছা পরে দাঁড়িয়ে আছে। গা দিয়ে বিন বিন করে ঘাম বেরোচ্ছে। মুখে একমুখ হাসি।

'কি করে খুললি নবেন্দু। তুই যাদু জানিস।'

'হ্যাঁ, যাদু জানি। মূর্খ, এ দরজাটা বাইরের দিকে খোলে' তুই তো দরজাটা ঠেলে দেখবি! তা না, তখন থেকে নিজের দিকেই টেনে চলেছিস!'

পরেশের মুখটা হাঁ হয়ে গেল, 'জানলি নবেন্দু, বিপদে মানুষের বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। আমি না কেমন বোকার মতো তখন থেকে ছিট-কিনিটা কেবল ঘোরাচ্ছি আর দরজাটা টানছি। কি রকম ঘেমে গেছি দেখ। আর একবার চান করে নিই। কি বল অপূর্ব!'

'হ্যাঁ তাই নাও ভাই। তবে বেরোতে পারবি তো!'

পরেশ একগাল হেসে বললে, 'আর ভুল হবে না, এবার শিখে গেছি।'

মরা টিয়া

বারান্দায় সুন্দর করে সাজান বেতের চেয়ার টেবিল। খসখসের পর্দার ভেতর দিয়ে গরম হাওয়া পথ করে নেবার সময় কিছুটা উত্তাপ হারিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গন্ধ মেখে গায়ে এসে লাগছে। আমরা পাশাপাশি বসে আছি অলস ভঙ্গিতে। কিছু করার নেই। কিছু পড়ার নেই।

সাদা পোশাক পরে একজন লোক এলেন, হাতে একটা কার্ড। কার্ডটা লাঞ্চের মেনু।

'আপনারা কি সবাই ভেজিটেরিয়ান, না ননভেজ, না মেশান?'

আমাদের আপনি বলায় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। নবেন্দুই উত্তর দিলে 'আমরা সবাই ননভেজ।'

'ভেরি গুড।'

'চিকেনে আপত্তি আছে?'

'না না।'

'ভেরি গুড। তা হলে একটার সময় ডাইনিং হলে চলে আসবেন! সোজা উত্তরে হেঁটে যাবেন, সামনেই ডাইনিং হল।'

লোকটির হাতের তালু দুটো কুচকুচে কালো। আমরা সবাই হাতের দিকে তাকিয়ে আছি, নবেন্দুই জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার হাতে কি কোনও রঙ লেগেছে!'

'ও নো নো। এইটাই আমাদের ফ্যামিলির বৈশিষ্ট্য। হেরিডিটিও বলতে পারেন। আমাদের দু'ভায়েরই হাতের তালু এইরকম কাল। আমাদের বাবা বা মায়ের কাল ছিল না, তবে শুনেছি, আমাদের গ্রেট গ্রেট গ্র্যাণ্ড ফাদারের হাতের তালু দুটো এইরকম ছিল। আচ্ছা, গুডবাই, থ্যাঙ্ক ইউ।'

লোকটি গট্‌মট করে চলে গেল।

পরেশ বললে, 'কি অদ্ভুত জায়গায় নিয়ে এলি নবেন্দু! অবাক অবাক সব ব্যাপার।'

'ঘরকুনো হয়ে বসে থাকলে এই সব দেখতে পেতিস?'

'তা পেতুম না, তবে আমার কিরকম ভয় ভয় করছে।'

'তোর ভয়ে গুলি মার। 'তুই তো আরশোলা দেখলেও ভয়ে আঁতকে উঠিস।'

দেখতে দেখতে সাড়ে বারোটা বেজে গেল। নবেন্দু বললে চল এবার বেরিয়ে পড়ি। বসে বসে ঝিম ধরে গেল।'

বাইরে যেন আগুন ছুটছে। গোলাপগুলো ঝিমিয়ে পড়েছে। ভোমরারা সব ছায়ায় সরে গেছে। দূরের পাহাড়ের রেখা যেন আরও অস্পষ্ট ধোঁয়াটে। বাগানে একটা বাঁশের গায়ে থার্মোমিটার বাঁধা। নবেন্দু দেখে বললে, 'একশো তেরো ডিগ্রি। উঃ গরম বটে। খুব পেঁয়াজ খেতে হবে।'

'মাথায় একটা করে ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে এলে মন্দ হত না'!

'ঠিক বলেছিস। চ ফিরে যাই।' প্রায় মাঝ রাস্তায় এসে পরেশ আবার ফিরতে চায়। এই না হলে পরেশ।

নবেন্দু বললে, 'হ্যাঁ, তুই ফিরে যা। ভিজে তোয়ালে মাথায় দিয়ে আসতে আসতেই আমাদের খাওয়া শুরু হয়ে যাবে!'

নবেন্দু হঠাৎ রাস্তা ছেড়ে বাঁ-পাশের ঝোপঝাড়ের দিকে সরে গেল। কিছু একটা চোখে পড়েছে।

'অপূর্ব, এদিকে আয়। দেখে যা! ওই দেখ। দেখেছিস।'

চার পাঁচটা টিয়া পাখি একটা পেয়ারা গাছের তলায় মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। গাছে পাকা পাকা পেয়ারা ঝুলছে।

'কি ব্যাপার বল তো! আহা অত সুন্দর সুন্দর পাখি!

'গরমে মরেছে বলে মনে হয় না। একশো তেরো ডিগ্রি এখানে এমন কিছু গরম নয়। কেউ মেরেছে বলেও মনে হয় না।'

'তা হলে কি? কি করে মরল তা হলে?'

'সন্দেহজনক ব্যাপার রে।'

আবার আমরা চলতে শুরু করলুম। মাথায় ঘুরছে মরা টিয়া।

পরেশ বললে, 'গরমেই মরেছে রে! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। এন্তার পেয়ারা খেয়ে কলেরা হয়ে মরেছে।'

'ঠিক বলেছিস। তুই চুপ কর পরেশ। কেবল মনে রাখিস, এখানে সব গুরুপাক খাদ্য। একটু ভেবেচিন্তে খাস'

ডাইনিং হল

ভারি সুন্দর ঠাণ্ডা ভেতরটা। এয়ারকণ্ডিশানড। চমৎকার সাজান। ছোট ছোট টেবিল। সাদা টেবিলক্লথ। প্রত্যেক টেবিলেই গলা সরু, ঝকঝকে একটা করে ফুলদানি। কোনটায় নীল ফুল, কোনটায় হলুদ ফুল। কোনটায় লালফুল। মুখোমুখি গদি আঁটা চেয়ার। চারপাশের দেয়ালে ভাল ভাল ছবি আঁকা। ডক্টর ল্যাং আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন।

'বাঃ তোমাদের খুব ফ্রেশ দেখাচ্ছে। এখানে কিছুদিন থাকলেই

তোমাদের চেহারা ফিরে যাবে। পরিষ্কার হাওয়া, তেমনি ভাল জল।'

আমরা হাসি হাসি মুখে ঘাড় নাড়লুম। নবেন্দু বললে, 'আঙ্কল, আসার সময় বাগানে একটা স্যাড অদৃশ্য দেখলুম।'

'কি দৃশ্য।'

'একটা পেয়ারাগাছের তলায় চার-পাঁচটা বড় বড় টিয়া মরে পড়ে আছে।

'সে কি!'

আমরা সমস্বরে বললুম, 'ইয়েস আঙ্কল। মরে কাঠ হয়ে পড়ে আছে।'

'আমি দেখতে চাই। আমার এখানে মৃত্যুর বিরুদ্ধে লড়াই চলছে, সেখানে মরা পাখি, সাংঘাতিক কথা! আই মাস্ট সি। চল চল।'

ঘরে আরও অনেকে এসেছেন। যে যাঁর টেবিলে বসে পড়েছেন। চীনে মেম সায়েবরা প্লেট হাতে ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরছেন। ডাক্তার বললেন, 'জেন্টল লেডিজ অ্যাণ্ড মেন, আপনারা শুরু করুন, আমরা এখনি আসছি।'

ঠাণ্ডা ঘর থেকে বাইরে আসতেই গরমে সারা শরীর জ্বলে গেল। মনে হল, গরম জলের নদীর মধ্যে দিয়ে হাঁটছি। সেই পেয়ারা গাছটার তলায় এসে আমরা অবাক হয়ে গেলুম। মরা পাখি ক'টা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি ডাক্তার বললেন, 'কই, কোথায় তোমাদের পাখি! ভুল দেখেছ তোমরা। ওরা হয়তো বসে ছিল, উড়ে গেছে।'

'না আঙ্কল, আমরা মরা পাখি চিনি। মরে কাঠ হয়ে পড়েছিল ঠিক ওই জায়গাটায়।'

অনেক খোঁজা হল। পাখিদের ডেডবডি পাওয়া গেল না। আমরা সকলেই চিন্তিত মুখে খাবার ঘরে ফিরে এলুম।

প্রচুর খাওয়া হল। স্যুপ দিয়ে শুরু, পুডিং দিয়ে শেষ। অনেকে এই গরমেও কফি খেলেন। ডাক্তার ল্যাং বললেন, 'দুপুরে তোমরা

রেস্ট নাও, বই-টই পড়। ঘুমোতেও পার। চারটের সময় চা। তারপর তোমাদের বেড়াতে নিয়ে যাব। সন্ধেবেলা আমার রিসার্চ ল্যাবরেটারি দেখাব। গুড বাই বয়েজ।'

পরেশ এত খেয়েছে নড়তেই পারছে না। ধরে ধরে নিয়ে যেতে পারলেই যেন ভাল হয়।

'এত খেলি কেন পরেশ?'

'ওঁরা দিলেন তাই খেলুম। জীবনে এরকম রান্না কখনও খাইনি রে নবেন্দু! পাগলা করে দিয়েছে।'

'তা দিয়েছে, তবে পেট ছেড়ে দিলে কি করবি।'

'এখানে পেট ছাড়বে! এক এক গেলাস জলই তো হজমি। ও তোরা ভাবিস নি কিছু। আমার হজম যন্ত্রটা এমনিই ভাল চলে।'

পরেশ ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর নবেন্দু চুপচাপ বসে রইলুম, খসখস ফেলা বারান্দায়। বাইরে গোঁয়া গোঁয়া দুপুরের রোদ ঝিম ঝিম করছে। নবেন্দু বললে, 'ব্যাপারটা কি হল বল তো! পাখিগুলো সত্যিই কি মরেনি?

'মরা পাখি অত সহজে চিনতে ভুল হবে! আচ্ছা নবেন্দু, খাবার ঘরে ডক্‌টর শিলারকে তো দেখা গেল না।'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছিস। অপূর্ব, শিলার মানুষটিকে তোর কি রকম মনে হয়েছে?'

'কেমন যেন চাপা মানুষ। চোখ মুখ দেখলে মনে হয় বেশ নিষ্ঠুর।'

ধরেছিস ঠিক। সাপ নিয়ে থাকেন বলেই বোধ হয় অমন মনে হয়। পাখির রহস্যটা পরিষ্কার করতেই হবে। তা না হলে আঙ্কল ভাববেন, আমরা মিথ্যেবাদী।'

'এখন বেরোবি একটু! অনেকক্ষণ তো বিশ্রাম হল।'

'মন্দ বলিসনি, বাগানটা একটু ঘুরে দেখলে হয়।'

রোদের তাপ থেকে বাঁচার জন্যে আমরা একটা করে কপাল চাপা টুপি পরে নিয়েছি। রোদ আর সোজা এসে চোখে লাগছে না।

তা হলেও বাইরেটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। হলকা এসে শরীর পুড়িয়ে দিচ্ছে। নবেন্দুর কথামতো ভরপেট জল খেয়ে নিয়েছি। সহজে লু লাগবে না।

অনেক দূর পর্যন্ত বাগান চলে গেছে। ফুল বাগান নয়। বড় বড় ফলের গাছ। লম্বা লম্বা হাঁটু সমান ঘাস গাছ। সাপ থাকতে পারে। শিলার বলেছিলেন, সাপ সহজে মানুষকে কামড়ায় না। ভয় পেলে তবেই ছোবল মারে। উঁচু নিচু জমি। মাঝে মাঝে পাথরের চাঁই পড়ে আছে। ঘাসের মধ্যে দিয়ে সরসর করে কি যেন একটা চলে গেল লম্বা মতো। মনে হল শরীরটা বেশ বিশাল। ঘাসের মাথাগুলো দুলতে লাগল। জমিটা ক্রমশই ঢালু হয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে চলেছে। বহু দূরে পাহাড়ের কোলে জল চিকচিক করছে। একটা নদী। নদীর ওপরে রেল ব্রিজ।

এক জায়গায় দেখা গেল ঘাস নেই। পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আর সেই জায়গাটায় বেশ বড় মাপের চৌকো কাঁচ বসানো। কি একটা পাখির কঙ্কাল পড়ে আছে। একটা গিরগিটির হাড়। অদ্ভুত দৃশ্য। নবেন্দু বললে, 'শুনেছি ড্রাগনের নিঃশ্বাসে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখানে ড্রাগন আছে না কি রে অপূর্ব!'

'কি জানি ভাই। এই দুপুর বেলাতেই আমার কি রকম গা ছম ছম করছে। গিরগিটির কঙ্কালটা দেখ নবেন্দু। দেখলেই ভয় করে।'

'এই পুরু গ্লাসটা কি ভাবে বসানো দেখেছিস। হঠাৎ এইভাবে এখানে কাঁচ লাগিয়ে রেখেছে কেন?'

'কি জানি ভাই। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।'

এখন আর তেমন গরম লাগছে না। বড় বড় সেগুন, কোটো বাদাম আর শাল গাছের তলায় তলায় বুনো আগাছার ঝোপ। একটা গাছের তলায় কাঠ বেড়ালীরা গাদা গাদা বাদাম জড়ো করেছে। নবেন্দু বললে, 'না, এখানে কিছু পাওয়া যাবে না। কোথায় খুঁজব পাখির ডেডবডি! কিন্তু ব্যাপারটা বড় রহস্যজনক। আচ্ছা, ওই ঘাস পোড়া

জায়গাটায় আর একবার চল তো অপূর্ব !'

আবার আমরা সেই জায়গাটায় এলুম। নবেন্দু নিচু হয়ে অনেকক্ষণ দেখল। পাখির সেই হাড়ের মাথাটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। সরু বাঁকা ঠোঁট।

'বুঝলি অপূর্ব, এটা টিয়ার মাথা। আমার সন্দেহ হচ্ছে !'

'কি বল তো !'

'এইখানেই একটু আগে পাখি পাঁচটাকে পোড়ান হয়েছে !'

'তা হলে আর সব হাড় গোড় গেল কোথায় !'

'হয় পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, না হয় ওই কাঁচের তলায় লোপাট করে দিয়েছে।'

'লোপাট করবে কেন ! পাখি কি মানুষ ! পাখি মরেছে, কোন কারণে মরেছে। তা নিয়ে কার কি মাথাব্যথা থাকতে পারে !'

'তোর কথাই হয়তো ঠিক। তবু আমার মন বলছে। চল চায়ের সময় হয়ে গেল।'

শ্যারন অসুস্থ

ডাইনিং হলের চায়ের টেবিলে আঙ্কলকে দেখতে পেলুম না। একজনকে জিজ্ঞেস করলুম, 'আমাদের আঙ্কল ডকটর ল্যাং কোথায় ? তিনি চা খাবেন না ?'

'তিনি হসপিট্যালে। শ্যারন ভীষণ অসুস্থ।'

'শ্যারন কে ?'

'ওঁর রিসার্চ অ্যাসিসটেন্ট।'

'আমরা একবার যেতে পারি ?'

'কেন পার না ! আমিও তো যাব চা খেয়ে।' যিনি বললেন তিনি একজন প্রবীণ মানুষ। বাঙালী। স্বাভাবিক চেহারা। লম্বা নন, বামন নন শরীরে কোন বিকৃতি নেই।

'আপনিও কি ডাক্তার !'

'ডাক্তার বলতে পার। তবে আমি রেডিওলজিস্ট। নানা রকম 'রে' নিয়ে আমার কারবার, একস রে, গামা রে, কোবাল্ট রে।'

ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আমরা পাশাপাশি হাঁটছি। বাইরের হাওয়ায় রোদের তাপ অনেক কমে এসেছে। বিকেল হয়েছে। আকাশ নীল। দূরের পাহাড় বেশ স্পষ্ট হয়েছে। আবার পাখি-টাখি দেখা যাচ্ছে।

'তোমাদের কিন্তু একটু ক্লাইম্ব করতে হবে। হসপিট্যালটা একটু উঁচু জায়গায়।'

'সে আমরা পারব। গত বছর আমরা স্কাউট থেকে ট্রেনিংএ গিয়েছিলুম।'

'এবারে তোমরা এখানে এলে কি করে !

'হঠাৎ স্টেশনে ডকটরের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। উনি নিয়ে এলেন।'

'ভীষণ ভাল মানুষ। প্রকৃত খ্রীশ্চান। দেবতার মত। একা এত বড় একটা ফাউণ্ডেশান চালাচ্ছেন। বড় কঠিন বিষয়। গবেষণা যদি সফল হয় পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ প্রাণীর জন্মের ঠিক ঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তোমাদের নাম কি ?'

'আমার নাম নবেন্দু।'

'আমার অপূর্ব।'

'আমার পরেশ।'

'আমি ডক্টর বোস।'

হসপিট্যালের সামনে বিশাল একটা বাঁধান চত্বর। সাদা একটা অ্যাম্বুলেন্স্ দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা সাদা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশ চাপা। গায়ে লেখা ডিপফ্রিজ।

একেবারে সর্বাধুনিক হাসপাতাল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। যে ওয়ার্ডে শ্যারন রয়েছেন ডকটর বোস আমাদের সেখানে নিয়ে এলেন।

ডক্‌টর ল্যাং চিন্তিত মুখে একপাশে দাঁড়িয়ে। বেডে যিনি শুয়ে আছেন, অসাধারণ সুন্দরী। জ্ঞান আছে বলে মনে হল না। মুখটা নীল হয়ে আছে।

'আঙ্কল, কি হয়েছে!'

'পয়েজনিং।'

'বিষ! বিষ খেয়েছেন?'

'না, খেয়েছিলেন পাকা পেঁপে।'

'পেঁপে খেয়ে···!'

'হ্যাঁ নবেন্দু, পেঁপেতে স্নেক ভেনম পাওয়া গেছে! যে গাছের পেঁপে সেই গাছের সব ক'টা ফল আমরা টেস্ট করেছি, সবকটাই ডেডলি। সাপের বিষ সারা গাছটায় ছড়িয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, তোমরা যে পেয়ারা গাছটার তলায় মরাপাখি দেখেছিলে, সেই গাছের সমস্ত ফল সাপের বিষে বিষাক্ত হয়ে গেছে অদ্ভুত ব্যাপার।'

'আঙ্কল, দিদি বাঁচবেন!'

'খুব চেষ্টা হচ্ছে। লেট আস সী। শোন, তোমাদের একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি, এখানকার কোন গাছের ফল খাবে না, ফুল শুঁকবে না, কিচেনে বলে দিয়েছি এখানকার কোন ভেজিটেবল ইউজ করবে না।'

'আঙ্কল, অনেক সাপ ছড়িয়ে পড়েছে বুঝি?'

'পরে বলব। আমি নিজেই জানি না। তবে সাবধানে থেক। অবশ্যই মশারি ফেলে শোবে। হাতের কাছে টর্চ রাখবে। সন্ধের পর বাঁধনে রাস্তা ছেড়ে একটুও এদিক ওদিক যাবে না। তোমাদের সঙ্গে এখন আমি বেরোতে পারছি না। ডক্‌টর বোস, আপনি ওদের সামান্য একটু বেড়িয়ে দেবেন?'

'ওঃ মোস্ট গ্ল্যাডলি। পেশেন্টের অবস্থা?'

'যমে মানুষে টানাটানি চলেছে।'

ডক্‌টর বোস আমাদের নিয়ে হাসপাতালের বাইরে এলেন। সাপের

বিষ খেলে মানুষের কি কি হতে পারে।

'ওই ভদ্রমহিলার কি হবে ডাক্তারবাবু।'

'সাপের বিষে মানুষ দু ভাবে মারা যেত পারে ভাই। এক ধরনের সাপ আছে যার বিষে মানুষের স্নায়ু অবশ হয়ে যেতে থাকে। আর এক ধরনের বিষ রক্ত জমাট বেঁধে শরীরে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কি যে এখন হবে বলা শক্ত। আমি অনেকবার বলেছি, ডক্‌টর শিলারকে বিশ্বাস করবেন না। ও সাপের চেয়েও সাংঘাতিক মানুষ। সাপ নিয়ে পাতালে থাকতে থাকতে নিজেই সাপ হয়ে গেছে।'

আমরা চারজনে কথা বলতে বলতে অনেকদূর চলে এসেছি। সামনেই কিছু দূরে সেই বিশাল কাঁচের ডোম। এতক্ষণ যেটাকে আমরা দূর থেকেই দেখেছি। একটা বিশাল কাঁচের গামলা যেন উপুড় হয়ে আছে।

'এটা কি জিনিস ডাক্তারবাবু?'

'আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, এর নিচে আর একটা রাজত্ব আছে, শিলারের রাজত্ব। এই কাঁচের গোলোকের মাথাটা খোলা, ভেতরে বিভিন্ন কোণে আয়না বসানো। এর মধ্যে দিয়ে সেই পাতাল পুরীতে হাওয়া, আলো আর উত্তাপ ঢুকছে। মাঝে মাঝেই দেখবে মাটিতে কাঁচ বসান। ওই একই কারণ। আলো ঢোকার ব্যবস্থা।'

'আপনি কখনও পাতালপুরীতে গেছেন?'

'না ভাই, আমার সাহস নেই। কয়েক লক্ষ সাপ কিলবিল করছে।'

দৈত্য

প্রথমে ভেবেছিলুম গাছতলায় একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্য নয় মানুষ। ডাক্তার বললেন, 'হ্যালো জেমস ?' দৈত্য উত্তর দিলেন, 'হ্যালো ডক।' আমরা প্রত্যেকেই এঁর কাছে যেন শিশুর মতো। ডাক্তারবাবু বড় জোর কোমরের কাছে কি তার একটু ওপরে পড়বেন। আমরা সব পেটের তলায় পড়ে আছি। মুখ দেখতে হলে পেছন দিকে ঘাড় হেলাতে হবে।

ডক্‌টর বোস পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'জেমস এখন পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা মানুষ। জেমস,এই ছেলেরা আমাদের অতিথি।'

জেমস হাসলেন। হেসে বললেন, 'আমি এখন বড় ব্যস্ত। আমার ওপর ভার পড়েছে, সব গাছের ফল সংগ্রহ। শুনলুম আমাদের বাগানের সমস্ত ফল বিষাক্ত হয়ে গেছে।'

জেমসের পিঠে একটা বাসকেট। বিভিন্ন ফলে ভরে উঠেছে।

জেমসের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা সামনে এগিয়ে চললুম। ডক্‌টর বোস বললেন, 'রাশিয়ায় একজন দৈত্য ছিলেন, নাম মাখনভ। হাইট ছিল ন'ফুট চার ইঞ্চি। ওজন ছিল ১৮২ কেজি। এক একটা হাতের চেটোর দৈর্ঘ্য ছিল ১৩ ইঞ্চি। পায়ের পাতার মাপ ছিল ২০ ইঞ্চি। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই রকম একজন মুষ্টিযোদ্ধা ছিলেন, নাম এওয়ার্টা পটগিটার। আমাদের জেমস তাঁদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছেন। জেমসের হাইট প্রায় দশ ফুট। তার মানে প্রায় একতলা উঁচু। প্রকৃতির কি অদ্ভুত খেয়াল। তাই না!'

'সত্যিই তাই।'

আমরা একটা গুহার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। খুব ঘেঁসঘেঁসে লোহার সিক দিয়ে মুখটা বন্ধ। সামনেই একটা নোটিস ঝুলছে।

'সাবধান!'

'এই গুহার মধ্যে কি আছে ডাক্তারবাবু? বাঘ!'

'বাঘের চেয়েও মারাত্মক জিনিস,ভ্যাম্পায়ার। ভ্যাম্পায়ার কাকে বলে জান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রক্তচোষা বাদুড়। এমন জিনিস রাখার কারণ?'

'কারণ একটা কিছু আছে নিশ্চয়। জানেন ডাকতার ল্যাং। ভ্যাম্পায়াররা কোথায় জন্মায় জান? মধ্য আর দক্ষিণ আমেরিকায়। এদের প্রধান খাদ্য হল রক্ত। ধারালো দাঁত দিয়ে শিকারের চামড়া ছিঁড়ে জিভ দিয়ে রক্ত চেটে চেটে খায়। এদের মুখ দেখলেই ভয় করে।'

নবেন্দু বললে, 'একবার দেখা যায় না?'

পরেশ ভয়ে থেমে পড়েছে, 'ডাক্তারবাবু কোনরকমে বেরিয়ে আসবে না তো!'

'না, বেরিয়ে আসার কোন উপায়, নেই দেখছ না লোহার সিক বসান।'

নবেন্দু আবার বললে, 'একবার দেখা যায় না?'

'আচ্ছা, ক্লোজড সার্কিট টিভিতে তোমাদের দেখাব।'

অনেকটা হাঁটা হয়েছে। পথের পাশে একটা কালভার্টে আমরা বসলুম। শুকনো হাওয়া বইছে। সারা শরীরটা যেন চনমন করছে। দুপুরের অত খাওয়া কখন হজম হয়ে গেছে। ডক্‌টর বোস পাইপ ধরাতে ধরাতে বললেন, 'তাহলে লড়াই এবার সত্যিই শুরু হল।'

'কিসের লড়াই?'

'ডক্‌টর ল্যাং আর শিলারের লড়াই।'

'তার মানে?'

'ক্ষমতার লড়াই! এতবড় একটা ফাউণ্ডেশান, প্রচুর টাকা। একজন গবেষণা করছেন জীবন নিয়ে, আর একজন মৃত্যু নিয়ে।'

'শিলার কেন লাঞ্চে এলেন না?'

'কেন আসবেন? তিনি থাকেন পাতালে। পাতালের রাজা।

সেখানে তাঁর আলাদা ব্যবস্থা, আলাদা লোকজন। বেশ কিছু বেদে আর বেদেনী আছে তাঁর পাতাল পুরীতে। বছরে একবার সর্প উৎসব হয়। সে এক দেখবার জিনিস। এই শিলার চাইছেন ডক্টর ল্যাঙকে হটাতে। তোমরা বড় খারাপ সময়ে এসে পড়লে।'

সাঁ করে ভীষণ একটা শব্দ হল। আমরা চমকে উঠেছিলুম। একটা ধোঁয়ার রেখা সোজা উঠে গেল মাটি থেকে আকাশে। ডক্টর বোস বললেন, 'ভয় পাবার কিছু নেই। রকেট। এখান থেকে মাঝে মাঝে রকেট ছোঁড়া হয়। পেনসিল রকেট। ওই দেখ কতদূরে উঠে যাচ্ছে। আশেপাশের লোককে একটু ভয় দেখাবার জন্যে মাঝেসাঝে এই সব করা হয়। আকাশে আগুন ছোঁড়া হয়।'

ধীরে ধীরে আকাশের আলো কমে আসছে। আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা ক্রমশ কালো হয়ে আসছে। নবেন্দু প্রশ্ন করলে, 'আশেপাশের লোককে ভয় দেখাতে হবে কেন?'

'তা না হলেই উৎপাত করবে। একবার এখানে ডাকাত পড়েছিল।'

'ডাকাত!'

'হ্যাঁ গো, ডাকাত। ওই যে দূরের পাহাড়। ওখানে কিনা আছে বাঘ আছে, ময়াল সাপ আছে, ডাকাতদের আড্ডা আছে।'

পাহাড়ের মাথার ওপর একটা তারা ফুটছে। সামনের পথটা সোজা একটা টিলার ওপর উঠে গেছে। সেখানে একটা গোল গম্বুজ বাড়ি।

'ডাক্তারবাবু, ওই গোল বাড়িটায় কি আছে?'

'ওটা একটা ওবজারভেটারি। একটা টেলিস্কোপ বসান আছে। আকাশ দেখা হয়। ওই যে দেখলে লম্বা জেমস, ও একজন মস্ত বড় জ্যোতির্বিদ। সারারাত জেগে জেগে তারা দেখে। ওর ধারণা দিনের পর দিন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকলে হঠাৎ নতুন কি দেখতে পাওয়া যাবে। মাঝরাতের, শেষরাতের আকাশেও নাকি

অনেক অদ্ভুত জিনিস দেখেছে। একদিন ওর কাছেই শুনে নিও।'

আমরা উঠে পড়লুম। অনেকটা পথ ফিরে যেতে হবে। কলোনিতে একে একে নানা রকমের আলো জ্বলে উঠেছে। জোর, কম জোর, নীল, লাল, সাদা। চার্চের চূড়োয় জ্বলছে নীল আলো। একটা টিপ টিপ আলোর মালা এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে।

ডক্টর বোস বললেন, 'তোমরা রাতের বেলা, রাত বারোটার পর ও ঘরের বাইরে বেরোবে না। সময় সময় পাহাড় থেকে বাঘ কি হায়না নেমে আসে। এই গুহাটা থেকে ভ্যাম্পায়ারদেরও ছেড়ে দেওয়া হয় শিকার ধরার জন্যে। চার্চের ঘড়িতে যেই বারোটা বাজবে, শুনতে পাবে, সঙ্গে সঙ্গে সাবধান হয়ে যাবে। আমি নিজেই একবার ভীষণ বিপদে পড়েছিলুম। সে গল্প তোমাদের আর একদিন বলব।'

সন্ধ্যা

আমাদের গেস্ট হাউসের বারান্দায় তিনজন বসে আছি চানটান করে ঠাণ্ডা হয়ে। অল্প অল্প বাতাস আসছে ফুলের গন্ধ মেখে। নরেন্দ্র বললে, 'দেখ অপূর্ব, ডক্টর বোসকে আমার তেমন সুবিধের মানুষ বলে মনে হচ্ছে না। এখানে কি একটা যেন ষড়যন্ত্র চলেছে!'

'ঠিক বলেছিস। আচ্ছা তোর কি বিশ্বাস হয়, রাত বারোটার পর রক্তচোষা বাদুড় ছেড়ে দেওয়া হয়!'

'কি জানি ভাই। ছেড়ে দিলে আবার ধরে কি করে!'

'তাও তো ঠিক কথা। ছাড়লে তো আবার ধরতে হবে।'

'তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার হতে পারে, বাদুড়গুলো হয়তো দিনের আলো ফুটলে নিজেরাই গুহায় ফিরে যায়।'

'তা হতে পারে।'

হঠাৎ চার্চের ঘণ্টা বেজে উঠল। এই সময় তো ঘণ্টা বাজার কথা

নয়। ঘণ্টার শব্দ কেঁপে কেঁপে সারা পাহাড়গুলিতে ছড়িয়ে পড়ছে করুণ আর্তনাদের মতো।

নবেন্দু বললে, 'লক্ষণ ভাল নয়। কেউ মারা গেলেই এই ঘণ্টা বাজে। শ্যারন বোধহয় মারা গেলেন বে অপূর্ব!'

'তা হলে তো আমাদের একবার যেতে হয়।'

'হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। চল বেরিয়ে পড়ি।'

চার্চের মাথার নীল আলোটা জ্বলছে। বহু দূরে হাসপাতাল। পেছনে একটা গাড়ির শব্দ পেলুম আমরা। ছোট্ট একটা স্কুটারভ্যান আসছে। সামনের আসনে ড্রাইভারের পাশে বসে আছেন ডকটর বোস। আমাদের পাশে এসে গাড়িটা থামল। ডক্টর বোস প্রশ্ন করলেন, 'কোথায় চললে তোমরা?'

পরেশ বললে, 'আঙ্কলের কাছে।'

'আঙ্কল! সে আবার কে?'

'ডক্টর ল্যাং।'

'ও তোমাদের আঙ্কল হন বুঝি! ভাল ভাল।' ডকটর বোস অদ্ভুত শব্দ করে হাসলেন। হেসে বললেন, 'চল তোমাদের পৌঁছে দি। পেছন দিকে উঠে পড়ো।'

পেছনের আসনে বসে তাঁর ঘাড়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঘাড়ে তিন থাক চর্বি, তার ওপর এক থাবা কাঁচা পাকা চুল। কেমন যেন গুণ্ডা গুণ্ডা দেখতে।

হাসপাতালের সামনে অনেকের জমায়েত। সকলেরই পরনে কালো পোশাক। বিশপ এসেছেন। শ্যারনের বিছানার মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর ল্যাং। বিষন্ন, করুণ মুখ। পাতলা চশমার তলায় ছলছলে দুটো চোখ। বুকের ওপর ঝুলছে সোনার ক্রুশ। আমাদের দেখে বললেন, 'শি ইজ ডেড! বাঁচান গেল না। এই হত্যার জন্য কে দায়ী! হেট দি সিন, নট দি সিনার। তা হলেও আমি অপরাধীকে ছাড়ব না।'

আঙ্কলের কথা শেষ হল, ওয়ার্ডে ঢুকলেন ডক্‌টর শিলার। বিছানার পাশে নতজানু হয়ে বসে বুকে তুবার ক্রশ আঁকলেন। উঠে দাঁড়ালেন মাথা হেঁট করে। ডক্‌টর ল্যাঙের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কেস অফ সুইসাইড।'

'নো, এ কেস অফ মার্ডার।'

মার্ডার, স্বপ্ন দেখছেন ডক্‌টর ল্যাং। শ্যারন বরাবরই হোমসিক ছিল। এই পরিবেশে সে মানিয়ে চলতে পারল না। 'ইউ নো ইট বেটার দ্যান মি।'

ডকটর শিলার ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেলেন। সারা ঘর নিস্তব্ধ। জুতোর শব্দ ক্রমশ দূর থেকে দূরে মিলিয়ে গেল।

মাঝরাতে শ্যারনকে সমাধি দেওয়া হল একটা ছোট টিলার নিচে ধি ক্ষেত্রে। আকাশে মরা চাঁদ। ফিকে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে পাতলা কাপড়ের পর্দার মতো। সমাধির গর্তে মাটি ফেলার শব্দ হচ্ছে ঝুপ ঝুপ করে।

আঙ্কলের একটা হাত আমার কাঁধে আর একটা হাত নবেন্দুর

'চল, তোমাদের পৌঁছে দি। আমার মনটা ভীষণ ভেঙে গেছে।'

পরেশ হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আঙ্কল, ভ্যাম্পায়ারদের কি এখন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে?'

'ভ্যাম্পায়ার?' ডক্‌টর ল্যাং যেন একটু আশ্চর্য হলেন, 'ভ্যাম্পায়ার এখানে আসবে কোথা থেকে! কে বলেছে তোমাদের এসব উদ্ভট কথা।'

'ডক্‌টর বোস।'

'ও। হঠাৎ এইভাবে তোমাদের ভয় দেখাবার মানে?'

'আঙ্কল, ওই গরাদ বসান গুহাটায় তাহলে কি আছে!'

'আরে দূর, ওটা হল পাগলা গারদ। এখানে কিছু পাগলও

আছে। আমাদের পরীক্ষার কাজে লাগে।' কথা বলতে বলতে আমরা গেস্ট হাউসে এসে পড়েছি। বাইরের বারান্দার আলোটা জ্বলছে। একটু ছিটকে এসেছে গোলাপ বাগানে।

ডক্‌টর ল্যাং ধপাস করে একটা বেতের চেয়ারে বসে পড়লেন। বড় ক্লান্ত। বসে বললেন, 'বাতিটা নিভিয়ে দাও, চারদিকে নেমে আসুক নরম অন্ধকার। আর কিছু পরেই ভোরের আলো ফুটবে।

পরেশ আলোর সুইচটা অফ করে দিল।

ডক্‌টর ল্যাং হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে আছেন। আমরা বসতেই বললেন, 'তোমাদের এমন একটা সময়ে এখানে নিয়ে এলুম যে সময়ে এখানকার পরিবেশটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'কেন এমন হল আঙ্কল?'

'পাওয়ার পলিটিকস। ক্ষমতার লোভ। আর একটা জিনিস জানবে তোমরা, মানুষের উপকার করলেই মানুষ তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এই যে ডক্‌টর শিলার, হি ইজ মাই এনিমি নাম্বার ওয়ান।'

'কেন আঙ্কল?'

'ডক্‌টর শিলার এখন রিসার্চ ছেড়ে ষড়যন্ত্রের নায়ক হয়েছেন। এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা হতে চাইছেন। অথচ এই শিলারকে আজ থেকে সাতবছর আগে আমিই এনেছিলুম ইতালি থেকে।'

ডক্‌টর শিলার

'ডক্‌টর শিলারের বাবা ছিলেন হিটলারের নাজি বাহিনীতে। যুদ্ধ-অপরাধী হিসেবে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তিনিও ছিলেন জীব বিজ্ঞানী। হিটলারের নির্দেশে তিনি এমন একটা জিনিস নিয়ে গবেষণা করেছিলেন যার প্রয়োগে মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে যায় কিংবা অমানুষ হয়ে যায়। শিলার পালিয়ে এলেন প্রথমে গ্রীসে, তারপর

জাত লুকিয়ে ছিলেন ইতালিতে। ইতালিতে আমার সঙ্গে পরিচয়। থাকতেন একটা বস্তিতে। দুবেলা ভাল করে খাবার জোটে না। কোন রোজগার নেই। এক ধরনের ছোট ছোট বিষাক্ত সাপ নিয়ে সন্দেহজনক একটা ছোট্ট কাফেতে এসে সন্ধেবেলা বসে থাকতেন। যে কোন মানুষের জিভে এইসব ছোট্ট সাপের ছোবলে একধরনের নেশা হয়। শিলার এই ভাবেই পুলিশের নজর এড়িয়ে সাপের নেশার কারবার করে সামান্য টাকা রোজগার করতেন। অথচ পণ্ডিত মানুষ। সেই শিলারকে সুস্থজীবনে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম। ভাবলুম, মানব-কল্যাণে তাঁর পাণ্ডিত্যকে কাজে লাগাব। কিন্তু যাঁর বংশের ধারাতেই পাপ, সে পাপ ছাড়া থাকে কি করে। জান নবেন্দু, এই বংশের ধারা নিয়েই আমার গবেষণা। মানুষ কেন লম্বা হয়, বেঁটে হয়, ফর্সা হয়, কালো হয়, চোখের মণি কেন বেড়ালের মত হয়, চুল কেন বাদামী হয়, কুঁচকে যায়, কেন শয়তান হয়, পাগল হয়, সাধু হয়।'

হঠাৎ একটা কাশির শব্দ কানে এল। বারান্দার শেষ কোণে একটা বেতের চেয়ার, এতক্ষণ তো ওই চেয়ারে কেউ ছিলেন না! কে যেন বসে আছেন, সাদা মতো! বুক পর্যন্ত ঝুলে থাকা লম্বা লম্বা সাদা দাড়ি। এক মাথা সাদা চুল। আলোটা জ্বালতে উঠলুম। ডাকতার বারণ করলেন, 'নো লাইট মাই বয়েজ '

ডকটর ল্যাং উঠে দাঁড়ালেন। এগিয়ে গেলেন চেয়ারটার দিকে। হাঁটু মুড়ে বসলেন বৃদ্ধের পায়ের কাছে। বৃদ্ধ তাঁর হাত রাখলেন আশীর্বাদের ভঙ্গীতে ডাকতারের মাথায়। অনেকক্ষণ কথা হল দুজনে। শেষরাতের মরা চাঁদ নেমে এসেছে পশ্চিমের পাহাড়ের মাথার ওপর। অনেক তারাই আকাশ থেকে অদৃশ্য। একটি মাত্র সাহসী তারা এখনও তরল অন্ধকারের গায়ে লেগে আছে।

কানে এল বৃদ্ধ বলছেন, 'আই মাস্ট গো নাও। দি ডে ইজ ব্রেকিং আউট।'

ডাকতার উঠে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ ধীর পায়ে বারান্দা থেকে নেমে

পড়লেন। হাঁটছেন। ধীরে ধীরে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কেমন ঝাপসা হয়ে মিলিয়ে গেলেন। ডাকতার সেই দিকে তাকিয়ে বুকে ক্রশ চিহ্ন আঁকলেন।

'আঙ্কল, উনি কে? কে এসেছিলেন! কি বলে গেলেন।'

নবেন্দুর প্রশ্নে ডাকতার চেয়াব টেনে আবার বসলেন। হাত দুটো হাঁটুর ওপর মোড়া।

'নবেন্দু, তোমরা বিশ্বাস করবে? উনি কোনও জীবিত মানুষ নন! মৃত। আজ থেকে সাতবছর আগে উনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। আমি আজকে যা হয়েছি তা হতে পেরেছি ওনার চেষ্টায়, শিক্ষায়, দীক্ষায়। আমাব গুরু। একটু আগে আমি মনে মনে ওঁকেই স্মরণ করছিলুম। ডকটর ডেভিস, আমার জীবনের সব।'

পরেশ চেয়ার উল্টে আমাদেব ঘাড়ে এসে পড়ছিল। শবীর কাঁপছে, ভূ, ভূ, ভূত '

ডাকতার একটু অসন্তুষ্ট হলেন, 'ভূত শব্দটা বড় নিকৃষ্ট শব্দ। ডোণ্ট ইউস ইট! সে স্পিরিট। তুমি জেনে বাখ পবেশ, মৃত্যুতেই আমরা শেষ হয়ে যাই না, যেতে পাবি না। মানুষকে অত সহজ করে নিও না। সাধাবণ বুদ্ধি দিয়ে জীবনের রহস্য জানা যায় না। আমরা কি আমরা নিজেবাই তা জানি না। পৃথিবীব যে দিকেই তাকাবে সেদিকেই দেখবে বিশাল একটা ইচ্ছার রূপ। লেট দেয়ার বি লাইট অ্যাণ্ড দেয়াব ওয়াজ লাইট। সেই বিশাল ইচ্ছাশক্তির সামান্য অংশও যদি আমরা পেয়ে যাই, আমরা সব কবতে পাবি। আমার ইচ্ছেতেই কোন্ সুদূব থেকে উনি এসেছেন। মানুষ ইচ্ছে করেছে তাই আকাশে উড়ছে। চাঁদে গেছে, গ্রহান্তরে গেছে, নদীকে বেঁধেছে, পর্বতকে নামিয়ে এনেছে।'

নবেন্দু জিজ্ঞেস করলে, 'ডকটর ডেভিস কি বলে গেলেন আঙ্কল!'

'ভয়ঙ্কর এক ষড়যন্ত্রের কথা। আজ থেকে ঠিক সাতদিন পরে বৃষ্টি নামবে এই পাহাড়তলিতে! ঠিক তার তিন দিন পরে ডকটর

শিলার তাঁর সর্পবাহিনী নিয়ে আমাদের আক্রমণ করবেন। তছনছ করে দেবেন এই গবেষণাকেন্দ্র। আমার বড় বিপদের দিনে তোমরা এসে পড়লে। তোমরা বরং আজই চলে যাও নরেন্দু। এখানে আর থেকে কাজ নেই।'

'তা হয় না আঙ্কল। আপনাকে বিপদে ফেলে চলে যাব! আপনার পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই করব। আপনি কিছু ভেবেছেন কি, কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়!'

হ্যাঁ, ডকটর ডেভিস বলে গেলেন।'

'কি বলে গেলেন?'

'তোমরা আমার সোলার ওভেন দেখেছ?'

'দূর থেকে!'

'ওই ওভেনে সাতদিন ধরে শুধু কাঁচ তৈরি হবে। এখানকার পথঘাট সব কাঁচ দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। মসৃণ কাঁচ। জান তো সাপ মসৃণ জায়গায় চলাফেরা করতে পারে না! এক জায়গায় পড়ে পড়ে নড়বে; কিলিবিলি করবে কিন্তু একচুল এগোতে পারবে না। এই ভাবেই ব্যর্থ করে দিতে হবে শিলাবের হানা।'

'তার আগেই আমরা যদি হামলা চালাই! পাতালপুরী আক্রমণ করি!'

'না, শত্রুকেই আগে এগিয়ে আসতে দাও। আক্রান্ত হয়ে আত্ম-রক্ষা করব। সেইটাই হবে আমাদের ধর্ম।'

ডকটর ল্যাং উঠে দাঁড়ালেন। সারারাত জেগে আছেন কিন্তু চেহারা দেখে কিছুই মনে হয় না, যেন তাজা ফুল। বারান্দার এমাথা থেকে ওমাথা একবার পায়চারি করে এলেন। লাল হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। বুকে হাত মুড়ে সেই দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। শেষে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তাহলে তোমরা থাকছ?'

নরেন্দু উঠে দাঁড়িয়েছে। সে বললে, 'নিশ্চয় থাকছি। শুধু

থাকছি না, আপনাকে সাহায্যও করছি। অবশ্য আমাদের ক্ষমতা

'ভেরি গুড। আমি তাহলে এখন যাই। তোমাদের ঘরে আমার সঙ্গে যোগাযোগের টেলিফোন আছে, সেইটা ব্যবহার করবে।'

'আচ্ছা আঙ্কল।'

'সাতটায় ব্রেকফাষ্ট। গেট রেডি. চান করে ফেল, ভাল লাগবে।'

ডকটর ল্যাং এগিয়ে চলেছেন সোজা পূব দিকে দীর্ঘ শরীর। লম্বা লম্বা পা ফেলে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে গেলেন।

পরেশ

গভীর রাতে আমাদের সভা বসেছে ডকটর ল্যাং-এর নিজের ঘরে। বেশ কিছু বিশ্বাসযোগ্য কর্মী চাই। ডকটর শিলারের সঙ্গে কারা কারা হাত মিলিয়ে বসে আছেন বোঝা যাচ্ছে না। কর্মী বাছাই করতে হবে। কিন্তু কি ভাবে? একজন গুপ্তচর চাই। আমি আর নরেন্দু গুপ্তচর হতে রাজি আছি। বড় শক্ত কাজ। সকলের সঙ্গে ভাল মানুষের মতো মিশতে হবে। নজর রাখতে হবে। তাদের কথাবার্তা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতে হবে। সে সময় কোথায়! ডকটর ল্যাং বললেন, 'ঠিক বলেছ, অত সময় কোথায়! আমাকে একটু নিষ্ঠুর হতে হবে। কিছু ফন্দী তৈরি করি।'

'কি ভাবে করবেন? বন্দুক ধরে!'

'না। ওষুধ খাইয়ে।'

'সে আবার কি?'

'বিজ্ঞান, নরেন্দু, বিজ্ঞান। এমন কিছু ওষুধ আছে যা খেলে মানুষের স্মৃতি নষ্ট হবে সাময়িক ভাবে, কিন্তু কাজ করবার ক্ষমতা ঠিকই

থাকবে। বাধ্য বালকের মতো যা করতে বলব তাই করবে।'

'আঙ্কল, তাহলে তাই করুন।'

'কাল সকালের লাঞ্চে চা এবং কফিতে এই ওষুধ থাকবে।'

'আমরাও খাব?'

'না, তোমরা কেন খাবে! তোমাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। সোনালী টিপট থেকে তোমরা কিছু খাবে না। তোমাদের জন্যে টেবিলে থাকবে ছোট্ট সাদা একটা পট। গুড নাইট। আজ তাহলে শুয়ে পড়। তোমরা যেতে পারবে তো! ভয় করবে না।'

'না আঙ্কল।'

'বেশ, তাহলে আমাদের যাত্রা হল শুরু।'

বাইরের আকাশে চাঁদ। ছায়া ছায়া ধোঁয়া ধোঁয়া। আশেপাশে মাটিতে যেখানে কাঁচ বসানো সেখান থেকে নীল আলো ঠিকরোচ্ছে। এমন সুন্দর স্বপ্নময় জায়গা কী রকম অসুন্দর হতে চলেছে! দূরে পাহাড়ে কি যেন ডাকছে। নরেন্দু বললে, ফেউ ডাকছে। বোধ হয় বাঘ বেরিয়েছে রে!'

নরেন্দুর কথা শুনে পরেশ আমার হাত চেপে ধরল। আমাদের সঙ্গে এসে পরেশটা মহা বিপদে পড়েছে।

কিছু দূরে পথের পাশের সাঁকোয় কে যেন বসে আছে। মানুষ না প্রেতাত্মা! এখানে এমন এক বিশ্বাস অবিশ্বাসের জগৎ তৈরি হয়ে আছে, আমাদের সবকিছু গুলিয়ে যাচ্ছে যেন! থেমে পড়লে চলবে না, সাহস করে এগিয়ে যেতেই হবে।

বসে আছেন ডকটর বোস। এত রাতে কি করছেন! ডকটর বোস বললেন, 'আরে এত রাতে তোমরা কোথা থেকে? চাঁদের আলোয় বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি!'

নরেন্দু বললে, 'ঘুম আসছে না কিছুতেই!'

'স্বাভাবিক, নতুন জায়গা তো! আমারই ঘুম আসছে না! এস একটু বসে যাও। এমন সুন্দর রাত! পাহাড়ে আবার ফেউ

ডাকছে, তার মানে বড় মিঞা আজ শিকারে বেরিয়েছেন !'

ডকটর বোসের পাশে একটু বসতেই হল। মুখে পাইপ। তামাকের গন্ধ, ফুলের গন্ধ, ইউক্যালিপটাস পাতার গন্ধ সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা গন্ধময় পরিবেশ।

ডকটর বোস ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'কাল পূর্ণিমা।'

কথা বলতে গিয়ে পাইপটা মুখ থেকে খুলে মাটিতে পড়ে গেল। ডকটব বোস নিচু হলেন পাইপটা কুড়োবার জন্যে। ডকটর বোস যেই সোজা হলেন, পাশেই বসে ছিল পরেশ, পেছন দিকে উল্টে পড়ে গেল ঝপাত করে। পেছন দিকেই ঢালু জমি, আগাছা জঙ্গল। আমরা দুজনেই উঠে দাঁড়িয়েছি, কি হল পরেশের ! নরেন্দু ঢালু জমি বেয়ে নামতে গেল।

ডকটর বোস গম্ভীর গলায় বললেন, 'তোমরা এক পাও নড়বে না। বিপদ হবে। পরেশকে পাবে না। তোমাদেব এই কারণেই বসতে বলেছিলুম। আচ্ছা গুড নাইট।'

ডকটর বোস উঠে দাঁড়ালেন।

নরেন্দু বললে, 'তার মানে ?'

'তাব মানে পরেশ এখন আমাদেব হাতে।'

'আমাদের হাতে মানে ?'

'আমাদেব হাতে মানে, তোমাদেব আক্কেলের হাতের বাইরে। ওই হাঁদা বোকা ছেলেটা এখন আমাদের টোপ। ওই টোপকে বঁড়শিতে বেঁধে এখন বড় মাছটাকে ধরতে হবে। বুঝলে কিছু !'

ডকটর বোস পাইপ টানতে টানতে চলে গেলেন। আমরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি।

'কি হবে নরেন্দু !'

'তাই তো ভাবছিরে ! মহা বিপদ হল বোকা ছেলেটাকে নিয়ে। আমাকে নিয়ে গেল না কেন ?'

'আমাকেও তো নিতে পারত।'

ফেউয়ের ডাক যেন আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। নবেন্দু বললে, 'এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই! চল, আঙ্কেলের কাছে ফিরে যাই।'

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল। দূর থেকে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। বোধ হয় পরেশকে ওরা সর্পরাজত্বে ওই গাড়িতে করেই নিয়ে গেল। ডক্‌টর বোসকে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হল!

'নবেন্দু, ডকটর বোসকে হঠাৎ পেছন দিক থেকে আক্রমণ করলে কেমন হত! আমাদের তো অনেক স্কাউটের প্যাঁচ জানা ছিল।'

'আমার কাছে কয়েক গজ দড়ি থাকলে একবার দেখে নিতুম রে। এখন আর উপায় নেই।'

ডক্‌টর ল্যাঙের ঘরে বাতিদানে বাতি জ্বলছে। টেবিলের ওপর নীল মলাটের একটা মোটা বই। মোলাটে সোনালী অক্ষরে লেখা বাইবেল। তার ওপর একটা ছোট ক্রশ।

'তোমরা ফিরে এলে?'

'পরেশকে ওরা হঠাৎ ধরে নিয়ে গেল।'

'সে কি? কি ভাবে? কারা ধরে নিয়ে গেল?'

'ডকটর বোসই আসল লোক। দলে আর কে কে ছিলেন বোঝা গেল না।

নবেন্দু পুরো ঘটনাটা বলে গেল। ডকটর ল্যাং সারা ঘরে পায়চারি করতে করতে সব শুনলেন। শেষে স্থির হয়ে বসলেন চেয়ারে।'

'পরেশকে কিভাবে উদ্ধার করা যাবে আঙ্কল?'

'যেমন করেই হোক করতে হবে। বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে।'

ঘরের কোণের টেলিফোনটা হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল। টেলিফোনটার পাশেই একটা চৌকো বাক্স, সেই বাক্সটার একটা সুইচ টিপে ডকটর ল্যাং রিসিভারটা কানে তুলে নিলেন, 'হ্যালো, ডকটর

ল্যাং বলছি। ওদিক থেকে যিনি কথা বলছেন তাঁর গলা আমরাও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি:

'শিলার বলছি। গুড আফটারনুন-ডকটর। ঘুম আসছে না কছুতেই। ছেলেটা ভয়ে এত চিৎকার করছে। ভীতু কাঁহাকা। ওই যে শুনুন

পরেশের ভীষণ ভয়ের চিৎকার কানে এল। আবার শিলারেব গলা।

'কিছুই না, ওকে একটা জালের খাঁচায় রেখেছি। তার চারপাশে অজস্র সাপ কিলবিল করছে। ছেলেটা এমন কবছে যেন জীবনে কখনও সাপ দেখে নি। ওই ছেলেটার ওপরেই আমার একটু পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাবার ইচ্ছে আছে। সম্প্রতি বোরাসাপ থেকে আমি এক ধরনের বিষ আবিষ্কার করেছি। ভারি সুন্দর জিনিস। মানুষের রক্তে অল্প অল্প করে মেশালে গায়ের চামড়া সাপের চামড়ার মতো হয়ে যায়। হাউ নাইস, হাউ নাইস। আজ রাতটা যাক, কাল থেকে শুরু করব। ওহে খোকা ঘুমোও ঘুমোও, তুমি আমার মানুষ-গিনিপিগ।

পরেশের চিৎকার আর শিলারের হাসি একসঙ্গে ভেসে এল ।

ডকটর ল্যাং জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি চাইছেন?

'আমি চাই কিংডাম অফ গড। ভগবানের রাজত্বের অধীশ্বর হতে চাই।'

'হোয়াট ইজ দ্যাট। সেটা আবার কি?'

'আমি পড়ে আছি পাতালে। উঠতে চাই মর্তে। সেখান থেকে স্বর্গে।'

'উঠুন না, কে বাধা দিচ্ছে।'

'ইউ, ইউ, আপনি বাধা দিচ্ছেন।'

'আমি?

'ইয়েস। একই বনে দুটো বাঘ থাকতে পারে না। ইউ মাস্ট গো। আপনাকে যেতে হবে।'

'কোথায় যাব?'

'জাহান্নামে। শ্যারন গেছে। পরেশও যাবে। একে একে সবাই যাবে। আমি যে কলকাঠি নেড়েছি তাতে কে কখন যাবে আমি নিজেই জানি না।'

'আমি থাকলে অসুবিধেটা কি হচ্ছে? আমি আছি আমার গবেষণা নিয়ে, আপনারা আছেন আপনাদের নিয়ে। গোলমালটা কোথায়?'

'গোলমাল ক্ষমতা নিয়ে। আপনি আমাদের মাথার ওপর বসে আছেন সব ক্ষমতার অধীশ্বর হয়ে। সেইটাই আমাদের সহ্য হচ্ছে না।'

'আমাদের মধ্যে কে কে আছেন? বহুবচন ব্যবহার করছেন কেন?

'তার কারণ আমার দলে আপনি ছাড়া সবাই আছেন।'

'তাই নাকি? তাহলে আসুন আমরা সকলে বসে ঠিক করি কি-ভাবে কাজকর্ম চলবে, কে চালাবে?'

'বসাবসির কি আছে। ঠিকই হয়ে গেছে আমিই হব সর্বেসর্বা।

বেশ তাই হবে। তার জন্যে শুধু শুধু একটা নিরীহ ছেলেকে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

'আমার রাজত্বে আপনাকে আসতে হবে। একটা চুক্তিপত্রে সই করতে হবে। তারপর মাথা নীচু করে এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যেতে হবে।

'বেশ তাই হবে। তাহলে পরেশকে ছেড়ে দিন।'

'পাগল না কি! আগে দেখাসাক্ষাৎ হোক। লেখালেখি হোক। তারপর মুক্তি। কাল রাত বারোটা। কেমন! ততক্ষণ বোকা ছেলেটাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। গুড নাইট। কালই হবে লাস্ট সাপার।'

কট করে একটা শব্দ হল। শিলার লাইন কেটে দিলেন। ল্যাং রিসিভারটা নামাতে নামাতে বললেন, 'ঈশ্বর এই অপরাধীকে ক্ষমা করুন।'

নবেন্দু বললে, 'স্কাউনড্রেল'।

ডকটর ল্যাং বললেন, 'উত্তেজিত হবে না। বিপদে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। একেই বলে দাবা খেলা। এক পাশে জীবন অন্য পাশে মৃত্যু। খুব সাবধানে খেলতে হবে এ খেলা।'

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না, 'আঙ্কল আপনার নিজের এত ক্ষমতা, এত শক্তি, আপনি কিছু করতে পারছেন না কেন?'

'পারছি না গোটাকতক কারণে। প্রথম কারণ, পরেশ। পরেশ ওদের হাতে বন্দী। দ্বিতীয় কারণ, সৃষ্টি বড় শক্ত কাজ। ধ্বংস তার চেয়ে অনেক সহজ ব্যাপার। একটা জীবন সৃষ্টি করতে পারি না, সহজে মেরে ফেলি কি করে! ডক্‌টর শিলারের রাজত্ব তছনছ করে দিতে আমার কয়েক মিনিট সময় লাগবে।'

নবেন্দু খুব চিন্তিত ভাবে বললে, 'তাহলে কি হবে?'

'কিচ্ছু ভেবো না তোমরা। আজকের রাতটা তোমরা আমার ঘরে কাটাও। আমি একবার সমাধি থেকে ঘুরে আসি।'

'আমরাও যাব।'

'কেন, ভয় করছে?'

'না ভয় নয়। আপনাকে আর একলা ছাড়ব না।'

'বেশ চল।'

বাইরের ঝাপসা ভাবটা কেটে গিয়ে চাঁদের আলোর জোর বেশ যেন বেড়ে গেছে। মা এই রকম জ্যোৎস্না দেখলে বলেন, ফিনিক ফুটছে। মন ভাল থাকলে এমন চাঁদের আলোয় গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

'তোমরা এইখানে একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।'

ডকটর ল্যাং সারি সারি ক্রুশের মধ্য দিয়ে পথ করে করে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন কিছুই বললেন না। সমাধি ক্ষেত্রটা নেহাত ছোট নয়। অনেক মৃত্যু হয়েছে এখানে

বছরের পর বছর ধরে। কেন এত মৃত্যু !

'নবেন্দু, এখানে মানুষ মরে বেশি, তাই না? কত ক্রুশ দেখেছিস?'

'আমার মনে হয় এটা অনেক পুরনো কালের সমাধি। হয়তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকেই এই সমাধিতে মানুষকে কবর দেওয়া হচ্ছে। হয়তো সৈনবাহিনীর ছাউনি ছিল!'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে।'

ডকটর ল্যাংকে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। চোখের সামনে আকাশের গায়ে পাহাড়ের রেখা। বাতাস বইতে শুরু করেছে জোরে। হিস হিস শব্দ হচ্ছে। কি হবে, কি হতে চলেছে কে জানে! পাহাড়ের দিকে এক পাল কুকুর ডাকছে।

দূর থেকে সাদা একটা মূর্তি এগিয়ে আসছে।

নবেন্দু বললে, 'ওই যে আঙ্কল আসছেন।'

ঠিকই বলেছে। আঙ্কল আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মুখে প্রশান্ত হাসি। যেন স্বয়ং যীশু দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের সামনে।

'পেয়ে গেছি নবেন্দু, পেয়ে গেছি দাবার শেষ চাল। আর ভাবনা নেই। চল চল, রাতটা কোন রকমে কাটিয়ে দি। কাল মধ্য রাতে হবে শেষ খেলা।'

আমরা আবার ফিরে এলুম আঙ্কলের ঘরে। ইলেকট্রিক কেটলিতে গরম জল চাপল।

'এক কাপ করে কফি খাওয়া যাক, কি বল। এমন রাতে কফি না খেলে হয়!'

দেয়ালের গা থেকে চাপা আলো ঠিকরাচ্ছে। কেমন যেন একটা স্বপ্নের জগৎ। কফি খাওয়া হল।

'নাও তোমরা এবার একটু শুয়ে পড়। আমি বসে বসে তোমাদের বেহালা বাজিয়ে শোনাই।'

সুরে ঘর ভরে গেল। মনে হল কে যেন দূর থেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কখনো মনে হল পাতার মধ্য দিয়ে বাতাস বইছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়লুম এক সময়ে, আমার মনে নেই, নরেন্দুরও মনে পড়ে না।

শেষ ভোজ

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত বারোটা। পাতালপুরীতে নামার সেই দরজা দিয়ে কিছু আগেই আমাদের গাড়ি নেমে এসেছে। নরেন্দু সামনে বসেছিল। আমি বসেছিলুম পেছনে। আমার পাশে ছোট একটা বাক্স আর আঙ্কেলের বেহালা। ডক্টর ল্যাং গাঢ় নীল রঙের স্যুট পরেছেন! চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা।

গোল একটা ঘরে আমরা বসেছি। লম্বা টেবিল সাদা কাপড়ে ঢাকা। চাপা আলো চারপাশ থেকে একটা আভার মতো বেরিয়ে আসছে। শিলার পরেছেন ম্যাজিসিয়ানদের মতো কালো একটা গাউন। বুকের ওপর গলা থেকে ঝুলেছে চেন দিয়ে বাঁধা দাঁতের মতো সাদা একটা কি জিনিস। ডকটর বোস বসে বসে পাইপ টানছেন। আর যাঁরা রয়েছেন তাঁদের আমরা আগে দেখিনি।

শিলার টেবিলের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। শয়তানের ছবি দেখিনি। মনে হয় এই রকমই দেখতে ছিল। শিলার বললেন, 'ঠিক বারোটা। দিন বদলে গেল, তারিখ বদলাল। এইবার বদলে যাবে আমাদের দু'জনের ভাগ্য।'

শিলার হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপলেন। কিছু দূরে একটা কাঁচের পর্দায় ঝিরঝির করে আলো কেঁপে উঠল। ভেসে উঠল পরেশ। পরেশ একটা চেয়ারে বসে আছে। দু হাত দূরে তারের জালের গায়ে অসংখ্য সাপ কিলবিল করছে।

আমি চিৎকার করে বললুম, 'আমাদের পরেশ।'

শিলার বললেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের পরেশ। এই বার আমার তৈরি কয়েকটা জিনিস দেখাই। মানুষের রূপান্তর।' দৃশ্য পালটে গেল। পর্দায় মধ্যবয়সী একটি মানুষের মুখ। সারা মুখে লাল লাল অসংখ্য ফুসকুড়ি। দেখলেই গাটা কেমন করে ওঠে।

'এক নম্বর মানুষ। এর নাম রেখেছি মিঃ ওয়ার্ট। এক ধরনের সাপের বিষ ধীরে ধীরে শরীরে প্রবেশ করিয়ে আমি এই মানুষটির চামড়ায় রূপান্তর এনেছি।'

পর্দায় ভেসে উঠল দ্বিতীয় আর একটি মুখ। সারা মুখে চাপড়া চাপড়া লাল দাগ। নাকটা থেবড়ে গেছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

'দু'নম্বর মানুষ। নাম রেখেছি, মিঃ লেপার। এক ধরনের কুষ্ঠ। ওই সাপের বিষেরই কেরামতি।' ডক্টর ল্যাং বললেন, 'এই সব বীভৎস পরীক্ষা আমাদের দেখাবার মানেটা কি! আমি তো প্রস্তুত হয়েই এসেছি। পরেশকে এনে দিন আমরা পাহাড়তলি ছেড়ে চলেই যাই।'

শিলার হাসতে হাসতে বললেন, 'মাত্র দুটো দেখেই ভয় পেয়ে গেলেন, এখনও তো অনেক আছে। যেমন ধরুন, আমার পায়ের কাছে একটা বোতাম আছে, সেটাতে চাপ দিলেই আপনারা যে দিকটায় তিনজনে বসে আছেন সেই মেঝেটা চেয়ার সমেত সাঁ করে পেছনের দেয়ালে ঢুকে যাবে, আর সেখানে আছে, এই দেখুন।'

পর্দায় ভেসে উঠল একফালি ঘর, মেঝেতে থিক থিক করছে ছোট ছোট মিশকালো সাপ।

'এরা তাজা মানুষকে চুমু খেতে বড় ভালবাসে।'

ডক্টর ল্যাং বললেন, 'তাই নাকি?'

'তাছাড়া যে চেয়ারে বসে আছেন, সেই চেয়ারের তলায় আছে একটা করে চৌকো বাক্স। তার মধ্যে আছে একটা করে কেউটে সাপ। এমন কায়দা করা আছে, বাক্সটা বের করে না নিলে চেয়ার ছেড়ে ওঠা যাবে না, উঠতে গেলেই ফোঁস করে কামড়ে দেবে পেছনে। ভীষণ বিষাক্ত। মাসখানেকের জমা বিষ রয়েছে দাঁতে।'

ডক্‌টর ল্যাং মনে হল ভীষণ ভয় পেয়েছেন। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি; নবেন্দুর মুখ দেখে কিছু বুঝতে পারলুম না। আসলে ভয়ে আমার মাথাটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছি, মৃত্যু সুনিশ্চিত। এখান থেকে বেঁচে বেরোতে পারব বলে মনে হয় না। মায়ের জন্যে মনটা কেমন যেন ছটফট করে উঠল। মন ছটফট করলেও শরীরটাকে স্থির রাখতে হবে, তা না হলেই ফোঁস করে পাছায় কামড়ে দেবে। ডক্‌টর ল্যাং বললেন, 'তা হলে পরীক্ষা করে দেখতে হয় আপনার বিষ কেমন। যে কোনও বিজ্ঞানীর কাজই হল বিশ্বাস করার আগে পরীক্ষা করে দেখা। এক্সপেরিমেন্ট, অবজার-ভেশান, ইনফারেনস। ভয় পেলে তো চলবে না।'

শেষ কথাটা বলেই ডকটর ল্যাং ঝড়াস করে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমি ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেলেছি। চোখ বুজিয়ে বুজিয়েই ফোঁসের বদলে হাসির শব্দ শুনছি। তীক্ষ্ণ, ধারাল হাসি। ডকটর ল্যাং হাসছেন আর বলছেন, 'ডকটর শিলার, হয় আপনার সাপ ঘুমিয়ে পড়েছে, কিংবা আপনার হিসেবের ভুলে চেয়ার বদলে গেছে, অথবা আপনার আদেশ অমান্য করছে। মনে হয় শেষটাই ঠিক।'

ডকটর শিলারের মুখে চোখে বিব্রত ভাব।

ডকটর ল্যাং বললেন, তোমরাও উঠে দাঁড়াও।'

উঠে দাঁড়াতে পারলেই তো আমরা বেঁচে যাই। আমরা দু'জনেই কলের পুতুলের মত উঠে দাঁড়ালুম। কিছুই হল না।

ডকটর ল্যাং হেসে উঠলেন, 'ডকটর শিলার, এইবার আপনাকে আর একটা সংবাদ দি। আপনার আর একটি ব্যর্থতা। পরেশ এই

মুমূর্তে বাইরে আমার গাড়িতে বসে আছে। আপনার খাঁচা এখন শূন্য।'

'মিথ্যে কথা। হতেই পারে না।'

'বেশ তো আপনার টিভি চালু করুন।'

ডকটর শিলার সুইচ টিপলেন। পর্দায় ভেসে উঠল শূন্য খাঁচা। খাঁচার গায়ে আর সাপ কিলবিল করছে না। ডকটর শিলার হতভম্ব হয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে পাগলের মত বললেন, 'নো নো, দ্যাট কাণ্ট বি। হতেই পারে না।'

'হয় হয়, অনেক কিছুই হতে পারে। যেমন এই মুহূর্তে আপনার পেছন দিকের দেয়ালটা খুলে পড়লে আর···।'

ডকটর শিলার পেছন দিকে তাকাতেই একটা চোখ ঝলসান আলো সারা ঘরে খেলে গেল। যেন বাজ পড়ল। দেয়ালে একটা বিশাল গর্ত তৈরি হয়েছে। প্রথমেই সেই গর্ত দিয়ে গলে এল ভাল্লুক আলি। সে এসেই দু হাতে শিলারকে জাপটে ধরল। তার পেছনেই এল বিশাল লম্বা জেমস। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল ডকটর ল্যাঙের অনুচর বাহিনীতে। শিলার চিৎকার করে বললেন, 'ডকটর বোস, আমাদের সমস্ত সাপ ঘরে ছেড়ে দিন ঃ ওয়াটসন, ওয়াটসন!' ডকটর বোস বসে বসে যেমন পাইপ টানছিলেন সেই রকমই পাইপ টানতে লাগলেন। মৃদু মৃদু হাসছেন। ডকটর ল্যাং বললেন, 'আপনার সব সাপ মরে গেছে ডকটর শিলার। চব্বিশ ঘণ্টা সময় একজন মানুষেব আত্ম-রক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি সময়।'

মোটা মানুষ বিজয়ার দিন যে ভাবে কোলাকুলি করে সেই ভাবে আলি ডকটর শিলারকে তখনও জাপটে ধরে আছে। শিলার রাগে গড়গড় করতে করতে বলছেন, 'ন্যাষ্টি বেয়ার, ইউ স্মেল গার্লিক। আমি পকেটে হাত ঢোকাতে পারছি না তাই, তা না হলে তোর ফুসফুস এখনই আমি ছেঁদা করে দিতে পারতুম।'

ডকটর ল্যাং আদেশের সুরে বললেন, 'মিস্টার জেমস, গিভ হিম এ শট।'

জেমসের হাতে সেই ইঞ্জেকসান লাগাবার জেটগান। ছ্যাঁক করে একটা শব্দ হল। ডকটর শিলার যেন একটু কেঁপে উঠলেন।

ডকটর ল্যাং বললেন, 'এখন আপনার প্রয়োজন প্রচণ্ড ঘুম, সম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের মত মেলামেশা। আর সাপ নয়, সাপের বিষ নয়। এবার পাখি আর ফুল। ওয়াটসন, ওয়াটসন।'

'ইয়েস স্যার।' ধবধবে সাদা পোশাকে ঘরে এলেন ওয়াটসন! চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা।

ডকটর ওয়াটসন, চলুন তা হলে, এঁকে অ্যাসাইলামে রেখে আসি। দীর্ঘ চিকিৎসার প্রয়োজন, তা না হলে ডকটর শিলার একজন উন্মাদ খুনী হয়ে যাবেন।' ডকটর বোস উঠে দাঁড়ালেন। তখনও তাঁর মুখে পাইপ। ডকটর ল্যাং টেবিলের ওপাশ থেকে হঠাৎ তাঁর ডান হাতটা সামনে বাড়িয়ে দিলেন। ডকটর বোস দু'হাত দিয়ে সেই হাতটা চেপে ধরে জোরে জোরে ঝাঁকাতে লাগলেন।

ডকটর ল্যাং বললেন, 'আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রতিষ্ঠান আপনার কাছে কৃতজ্ঞ। চলুন, লেট আস গো আপ।'

গোল গর্তটার মধ্যে দিয়ে আমরা একে একে বেরিয়ে এলুম। কিছু দূর এগোতেই মনে হল বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগছে। আরে, ওই তো মাথার ওপর তারায় ভরা আকাশ। আমরা একে একে উঠে এলুম সেই সমাধি ভূমিতে। সব শেষে বেরিয়ে এলেন ডকটর বোস আর ডকটর ল্যাং। মাটির ওপর একটা ক্রশ শুয়ে ছিল। ডকটর ল্যাং দু'হাত দিয়ে সেটাকে সোজা করে দিতেই গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল। একটা গাড়ি আসছে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। গাড়িটা থামল। একটু পরেই দেখি কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে। আমরা সকলেই চিৎকার করে উঠলুম, 'পরেশ, পরেশ।'

ডকটর ল্যাং বললেন, 'আমাদের হিরো।' দু'হাতে পরেশকে বুকে চেপে ধরলেন।

॥ কি হলো ॥

ডকটর শিলারের অবসন্ন দেহটাকে ওঁরা ধরাধরি করে সেই গুহাটায় নিয়ে গেলেন, যে গুহায় ডকটর বোস বলেছিলেন ভ্যাম্পায়ার আছে। ব্যাপারটা তাহলে কি হল। ডকটর বোস সম্পর্কে আমাদের ধারণা তাহলে পালটাতে হচ্ছে।

'নবেন্দু, সব কেমন যেন গুলিয়ে গেল!'

চার্চের সামনে বেশ বড় একটা জমায়েত। চাঁদের আলো। চার্চের ছায়া। নীল আকাশের দিকে চুড়োটা উঠে গেছে।

'ঠিক বলেছিস অপূর্ব, সবই যেন কেমন গুলিয়ে গেল। কি ভাবে কি হল! ডকটর বোসকে আমরা সন্দেহ করেছিলুম। ডকটর ল্যাং কি তাহলে আমাদের সঙ্গে অভিনয় করলেন?'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

চার্চে ঢোকার সিঁড়ির উঁচু ধাপের আলোছায়ায় ডকটর ল্যাং দাঁড়িয়েছেন, যেন সভা হচ্ছে। ডকটব ল্যাং সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'ফ্রেণ্ডস, আমি আজ আপনাদের ছেড়ে বিদায় নিচ্ছি। বিদায় নিচ্ছি চিরকালের জন্যে। ফর এভার ফর এভার।'

সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'সে কি? সে কি?'

'হ্যাঁ, আমার যাবাব সময় হয়েছে। আপনারা আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন এতকাল। আমি কৃতজ্ঞ। এক সময়ে আমাকে সকলেই ভালবাসতেন। এখন কারুর কারুর মনে আমার সম্পর্কে ঘৃণা জন্মেছে, সন্দেহ জেগেছে আমার ক্ষমতা সম্পর্কে। আমার মনেও প্রশ্ন জেগেছে বিজ্ঞান বড়, না মানুষ বড়! প্রশ্ন জেগেছে সমস্যা আর তার সমাধান বড়, না ক্ষমতার লড়াই বড়। সাধনা বড়, না ব্যক্তিগত ক্ষমতা বড়। উত্তব আমি আজ পেয়েছি। মানুষের তৈরি প্রতিষ্ঠান কখনও নির্দোষ হতে পারে না, মানুষ কখনও ভগবান হতে পারবে না। একদিন শয়তান এসে মানুষকে স্বর্গোদ্যান থেকে তাড়িয়েছিল, ওইটাই মানুষের নিয়তি। ফেট।

আমাকে শেষ মুহূর্তে ডকটর বোস একসঙ্গে বহুপ্রাণ বাঁচাবার কাজে সাহায্য করেছেন। অবশ্য নিঃস্বার্থ ভাবে নয়। তাঁর সঙ্গে আমার চুক্তিই হয়েছিল বিনা রক্তপাতে এই গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান শেষ পর্যন্ত রক্ষা পাবে এবং সব ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। ভদ্রলোকের চুক্তি। একটা কারণে আমি সুখী, ডকটর শিলারের কর্তৃত্বে আপনাদের থাকতে হচ্ছে না! তিনি মানসিক বিকলতায় ভুগছেন। কেন ভুগছেন তাও আমি জানি। বংশের ধারা। এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে কিছু বিকলতার ধারা এই ভাবেই প্রবাহিত হয়। ডকটর বোসের কাছে আমার শেষ অনুরোধ, কিছু শিক্ষিত, স্বেচ্ছাচারী লোক বিজ্ঞানের নামে জীব-জগতের ওপর ভীষণ অত্যাচার চালাবার ছাড়পত্র নিয়ে বসে আছেন, সেই অত্যাচারের কিছু নির্দোষ শিকার আমার অজান্তেই এখানে বন্দী হয়ে আছেন। তাদের তিনি শুধু মুক্তিই দেবেন না, তাদের সুস্থতাও ফিরিয়ে দেবেন। আমি জানি মৃত্যু যত সহজে আনা যায়, জীবন তত সহজে আনা যায় না। সেই জীবনকে প্রয়োজন হলে জীবন দিয়েও বাঁচাতে হবে। আপনারা সুন্দরের সাধনা করুন। বিদায়।'

॥ সামনে সহজ পথ ॥

ডকটর ল্যাং গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বসে আছেন। সামনে সোজা পথ চাঁদের আলোয় খুলছে, ক্রমশ খুলছে। সঙ্গে সেই বাকস আর বেহালা। সামনে নবেন্দু, পেছনে আমি আর পরেশ। নবেন্দু হঠাৎ বললে, 'আপনি হেরে গেলেন আঙ্কল!'

'হেরে? কই, না তো। আমাদেরই তো জিত হল।'

'আমরাই দায়ী।'

'কেন? হ্যাঁ দায়ী, তবে অন্যভাবে। আমাকে তোমরা বাঁচিয়েছ তা না হলে ষড়যন্ত্র করে শ্যারনের মত আমাকেও একদিন হত্যা করত।

'হত্যা!'

'হ্যাঁ, হত্যা। ক্ষমতার লোভে, অর্থের লোভে সারা পৃথিবীতে প্রতিদিন কত মানুষ জীবন দিচ্ছে জান কি?'

'আপনার গবেষণার কি হবে?'

'আমার রিসার্চ শেষ হয়ে গেছে নবেন্দু। আমি সত্যি আবিষ্কার করে ফেলেছি, মানুষ মানুষই থাকবে। পৃথিবী যেভাবে চলছে ঠিক সেই ভাবেই চলবে। পরিপূর্ণ সুন্দর মানুষ আসবে, বিকৃত, বিকলাঙ্গ আসবে, দেবতা আসবে, শয়তানও আসবে। এ খেলা চলতেই থাকবে আবহমান কাল ধরে।'

'আঙ্কল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

'প্রথমে কলকাতায় তোমাদের নামিয়ে দোব। কোন একটা হোটেলে রাত কাটিয়ে প্লেন ধরে চলে যাব সিসিলি। সেখানে অনেক অনেক দিন ধরে একজন মা তাঁর ছেলের জন্যে অপেক্ষা করে আছেন।'

গাড়ির গতি ক্রমশঃ বাড়ছে। পথ কখনও বেঁকেছে, কখনও সোজা। দু'পাশে বন। মাঝে মাঝে পাহাড়। মাঝে মাঝে গ্রাম।

আজও মনে পড়ে আমাদের সেই অভিযানের কথা। আজও চোখের সামনে ভাসছে, আঙ্কল ল্যাং, ডকটর ল্যাঙের মুখ। সেই মুখ। সেই পাহাড়ী পথে, চাঁদের আলোছায়া আর তাঁর সেই শেষ কথা:

তোমরা হলে ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র। তাঁর মতই হবার চেষ্টা কর। অনুশীলন ছাড়া কিছুই হয় না, হবার নয়। প্রেম দিয়ে জীবনকে বাঁধবার চেষ্টা কর। যীশু আমাদের ভালবেসে জীবন দিয়েছিলেন। আমরা সবাই একদিন ঝরে যাব, তাহলে সুগন্ধী ফুলের মত পুজার অর্ঘ্য হয়েই ঈশ্বরের পদতলে ঝরে পড়ি না কেন।